সরল ভারতীয় শিক্ষার বর্ত্তমান সমস্যা

(For Degree and B. T. Students)

অসীম বর্দ্ধন, এম. এ.

মৌলিক লাইব্রেরী
৮-ডি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীতেজেন্দ্রনাথ মৌলিক
মৌলিক লাইব্রেরী
৮-ডি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ—ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১

॥ মূল্য ছয় টাকা পঞ্চাশ নয়া-পয়সা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীক্ষিরোদচন্দ্র পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার বর্ত্তমান সমস্যাগুলি সম্পর্কে সঠিক তথ্য আহরণ করা সহজ নয়। সমস্যাগুলি জটিল এবং একাধিক কার্য্য-কারণ সম্পর্কিত।

শিক্ষাসমস্যা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যায়ে অধ্যয়নের ব্যবস্থা হওয়ায় এ বিষয়ে উপযুক্তভাবে সঙ্কলিত গ্রন্থের প্রয়োজন শিক্ষার্থীরা অনুভব করেছেন। তাঁদের অধ্যয়নের পক্ষে সহায়ক হতে পারে, এমন ভাবেই এই গ্রন্থখানি রচনা করা হলো। যদি এই বইটি ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ হয়, তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। এই বইটি ভবিষ্যতে যাহাতে আরও উন্নত ধরণের হয় সেইজন্য যে কোন পরামর্শ সানন্দে গৃহীত হইবে।

গ্রন্থকার

CONTENTS

সরল

ভারতীয় শিক্ষার বর্তমান সমস্যা

I

OUTLINE SYSTEM OF EDUCATION IN INDIA

[Background—Central Government—State Government—Local Boards—Classification of Institutions—Educational Ladder—Expenditure—Third Five-year Plan—Primary Education—Secondary Education—University Education.]

Q. 1. Give an account of the background of the present educational administrative system in India.

Ans. ভারতের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রশাসন ও পরিচালন নীতি সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা করতে হলে বিগত যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাসের মধ্যে কিছুটা দৃষ্টিপাত করতে হবে। কারণ বর্তমান শিক্ষা প্রশাসন ও পরিচালন নীতির মূল ভিত্তি গঠিত হয়েছে অনেক আগেই। ১৮৫৪ সালের উডের ডিস্‌প্যাচের সুপারিশ অনুসারে বিভিন্ন প্রদেশে ডিপার্টমেণ্ট অব্ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশন গঠিত হয় এবং ১৮৫৭ সালে সরকারী স্বরাষ্ট্র (হোম) দপ্তরে একটি শিক্ষা বিভাগের কাজ সুরু হয়। ১৯০১ সালে লর্ড কার্জন কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরে একজন ডিরেক্টর জেনারেল অব এডুকেশন নিযুক্ত করেন। এই পদটি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীন ছিল এবং মূলতঃ সকল প্রকার শিক্ষা বিষয়ে ভারত সরকারকে পরামর্শ দান করাই ছিল ডিরেক্টর জেনারেলের কর্তব্য।

ন'বছর এই ব্যবস্থা প্রচলিত থাকার পর ১৯১০ সালে কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরে একটি স্বতন্ত্র শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বড়লাটের মন্ত্রণা পর্ষদের মধ্যে একজন শিক্ষাবিষয়ক সদস্য অন্তর্ভুক্ত হন। এই সময়ে ডিরেক্টর জেনারেলের পদটি বিলুপ্ত করা হয়। পরে ১৯১৫ সালে এই পদটি ভিন্ন নামে পুনঃ প্রবর্তিত হয় এবং তখন পদটির নাম হয় এডুকেশন্যাল কমিশনার। ঐ বছরের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ব্যুরো অব এডুকেশনের প্রতিষ্ঠা; এই ব্যুরোটি সমগ্র দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার রিপোর্ট প্রণয়ন ও প্রকাশের কাজে নিযুক্ত হল।

১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারই সমগ্র দেশের শিক্ষানীতি নির্দ্ধারণ ও শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব বহন করতেন। কিন্তু ১৯১৯ সালে মণ্টফোর্ড সংস্কার (Montford Reforms) নীতি ঘোষিত ও প্রবর্ত্তিত হওয়ার পরে প্রাদেশিক শিক্ষানীতি নির্দ্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নবগঠিত প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রীদের ওপর ন্যস্ত হয়। এই সংস্কারের ফলে কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি থেকে প্রাদেশিক শিক্ষানীতির পার্থক্য বৃদ্ধি পায় এবং শুধু তাই নয়, বিভিন্ন প্রদেশের স্বাধীন স্বতন্ত্র শিক্ষানীতি ও প্রশাসনের ফলে প্রাদেশিক বৈষম্যও প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণ মনোভাব যেমন এই ব্যবস্থার ফলে বৃদ্ধি পেতে থাকল, তেমনই একই ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ধারায় পরিচালিত হয়ে শ্রম, চিন্তা ও অর্থের অপচয় ঘটতে লাগল। সমগ্র দেশের সর্ব্বাঙ্গীন সুসংহত শিক্ষানীতি প্রণয়নে বা প্রণয়নের ব্যাপারে কোনরকম নির্দ্দেশদানের ক্ষমতাও কেন্দ্রীয় সরকার হারালেন। এমন কি প্রাদেশিক সরকারগুলিকে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শদান বা প্রাদেশিক শিক্ষাধারাগুলির সুসমঞ্জস সংহতি সাধনের মর্য্যাদাটুকুও কেন্দ্রীয় সরকারের রইল না।

অবশ্য এ ধরণের সংহতি সাধনের প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করেছিলেন। তারই ফলে ১৯২১ সালে একটি সেণ্ট্রাল এডভাইসরী বোর্ড অব্ এডুকেশন সংগঠিত হল, কিন্তু বছর দুয়েক কাজ করার পরেই অকস্মাৎ আর্থিক কারণে সেটি বিলুপ্ত করা হল। একই কারণে কিছুদিন পরে ব্যুরো অব্ এডুকেশন বন্ধ হল এবং ডিপার্টমেণ্ট অব এডুকেশনটি স্বাস্থ্য, ভূমি ও কৃষি দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এইভাবে এডুকেশন্যাল কমিশনারের কাজের পরিধি ও দায়িত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল।

তবে কিছুদিন পরে কর্ত্তৃপক্ষ বুঝতে পারলেন যে, দপ্তরগুলির কাজ বন্ধ করে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হয়নি। হার্টগ কমিটির সুপারিশ মত এই কারণে ১৯৩৯ সালে আবার সেণ্ট্রাল এডভাইসরী বোর্ড অব এডুকেশন সংগঠিত হয়। এই বোর্ডটি ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি সংক্রান্ত দপ্তরে সংশ্লিষ্ট ছিল। বড়লাটের মন্ত্রণা পর্ষদের একজন সদস্য ঐ দপ্তরটির ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।

১৯৪৫ সালে ঐ দপ্তরটিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে পৃথক একটি শিক্ষা বিভাগ সংগঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে বিভাগটি মন্ত্রণালয় (মিনিষ্ট্রি)-এর মর্য্যাদা লাভ করে। দশ বছর পরে এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিশেষ ব্যবস্থাও করা হয়। ১৯৫৮ সালে শিক্ষা ও বিজ্ঞান গবেষণা মন্ত্রণালয়টি পুনর্গঠিত হয় এবং দুটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ের কাজ সুরু হয়, (১) শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং (২) বিজ্ঞান গবেষণা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয় (মিনিষ্ট্রি অব সা[illegible] রিসার্চ এণ্ড কালচারাল এফেয়ার্স)।

এদেশে শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থা কিভাবে গড়ে উঠেছে, এই হল তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। বর্ত্তমানে যে শিক্ষা প্রশাসননীতি প্রবর্ত্তিত রয়েছে, তাতে রাজ্য সরকারগুলিই আগের মত শিক্ষাব্যবস্থার জন্যে দায়ী রয়েছেন এবং এ বিষয়ে দেশের সংবিধান কোনও ব্যাপক পরিবর্ত্তন বা প্রশাসন সংস্কারের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশও দেয়নি। এখন মূলতঃ (১) কেন্দ্রীয় সরকার, (২) রাজ্য সরকার এবং (৩) স্থানীয় সংস্থাগুলির দ্বারাই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রশাসিত ও পরিচালিত হচ্ছে।

Q. 2. Write what you know of the role of Central Goverment of India in the country's educational system.

Ans কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ত্তাধীনে আছে **শিক্ষা মন্ত্রণালয়**। এর ভারপ্রাপ্ত হয়েছেন একজন মন্ত্রী। বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা ধারার মধ্যে যাতে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য ও ঐক্য বজায় থাকে, তার জন্য শিক্ষামন্ত্রী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে থাকেন এবং সমগ্র দেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার মূলনীতিগুলি তিনিই প্রথমে প্রণয়ন করেন। তাঁর সহায়তার জন্য আছেন ডুএকজন উপমন্ত্রী।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও পরিচালনের মূল কর্ত্তা হলেন এডুকেশন্যাল এডভাইসর ; তিনি ভারত সরকারের সেক্রেটারীর মর্য্যাদাসম্পন্ন এবং এই মন্ত্রণালয় পরিচালনার সকল দায়িত্ব তাঁর। এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে আটটি ডিভিশন আছে ঃ

১। প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষা
২। মাধ্যমিক শিক্ষা
৩। উচ্চতর শিক্ষা এবং ইউনেস্কো
৪। হিন্দী
৫। সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ
৬। শারীর শিক্ষা ও প্রমোদন (রিক্রিয়েশ্যন)
৭। ছাত্রবৃত্তি, এবং
৮। প্রশাসন

এই মন্ত্রণালয়ের কাজে সহায়তা করার জন্য আরো কয়েকটি উপদেষ্টা পর্ষৎ ও আইনবদ্ধ সংস্থা আছে। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ঃ (১) সেণ্ট্রাল এডভাইসরী বোর্ড অব্ এডুকেশন, (২) ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্টস্ কমিশন, (৩) অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর সেকেণ্ডারী এডুকেশন, (৪) অল্ ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর এলেমেণ্টারী এডুকেশন, (৫) সেণ্ট্রাল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড, (৬) ডিরেক্টরেট অব হিন্দী, (৭) সেণ্ট্রাল বোর্ড অব স্যাংস্ক্রীট (সংস্কৃত), (৮) ন্যাশন্যাল বোর্ড অব অডিওভিজুয়াল

এডুকেশন, (৯) ন্যাশন্যাল কাউন্সিল ফর য়ুমেন্স্ এডুকেশন, এবং (১০) ন্যাশন্যাল কাউন্সিল ফর রুর্যাল হায়ার এডুকেশন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষা উপদেষ্টা

ডিভিশন	উপদেষ্টা পর্ষদসমূহ	প্রশাসন পরিধি
প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষা	সেণ্ট্রাল এডভাইসী বোর্ড অব এডুকেশন	কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল সমূহ
মাধ্যমিক শিক্ষা	ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্ট্স্ কমিশন	ব্যুরো অব এডুকেশন
উচ্চতর শিক্ষা এবং ইউনেস্কো	অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর সেকেণ্ডারী এডুকেশন	বৈদেশিক শিক্ষা
হিন্দী	অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর এলেমেণ্টারী এডুকেশন	কেন্দ্রীয় পরিচালনাধীন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ (আলিগড়, কাশী, দিল্লী ও বিশ্বভারতী)
সমাজশিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ	সেণ্ট্রাল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড	পাবলিক স্কুলসমূহ
শারীর শিক্ষা ও প্রমোদন	সেণ্ট্রাল বোর্ড অব স্যাংস্ক্রীট	কয়েকটি জাতীয় গবেষণা সংস্থা ও শিক্ষাকেন্দ্র
ছাত্রবৃত্তি	ইত্যাদি	
প্রশাসন		

সেণ্ট্রাল এডভাইসরী বোর্ড অব এডুকেশনের প্রথম সংগঠন হয় ১৯২১ সালে এবং এটি একটি আইনবদ্ধ সংস্থা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সকল কর্ম্মপদ্ধতির প্রধান আলোচনাস্থল এই বোর্ডটি। এতে আছেন :

১। শিক্ষামন্ত্রী (বোর্ডের সভাপতি)

২। এডুকেশন্যাল এডভাইসর

৩। ১৫ জন সরকারী মনোনীত সদস্য (তার মধ্যে ৪ জন হবেন মহিলা)

৪। লোকসভা মনোনীত তিনজন সদস্য এবং রাজ্যসভা মনোনীত দুজন সদস্য

৫। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে ভারতীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের মনোনীত দুজন সদস্য

৬। অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশনের মনোনীত দুজন সদস্য

৭। প্রত্যেক রাজ্য সরকারের একজন প্রতিনিধি (শিক্ষামন্ত্রী)

৮। বোর্ডের কর্ম্মসচিব (ভারত সরকারের নিযুক্ত)

এই বোর্ডের বেসরকারী সদস্যরা তিন বছর কাজ করেন এবং সরকারী বা অন্যান্য সংগঠনের মনোনীত সদস্যগণ সেই সকল সংগঠনের সদস্যপদ থেকে অবসর গ্রহণ করলে তাঁদের এই বোর্ডের সদস্য মর্য্যাদাও লুপ্ত হয়।

এই বোর্ডের সদস্যগণ প্রতি বছর মিলিত হন এবং সর্ব্বভারতীয় গুরুত্ব আছে এমন সকল শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা করেন। এই বোর্ড যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেগুলি অনুসরণ করার জন্য কোনও রাজ্য সরকারই বাধ্য ন'ন। তবে তাঁরা স্বেচ্ছায় বোর্ডের যে কোন সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করার জন্যে নিজ নিজ রাজ্যে সচেষ্ট হতে পারেন। অতএব, সেণ্ট্রাল এডভাইসরী বোর্ড অব এডুকেশনের কাজ কেবল সুপারিশ করার মধ্যেই সীমায়িত রয়েছে। বোর্ডের কর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে আপত্তিজনক কিছু নেই বটে, তবে দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা যে রকম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে বোর্ডের বহু সিদ্ধান্তই বাস্তবে রূপায়িত করা আদৌ সম্ভব হচ্ছে না। ফলে, বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীগণ বোর্ডে থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে তাঁরা পৃথকভাবে শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে মিলিত হয়ে শিক্ষা সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করতে বাধ্য হন।

এই বোর্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে সেণ্ট্রাল ব্যুরো অব এডুকেশন। এই ব্যুরোর কাজ হলো দেশের ও বিদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা ও ভারতের শিক্ষা প্রগতির বিবরণ প্রকাশ করা। এ ছাড়া এই ব্যুরো থেকে শিক্ষাসংক্রান্ত বহু মূল্যবান পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের এ সকল আয়োজন সত্ত্বেও একটি কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, ভারতের বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা একান্তই সীমাবদ্ধ এবং গণশিক্ষা পরিচালনের সামগ্রিক দায়িত্ব রাজ্য সরকারগুলির ওপরেই প্রকৃতপক্ষে ন্যস্ত রয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা পুনর্গঠনের সাধারণ নীতি নির্দ্ধারণ করে রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সংহতি বিধানে সহায়তা করেন, বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সহিত সাংস্কৃতিক যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে সচেষ্ট থাকেন, এবং

আদিবাসী, তপশীলভুক্ত শিক্ষার্থী ও বিদেশে অধ্যয়নেচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে থাকেন। বিদেশে অধ্যয়নরত ভারতীয় শিক্ষার্থীদের কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে লণ্ডনে, ওয়াশিংটনে, বন্ ও নাইরোবিতে ওভারসীজ এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট আছে। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলিতে শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও পরিচালন ক্ষমতা রাখেন; এই অঞ্চলগুলি হল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ, মণিপুর ও ত্রিপুরা। এছাড়া কেন্দ্রীয় পরিচালিত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ পরিচালনভারও কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে আছে; এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হল দিল্লী, আলিগড়, কাশী ও বিশ্বভারতী। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভারতের ১৮টি পাবলিক স্কুলের পরিচালনার পূর্ণ ক্ষমতা সংরক্ষণ করেছেন। কয়েকটি গবেষণা ও শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানও কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রচলিত হয়ে থাকে; যেমন, দিল্লীর সেণ্ট্রাল ইন্‌ষ্টিটিউট অব এডুকেশন; দেরাদুনের ট্রেনিং সেণ্টার ফর এডাল্ট ব্লাইণ্ড, দেরাদুনের সেণ্ট্রাল ব্রেইল প্রেস, দিল্লীর ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব বেসিক এডুকেশন, এবং ন্যাশন্যাল ফাণ্ডামেণ্টাল এডুকেশন সেণ্টার।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে রাজ্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষাখাতে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সাহায্য করা হয় এবং এর মাধ্যমে সমগ্র দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে সুসংহত অগ্রগতি সম্ভব করে তোলার পথে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা করা হয়। তবে কেন্দ্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা সংস্থা বা পরিকল্পনাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত না হলে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয় না; একটি সর্ব্বভারতীয় জাতীয় অনুমোদিত পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে যাঁরা শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাঁদের কথাই বিবেচনা করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের **বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়টি** (মিনিষ্ট্রি অব সায়েন্টিফিক রিসার্চ এণ্ড কালচারাল এফেয়ার্স) ১৯৫৮ সালে সংগঠিত হয়। এই মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সাংস্কৃতিক কার্য্যধারা, বিজ্ঞান গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান এবং টেকনিক্যাল ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে দায়ী থাকেন। বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ ও কানপুরে এই মন্ত্রণালয়ের আঞ্চলিক কার্য্যালয় আছে। এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমগ্র দেশের ২১টি গবেষণা কেন্দ্র পরিচালিত হয়। যেমন জিওডিটিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, জুওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, এবং সেণ্ট্রাল বোর্ড অব জিওফিজিক্স। এছাড়া, এই মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে আছে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান, যথা, ধানবাদের ইণ্ডিয়ান স্কুল অব্ মাইন্‌স্ এণ্ড

এপ্ল্যায়েড্ জিওলজি, দিল্লী পলিটেকনিক, খড়্গপুরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজী, নয়াদিল্লীর ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সায়েন্টিফিক ডকুমেণ্টেশ্যন সেণ্টার, ইত্যাদি। এছাড়া অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে অনেকগুলি বিজ্ঞান সংস্থার ওপরেও এই মন্ত্রণালয়ের কিছু কিছু প্রভাব আরোপিত হয়ে থাকে। উচ্চতর টেকনিক্যাল শিক্ষার ব্যাপারে এই মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ দিয়ে থাকেন অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন।

Q. 3. Describe the functions of State Governments and local boards in the educational administration in India.

Ans. রাজ্যসরকার: ১৯২১ সাল থেকেই স্থানীয় শিক্ষা সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব প্রাদেশিক (বর্ত্তমানে রাজ্য) সরকারের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী বিধান মণ্ডলীর কাছে এ ব্যাপারে দায়ী থাকেন। ভারতের মূল সংবিধানে সেই ধরণের ব্যবস্থাই বিধিবদ্ধ হয়েছে। তবে উন্নততর গবেষণা ও টেকনিক্যাল শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে এই দুটি বিষয় রাজ্য সরকারগুলির আওতা থেকে সরিয়ে এনে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ প্রশাসনভুক্ত করা হয়েছে। এই দুটি বিষয়ে যে বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় ও পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়, সেকথা বিবেচনা করে যাতে অকারণ অপব্যয় না ঘটে, তারই উদ্দেশ্যে এগুলি রাজ্য সরকারের আয়ত্তাধীন রাখা হয়নি।

রাজ্যের মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রশাসন ও পরিচালনার ব্যাপারে রাজ্যসরকারগুলি সম্পূর্ণ স্বয়ংশাসিত। অবশ্য যে শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অর্থসাহায্য দেন, সেগুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ কিছু পরিমাণে স্বীকার করতেই হয়। প্রত্যেক রাজ্যের শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার মূলে থাকেন শিক্ষামন্ত্রী এবং তাঁর সঙ্গে সেক্রেটারী অব এডুকেশন, ডিরেক্টর অব এডুকেশন, পরিদর্শক-মণ্ডলী এবং সাধারণ কর্ম্মচারীবৃন্দ। শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যের শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন এবং তিনিই রাজ্যের বিধানমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দের কাছে শিক্ষানীতির উপযোগিতা ব্যক্ত করেন। সেক্রেটারী অব এডুকেশন সাধারণতঃ প্রশাসনিক কর্ম্মচারী। ডিরেক্টর অব এডুকেশন শিক্ষাদপ্তরের মূলকর্ত্তা এবং শিক্ষামন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা। কোন কোন রাজ্যে তিনিই সেক্রেটারীরূপে কার্য্যভার পরিচালনা করেন।

শিক্ষা বিভাগের মধ্যে শিক্ষার বিভিন্ন শাখা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী থাকেন। ডিরেক্টর অব এডুকেশনের কাজে সহায়তা করেন ইন্সপেক্টরগণ। ইন্সপেক্টর বিভাগে আবার থাকেন বহু ডিষ্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর, সহকারী ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর।

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিচালনা ব্যাপারে রাজ্য সরকারগুলি কিছু কিছু ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে অর্পণ করে থাকেন। কোন কোন আইনবদ্ধ সংস্থা, যেমন, বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশন ইত্যাদি, সংগঠনের মাধ্যমেও রাজ্য সরকার শিক্ষা প্রশাসনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্র সংস্থার হাতে অর্পণ করেন।

স্থানীয় সংস্থা : ভারতের শিক্ষা ধারার প্রশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থায় স্থানীয় সংস্থা (লোক্যাল বোর্ড)-গুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে থাকে। এই সংস্থাগুলি রাজ্য সরকারের সঙ্গেই মিলিতভাবে কাজ করে এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড, ক্যাণ্টনমেণ্ট বোর্ড, টাউন এরিয়া কমিটি বা জনপদ সভা প্রভৃতি নামে পরিচিত। এই সংস্থাগুলির ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকে অনেকখানি ; তবে ১৯১৯ সালের রিফর্ম রিপোর্টের সুপারিশ অনুসারে স্থানীয় শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা সম্পর্কে সংস্থাগুলির যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে বহু রাজ্যেই প্রাথমিক শিক্ষার অধিকাংশ পরিচালনভার এই সমস্ত সংস্থাগুলির ওপরেই ন্যস্ত হয়েছে।

Q. 4. Give an account of the classification of educational institutions and educational ladder prevalent now in India.

Ans : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রেণীবিভাগ : মোটামুটিভাবে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রথমেই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে—অনুমোদিত এবং অননুমোদিত। অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে সেইগুলিকেই বোঝায়, যেগুলিতে সরকারী শিক্ষা দপ্তর, এডুকেশন বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দ্ধারিত পাঠক্রম অনুসরণ ক'রে কোন এক নির্দ্দিষ্ট শিক্ষা-মান অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা হয়। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলিতে সরকারী বা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের পরিদর্শকরা যে কোন সময়ে গিয়ে পরিদর্শন করতে পারেন এবং প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা সরকারী বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে আসনগ্রহণের অধিকার অর্জন করে। যে সব প্রতিষ্ঠানে এধরণের কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের প্রশাসন মানা হয় না, সেগুলিকে অননুমোদিত প্রতিষ্ঠান বলা বলা হয় এবং সেগুলিতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের পছন্দমত কোন ভাষা বা শাস্ত্র শিক্ষাদানের আয়োজন থাকে।

অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারী ও বেসকারী দুশ্রেণীর হয়ে থাকে। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারী শিক্ষাদপ্তর বা স্থানীয় সংস্থার পরিচালনাধীন হয় এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সমিতি বা ব্যক্তিবিশেষের পরিচালনায় চলে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি আবার দুশ্রেণীর হতে পারে : সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত অথবা সাহায্য বহির্ভূত। সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি কতকগুলি

সর্ত্ত অনুসরণ করতে পারলে সরকারী অথবা স্থানীয় সংস্থার তহবিল থেকে অর্থসাহায্য পেতে পারে। অপর পক্ষে সরকারী সাহায্যবহির্ভূত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার্থী-বেতন, দান ও চাঁদার ওপরেই নির্ভরশীল।

১৯৬০ সালে সমগ্র ভারতে অনুমোদিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হয়েছে ৪,৪২,০১৬। এর মধ্যে ৯৫,০৭০টি সরকারী পরিচালনাধীন। ১,৮৯,৬৬৩টি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড পরিচালনা করে থাকে, ১৩,১৭১টি মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত এবং ১,১৪,৬৩৯টি বেসরকারী (১,২৮,২৪৯টি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং ১২,৬৯০টি সাহায্য বহির্ভূত)। এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪,৪৬·৩৯ লক্ষ; শিক্ষকসংখ্যা ১৪·১০ লক্ষ; প্রত্যক্ষ ব্যয়ের পরিমাণ ২২৫·৭২ কোটি টাকা; গৌণ ব্যয় ৭২·০৫ কোটি টাকা (অর্থাৎ শিক্ষাখাতে জাতীয় ব্যয় ২৯৭·৭৮ কোটি টাকা)।

শিক্ষার পর্য্যায়ক্রম ঃ জগতের সকল প্রগতিশীল দেশের মতই ভারতে এক সুপরিকল্পিত পর্য্যায়ক্রম অনুসরণ করে শিক্ষাধারা প্রবর্ত্তিত রয়েছে। এদেশে অবশ্য এখনও প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার আয়োজন যথেষ্ট হয়নি; কেবলমাত্র শহরাঞ্চলগুলিতে কিছু কিছু নার্শারী, কিণ্ডারগার্টেন বা শিশু বিদ্যালয় আছে মাত্র। পরবর্ত্তী পর্য্যায় হল প্রাথমিক শিক্ষা। কোন রাজ্যে চার বছর, কোথাও পাঁচ বছর ধরে প্রাথমিক শিক্ষা চলে এবং এই শিক্ষা সাধারণতঃ সুরু হয় শিশুর ৬।৭ বছর বয়সে এবং ১০।১১ বছর বয়সে সমাপ্ত হয়। নতুন বুনিয়াদি (বেসিক) শিক্ষা পরিকল্পনা অনুসারে কোন কোন রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা পর্য্যায়ের সমতুল জুনিয়র বেসিক স্কুল প্রবর্ত্তিত হয়েছে, তবে সংখ্যায় সেগুলি অল্প। কোন কোন রাজ্যে উচ্চতর প্রাথমিক স্কুল বা ভার্ণাকুলার মিড্‌ল্ স্কুল নামে এক নতুন ধরণের শিক্ষা পর্য্যায় প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হয়েছে; এধরণের স্কুলে মাতৃভাষার মাধ্যমেই সব কিছু শেখানো হয়, আর কোন ভাষা শেখানো হয় না। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে তিন বছর পাঠ দান হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা পর্য্যায় শেষ করে এখানে ভর্ত্তি হওয়া চলে।

মাধ্যমিক শিক্ষা পর্য্যায়ে দুটি স্তর আছে—জুনিয়র অর্থাৎ মিড্‌ল বা সিনিয়র বেসিক স্কুল এবং সিনিয়র অর্থাৎ হাই স্কুল। জুনিয়র স্তরের শিক্ষাকাল বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন—তিন বা চার বছর। পরবর্ত্তী স্তরেও শিক্ষাকাল তিন বা চার বছর। সম্প্রতি কোন কোন রাজ্যে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়েছে। এই নতুন ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষা স্তর থেকে এক বছরের পাঠক্রম হাইস্কুলের পাঠক্রমে যুক্ত করে সেগুলির মান উন্নয়ন করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যায়ে প্রথম ডিগ্রী পাঠক্রমটি সাধারণতঃ চার বছরের—দুবছর ইণ্টারমিডিয়েট এবং দুবছর ডিগ্রী পাঠক্রম। যে সকল রাজ্যে হায়ার

সেকেণ্ডারী (উচ্চতর মাধ্যমিক) স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে ডিগ্রী পর্য্যায়ের পাঠক্রম তিন বছরের এবং ইণ্টারমিডিয়েট স্তর বিলুপ্ত হয়েছে। স্নাতকোত্তর (মাষ্টার্স্) ডিগ্রীর জন্য আরও দুবছর অধ্যয়ন করতে হয় এবং ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য আরও দুবছর।

সাধারণ শিক্ষার জন্য এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ভারতে বহু স্কুল ও কলেজ আছে বাণিজ্য, ইন্‌জিনীয়ারীং, টেকনোলজী, শিক্ষণ, চিকিৎসাবিদ্যা, আইন, কৃষি, বনসম্পদ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য। কোনও পেশাগত শিক্ষা গ্রহণের জন্য কলেজে ভর্ত্তি হতে হলে শিক্ষার্থীকে অন্ততঃ পক্ষে ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়; অবশ্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও পলিটেকনিক বা টেকনিক্যাল বা কারিগরী বিদ্যালয়ে বিশেষ কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের অধিকার অর্জ্জন করা যায়। এছাড়া, বিকলাঙ্গ বা বিপথগামী কিশোরদের জন্যও বিশেষ স্কুলের ব্যবস্থা আছে।

উপরিউক্ত শিক্ষা বিন্যাস থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কলা বা বিজ্ঞান যে কোন পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে কোন শিক্ষার্থীর শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে ১৬ থেকে ১৮ বছর সময় লাগে। যদি কোনও শিক্ষার্থী ৬বছর বয়সে শিক্ষাগ্রহণ সুরু করে, তবে প্রায় ২০।২১ বছর বয়সে ডিগ্রী পর্য্যায়ে উপনীত হতে পারবে।

১১ পৃষ্ঠায় ভারতীয় শিক্ষার পর্য্যায়ক্রম একটি সরল নক্সার দ্বারা বোঝানো হয়েছে। অবশ্য এই পর্য্যায়ক্রম দেশের সর্ব্বত্র একইভাবে অনুসৃত হয় না; আঞ্চলিক এবং স্থানীয় প্রয়োজন ও জনমত অনুসারে এর কিছু কিছু সংশোধন করে নিতে হয়। বিশেষ করে স্কুল শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম পর্য্যায়ক্রম প্রচলিত আছে। যদিও এই বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস চলেছে।

১৯৬০ সালে ভারতের অনুমোদিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৪·৪৫ কোটি (৩·১৬ কোটি ছাত্র এবং ১·২৯ কোটি ছাত্রী)। এই শিক্ষার্থী সংখ্যার ০·৩% ছিল প্রাক্ প্রাথমিক পর্য্যায়ে, ৭২·৫% প্রাথমিক পর্য্যায়ে ২০·৫% মাধ্যমিক পর্য্যায়ে, ১·৮% বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যায়ে এবং অবশিষ্ট ৪·৯% বিবিধ বৃত্তিমূলক বা বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রায় ৭১% শিক্ষার্থী ছিল গ্রামাঞ্চলের।
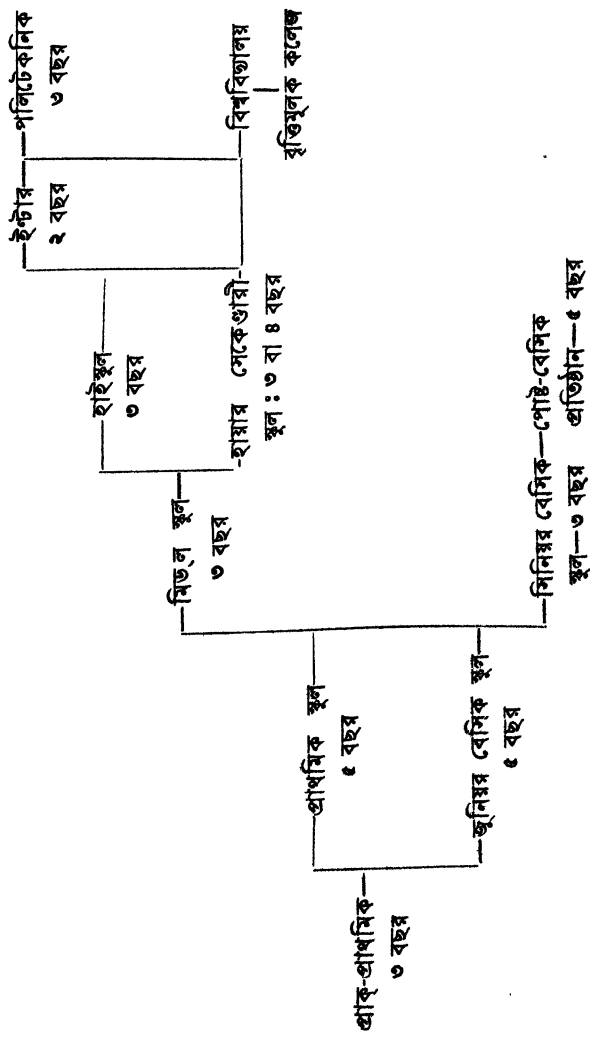
ভারতীয় শিক্ষার
পর্য্যায়ক্রম

ভারতের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রশাসন ও পরিচালনার ব্যাপক সংশোধন হচ্ছে। বহু নতুন পরিকল্পনা রচিত হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই কর্মোদ্যোগ সুরু হয়েছে। অল্পকাল মধ্যেই দেশের শিক্ষা প্রশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থা নবরূপ ধারণ করবে।

Q. 5. Give a brief account of the expenditures involved in Indian education and its significance in relation to literacy in India.

Ans. শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়ঃ শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় হয় দুটি খাতে—প্রত্যক্ষ (direct) এবং গৌণ (indirect) ব্যয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান ও শিক্ষক বেতন বিষয়ক যে সকল খরচ তা হলো প্রত্যক্ষ ব্যয়। পরিদর্শন, বৃত্তিদান প্রভৃতি যে ধরনের খরচ কোন একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের জন্যে নয়, তা হলো গৌণ ব্যয়।

সাম্প্রতিক কালে ভারতের শিক্ষা পরিচালন ব্যবস্থার উভয়বিধ ব্যয়ের পরিমাণই বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪৭ সালে সমগ্র ভারতে শিক্ষা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২০'৫ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার এই খাতে ব্যয় করতেন ২ কোটি টাকারও কম। সম্প্রতি ১৯৬০ সাল পর্য্যন্ত শিক্ষাব্যয়ের যে হিসাব পাওয়া গেছে, তাতে জানা যায়, সমগ্র ভারতে এখন ২৯৯ কোটি টাকারও বেশি প্রতি বছর শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ও ব্যয়িত হচ্ছে। তবে স্মরণ রাখতে হবে, সমগ্র ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ৪০০০ কোটি টাকার প্রয়োজন।

১৯৬০ সালে ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বিভাগ ছিল এইরকম :

প্রাক্-প্রাথমিক স্কুল—	১,৩৫১	বৃত্তিমূলক স্কুল—	৭২৮
প্রাথমিক „ —	৩,২০,৫৮৬	বিশেষ ধরণের শিক্ষার কলেজ—	১৭৭
মাধ্যমিক „ —	৫৭,৮৬৩	গবেষণা প্রতিষ্ঠান—	৪২
কারিগরী স্কুল—	৩,৮৩৬	বোর্ড অব এডুকেশন—	১৩
বিশেষ ধরণের শিক্ষার স্কুল—	৫৬,৪৩৪	বিশ্ববিদ্যালয়—	৪০
কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ক „ —	৯৪৬		

পরিচালন ব্যবস্থা অনুসারে প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রেণীবিভাগ এইরকম :

	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	শিক্ষার্থী সংখ্যা
সরকারী—	৯৫,০৭০	১,০৩,০৯,১১৯
ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড—	১,৮৯,৬৬৩	১,৬০,৬৬,১৬০
মিউনিসিপ্যালিটি—	১৩,১৭১	৩২,১৩,২৩১
বেসরকারী (সাহায্য প্রাপ্ত)—	১,২৮,৯৪৯	১,৩৬,১১,৬০৭
„ (সাহায্য বহির্ভূত)—	১২,৬৯০	১৪,২৮,১০৪

১৯৬০ সালে শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্থাগমের বিভিন্ন পথ ছিল এইরকম :

	%	কোটি টাকা
সরকারী—	৬৭ ৪	২০০.৬
ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড—	৩.৫	১০.৩
মিউনিসিপ্যালিটি—	৩.১	৯.৫
শিক্ষার্থী বেতন—	১৭.৪	৫১.৮
সম্পত্তি তহবিল—	৩.১	৯.২
বিবিধ, চাঁদা ইত্যাদি—	৫.৫	১৬.৪
	১০০	২৯৭.৮

উপরের হিসাব থেকে বোঝা যায় যে, বর্ত্তমানে দেশের সামগ্রিক শিক্ষাব্যয়ের ⅔ সরকারী তহবিল থেকে নির্ব্বাহ হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীদের বেতন থেকে ১৭.৪% ব্যয় নির্ব্বাহ হচ্ছে।

১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুসারে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সাধারণ সাক্ষরতার হার এইরকম :

ক্রম	রাজ্য		প্রতিহাজারে সাক্ষর জনসংখ্যা
১.	দিল্লী—	—	৫১০
২.	কেরলা—	—	৪৬২
৩.	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ		৩৩৬
৪.	গুজরাট—	—	৩০৩
৫.	মাদ্রাজ—	—	৩০২
৬.	মহারাষ্ট্র—	—	২৯৭
৭	পশ্চিমবঙ্গ—	—	২৯১
৮.	আসাম—	—	২৫৮
৯.	মহীশূর—	—	২৫৩
১০.	পঞ্জাব—	—	২৩৭
১১.	লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ—	—	২৩৩
১২.	ত্রিপুরা—	—	২২২
১৩.	উড়িষ্যা—	—	২১৫
১৪.	অন্ধ্র প্রদেশ—	—	২০৮
১৫.	বিহার—	—	১৮২
১৬.	উত্তর প্রদেশ—	—	১৭৫
১৭.	মধ্যপ্রদেশ—	—	১৬৯

ক্রম	রাজ্য		প্রতিহাজারে সাক্ষর জনসংখ্যা
১৮.	রাজস্থান—	—	১৪৭
১৯.	হিমাচল প্রদেশ	—	১৪৬
২০.	জম্মু ও কাশ্মীর—	—	১০৭

সমগ্র ভারতে নারী সাক্ষরতার হার সাধারণ হারের ৫০%-এর কিছু বেশি, যদিও কোন কোন অঞ্চলে প্রতি হাজারে ৬০ জনেরও কম নারী সাক্ষর। ভারতের ন্যায় বিশাল উপমহাদেশে সম্পূর্ণ সাক্ষরতা অর্জ্জনের গুরুদায়িত্বের কথা এই হিসাব থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

Q. 6. State the salient features of the Third Five-year Plan on Education in India.

Ans. ১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬৫-৬৬ পর্যন্ত পাঁচ বছরের জন্য ভারতের পঞ্চবার্ষিকী শিক্ষা পরিকল্পনায় মোট ৪০৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে। শিক্ষার বিভিন্ন খাতে ব্যয় বিভাগ হচ্ছে এইরকম :

		ব্যয় বরাদ্দ (কোটি টাকা)
১।	প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষা—	২০৯
২।	মাধ্যমিক ” —	৮৮
৩।	বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চতর শিক্ষা—	৮২
৪।	অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা—	২৯
		৪০৮

ভারতীয় সংবিধানের ৪৫ ধারার প্রতিশ্রুতি অনুসারে ১৯৬০ সালের মধ্যে (অর্থাৎ সংবিধান বিধিবদ্ধ হওয়ার দশ বছরের মধ্যে) ১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত ভারতের সকল ছেলেমেয়ের অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ার কথা ছিল। ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে ৬-১৪ বছর বয়সের মোট ৬৯০ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ২১০ লক্ষ শিশু প্রাথমিক এবং মিড্‌ল্ স্কুলের তালিকাভুক্ত ছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৩০০ লক্ষ হয়; অবশ্য ইতিমধ্যে ঐ বয়সের ছেলেমেয়ের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭৫০ লক্ষে। ১৯৫৭ সালে পরিকল্পনা কমিশনের বিবেচনায় এই মর্ম্মে সিদ্ধান্ত হলো যে, বাস্তবক্ষেত্রে সংবিধানের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা এইসব কারণে সম্ভব নয়। কমিশনের মতে ১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত সকল ছেলেমেয়ের অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করাই মূল লক্ষ্য থাকলেও তা ১৫।২০ বছর সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা নেওয়াই বাস্তব যুক্তিসম্মত এবং আপাততঃ ১৯৬৫-৬৬ সালের মধ্যে ১১ বছর বয়স পর্য্যন্ত সকল

ছেলেমেয়ের আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা উচিত।

প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভে ৬-১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ১৯১'৫৫ লক্ষ জন স্কুলে পড়তো। ১৯৫৫-৫৬ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৫১'৮৬ লক্ষ—অর্থাৎ ৩০'৭% বৃদ্ধি। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে প্রাথমিক স্কুলগুলির শিক্ষার্থীসংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় আনুমানিক ৩'৪৩ লক্ষ। আদমসুমারীর হিসাবমত এই বয়সের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ১৯৬৬ সালে হবে ৫৮০ লক্ষ।

প্রত্যেক প্রাথমিক স্কুলের চারিপাশের জনসংখ্যার সঠিক হিসাব সংগ্রহ, স্কুলের সুনির্দ্দিষ্ট এলাকা নির্দ্ধারণ এবং নতুন স্কুলের স্থান নির্ব্বাচনের সুবিধার জন্য ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্য্যন্ত একটি ব্যাপক তথ্যসন্ধানী অভিযান পরিচালিত হয়। এই অভিযানের ফলে তিন শ্রেণীর স্কুল-এলাকা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এমন অঞ্চল আছে যেখানে একটি স্বতন্ত্র স্কুলের দরকার, আবার কোন অঞ্চলে কয়েকটি স্কুলের সঙ্ঘবদ্ধ কর্ম্মপদ্ধতি বা ভ্রমন্ত (peripatetic) শিক্ষকের প্রয়োজন। শেষোক্ত শ্রেণীর ব্যবস্থায় একজন শিক্ষক ৩০০ জনের কম লোকবসতিবিশিষ্ট অঞ্চলগুলিতে দূরাঞ্চলে অবস্থিত ছোট ছোট স্কুলগুলিতে পালাক্রমে শিক্ষাদান করে আসবেন। যে অঞ্চলে লোকবসতি ৩০০ থেকে ৪০০, সেখানে একজন শিক্ষকবিশিষ্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হবে এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত থাকবে ১ : ২৫। তথ্যসন্ধানী অভিযানের হিসাবমত ৩০০-জনবসতি বিশিষ্ট অঞ্চলের সংখ্যা ৯০,৩২৮, যেখানে স্কুল প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ এই সব এলাকার জনসংখ্যা হবে ৪০০ এবং তখন সেখানে একজন শিক্ষক বিশিষ্ট স্কুলের দাবী বিবেচিত হবে। ৩০০-জনবসতিপূর্ণ যে ৯০,৩২৮টি অঞ্চলের কথা উল্লেখ করা হলো, ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যে সেগুলির ৫২,৩১৫টিতে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় একজন শিক্ষক-বিশিষ্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হবে ৩৮,০১৩টি এবং সেইসব স্কুলে ৬-১১ বয়সের ২৮ লক্ষ শিশু শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে বলে আশা করা যায়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষা-সম্প্রসারণের জন্য ৪'১ লক্ষ শিক্ষক প্রয়োজন হবে—নতুন স্কুলগুলির জন্য ০'৯ লক্ষ জন এবং বর্তমান স্কুলগুলির জন্য ৩'২ লক্ষ জন। এখন শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে সমগ্র ভারতে ৬৮০টি; তৃতীয় পরিকল্পনা-কালে বৃদ্ধি পেয়ে হবে সহস্রাধিক এবং প্রতি বছর প্রায় ৩৪ হাজার শিক্ষককে শিক্ষণদানের ব্যবস্থা সম্ভব হবে। অবশ্য দেশে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব সম্পূর্ণভাবে দূর করতে হলে আমাদের পঞ্চম পরিকল্পনা পর্য্যন্ত কাজ করে যেতে হবে, শিক্ষা-পরিকল্পনাকারীদের এই অভিমত।

২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ১১-১৪ বয়সের জনসংখ্যার ২২'৫%

অর্থাৎ ৭০ লক্ষ বালকবালিকার মিড্‌ল্‌ স্কুল পর্য্যন্ত শিক্ষাদানের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ার কথা। এই বয়সের জনসংখ্যা ১৯৬৫'-৬৬ সালে হবে ৩৪৮ লক্ষ এবং তার ৩০% অর্থাৎ ১০৫ লক্ষ ছেলেমেয়ের শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। এই হিসাব মত ৩য় পরিকল্পনাকালে আরও ৩৫ লক্ষ শিশুর মিড্‌ল্‌ স্কুলের শিক্ষালাভের আয়োজন করা হবে। এই পরিকল্পনাকালে শিশুর বাসস্থানের তিন মাইলের মধ্যে অন্ততঃ একটিও মিড্‌ল্‌ প্রতিষ্ঠিত করার কথা। ৩য় পরিকল্পনার শেষে ১৪-১৭ বয়সের জনসংখ্যার ১৫'৬% অর্থাৎ ৪৫ লক্ষ ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রতালিকাভুক্ত হতে পারবে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে কিভাবে বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের পূর্ণ অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার আয়োজন করা হয়েছে, তা নীচে দেওয়া হলো :—

(সংখ্যাগুলি % বুঝতে হবে)

পরিকল্পনা	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	
সাল	১৯৫০-৫১	'৫৫-৫৬	'৬০-৬১	'৬৫-৬৬	'৭০-৭১	'৭৫-৭৬	'৮০-৮১	'৮৫-৮৬	'৯০-৯১
প্রাথমিক ৬-১১ বয়স	৪২	৫২'৭	৬৩	১০০					
মিড্‌ল ১১-১৪	১২'৮	১৬'৮	২২'৬	৩০	৬২'২	১০০			
হাই/হায়ার সেকেণ্ডারী ১৪-১৭	৫'৫	৮'১	১১ ৪	১৫'৬	২০	৪০	৬০	৮০	১০০

৩য় পরিকল্পনাকালে বালিকাদের মাধ্যমিক শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, সেণ্ট্রাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দ্রুততর অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে ক্যারীয়ার মাষ্টার্স ও কাউন্সেলর্স ট্রেণিং কোর্সের ব্যাপক আয়োজন থাকবে। এছাড়া ৩০০টি আদর্শ বহুমুখী (মাল্টিপারপাস) স্কুলও প্রতিষ্ঠিত হবে। ৪টি আঞ্চলিক আদর্শ ট্রেণিং কলেজ সংগঠিত হবে। বোর্ড অব এডুকেশনগুলির সঙ্গে একটি করে ব্যুরো অব এগজামিনেশন্স সংশ্লিষ্ট থাকবে। দিল্লীর সেণ্ট্রাল ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশন প্রতিষ্ঠানটিকে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্রে (ন্যাশন্যাল সেণ্টার ফর এডুকেশন্যাল রিসার্চ্‌) উন্নীত করা হবে। ইতিমধ্যে ১৯৫৪ সালে সেণ্ট্রাল ব্যুরো অব টেক্সট্‌ বুক্‌স্‌ রিসার্চ এবং সেণ্ট্রাল ব্যুরো অব এডুকেশন্যাল এণ্ড ভোকেশন্যাল গাইড্যান্স সংগঠিত হয়েছে। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সহায়তায় ইতিমধ্যে ১৯৫৮ সালে হায়দ্রবাদে সেণ্ট্রাল ইনষ্টিটিউট অব ইংলিশও প্রতিষ্ঠিত

হয়েছে। বর্ত্তমানে সমগ্র দেশে ৩৭টি পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট বেসিক ট্রেণিং কলেজ আছে —পরিকল্পনাকালে ঐরকম আরও ১০টি কলেজ গড়া হবে। বিভিন্ন রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার মাধ্যমে যাতে পারস্পরিক সংহতিবোধ ক্রমজাগ্রত হয়ে ওঠে, তার জন্য নানাবিধ উপায় নির্দ্ধারিত ও কার্য্যকরী করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও অসন্তোষ প্রকট হয়ে উঠেছে, তা দূর করে শিক্ষাজগতের উপযুক্ত পরিবেশ পুনরুদ্ধার করার প্রচেষ্টাও ৩য় পরিকল্পনার মধ্যে বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনাকালে নারীশিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীন সম্প্রসারণের জন্য ১৯৫৯ সালে ন্যাশন্যাল কমিটি অন্ য়ুমেন্স এডুকেশন-এর কাছ থেকে সর্ব্বপ্রকার পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৫৫ সালে রুর‍্যাল হায়ার এডুকেশন কমিটি প্রস্তাব করেছেন ৩য় পরিকল্পনাকালে গ্রামাঞ্চলে উচ্চতর ইঞ্জিনীয়ারীং শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে রুর‍্যাল ইনষ্টিটিউট স্থাপন করতে হবে; পরিকল্পনায় এই প্রস্তাব স্থান পেয়েছে। এছাড়া সান্ধ্য ক্লাশে কলেজে শিক্ষাদান, করেসপণ্ডেন্স কোর্সের মারফৎ পত্রযোগে শিক্ষাদানের ব্যাপক সম্প্রসারণ এবং এক্সটার্নাল পরীক্ষা ব্যবস্থার সর্ব্বাঙ্গীন আয়োজন করার পরিকল্পনাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পরিকল্পনাকালে সমগ্র ভারতে যথাসম্ভব একই ধরণের শিক্ষাদান পদ্ধতি, পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থী গ্রহণ (এডমিশন) পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের কথাও বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। কলেজীয় শিক্ষাক্ষেত্রে ১৭-২৩ বয়সের তরুণ-তরুণীদের শিক্ষাদানের আয়োজন কিভাবে পরিকল্পনার মাধ্যমে অগ্রসর হয়ে চলেছে, নীচের হিসাব থেকে বোঝা যাবে:—

বছর	মোট জনসংখ্যা (লক্ষ)	১৭-২৩ বয়সের জনসংখ্যা (লক্ষ)	শিক্ষাগ্রহণরত (লক্ষ)	১৭-২৩ বয়সের কত % শিক্ষাগ্রহণরত
১৯৫০-৫১	৩৬১৮	৪১২	৩'৭৩	'৯৩
'৫৫-৫৬	৩৯১৪	৪৪৫'৬	৬'৩৪	১'৪০
'৬০-৬১	৪৩০৮	৪৯০'৪	৯'০	১'৮৭
'৬৫-৬৬	৪৭৯৬	৫৪৫'৪	১৩'০	২'৩৪

৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্দ্ধারিত হয়েছে এইরকম:—

কর্ম্মসূচী		১৯৬৫-৬৬ লক্ষ্য
১ম—৫ম শ্রেণীতে শিক্ষার্থী সংখ্যা (লক্ষ)	—	৪,৯৬
—ঐ—৬-১১ বয়সের শিশুসংখ্যার %	—	৭৬'৪
৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণীতে শিক্ষার্থী সংখ্যা (লক্ষ)	—	৯৮
—ঐ—১১-১৪ বয়সের জনসংখ্যার %	—	২৮'৬

কর্মসূচী		১৯৬৫-৬৬ লক্ষ্য
৯ম—১১শ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী সংখ্যা (লক্ষ)	—	৪৬
—ঐ—১৪—১৭ বয়সের জনসংখ্যার %	—	১৫·৬
বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখার শিক্ষার্থী সংখ্যা (লক্ষ)	—	১৩
—ঐ— ১৭-২৩ বয়সের জনসংখ্যার %	—	২·৪
বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যায়ের কেবল বিজ্ঞান শাখায় শিক্ষার্থী সংখ্যা (লক্ষ)	—	৪২·৫
প্রাথমিক/জুনিয়র বেসিক স্কুল	—	৪,১৫,০০০
মিড্‌ল/সিনিয়র " "	—	৫৭,৭০০
হাই/হায়ার সেকেণ্ডারী "	—	২১,৮০০
মাল্‌টিপারপাস "	—	২,৪৪৬
ট্রেনিং স্কুল	—	১,৪২৪
" কলেজ	—	৩১২
কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শিক্ষার কলেজ	—	১,৪০০
বিশ্ববিদ্যালয়	—	৫৮
শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের %		
প্রাথমিক স্কুলে	—	৭৫·০
মিড্‌ল "	—	৭৫·০
হাই/হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে	—	৭৫·০

Q. 7. Give an account of the present position of Primary Education in India.

Ans : ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন ও পরিচালনার দায়িত্ব যাঁদের, তাঁরা (১) রাজ্য সরকার, (২) স্থানীয় সংস্থাগুলি (যথা, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি) এবং (৩) বেসরকারী সংস্থাগুলি (অধিকাংশই সরকারী অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত)। নীচের হিসাব থেকে বোঝা যায় ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কোন সংগঠনের ওপর কতখানি রয়েছে :

	প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা %
সরকারী—	২৩·৩
ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড—	৪৭·৯
মিউনিসিপ্যালিটি—	৩·২
বেসরকারী সংস্থা—	২৪·২
অর্থসাহায্য প্রাপ্ত :—	২৪·২
অর্থসাহায্যহীন :—	১·৪

প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার জন্য অর্থব্যয় করা হয় সরকারী তহবিল, স্থানীয় সংস্থা (ডিষ্ট্রিক্ট ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ড) তহবিল, শিক্ষার্থীদের বেতন, সম্পত্তি তহবিল এবং জনসাধারণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদা থেকে। এই পাঁচটি অর্থাগমের উপায় থেকে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কি পরিমাণ অর্থব্যয় করা হয়, তার একটি হিসাব নীচে দেওয়া হলো:

অর্থাগমের পথ	অর্থের পরিমাণ %
সরকারী তহবিল—	৭৩.৬
ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড „	১১.৬
মিউনিসিপ্যাল বোর্ড তহবিল—	৮.৪
শিক্ষার্থী বেতন—	৩.৩
সম্পত্তি তহবিল—	১.২
চাঁদা—	১.৯
মোট	১০০.০

এই হিসাব থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ব্যয়ের বহুলাংশই সরকারী তহবিল থেকে নির্ব্বাহ করা হয়। অবশ্য বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা পরিকল্পনাগুলিকে যথাযথভাবে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার থেকেও অর্থসাহায্য মঞ্জুর করা হয়ে থাকে। তবে এবিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট নীতি নির্দ্ধারিত নেই। স্থানীয় সংস্থা, সম্পত্তি তহবিল এবং জনসাধারণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদা থেকে খুব উৎসাহব্যঞ্জক অর্থও পাওয়া যায় না। অর্থাগমের এই পথগুলি থেকে আরও অর্থ সংগ্রহের আয়োজন করা যেতে পারে।

যে সকল অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক বা আবশ্যিক বলে ঘোষিত হয়েছে, সেখানে স্কুলগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক। যে সকল অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক ঘোষিত হয়নি, সেখানেও সরকারী ও অধিকাংশ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের স্কুলগুলির প্রাথমিক শ্রেণীতে কোন বেতন নেওয়া হয়না। অবশ্য বেসরকারী স্কুলগুলিতে বিভিন্ন হারে বেতন ধার্য্য করা হয়।

প্রাথমিক স্কুলের একজন শিক্ষার্থীর জন্য বছরে গড়ে ২৭ টাকা খরচ হয়। বিভিন্ন রাজ্যে এই ব্যয়ের পরিমাণ বিভিন্ন রকম।

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী অর্থসাহায্যদানের প্রশ্নটি তিনটি পর্য্যায়ে বিবেচিত হতে পারে—(১) কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্য সরকারকে সাহায্য প্রদান, (২) রাজ্য সরকার থেকে স্থানীয় সংস্থাগুলিকে সাহায্য বিতরণ এবং (৩) রাজ্য সরকার বা স্থানীয় সংস্থা থেকে বেসরকারী শিক্ষা সংগঠনগুলিকে অর্থসাহায্য বণ্টন। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে

নির্দ্ধারিত কোন অর্থ মঞ্জুর করেন না; কেন্দ্রীয় সরকার থেকে শিক্ষাখাতে মোটামুটিভাবে অর্থমঞ্জুর হয় এবং রাজ্য সরকারগুলি স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে অর্থ বণ্টন করে দেন। প্রকৃতপক্ষে, রাজ্য সরকারগুলি যে নীতিতে স্থানীয় সংস্থা ও প্রাথমিক স্কুলগুলিকে অর্থসাহায্য বণ্টন করেন, তা বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন। সেই সমস্ত বিভিন্ন অর্থমঞ্জুরী নীতিগুলি এইরকম :—

১। ব্লক-গ্রাণ্ট : পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যপ্রদেশের মত রাজ্যগুলিতে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহের দায়িত্ব স্থানীয় সংস্থাগুলির। সেখানে রাজ্য সরকার স্থানীয় সংস্থাগুলিকে এই খাতে ব্লক-গ্রাণ্ট (এককালীন থোক টাকা) দিয়ে থাকেন।

২। শতকরা গ্রাণ্ট : বিহার, বোম্বাই, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে শতকরা ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে সরকারী অর্থমঞ্জুরী বণ্টিত হয়ে থাকে। রাজ্যসরকার ও স্থানীয় সংস্থাগুলির প্রাথমিক শিক্ষাব্যয়ের শতকরা পরিমাণ অনুসারে অর্থসাহায্য পরিবেশিত হয়। এই শতকরা অর্থমঞ্জুরী বিভিন্ন রাজ্যের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি কর্ম্মপরিধি অনুসারে তারতম্য হয়।

৩। স্থানীয় সংস্থাগুলি সরকারী অর্থসাহায্য ছাড়াও অন্যান্য উপায়ে যে অর্থসংগ্রহ করেন, তার কিছু অংশ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থসাহায্যরূপে স্কুলগুলিকে দিয়ে থাকেন। অবশ্য এ বিষয়ে স্থানীয় সংস্থাগুলির সামর্থ্য নিতান্তই সীমাবদ্ধ এবং রাজ্য সরকারগুলিকেই অধিকাংশ ব্যয়ভার লাঘবের জন্য সরকারী অর্থসাহায্য মঞ্জুর করতে হয়। বোম্বাই রাজ্যে এই নীতি অনুসরণ করা হয়।

উল্লিখিত তিনটি নীতির মধ্যে তৃতীয় নীতিটি অনুসরণ করার দিকেই শিক্ষা সংগঠকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোন কোন রাজ্যে রাজ্যসরকার সম্পূর্ণ নিজেদের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করছেন অথবা স্থানীয় সংস্থা থেকে অর্থসাহায্য পাওয়ার পরেও স্কুলের ব্যয়নির্ব্বাহের আর যতটুকু অর্থ প্রয়োজন হচ্ছে, তা সবই দিয়ে দিচ্ছেন। কোন কোন রাজ্যে শিক্ষকদের বেতনহার বৃদ্ধি, স্কুলভবন নির্ম্মাণ প্রভৃতি সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্যসরকার স্থানীয় সংস্থাগুলিকে ব্লক-গ্রাণ্টও দিচ্ছেন।

বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষামঞ্জুরী বণ্টনের বিভিন্ন রীতি প্রচলিত। কোথাও প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও-বা পরোক্ষভাবে সরকারী অর্থসাহায্য বণ্টিত হয়ে থাকে। মাদ্রাজে অর্থমঞ্জুরী দেওয়া হয় শিক্ষকদের বেতনের ভিত্তিতে; বোম্বাইতে (গুজরাটে) কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে এককালীন অর্থসাহায্য দেওয়া হয়; বিহার রাজ্যে বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের নির্দ্দিষ্ট হারে বৃত্তি দেওয়া হয়; কোনও কোনও মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে স্কুলের বার্ষিক আয়ের কোনও নির্দ্দিষ্ট

শতকরা অংশ অর্থমঞ্জুরী হিসাবে দেওয়া হয়ে থাকে। তবে সরকারী অর্থসাহায্য ও শিক্ষার্থীদের বেতনের পরিমাণ যে পর্য্যাপ্ত নয়, একথা সর্ব্বত্রই স্বীকার করতে হবে। শিক্ষকরা অতি অল্প বেতনে কাজ করে চলেছেন বলেই প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা অব্যাহত থাকা সম্ভব রয়েছে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির (১৯৪৭) পর থেকেই দেশের প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। ১৯৪৮ সালে সমগ্র ভারতে ছিল ১,৪০,১২১টি মাত্র প্রাথমিক স্কুল এবং তাতে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ১১,০০০,৯৬৪ জন। ১৯৬০ সালে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৩১৯,০৭০ এবং তাতে শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৫,৮৫৬,৬১৩ জন।

সরকার বর্ত্তমানে এই নীতি গ্রহণ করেছেন যে, দেশের সামগ্রিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা হবে গান্ধিজী প্রবর্ত্তিত বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে। সেই অনুযায়ী দেশের রাজ্য সরকারগুলি প্রাথমিক স্কুলগুলিকে বুনিয়াদী স্কুলে রূপান্তরিত করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অসংখ্য সমস্যার মধ্যে এই পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করা বিশেষ সহজসাধ্য নয় বলে এখন সকলেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন। ফলে দেশের মধ্যে মূলতঃ প্রচলিত প্রাইমারী স্কুল এবং নতুন ধরণের বুনিয়াদী স্কুল—এই দুধরণের প্রাথমিক স্কুলই চলছে। তাছাড়া বিভিন্ন রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকালও একরকম করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সূচনা ১৯৪৭ সালের পূর্ব্বেই হয়েছে এবং মধ্যভারত, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ও দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চলে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা যথেষ্ট প্রসারলাভ করতে সুরু করেছিল। ১৯৪৮ সালে ভারতের ২২৪টি শহরে এবং ১০,০১০টি গ্রামে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়ে গিয়েছিল। ১৯৬০ সালে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১২১৮টি শহর এবং ৬০,৪৭৮টি গ্রাম। শিক্ষার্থী সংখ্যা হয়েছে ৭৯·২২ লক্ষ (৫১·০৪ লক্ষ বালক এবং ২৮·১৮ লক্ষ বালিকা)।

ভারত স্বাধীন হওয়ার সময়ে ৬-১১ বয়সের মাত্র ৩০% শিশু স্কুলে পাঠগ্রহণের সুযোগ পেতো। ১৯৫১ সালে ঐ বয়সের ৪২% শিশু শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেতে থাকে। ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যাবৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫৩% এবং ২য় পরিকল্পনার শেষে ৬৩% হয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে, ১৯৬৬ সালে ৩য় পরিকল্পনার শেষে দেশের ৬-১১ বয়সের ১০০% শিশুই শিক্ষাগ্রহণের অধিকার অর্জ্জন করতে পারবে। অবশ্য একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ভারতীয় সংবিধানের ৪৫ ধারা অনুসারে ১৯৬১ সালের মধ্যেই ৬-১৪ বয়সের সমস্ত বালকবালিকার আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ার যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব এলেমেণ্টারী এডুকেশন: নিখিল ভারত প্রাথমিক শিক্ষা পরিষদ সংগঠিত হয়েছে ১৯৫৭ সালে, ভারতীয় সংবিধানের প্রতিশ্রুতি মত দেশের আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে যথাসম্ভব দ্রুত প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে। সংবিধানের প্রতিশ্রুতিকে কার্য্যকরী করার জন্যে এই পরিষদ পরিকল্পনা ও কর্ম্মসূচী প্রণয়ন করে থাকেন, প্রয়োজন মত কর্ম্মসূচীর সংশোধন ও পরিবর্ত্তনের অধিকারও তাঁদের দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সমগ্র দেশের অগ্রগতির বিবরণ সংগ্রহ করাও পরিষদটির অন্যতম কর্ত্তব্য। দেশের প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণায় উৎসাহ দান, শিক্ষকদের জন্য তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ, গবেষণা পরিচালনা প্রভৃতি সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভারত সরকার এই পরিষদটিকে যথেষ্ট ক্ষমতা দিয়েছেন।

এই পরিষদে আছেন ২৩ জন সদস্য, প্রত্যেক রাজ্য থেকে একজন করে প্রতিনিধি, সেণ্ট্রাল এডভাইসরী বোর্ড অব এডুকেশনের একজন প্রতিনিধি, অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব সেকেণ্ডারী এডুকেশনের একজন প্রতিনিধি, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মনোনীত কোনও শিক্ষক শিক্ষণ কলেজের একজন অধ্যক্ষ এবং বুনিয়াদী শিক্ষা, বালিকাদের শিক্ষা ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষাক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দুজন শিক্ষাবিদ্। এই পরিষদের সভাপতি কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা উপদেষ্টা এবং কর্ম্মসচিব হলেন ঐ মন্ত্রণালয়ের বুনিয়াদী ও সমাজ শিক্ষা ডিভিশনের প্রধান। পরিষদের বেসরকারী সদস্যগণ দুবছর সদস্যপদে অধিষ্ঠিত থাকেন এবং সরকারী সদস্যগণ পদ পরিবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত সদস্য থাকেন। নয়াদিল্লীতে এই পরিষদের সদর কার্য্যালয়।

Q. 8. Describe the present position of Secondary Education in India.

Ans. ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষা পর্য্যায় সাধারণতঃ সাত বছরে সম্পূর্ণ হয়। এর মধ্যে মোটামুটি দুটি ভাগ আছে, (১) মিড্‌ল বা সিনিয়র বেসিক (উচ্চ বুনিয়াদী) বা জুনিয়র সেকেণ্ডারী (নিম্ন মাধ্যমিক), যে স্তরে ১১-১৩ বছরের ছেলেমেয়েদের তিন বছর শিক্ষাদান করা হয়; এবং (২) হাই (উচ্চ) স্কুল স্তর, যখন ১৩-১৬ বছরের ছেলেমেয়েদের আরও তিন চার বছর শিক্ষাদান করা হয়। বিভিন্ন রাজ্যে এই স্তরগুলিতে শিক্ষাকাল বিভিন্ন রকম। সচরাচর হাইস্কুলেই মিড্‌ল ক্লাশগুলি থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্কুলেই সেগুলি সংযুক্ত করে দেওয়া হয়।

সাম্প্রতিক কালে নতুন ধরণের কয়েক রকম মাধ্যমিক স্কুল গড়ে উঠেছে। যেমন, উত্তর-বুনিয়াদী (পোষ্ট-বেসিক) স্কুল তাদের মধ্যে অন্যতম। উচ্চতর

মাধ্যমিক (হায়ার সেকেণ্ডারী) স্কুল নামে আর এক ধরণের নতুন স্কুল অনেক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে তিন বা চার বছরের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

১৯৬০ সালে সমগ্র ভারতে অনুমোদিত মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ৫৭,৬২৪, এর মধ্যে ৪১,৯২১টি মিড্‌ল্‌ স্কুল, ১১,৯০৬টি হাইস্কুল, ৩,৭৬৩টি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল এবং ৩৪টি উত্তর-বুনিয়াদী স্কুল ছিল। বালিকাদের জন্যে মাধ্যমিক স্কুল ছিল এর মধ্যে ৬,৩৩৭টি। গ্রামাঞ্চলে ছিল ৭৮০৪টি হাইস্কুল বা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল এবং ৩৪০৫০টি মিড্‌ল্‌ স্কুল।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষার্থী সংখ্যার প্রকৃত পরিচয় পেতে হলে মাধ্যমিক স্কুলগুলির প্রাথমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের হিসাব থেকে বাদ দিতে হবে, আবার কোন কোন কলেজের সঙ্গে যুক্ত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা হিসাবে আনতে হবে। ১৯৬০ সালে সমগ্র দেশে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ১,৫৬,৪৬,৩৩৬ জন (১,১২,৫৯,০৫১ বালক এবং ৪৩,৮৭,২৮৫ বালিকা)। ঐ বছরে মিডল স্কুলের শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৮৮,৮৩,৭৯০ জন (৬১,০০,৯০৭ জন বালক এবং ২৮,৮২,৮৮৩ জন বালিকা) এবং হাইস্কুল ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে ছিল ৬৭,৫৮,১৫২ জন (৫১,৫৪,৭৩৪ জন বালক এবং ১৬,০৩,৪১৮ জন বালিকা)। আলোচ্য বছরে সমগ্র দেশের ১১-১৪ বছর বয়সের স্কুল গমনোপযোগী ছেলেমেয়েদের ২০.৭% এবং ১৪-১৭ বৎসর বয়সের ঐরকম ছেলেমেয়েদের ১০·৩% কোনও না কোন মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। এই শতকরা হার বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম।

পরিচালনার ভিত্তিতে মাধ্যমিক স্কুলগুলির শ্রেণীবিভাগ করা যায় এইভাবে :

	স্কুলের সংখ্যা %
সরকারী—	২০·২
ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড—	২৮·১
মিউনিসিপ্যালিটি—	৩·৮
বেসরকারী :	
সাহায্যপ্রাপ্ত—	৩৫·৭
সাহায্য বহির্ভূত—	১২·২
মোট	১০০·০

প্রায় এক-পঞ্চমাংশ মাধ্যমিক স্কুল সরকারী পরিচালনাধীনে আছে এবং প্রায় অর্দ্ধেক মাধ্যমিক স্কুল বেসরকারী পরিচালনাধীন রয়েছে। বেসরকারী স্কুলগুলির প্রায় এক চতুর্থাংশ কোন সরকারী সাহায্য গ্রহণ করে না। স্থানীয় সংস্থাগুলি পরিচালনা করেন প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মাধ্যমিক স্কুল। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী পরিচালনা এখনও বিশেষ সীমিত রয়েছে।

অবশ্য মাধমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সকল দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর অধীনস্থ একটি শিক্ষা দপ্তর আছে; সেখানে একজন শিক্ষা সচিব (সেক্রেটারী) মন্ত্রীকে সহায়তা করেন। এই শিক্ষা দপ্তরটির প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হলেন ডিরেক্টর অব এডুকেশন। কোন কোন রাজ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছে সরকারকে পরামর্শদানের জন্য। এই কমিটিতে সরকারী এবং বেসকারী সদস্যরা থাকেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও দপ্তর ছাড়াও আরও কতকগুলি দপ্তর ও মন্ত্রণালয় প্রতি রাজ্যে এবং কেন্দ্রেও শিক্ষা সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত থাকেন। যেমন, কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় এবং শ্রম মন্ত্রণালয় গুলির পরিচালনাধীনে কয়েকটি করে বিশেষ ধরণের ট্রেনিং স্কুল এবং কলেজও থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল বিভিন্ন দপ্তর ও মন্ত্রণালয়গুলির মধ্যে কোনও সংহতি থাকে না, ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়িত অর্থ ও প্রচেষ্টা অনেকাংশে অপচয় হয়।

তবে মোটামুটিভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকেন রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর। অনুমোদিত স্কুলগুলি কি ধরণের সর্ত্ত ও নিয়মকানুন পালন করে চলবে, তা নির্দ্ধারণ করেন এই দপ্তর। এ ছাড়া বেসরকারী স্কুলগুলিকে সরকারী অর্থসাহায্য মঞ্জুর, স্কুল পরিচালনার নিয়মকানুন প্রণয়ন, পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন ও পাঠক্রম নির্দ্ধারণ প্রভৃতি বিষয়েও রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

ডিরেক্টর অব এডুকেশন্ যিনি, তাঁর সহায়ক হলেন, ডেপুটি ডিরেক্টরগণ এবং বিপুল সংখ্যক আঞ্চলিক পরিদর্শক ও পরিদর্শিকামণ্ডলী। সমগ্র ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনা ও পরিদর্শনের কাজে কত জন নিযুক্ত আছেন, তার একটি সাম্প্রতিক হিসাব এইরকম :—

	পুরুষ	মহিলা	মোট
পরিচালনা কার্য্যে নিযুক্ত	১৩৭	৬	১৪৩
পরিদর্শন " "	৫১৭	৬৩	৫৮০
মোট	৬৫৪	৬৯	৭২৩

এই বিশাল দেশে এত অল্পসংখ্যক প্রশাসন কর্ম্মী নিয়ে সমগ্র মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। এই কারণেই মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫৩) বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে পরিদর্শন ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটি পূর্ণ। পরিদর্শক একটি স্কুলে যে সময়ের মধ্যে পরিদর্শন কার্য্য সমাধা করেন, তা নিতান্ত অপর্য্যাপ্ত।

কোন কোন রাজ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড বা ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষা বোর্ড সংগঠিত আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৮৮২)-এর সুপারিশক্রমেই

এই ব্যবস্থা এদেশে প্রবর্ত্তিত হয়েছে। ১৯৬০ সালে ভারতে এধণের সংগঠন ছিল ১৩টি।

আজমীরে যে সেণ্ট্রাল বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশন আছে, ভারত সরকার সম্প্রতি সেটিকে পুনর্গঠিত করেছেন। এখানে সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, ফলে ভারতের যে কোন রাজ্যের বা অঞ্চলের শিক্ষার্থী কার্য্যবশতঃ অন্য রাজ্যে গেলেও পরীক্ষার পাঠক্রম পরিবর্ত্তনের অসুবিধার সম্মুখীন হবে না। যে সব শিক্ষার্থীর অভিভাবক কার্য্যবশতঃ প্রায়ই এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত হয়ে থাকেন, তাদের পক্ষে এই ব্যবস্থা খুব সুবিধাজনক হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়নির্ব্বাহের কতখানি কোন্ কর্ত্তৃপক্ষ বহন করে থাকেন, তা নীচের হিসাব থেকে বোঝা সহজ হবে :

	টাকা %
সরকারী তহবিল—	৪৬·৬
ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড তহবিল—	৪·৭
মিউনিসিপ্যালিটি „ —	২·০
শিক্ষার্থীদের বেতন—	৩৭·৮
সম্পত্তি তহবিল—	২·৮
চাঁদা—	৬·১
মোট	১০০·০

এই হিসাব থেকে বোঝা যায় যে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী তহবিল থেকে প্রায় অর্দ্ধেক ব্যয় বহন করা হচ্ছে। তবে এই হিসাব বিভিন্ন রাজ্যে একরকম নয়। তবে সকল রাজ্যেই শিক্ষাক্ষেত্রের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য একটি বিশেষ নির্ভরযোগ্য অর্থাগমের উপায় হলো শিক্ষার্থীদের বেতন।

বেসরকারী স্কুলগুলির প্রসার ও উন্নতির জন্য সরকারী অর্থসাহায্য দেওয়ার রীতি আছে। এই অর্থমঞ্জুরীর পরিমাণ রাজ্যবিশেষে তারতম্য হয়। যে সকল উদ্দেশ্যে এই অর্থ সাহায্য সাধারণতঃ দেওয়া হয়ে থাকে, সেগুলি মোটামুটি :

১। শিক্ষণ (ট্রেনিং) গ্রহণরত শিক্ষকের ভাতা,
২। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য চিকিৎসকের দক্ষিণা,
৩। অনাথ শিক্ষার্থীদের আবাস পরিচালনার ব্যয়,
৪। স্কুলভবন ও ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ ও সম্প্রসারণ,
৫। আসবাবপত্র, সরঞ্জাম, রাসায়নিক উপকরণ এবং গ্রন্থাগারের বই,
৬। স্কুলভবন, ছাত্রাবাস বা ক্রীড়াভূমির জন্য জমি সংগ্রহ,

৭। শিল্প বা কারিগরী শিক্ষা,

৮। মেরামতী খরচ।

প্রত্যেক রাজ্যেই যে উপরোক্ত সকল উদ্দেশ্যেই সরকারী অর্থসাহায্য বন্টিত হয়, তা নয়। ভারত সরকারও অনুমোদিত ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে অর্থসাহায্য করে থাকেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সকল অর্থসাহায্য বিতরিত হয়।

অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর সেকেণ্ডারী এডুকেশন :—মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশমত ১৯৫৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর সেকেণ্ডারী এডুকেশন সংগঠিত হয়। ১৯৫৮ সালে কাউন্সিলটি পুনর্গঠিত হয়েছে। একটি উপদেষ্টা পরিষদ রূপেই এই সংস্থাটির কাজ চলছে। এতে সভাপতিরূপে আছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক শিক্ষা ডিভিশনের যুগ্ম সচিব এবং অন্যান্য সদস্যরূপে আছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ডিরেক্টরেট অব্ এক্সটেনশ্যান প্রোগ্রাম্‌স্ ফর সেকেণ্ডারী এডুকেশন-এর কর্ম্মকর্ত্তা, শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক অব-উপদেষ্টা, অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেক্‌নিক্যাল এডুকেশনের একজন প্রতিনিধি, য়ুনিভার্সিটি গ্রাণ্ট্‌স্ কমিশনের একজন প্রতিনিধি, অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর্ এলেমেণ্টারী এডুকেশনের একজন প্রতিনিধি। অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অব এডুকেশন্যাল এসোশিয়েশন্‌স্-এর একজন প্রতিনিধি, এসোশিয়েশন অব প্রিন্সিপ্যাল্‌স্ অব্ ট্রেণিং কলেজেস্-এর একজন প্রতিনিধি, প্রত্যেক রাজ্য সরকারের এক একজন প্রতিনিধি, ভারত সরকার মনোনীত মাধ্যমিক শিক্ষায় অভিজ্ঞ পাঁচজন। এই সংস্থাটির কর্ম্মসচিব রয়েছেন মাধ্যমিক শিক্ষা ডিভিশনের কর্ম্মকর্ত্তা।

অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর সেকেণ্ডারী এডুকেশনের কর্ম্মধারার মধ্যে আছে :

(১) সমগ্র দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে এই কাউন্সিল অভিমত প্রকাশ করবেন এবং সকল স্তরে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার সম্পর্কে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে সর্ব্বপ্রকার পরামর্শ দেবেন।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি এ বিষয়ে কাউন্সিলের কাছে যে সকল প্রস্তাব উত্থাপন করেবন, সেগুলি সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করে যথাযথ সুপারিশ করবেন।

(৩) ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এবং লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই কাউন্সিল মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন সম্পর্কে নতুন প্রস্তাবও প্রণয়ন করবেন।

(৪) প্রয়োজন হলে এই কাউন্সিল সকল স্তরের মাধ্যমিক শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে গবেষণার জন্য প্রস্তাব বিবেচনা করে যথাযথ সুপারিশ করবেন।

(৫) এই কাউন্সিল প্রয়োজন মত কমিটি নিয়োগ করে মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নের উদ্যোগ করতে পারেন।

ডিরেক্টরেট অব্ এক্সটেনশন্ প্রোগ্রামস্ ফর সেকেণ্ডারী এডুকেশন নামে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যে দপ্তরটি আছে, তার অধীনে আছে পাঁচটি সাব-কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির কার্য্যনির্ব্বাহের উদ্দেশ্যে: (১) উচ্চতর মাধ্যমিক ও বহুসাধক স্কুল, (২) পাঠক্রম ও পরীক্ষা সংস্কার। (৩) কার্য্যরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ। (৪) গবেষণামূলক পরীক্ষানিরীক্ষা ও শিক্ষক; এবং (৫) বিজ্ঞান শিক্ষা।

বর্ত্তমানে ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষা পর্য্যায়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত আছে সাধারণতঃ নিম্নোক্ত বিষয়গুলি: (১) ইংরেজী, (২) অঙ্ক, (৩) মাতৃভাষা, (৪) ইতিহাস ও ভূগোল, (৫) বিজ্ঞান, এবং (৬) একটি প্রাচীন ভাষা। কোনও কোনও রাজ্যে বৃত্তিমূলক পাঠ্যবিষয়ও প্রবর্ত্তিত হয়েছে। বর্ত্তমান পাঠক্রমের ত্রুটি সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বলেছিলেন:

(১) বর্ত্তমান পাঠক্রম সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গঠিত;

(২) এই পাঠক্রম পুঁথিকেন্দ্রিক এবং তত্ত্বমূলক;

(৩) এই পাঠক্রম বিপুল, অথচ মূল্যবান ও তাৎপর্য্যপূর্ণ বিষয়বস্তুর অভাবদুষ্ট;

(৪) বাস্তবানুগ যে সকল কর্ম্মপদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হতো, এমন বিষয়বস্তুর অভাব রয়েছে বর্ত্তমান পাঠক্রমে;

(৫) বিকশমান তরুণ মনের আকাঙ্ক্ষা ও সামর্থ্যের উপযোগী বিষয়বস্তুর আয়োজন বর্ত্তমান পাঠক্রমে নেই;

(৬) এই পাঠক্রমে পরীক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক; এবং

(৭) দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথে যে সকল কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন, বর্ত্তমান পাঠক্রমে সে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে তারাচাঁদ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে পাঠক্রমে নানাবিধ বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করে বহুমুখী করার তীব্র আন্দোলন সুরু হয়। ফলে, এখন মোটামুটি একথা সর্ব্বজন স্বীকৃত হয়েছে যে, মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ত্রুটি হলো একমুখী পাঠক্রম। এই পর্য্যায়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও ব্যাপক করার প্রচেষ্টাও চলেছে। কারিগরী, কৃষিমূলক ও বাণিজ্যমূলক বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ ধরণের মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত ও সুসংগঠিত হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ, উত্তরপ্রদেশে মাধ্যমিক স্কুলে ছ'রকমের পাঠক্রম প্রবর্ত্তিত হয়েছে: সাহিত্য বিষয়ক, বিজ্ঞানবিষয়ক, বাণিজ্যবিষয়ক, সৃজনমূলক, শোভনমূলক, এবং

কৃষিবিষয়ক। মাদ্রাজে হাইস্কুল পর্য্যায়ের পাঠক্রমকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে : (ক) পরিচালনমূলক, (খ) পূর্ব্ব-কারিগরী, (গ) শোভনমূলক ও গার্হস্থ্যবিষয়ক, এবং (ঘ) শিক্ষকতাবিষয়ক। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশে এই ধরনের নব আন্দোলন প্রসারলাভ করছে।

এছাড়া সমাজবিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্পকলা এবং সমরশিক্ষা, সমাজশিক্ষা প্রভৃতি শিক্ষামূলক ও প্রমোদনমূলক বিষয়গুলিও পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলেছে।

দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য যে পরিমাণ স্কুলভবন ও শিক্ষা উপকরণের প্রয়োজন, তার নিতান্ত নগন্য অংশই পাওয়া যাচ্ছে। এবিষয়ে অগ্রগতি মোটেই সন্তোষজনক নয়, যদিও জনসাধারণ এ বিষয়ে ক্রমেই গুরুত্ব উপলব্ধি করছেন এবং অর্থসাহায্য দিতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। কারণ দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রের আয়তন সুবিপুল এবং এইজন্য কোন কোন সময়ে শিক্ষা উন্নয়নের কর্ণধারগণ হতাশা প্রকাশ করেন যে উপযুক্ত স্কুলভবন ও উপকরণ ছাড়াই আমাদের শিক্ষা প্রসারের আয়োজন করে চলতে হবে।

মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষার্থীদের দুরকমের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়— আভ্যন্তরীণ এবং সাধারণ। প্রত্যেক স্কুলেই আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা হয় শিক্ষার্থীর অগ্রগতির মূল্যায়ন ও মান-নির্ণয়ের জন্য এবং তাকে উচ্চতর শ্রেণীতে অধ্যয়নের অধিকারদানের বিবেচনার জন্য। কোন কোন স্কুলে সাপ্তাহিক বা মাসিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, কোথাও বা ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকে। বার্ষিক শেষ পরীক্ষাটিই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ফলাফল দ্বারাই শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিক্ষাসূচী নির্দ্ধারিত হয়।

সাধারণ (এক্সটার্ণাল বা পাবলিক) পরীক্ষা হয় স্কুলের শিক্ষাকাল সমাপ্ত হওয়ার পর এবং এই পরীক্ষার নাম ম্যাট্রিকুলেশন, স্কুল ফাইনাল বা স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা। এই জাতীয় সাধারণ পরীক্ষাগুলিতে প্রায় ৫০% শিক্ষার্থীরও বেশি বিফল হয়। এই বিপুল বিফলতা দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক চরম বিভীষিকা হয়ে রয়েছে। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সাধারণ পরীক্ষার এই ব্যাপক হতাশাপূর্ণ প্রভাব ক্রমাগত অবনতির কারণ হয়ে পড়েছে। কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মানমর্য্যাদা নির্ভর করে এই সাধারণ পরীক্ষার ফলাফলের ওপর; সেই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদানপ্রণালী যতোই উন্নততর হোক না কেন। যে শিক্ষকের বেশিসংখ্যক ছাত্র এইসব সাধারণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে, তাঁরাই সুনাম হয় বেশি। শিক্ষার্থীর ভাগ্য নির্ভর করে এই সাধারণ পরীক্ষার ফলাফলের ওপর; তার নিজস্ব প্রতিভার ওপর নয়। পরীক্ষার এই ব্যাপক কর্ত্তৃত্বের কাছে স্কুলের স্বাধীনতা,

শিক্ষকের কর্ম্মানুরাগ, প্রধান শিক্ষকের উদ্যোগ এবং শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহ পর্য্যন্ত ম্লান হয়ে গেছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা পর্য্যায়ে যে সকল উদ্যমী উজ্জ্বল আশা-চঞ্চল বালকবালিকার সমাবেশ ঘটে, তাদের বয়সোচিত আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন এবং ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয় বলে তাদের যথাযথ বিকাশ সম্ভব হয় না। বর্ত্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থা এমনই যে, শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকেনা। এমনকি, অতি মেধাবী শিক্ষার্থীকেও অনেক বিষয় যান্ত্রিকভাবে মুখস্থ রাখতে হয়। এছাড়া পরীক্ষাব্যবস্থার আতঙ্ক ও উদ্বেগ তরুণ মনের স্বাভাবিক বিকাশের যে অবর্ণনীয় ক্ষতিসাধন করছে তা বলা বাহুল্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহরাঙ্কিত একখানি সার্টিফিকেট লাভের জন্য সরল বালক বালিকাদের স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিত্বের প্রভূত অনিষ্ট হচ্ছে। সৎ এবং আন্তরিকভাবে উদ্যোগী শিক্ষক উপযুক্ত শিক্ষার মান অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হচ্ছেন না। কারণ তাঁকে পরীক্ষার মান অনুসরণ করতে হচ্ছে। চতুরতার সঙ্গে পরীক্ষার উপযোগী করে পাঠক্রমের বহু অংশ বাদ দিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছে। ফলে, শিক্ষকতাজীবনের আকর্ষণ হ্রাস পেয়েছে এবং আধুনিক শিক্ষাদানরীতির উন্নত সূত্রগুলিকে মোটেই ব্যবহারের অবকাশ পাওয়া যাচ্ছে না।

Q. 9. Give an account of the present system of University Education in India.

Ans. বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রথম পর্য্যায়ে যে সকল কলেজে উচ্চতর শিক্ষাদানের আয়োজন আছে ভারতে ১৯৬০ সালে সেই ধরণের কলেজের সংখ্যা ছিল ১৮৫০ এবং এর মধ্যে সাধারণ কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার কলেজ ছিল ৯৪৬টি, বৃত্তিমূলক শিক্ষার কলেজ ৭২৪টি এবং সঙ্গীত, নৃত্য, সমাজবিজ্ঞান, প্রাচ্য বিদ্যা প্রভৃতি বিশেষ ধরণের শিক্ষার কলেজ ছিল ১৮০টি। পরিচালনার ভিত্তিতে কলেজগুলিকে এইভাবে শ্রেণীবিভাগ করা চলে :—

পরিচালনা	কলা ও বিজ্ঞান কলেজ	বৃত্তিমূলক কলেজ	বিশেষ ধরণের শিক্ষার কলেজ	%
সরকারী :	১৮৬	১৯৬	২৮	৩৩.৯
স্থানীয় সংস্থা :	৩	৩	১	০'৬
বেসরকারী :				
সাহায্যপ্রাপ্ত :	৪৫৮	১০১	৬৮	৫২'৩
সাহায্য বহির্ভূত :	৯৯	৪৫	১৫	১৩'২
মোট	৭৪৬	৩৪৬	১১২	১০০'০

প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কলেজই বেসরকারী পরিচালনাধীন এবং বৃত্তিমূলক কলেজগুলির অর্দ্ধেকেরও বেশি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন। উল্লেখযোগ্য এই যে, কলেজ শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থানীয় সংস্থাগুলির ভূমিকা নিতান্তই নগণ্য।

সমগ্র ভারতে ১৯৬০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪০ এবং এর মধ্যে একটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়। সাধারণভাবে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তিন শ্রেণীর : অনুমোদনধর্ম্মী (এফিলিয়েটিং), এককেন্দ্রিক (ইউনিটারী) এবং সঙ্ঘবদ্ধ (ফেডেরাল)।

অনুমোদনধর্ম্মী বিশ্ববিদ্যালয় : যে সকল কলেজ নির্দ্দিষ্ট পাঠক্রম অনুসরণ করে শিক্ষাদানের উপযুক্ত, সেগুলিকে অনুমোদন দান করাই অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মূল কাজ। এই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মপরিধি ব্যাপক হয়ে থাকে এবং ছোট বড় বিক্ষিপ্ত বহু কলেজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ত্তাধীন থাকে। অনুমোদনধর্ম্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলি এক একটি ক্ষুদ্র শাখা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই কাজ করে। তবে সেগুলির কর্মপদ্ধতির ওপর বিশেষ করে পাঠক্রম ও শিক্ষারীতির ওপর অনুমোদনধর্ম্মী কেন্দ্রীয় সংগঠনের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং অনুমোদিত কলেজগুলির মধ্যে সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে ১৯০৪ সালের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনবিধি অনুসারে। ঐ আইন অনুসারে, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ পরিদর্শন ও অনুমোদন করবেন, পাঠক্রম নির্দ্ধারণ করবেন, পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন এবং পরীক্ষান্তে উপাধি বিতরণ করবেন। স্বীয় এলাকার মধ্যে কলেজ অনুমোদন করার পর সেগুলির পরিচালনার কোনও প্রত্যক্ষ দায়িত্ব অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করবেন না। কলেজ পরিচালনার সর্ত্তাদি প্রণয়ন ক'রে সেইগুলি যথাযথ অনুসৃত হচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে পরিদর্শনের আয়োজন করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ।

কোনও কলেজ অনুমোদন লাভের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের কাছে কোন কোন বিষয়ে সন্তোষজনক বিবরণ ও আবেদন পেশ করবেন, সে বিষয়েও ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনে নির্দ্দেশ আছে। সাধারণতঃ যে বিষয়গুলি কলেজ-অনুমোদনের পূর্ব্বে বিবেচিত হয়ে থাকে, তা হলো : (১) সংগঠন ও পরিচালনা, (২) শিক্ষক ও কর্ম্মীমণ্ডলী, (৩) কলেজ ভবন ও ছাত্রাবাস, (৪) শিক্ষা উপকরণ, (৫) শিক্ষার্থী সংখ্যা ও গুণ পরিচয়, (৬) অর্থ, (৭) গ্রন্থাগার, (৮) নথিপত্র এবং (৯) অন্যান্য।

এককেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় : একটি কেন্দ্রে অবস্থিত শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে এককেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়। এই ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব বিভাগ বা কলেজের মাধ্যমে শিক্ষাদান কার্য্য পরিচালনা করে থাকেন।

পরিচালনা, শিক্ষাদান ও শিক্ষকমণ্ডলীর ওপর এই ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে।

সঙ্ঘবদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ঃ এ ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য হলোঃ (১) এই বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার কলেজগুলি খুব কাছাকাছি অবস্থিত থাকবে, (২) প্রত্যেকটি অধীনস্থ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষামান অনুযায়ী শিক্ষাদান করবে, (৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্ঘশক্তি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক কলেজই কিছু কিছু স্বতন্ত্রবোধ ত্যাগ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল নীতি অনুসরণ করবে এবং (৪) প্রকৃত শিক্ষাদানের কাজ কলেজগুলিতেই চলবে, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দেশমত। সংক্ষেপে, সঙ্ঘবদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান চলে কতকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, এবং সেই প্রতিষ্ঠানগুলি স্বতন্ত্র সংগঠন হলেও মূল বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিকেই অনুসরণ করে; ফলে সেগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে।

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রকৃতপক্ষে পরিচালিত হয় প্রতিনিধিত্বমূলক এক একটি সংসদ দ্বারা, যাকে বলা হয় কোর্ট বা সেনেট। এই কোর্ট বা সেনেটই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল নীতি নির্দ্ধারণ করে এবং এতে বহু সদস্য থাকেন। সদস্যগণ সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান সংক্রান্ত বিষয়গুলি আলোচিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা ও প্রশাসন সংক্রান্ত কাজকর্ম্মের জন্য থাকে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বা সিণ্ডিকেট। এ ছাড়া থাকে বোর্ড অব্ ষ্টাডিস্, বা কমিটি অব কোর্সেস এণ্ড ষ্টাডিস্ অথবা ডিপার্টমেণ্ট অব ষ্টাডিস; এগুলি বিভিন্ন পাঠক্রমের বিশদ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এই মণ্ডলীগুলির কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য থাকে কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা, শিক্ষকতা, প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ফ্যাকাল্টি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোধা হলেন চ্যান্সেলর। সাধারণতঃ রাজ্যের রাজ্যপাল স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হন। ভারতে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে; ফলে বহু রাজ্যে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে সব ক্ষেত্রে, কোন কোন রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নিজ নিজ চ্যান্সেলর নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

চ্যান্সেলরের পরবর্ত্তী দায়িত্বপূর্ণ পদ ভাইস-চ্যান্সেলর। প্রকৃতপক্ষে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভাইস-চ্যান্সেলরই মূল কর্ম্মকর্ত্তা। অধিকাংশ প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে চ্যান্সেলরই ভাইস্-চ্যান্সেলর নিয়োগ করেন। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভাইস্-চ্যান্সেলর নির্ব্বাচিত হন; সিণ্ডিকেট সদস্যগণ ভাইস-চ্যান্সেলর পদের জন্য যাঁদের নাম উত্থাপন করেন, সেনেট তাঁদের মধ্যে নির্বাচন করেন এবং পরে চ্যান্সেলর তা অনুমোদন করলেই নিয়োগ করা

হয়। পূর্ব্বে ভাইস-চ্যান্সেলরের পদটি ছিল অবৈতনিক এবং কোন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীকে তিন বছরের জন্য নিয়োগ করা হতো। বর্ত্তমান প্রচলিত বিধি অনুযায়ী ভাইস-চ্যান্সেলরের পদটি বহু জায়গায় সর্ব্বসময়ের বেতনভুক্ পদে পরিণত হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থার সম্যক্ সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে আরও কতকগুলি সংস্থার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বিভিন্ন রাজ্যে আছে সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ড। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য ইণ্টার ইউনিভার্সিটি বোর্ড এবং ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্ট্‌স্ কমিশন আছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এদেশে স্কুল বোর্ড, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড বা ইণ্টারমিডিয়েট বোর্ড গঠিত হওয়া সুরু হয়। নিজ নিজ অঞ্চলে এই সংস্থাগুলি সম্পূর্ণ ক্ষমতাবলে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করেন।

ইণ্টার-ইউনিভার্সিটি বোর্ডও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তথ্যের আদানপ্রদানের ব্যাপারে, অধ্যাপক বিনিময় বিষয়ে, বিদেশে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির মর্য্যাদা স্থাপনে, উচ্চশিক্ষার আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন ইত্যাদিতে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি প্রেরণে এবং এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে পরীক্ষা এবং উপাধি সংক্রান্ত বিষয়ে মতবিরোধ মীমাংসা ব্যাপারে এই ইণ্টার-ইউনিভার্সিটি বোর্ড বিশেষ সহায়ক। এই বোর্ডের বার্ষিক অধিবেশন ছাড়াও প্রতি পাঁচ বছরে একটি সম্মেলন হয়। ঐ সম্মেলনে বিভিন্ন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিবর্গ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সমস্যাবলী আলোচনা করেন। এই সংস্থাটির মাধ্যমে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পরস্পরের কাছে সুস্পষ্টরূপে উপস্থাপিত হওয়ার সুযোগ ঘটায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সুসংহত হতে পারছে।

ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্ট্‌স্ কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৫ সালে সার্জেণ্ট রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে। প্রথমে এই কমিশনের সদস্য ছিলেন মাত্র চারজন এবং কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধান করতেন। ১৯৪৭ সালে এই কমিশনের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করা হয় এবং ১৯৪৯ সালে ইউনিভার্সিটি এডুকেশন কমিশনের সুপারিশমত ব্রিটেনের ইউ. জি. সি. সংস্থার অনুরূপ ধারায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্য বণ্টনের ব্যাপারে পরামর্শ দানের উদ্দেশ্যে এই গ্রাণ্ট্‌স্ কমিশনকে ক্ষমতাসম্পন্ন করা হয়। ১৯৫৩ সালে এই কমিশনের কর্ম্মক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং বর্ত্তমানে এর কর্ম্মসূচী এইরূপ :

১। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপনার সুযোগ ও মান সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শদান এবং প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা অবলম্বন ;

২। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আর্থিক প্রয়োজন সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান এবং এ বিষয়ে অর্থ সাহায্য মঞ্জুর সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দান ;

৩। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্য বণ্টন ;

৪। কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বা সম্প্রসারণ সম্পর্কে প্রয়োজন হলে পরামর্শ দান ;

৫। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অনুমোদন সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দান ;

৬। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পরামর্শ দান ; এবং

৭। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতির জন্য অন্য সকল প্রকার কর্ত্তব্য।

১৯৫৫ সালের এক আইন অনুসারে এই কমিশন বিধিবদ্ধ সংগঠনরূপে পরিগণিত হয়েছে এবং এতে ন'জন সদস্য আছেন। সদস্যদের মধ্যে অন্ততঃ তিনজন হবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর, কেন্দ্রীয় সরকারের দুজন প্রতিনিধি এবং চারজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্। এই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে আর্থিক সাহায্য দান করে সর্ব্বপ্রকার উন্নতিতে সহায়তা করেন।

ভারতের সংবিধান অনুসারে সকলপ্রকার শিক্ষাব্যবস্থা (বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থাও) রাজ্য সরকারগুলির দায়িত্বাধীন ; কিন্তু উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও বিজ্ঞান এবং কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মান নির্দ্ধারণের দায়িত্ব ও ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাখাতে সমগ্র ভারতে অর্থব্যয়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। নীচের হিসাব থেকে বর্ত্তমান ব্যয়ের পরিমাণ বোঝা যাবে :

অর্থাগমের পথ	টাকা (কোটি)	%
সরকারী তহবিল	১৩·৫০	৪৭·৬
স্থানীয় সংস্থা	·০৮	০·৩
শিক্ষার্থীদের বেতন	১১·১৮	৩৯·৪
সম্পত্তি তলবিল	·৮৬	৩·০
চাঁদা ইত্যাদি	২·৭৬	৯·৭
মোট	২৮·৩৮	১০০·০

প্রায় অর্দ্ধেক অর্থ সরকারী তহবিল থেকেই আসে এবং উচ্চশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহে শিক্ষার্থীদের বেতন অনেকখানি অংশ বহন করে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার থেকে, বিভিন্ন সম্পত্তি তহবিল থেকে, পরীক্ষা ফী এবং শিক্ষার্থীদের বেতন প্রভৃতি থেকে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করলেও তাদের অনুমোদিত কলেজগুলি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাধারণতঃ কোন অর্থ সাহায্য পায় না। সরকারী অর্থ সাহায্য পুষ্ট কলেজগুলি রাজ্য সরকার থেকে অর্থ পান এবং তা বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন হারে বণ্টিত হয়ে থাকে। কোন কোন রাজ্যে কলেজের বিভিন্ন পদের বেতন বাবদ ব্যয়ের ৫০% পর্য্যন্ত সরকারী অর্থ সাহায্যরূপে দেওয়া হয়। কোন কোন রাজ্যে সরকারী অর্থ সাহায্যের পরিমাণ অতি সামান্য। সাধারণতঃ কলেজের ঘাটতি হিসাব পরিপূরণের ভিত্তিতে ব্লকগ্রাণ্টরূপে এই সাহায্য বণ্টিত হয়।

কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অর্থ সাহায্য দেন ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্ট্স্ কমিশনের মাধ্যমে। সাধারণতঃ স্নাতকোত্তর শিক্ষা, গবেষণা ও বিশেষ পরিকল্পনাগুলির জন্যই কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্য বিতরিত হয়। কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্যের সর্ত্ত এই যে, বিশ্ববিদ্যালয় বা রাজ্য সরকার এককালীন ব্যয়ের ⅓ এবং পৌনঃপুনিক ব্যয়ের অর্দ্ধেক বহন করতে সম্মত থাকবেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রারম্ভ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে উচ্চতর শিক্ষার পৌনঃপুনিক ব্যয়ের সবটুকুই বহন করার নীতি প্রবর্ত্তিত হয়েছে।

II

PROBLEMS OF FREE AND COMPULSORY PRIMARY EDUCATION

[Background—Effects of Downward Filtration Theory—Compulsory education in practice during 1898-1950—Physical, Social, Cultural, Political, Administrative and Economic obstacles to progress—Approximate cost—Alternative proposals—Part-time instruction—Simplification of the curriculum—Case of the poor parent—Raising necessary funds—Enforcement—Attendance.]

Q. 1. Trace the development of movement for compulsory education in India.

Ans. বলা যেতে পারে, ১৮৩৮ সালে উইলিয়ম এডামের শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধান এবং সুপারিশের মাধ্যমেই ভারতে বাধ্যতামূলক শিক্ষাধারার চিন্তার সূত্রপাত হয়। এডাম বলেন, প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ একটি করে স্কুল প্রতিষ্ঠা বাধ্যতামূলক করার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করা দরকার। নতুবা এই বিশাল দেশে শিক্ষা প্রসার একরূপ অসম্ভব। ১৮৫২ সালে ক্যাপ্টেন উইনগেট বোম্বাই প্রদেশের রাজস্ব সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধান প্রসঙ্গে প্রস্তাব করেন যে, কৃষিজীবীদের সন্তানসন্ততির বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ভূমিরাজস্বের ওপর ৫% কর ধার্য্য করা উচিত। এরপর ১৮৫৮ সালের কিছু পরে গুজরাটের এডুকেশন্যাল ইন্সপেক্টর টি. সি. হোপ প্রস্তাব করেন যে, স্কুল স্থাপন উদ্দেশ্যে স্থানীয় অধিবাসীদের করদানে বাধ্য করার জন্য আইন প্রণয়ন করা উচিত।

সর্ব্বজনীন বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ভারতে আধুনিক হলেও এর ইতিহাসকে মোটামুটি পাঁচটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্য্যায় সুরু হয়েছে ধরা যেতে পারে ১৮১৩ সালে যখন জনগণের শিক্ষার দায়িত্ব সরকার স্বীকার করে নিলেন এবং শেষ হয়েছে ১৮৮২ সালে যখন ইণ্ডিয়ান এডুকেশন কমিশন নিয়োজিত হল। এই পর্য্যায়ে নিম্নমুখী পরিস্রুতি মতবাদ (downward filtration theory) শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল এবং আবশ্যিক শিক্ষাসমস্যার বিষয়টি রাষ্ট্র কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্য্যায় ১৮৮২ থেকে ১৯১০ সাল—এই সময় মহামান্য গোখেল আবশ্যিক শিক্ষাসংক্রান্ত প্রস্তাব নিয়ে আন্দোলন করেন। এই পর্য্যায়ে ভারতীয় নেতারাই বিষয়টি সম্পর্কে দাবী উত্থাপন করেন কিন্তু তাঁদের আন্দোলন যথেষ্ট সফলতা লাভ করতে পারেনি, কারণ সরকারী কর্ত্তৃপক্ষকে প্রভাবান্বিত করবার মতো শক্তিশালী জনমত তখনো গড়ে ওঠেনি।

তৃতীয় পর্য্যায় ১৯১০ থেকে ১৯১৭—যে সময় গোখেল অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে আবশ্যিক শিক্ষাধারা প্রবর্ত্তনের দাবী নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যান ; কিন্তু তাঁর এই স্মরণীয় সংগ্রামের পরিণামে অনেকাংশে ব্যর্থতাই এসেছিল। কারণ সরকারী অনমনীয় মনোভাব তাঁর প্রস্তাব গ্রাহ্য করেনি।

চতুর্থ পর্য্যায় ১৯১৮ থেকে ১৯৩০ সাল এবং এই সময়ে সরকার আবশ্যিক শিক্ষার দাবী ক্রমে ক্রমে স্বীকার করতে থাকেন। ফলে, একটির পর একটি প্রদেশে আবশ্যিক শিক্ষার নীতি গৃহীত হয় এবং বৃটিশ ভারতের প্রায় সকল প্রদেশে এবং রাজ্যে আবশ্যিক শিক্ষাসংক্রান্ত আইনও বিধিবদ্ধ হয়।

পঞ্চম পর্য্যায় ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ সাল, যে সময়ে পরীক্ষামূলকভাবে কতকগুলি অঞ্চলে আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় এবং কার্য্যক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার সুবিধা-অসুবিধা পর্য্যবেক্ষণ করা চলতে থাকে।

ষষ্ঠ পর্য্যায়ে সমগ্র দেশের প্রতিটি অঞ্চলে যথাশীঘ্র সম্ভব আবশ্যিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ব্যাপক আয়োজন সুরু হয়েছে এবং দেশের ৪৫ ধারায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে 'সংবিধান কার্য্যকরী হওয়ার দশ বছরের মধ্যে রাষ্ট্র দেশের সকল বালকবালিকার ১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাধারা প্রবর্ত্তনে সচেষ্ট হবে।' অবশ্য নানারকম সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই অঙ্গীকার রক্ষা সম্ভবপর হয়নি এবং ১৯৭৫ সালের মধ্যে ৬-১৪ বছর বয়সের সকল বালকবালিকার আবশ্যিক শিক্ষাধারা প্রবর্ত্তন সম্পূর্ণ করার নতুন নীতি গৃহীত হয়েছে।

Q. 2. What is Downward Filtration Theory and what are the effects of this theory on mass education in India ?

Ans. ১৮১৩ সালের চার্টার আইন মত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারত-বাসীর শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করলেও আইনের ৪৩ ধারায় উল্লিখিত "ভারতে বৃটিশ অঞ্চলগুলির অধিবাসীদের" শব্দগুলির সঙ্কীর্ণ অর্থ করার জন্য দেশের নিরক্ষর গ্রামবাসী দরিদ্রদের শিক্ষার প্রকৃত ব্যবস্থা হয়নি। শাসকবৃন্দ এই শব্দগুলির অর্থে সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিদেরই গণ্য করেছিলেন, কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমাজের উচ্চস্তর থেকেই ক্রমে ক্রমে নিম্নস্তরে সঞ্চারিত হয়। এই চিন্তাধারা থেকেই প্রসিদ্ধ নিম্নমুখী পরিস্রুতি মতবাদ (ডাউনওয়ার্ড ফিলট্রেশান থিওরী) সৃষ্টি হয়।

এই মতবাদ এই কারণে গণশিক্ষার পরিবর্ত্তে শ্রেণী শিক্ষারই পরিপোষক এবং যতদিন এ ধরণের চিন্তাধারার সামান্য পরিমাণে অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার অসম্ভব।

এই পরিস্রুতি মতবাদ সৃষ্টি হওয়ার মূলে ছিল রাষ্ট্রকোষে উপযুক্ত অর্থের অভাব এবং ইংলণ্ডের ভাবধারাকে এদেশে প্রভাবশালী করে তোলার পরিকল্পনা। সমাজের উচ্চস্তরের সন্তান সন্ততিদের অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার পেছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধিও ছিল; শাসকবৃন্দ এই নীতির মাধ্যমে সামাজিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সন্তুষ্ট রাখতে চেয়েছিলেন।

পরিস্রুতি মতবাদের ফল হয়েছিল এই যে সরকারী স্কুলগুলিতে অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষার সুযোগ পেত সমাজের উচ্চস্তরের স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে-মেয়েরাই, যারা ইতিপূর্ব্বেই নিজেদের অভিভাবকের খরচে কিছু কিছু বিদ্যাভ্যাস করে ফেলেছে; অথচ সমাজের অগণিত দরিদ্র ছেলেমেয়েরা, যারা শিক্ষার উপকারিতার স্বাদ পায়নি এবং তার জন্য অর্থব্যয় করতেও পারে না, তারা বহু কষ্টার্জ্জিত অর্থব্যয়ে দেশীয় ক্ষুদ্র স্কুলগুলিতে বেতন দিয়ে শিক্ষাগ্রহণ করবার চেষ্টা করত, না পারলে অজ্ঞানতার অন্ধকারেই জীবন কাটাত। প্রকৃতপক্ষে, দেশের দরিদ্র জনগণ রাষ্ট্রীয় শিক্ষা প্রচেষ্টার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত।

এই নীতির আর একটি কুফল হল এই যে দেশের উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে যে স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখা একান্ত প্রয়োজন, তার বিশেষ ক্ষতি। উচ্চস্তরের সমাজের মানুষ নিজের অধিকতর মর্য্যাদা সম্পন্ন বোধ করতে থাকে এবং বঞ্চিত মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সমাজের মানুষের ক্ষোভ সবসময়ই সামাজিক দ্বন্দ্ব বিবাদ সৃষ্টি করতে থাকে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতি বোধ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে উচ্চস্তরের স্বচ্ছল পরিবারের শিক্ষিত ব্যক্তি দরিদ্র জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগের সুযোগ পান না, উপরন্তু তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উচ্চ বেতনের চাকুরীতে অধিষ্ঠিত হয়ে সন্তুষ্ট থাকেন।

সংক্ষেপে, নিম্নমুখী পরিস্রুতি নীতি যে দেশের সর্ব্বজনীন আবশ্যিক শিক্ষা ধারা প্রবর্ত্তনের পথে বিপুল প্রতিবন্ধক স্বরূপ, একথা আজ অনস্বীকার্য্য। আবশ্যিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করতে হলে রাষ্ট্রের সমগ্র জনগণের কথাই স্মরণে রাখতে হবে এবং রাষ্ট্রকে এবিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে উদ্যোগী হতে হবে। পরিস্রুতি মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র শ্রেণীসম্প্রদায়ের শিক্ষার কথাই ভেবেছিলেন এবং দরিদ্র বিপুল জনগণের শিক্ষাদানের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব অস্বীকার করেছিলেন। এই ভ্রান্ত আদর্শে আবশ্যিক শিক্ষানীতি ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এই ভ্রান্ত নীতি পরিত্যাগ করার জন্য সর্ব্বপ্রথম ১৮৫৪ সালের শিক্ষাসংক্রান্ত সরকারী ডিসপ্যাচে সতর্কবাণী ধ্বনিত হয়। ক্রমে এই নীতির বিরুদ্ধে জনমত দৃঢ় হতে থাকে এবং ১৮৮২-৮৩ সালে ইণ্ডিয়ান এডুকেশন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ এই নীতি বর্জ্জন করে সর্ব্বজনীন শিক্ষার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব স্বীকার করে নেন।

Q. 3. What are the factors which led to the agitation for compulsory primary education in India ?

Ans. ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে যে নবজাগরণের সূচনা দেখা যায়, তারই মধ্যে ছিল এদেশের আবশ্যিক শিক্ষা-ব্যবস্থা সংক্রান্ত দাবী ও আন্দোলনের মূল প্রেরণা। বৃটিশ শাসনের যুগে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদেশে এক নতুন সমাজ চেতনায় জনগণ অনুপ্রেরিত হয় এবং এই অনুপ্রেরণা ও নবজাগরণের পরিণামে দেশের ধর্ম্ম, সমাজ, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে বিপুল পরিবর্ত্তন আনে। আধুনিক কালের আবশ্যিক শিক্ষা আন্দোলনের সূত্রপাত এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যেই ঘটেছে, তাই সেগুলি জানা দরকার।

১৯শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সংস্কার বিষয়ে একাধিক আন্দোলনের সূচনা হয়। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্য সমাজ বা রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্মধারা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলনগুলি ধর্ম্ম সম্পর্কীয় হলেও, এগুলির সঙ্গে দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির নিবিড় সংযোগ ছিল। ব্রাহ্মসমাজ নারীশিক্ষার ব্যাপক আয়োজন করেন এবং বাল-বিবাহ, বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে জনমতকে শিক্ষিত করে সমাজে নারীর মর্য্যাদা বৃদ্ধির কাজে বিশেষ উদ্যোগী হন। হরিজন সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও বয়স্কশিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অল্প নয়। তাঁরা বর্ণভেদ প্রথারও প্রতিবাদ সুরু করেন এবং আর্য্য সমাজ এ বিষয়ে ব্যাপক কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করেন। রামকৃষ্ণ মিশন অবহেলিত সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন মান উন্নয়নের জন্য সুপরিকল্পিত মানব-সেবামূলক কর্ম্মসূচী অনুসরণ করেন। এইভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে উন্নয়নের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন স্যর সৈয়দ আহমেদ খাঁ এবং আলিগড় আন্দোলন এজন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

ইউরোপের শিল্প বিপ্লব ঐ দেশে সর্ব্বজনীন শিক্ষারীতি প্রবর্ত্তনে বিশেষ সহায়তা করেছিল। তবে ভারতবর্ষে ঐ বিপ্লব শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কারণ ইউরোপে শিল্পবিপ্লব সুরু হয় ১৭৬০ সালে, কিন্তু ভারতে ঐ বিপ্লবের রেশ লাগে মাত্র ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে। এছাড়া, বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষে শিল্পোন্নতির দ্রুত প্রগতি পছন্দ করেনি, কারণ তাতে বৃটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এই কারণে ১৯শ শতাব্দীর শেষাংশে ভারতবর্ষে যে সমস্ত কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেগুলি অধিকাংশই ছিল ক্ষুদ্র। শ্রমিক ছিল অতি অল্প, বড় বড় শিল্পপ্রধান শহর পত্তনেরও বিশেষ উদ্যোগ দেখা যায়নি।

তবে, সীমিত হলেও, শিল্পবিপ্লবের ফলে এদেশে সর্ব্বজনীন শিক্ষার ধারাটি ক্ষীণভাবে বইতে সুরু করে। শিল্পপ্রধান শহরগুলিতে শ্রমিকদের জন্য শিক্ষার

ভাল ব্যবস্থাই প্রবর্ত্তিত হয় এবং গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবীদের চেয়ে তাদের শিক্ষাসুযোগ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। এরই ফলে শহরাঞ্চলে সাক্ষর জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ভারতে সর্ব্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্ত্তনের অন্যতম একটি কারণ গণতান্ত্রিক নীতির ক্রমবর্দ্ধমান মর্য্যাদা। ১৯শ শতাব্দীতে দেশে বহু গণতান্ত্রিক সংস্থা সংগঠিত হয়। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতায় পৌরশাসন প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৫০ সাল থেকে সুরু করে বহু শহরে পৌরসভা (মিউনিসিপ্যালিটি) স্থাপিত হয়; ১৮৬০ থেকে জিলা বোর্ড, তালুক বোর্ড প্রভৃতি স্থানীয় সংস্থা স্থাপিত হতে থাকে। ১৯০৯ সালের পর থেকে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের আইন সভাগুলিতেও ভারতীয়রা মনোনয়ন পেতে থাকেন। দেশে নির্ব্বাচনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয় এবং মিউনিসিপ্যালিটি, লোক্যাল বোর্ড, আইনসভা প্রভৃতির সদস্য নির্ব্বাচন বিষয়ে জনগণ ক্রমশই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে থাকেন এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপরিচালনার মূল নীতিগুলি সম্পর্কে অবহিত হতে থাকেন। এর ফলে জনগণ আত্মমর্য্যাদাবোধ উপলব্ধি করে দাবী উত্থাপনের সাহস অর্জ্জন করতে থাকেন। তাঁরা বুঝতে পারেন যে, তদানীন্তন সরকারী প্রশাসনব্যবস্থা ত্রুটি-পূর্ণ এবং আমলাতান্ত্রিক। জনগণ উপলব্ধি করতে পারেন যে, ঐ ব্যবস্থার সংস্কার করে গণতান্ত্রিক প্রশাসন প্রবর্ত্তন করতে হলে শিক্ষিত বুদ্ধিমান নেতৃত্বক্ষম ব্যক্তির প্রয়োজন। এই কারণে স্বায়ত্তশাসন ও স্বরাজ দাবী করার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বজনীন আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দাবীও উত্থাপিত হয়, কারণ শিক্ষাই গণতান্ত্রিক চেতনার উৎস এবং পরিপোষক।

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে আর একটি ঘটনা-পরিবেশ সর্ব্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা বিবর্ত্তনের সহায়ক হয়েছিল, তা হল অনুন্নত অবহেলিত সম্প্রদায়গুলির গণজাগরণ। যেমন, হিন্দুদের হরিজন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধীরে ধীরে মর্য্যাদাবোধ জাগতে থাকে এবং তাদের সামাজিক সুখসুবিধা ও অধিকারের দিকে ক্রমশই দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বিশেষ করে, এইসব অনুন্নত অবহেলিত শ্রেণীগুলির ওপরেই মিশনারীদের সযত্ন লক্ষ্য ছিল, কারণ এই শ্রেণীর লোকেদের শিক্ষিত করে তুলে ধর্ম্মান্তর করা মিশনারীদের পক্ষে সুবিধা ছিল। পরে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেও এই শ্রেণীর লোকেদের শিক্ষার জন্য মনোযোগ দেওয়া হয়। হরিজনদের স্কুলে পড়ার অধিকার, বিনাবেতনে পড়ার সুযোগ, ছাত্রবৃত্তি প্রদান প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে প্রবর্ত্তিত হয়।

এই সঙ্গে নারীশিক্ষার প্রতিও যথেষ্ট মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। পর্দ্দাপ্রথা এবং বাল-বিবাহ প্রথার সর্ব্বনাশা প্রভাব থেকে নারীসমাজকে মুক্ত করার জন্য সমাজ সংস্কারকরা বালিকাদের শিক্ষার ব্যাপক আয়োজনে ব্রতী হন। ইংরেজ মিশনারীরাও বহু বালিকাদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইংরেজ সরকারও

উদ্যোগী হন। বেসরকারী উদ্যোগেও বহু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে। লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেন এবং ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইনতঃ সিদ্ধ হয়। ইতিমধ্যে বালিকাদের বিবাহের বয়স সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে শহরাঞ্চলে অনেক পিছিয়ে যায়। এই সব কারণে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এদেশে নারীশিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

ভারতবর্ষে আবশ্যিক শিক্ষাধারা প্রবর্ত্তনের অনুকূলে যে সকল ঘটনা-পরিবেশের উল্লেখ উপরে করা হল, সেগুলিকে অবশ্য একক বা সমষ্টিগতভাবে এমন কিছু শক্তিশালী প্রভাব বলে বিবেচনা করা যেতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে যে উদ্দীপনাটুকু না থাকলে এই সকল প্রভাবই ব্যর্থ হতো, সেটি এসেছিল ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয় সচেতনতার মাধ্যমে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনকে আশীর্ব্বাদ বলেই জনগণ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ১৮৮৫ সালে ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই এই মনোভাব অতিক্রত পরিবর্ত্তিত হতে সুরু করে এবং ভারতবাসী নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি ক্রমশই শ্রদ্ধাবান হতে থাকে। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে জগত সভ্যতায় প্রাচ্যের অবদান সম্পর্কে দেশবাসী সচেতন হতে থাকে। শিক্ষিত ভারতবাসীরা নিজের দেশের অবস্থার সঙ্গে জগতের অন্যান্য স্বাধীন দেশের তুলনা করে বুঝতে পারে যে, পরাধীন ভারতবর্ষ শিক্ষায় খুবই অনুন্নত হয়ে রয়েছে এবং বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী দেশের শিক্ষাপ্রগতির জন্য কিছুই করছেন না। এর ফলে সমগ্র দেশে ব্যাপক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে এবং শিক্ষাপ্রসারের নানা কর্ম্মসূচী অনুসৃত হয়।

এই জাতীয়তাবোধের যুগে শিক্ষাপ্রগতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল বেসরকারী উদ্যোগে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা। এই যুগের আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, জনগণ বৃটিশ শাসকদের শিক্ষাপরিকল্পনাগুলিকে পূর্ব্বের মত বেদবাক্য বলে স্বীকার করে না নিয়ে তীক্ষ্ণ সমালোচনার মনোভাব নিয়ে বিবেচনা করতে সুরু করে। বিদেশী শাসকদের শিক্ষা পরিকল্পনার ত্রুটি উপলব্ধি করে এই সময়ে অনেকগুলি জাতীয় শিক্ষা সংগঠনও স্থাপিত হয় নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে।

ভারতবর্ষে আবশ্যিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের আন্দোলন উল্লিখিত জাতীয়তাবোধের আন্দোলনেরই অঙ্গীভূত এবং জাতীয় প্রগতির উদ্দেশ্যেই ভারতীয় নেতৃবৃন্দ জাতীয় সর্ব্বজনীন শিক্ষার মাধ্যমে জনগণকে শিক্ষিত করে যথাসম্ভব দ্রুত দেশের পুনর্গঠন করার ব্রত গ্রহণ করেন।

Q. 4. Summarise the results and difficulties of Compulsory education in practice in India during 1893-1950.

Ans: ভারতের সকল অঞ্চলের বালকবালিকার জন্য সর্ব্বজনীন,

আবশ্যিক এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের নীতি স্বীকৃত হয়েছে ১৯৫০ সালের সংবিধানে। এই নীতি স্বীকৃত হওয়ার অর্থ এদেশে আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দীর্ঘসংগ্রাম জয়যুক্ত হল, কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও স্মরণ করতে হবে যে, এই স্বীকৃতির ফলে আর এক নতুন সংগ্রামের সূচনা হল, সে সংগ্রাম আবশ্যিক শিক্ষানীতির সফলতা অর্জ্জনের জন্য। অবশ্য ভারতবর্ষে সর্ব্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রাম অনেকদিনের এবং আইনের সহায়তায় সর্ব্বপ্রথম ১৮৯৩ সালে বরোদা রাজ্যে এই সংগ্রামের জয় ঘোষিত হলেও আজ পর্য্যন্ত অগ্রগতি সন্তোষজনক হয়নি। কি কি কারণে সন্তোষজনক হয়নি, তা বুঝতে হলে ১৮৯৩ সাল থেকে আবশ্যিক শিক্ষাপ্রসারের ধারা পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন।

যে যে কারণে বরোদায় আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার আশানুরূপ ফলাফল দেখা যায় নি, সেগুলি হল ঃ

(১) আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রথম পদক্ষেপেই আবশ্যিক শিক্ষাগ্রহণের বয়সের বালকবালিকাদের জনগণনা দরকার। প্রধান অসুবিধা হয়েছিল বালিকাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে। বিশেষতঃ পর্দাপ্রথার জন্য রাজপুত এবং মুসলমান পরিবারের বালিকাদের সম্পর্কে কোন তথ্য সংগ্রহ করা একেবারেই অসম্ভব ছিল। মেয়েদের সম্পর্কে সকল তথ্য গোপন করার বংশানুক্রমিক রীতি বহু পরিবারে প্রচলিত ছিল। এ বিষয়ে রাজস্ব আদায়কারী সরকারী কর্ম্মচারীদের সহযোগিতা মূল্যবান, কিন্তু তাদের সহযোগিতাও শিক্ষা দপ্তর পায়নি। গ্রামের লোক ছেলেমেয়েদের ঘরের কাজে লাগিয়ে রাখতে চায়, সেজন্য অনেকেই জনগণনার সময়ে ছেলেমেয়েদের নাম উল্লেখ করত না। নাম উল্লিখিত হলে ছেলেমেয়েদের স্কুলে যেতে হবে অর্থাৎ তাদের ঘরের কাজে বা চাষবাসের কাজে লাগানো যাবে না। এ ছাড়া, যাদের ওপর বালকবালিকার সংখ্যাগণনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তারাও যত্নসহকারে কাজ করত না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পল্লীর বাসিন্দাদের সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে তারা ভুল তথ্য লিপিবদ্ধ করে নিয়ে যেত। ফলে জনগণনার তালিকা নির্ভরযোগ্য হতে পারত না।

(২) আবশ্যিক শিক্ষাবিধি থেকে অব্যাহতিদানের যে ব্যবস্থা আইনে ছিল, সে সম্পর্কে অধিকাংশ লোকই ছিল অজ্ঞ। কারণ অভিভাবকদের কাছে ব্যক্তিগত নোটিশ পাঠানোর কোন আয়োজন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে, বালকদের চেয়ে বালিকাদের জন্যে অব্যাহতিদানের আবেদন পাওয়া যেত।

(৩) আর একটি অসুবিধা হয়েছিল আইন অমান্যকারী অভিভাবকদের শাস্তিদান বিষয়ে। আবশ্যিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যে অভিভাবক আপন

সন্তানকে প্রেরণ করেন না বা প্রেরণ করলেও সন্তানের নিয়মিত উপস্থিতি সম্পর্কে যত্নবান হন না, সে সব ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধি থাকলেও প্রয়োগ অসুবিধা ছিল। প্রধান শিক্ষকগণ আইন অমান্যকারী অভিভাকদের তালিকা প্রস্তুত করে নিয়মিত পাঠাতেন, কিন্তু আইন অমান্য-কারীদের যে জরিমানা ধার্য্য হত, তা আদায়ের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ফলে বছরের পর বছর বকেয়া জরিমানার পরিমাণই বৃদ্ধি পেয়েই চলত। বহু ক্ষেত্রে অভিভাবকদের অস্বচ্ছল আর্থিক অবস্থার দরুণ জরিমানা আদায় করা সম্ভব হত না। এর একমাত্র প্রতিবিধান ছিল স্কুলের সময়সূচীর অদলবদল করে গ্রামবাসীদের সুবিধামত করা এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

(৪) বরোদা রাজ্যে আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থা কার্য্যকরী করার প্রতিবন্ধকরূপে কতকগুলি সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসুবিধাও ছিল। প্রথমতঃ, সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিরাই সর্ব্বাধিক সুবিধা ভোগ করত এবং নিম্নস্তরের মানুষকে অবহেলিত হতে হত। উচ্চস্তরের ব্যক্তিরা নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের অধীনে রাখার উদ্দেশ্যে তাদের বেশি শিক্ষাদীক্ষা পছন্দ করত না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিম্নস্তরের ব্যক্তিরা শাস্তি, জরিমানা এবং অযথা আদেশ পালন করবার জন্যেই তৈরী থাকত ; শিক্ষাগ্রহণের উপযোগিতা তাদের কেউ বোঝায়নি।

দ্বিতীয়তঃ, নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের, বিশেষ করে হরিজন সন্তানদের দারিদ্র্যের জন্যই সমাজে তারা ছিল ঘৃণ্য এবং মন্দিরে বা কোন বসতবাটিতে স্কুল বসলে সেখানে তাদের প্রবেশাধিকার দিতে অনেকেই কুণ্ঠাবোধ করত। কোন কোন ক্ষেত্রে হরিজনরা নিজ সন্তানদের শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে আগ্রহ প্রদর্শন করলে উচ্চস্তরের ব্যক্তিরা নানারূপ পরোক্ষ অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করত।

তৃতীয়তঃ, কৃষিজীবী গ্রামবাসীদের সন্তানরা কর্মক্ষম হলেই তাদের চাষবাসের কাজে, পরিবারের শিশুদের প্রতি লক্ষ্য রাখার বিষয়ে নিযুক্ত করা হয় অথবা পরিবারের উপার্জ্জন বৃদ্ধি করার জন্য কোনও কাজে সহায়তা করতে পারে। যেমন, গৃহপালিত পশুদের দেখাশোনা, বীজবোনা প্রভৃতি। এ রকম পরিস্থিতিতে দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তানকে স্কুলে পাঠানোর জন্য বাধ্য করলে তাদের অর্থনৈতিক সঙ্কট আরও বৃদ্ধি পাবে।

এই সকল অসুবিধার মধ্যে বরোদা রাজ্যে আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থা খুব বেশি অগ্রসর হতে পারেনি এবং প্রায় ৫০ বছর ধরে কাজ চলার পরেও ১৯৪১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ রাজ্যে সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা হয়েছে মাত্র ২৩%। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজ্যে আবশ্যিক শিক্ষা আইন বলবৎ না থাকা সত্ত্বেও ঐ দুটি রাজ্যে ঐ বছরে সাক্ষর ব্যক্তির

হার যথাক্রমে ৫৮% এবং ৩৫% ছিল। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আইনের সাহায্যে সাক্ষরতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

ব্যর্থতার কারণ পর্য্যালোচনা প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিভিন্ন অঞ্চলে বিনা পরিকল্পনায় যথেচ্ছভাবে স্কুল স্থাপন এবং এক-শিক্ষক পরিচালিত স্কুলের প্রতি রাজ্য কর্তৃপক্ষের বিশেষ মনোভাবের জন্যেই বহু অঞ্চলে স্কুল শিক্ষার সুযোগ সুবিধা প্রসারিত হতে পারেনি। এক-শিক্ষক পরিচালিত স্কুলগুলিকে অপকারী মনে করে, সেগুলির কয়েকটিকে সংযুক্ত করার প্রয়াস সুরু হয়। ফলে, ক্ষুদ্র গ্রামাঞ্চলগুলি স্কুলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে থাকে।

অনেকে মনে করেন, শিশুদের আবশ্যিক শিক্ষাকে সফল করতে হলে বয়স্কশিক্ষার ব্যাপক এবং সুষ্ঠুতর আয়োজন দরকার। কারণ সমাজের বয়স্ক ব্যক্তিরা শিক্ষার উপযোগিতা বুঝতে পারলে তখন তারা নিজ নিজ সন্তানদের আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থায় সহযোগিতার সার্থকতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে আবশ্যিক শিক্ষা আইন বলবৎ না থাকা সত্ত্বেও বরোদা রাজ্য অপেক্ষা সেখানে সাক্ষর জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার বিস্ময়কর অগ্রগতি সম্পর্কে নুরুল্লা এবং নায়েক বলেছেন, যে সকল কারণে এই আশ্চর্য্য পার্থক্য দেখা গেছে, তাদের মধ্যে প্রথম হল, জনমতের জাগরণ, দ্বিতীয়, সমাজে নারীর বিশেষ মর্য্যাদা ; এবং তৃতীয়, বহু হরিজনের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ। নারী সমাজ ও হরিজন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাক্ষরতার স্বল্প হারের দরুণই সামগ্রিকভাবে সাক্ষরতার শোচনীয় অল্পতা প্রতীয়মান হত। ত্রিবাঙ্কুরে নারীশিক্ষার প্রতি সামাজিক বিধিনিষেধ অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে খুব অল্পই ছিল। এবং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মিশনারীদের সমাজকল্যাণকর কর্ম্মসূচীর ফলে খৃষ্টান ভারতীয়দের মধ্যে সাক্ষরতা বৃদ্ধি পায় বিশেষভাবে। এই সব কারণে আবশ্যিক শিক্ষাআইন প্রবর্ত্তিত না হলেও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা এত বেশি।

বরোদা রাজ্যে আবশ্যিক শিক্ষা আইন ব্যর্থ হলেও এর ফলে সমগ্র দেশের সর্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের এক অভূতপূর্ব্ব আন্দোলন সুরু হয়। একটির পর একটি রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হতে থাকে এবং আবশ্যিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবর্ত্তিত হয়। অবশ্য এই উন্মাদনার ফল আশানুরূপ হয়নি। ১৯১৯ সালে বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আইন গৃহীত হয়, কিন্তু ১৯৪৮-৪৯ সালের হিসাবে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা শহরের মাত্র একটি পল্লীতে আবশ্যিক শিক্ষা বলবৎ করা সম্ভব হয়েছে! বিহারেও ১৯১৯ সালে আবশ্যিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হয়, কিন্তু স্বাধীনতার প্রাক্কালে ঐ রাজ্যের মাত্র ১৭টি শহরাঞ্চল ও ১টি গ্রামাঞ্চলে ঐ আইন কার্য্যকরী

করা সম্ভব হয়েছে। উড়িষ্যায় ১৯২০ সালে আইন বিধিবদ্ধ হলেও ত্রিশ বছরের মধ্যে মাত্র ১টি শহর এবং ২৪টি গ্রামে আইনমত শিক্ষা সুযোগ সম্প্রসারিত হতে পেরেছে। আসামে ১৯২৬ সালে আবশ্যিক শিক্ষা আইন গৃহীত হয় কিন্তু প্রথম কার্যকরী হয় মাত্র ১৯৩৭ সালে। কেবলমাত্র বোম্বাই রাজ্যে এ বিষয়ে তৎপরতার লক্ষণ দেখা যায়; সেখানে স্বাধীনতার প্রাক্কালে ১০৪টি শহর এবং ৫২৬৭টি গ্রামে আবশ্যিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সমস্যার বিশালতার পরিপ্রেক্ষিতে এই অগ্রগতিকে নগণ্যই বলা চলে।

এতগুলি রাজ্যে আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও এই সামান্য অগ্রগতির মূলে ছিল সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের অবহেলা। অবশ্য এই অবহেলার সঙ্গে আরও শক্তিশালী প্রতিবন্ধক ছিল রাষ্ট্রকোষে যথেষ্ট অর্থের অপ্রাচুর্য্য। ১৯২৮ সালে হার্টগ কমিটি মন্তব্য করেন, শিক্ষাসুযোগের সংখ্যাগত বৃদ্ধির চেয়ে গুণগত মান উন্নয়নের দিকেই অধিকতর লক্ষ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। এই মন্তব্যের ফলেও উদ্যোক্তারা প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসারে বিশেষ আগ্রহ নিতেন না। হার্টগ কমিটি আরও মন্তব্য করেন যে, আবশ্যিক শিক্ষাপ্রসারে অত্যধিক দ্রুততা অবলম্বন করলে শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া হ্রাস পাবে না। এই আশঙ্কাতেও আবশ্যিক শিক্ষা প্রসারের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে পড়ে।

আরও একটি কারণে আবশ্যিক শিক্ষা প্রসার ব্যাহত হয়, সেটি হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধ সুরু হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীগুলি পদত্যাগ করেন এবং ব্রিটিশ সরকার কোনও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা পরিচালনা করতে অস্বীকৃত হন।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরে দেশবিভাগজনিত নানা নতুন সমস্যার জটিলতায় জাতীয় সরকারের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের দিকে যথাযথ মনোযোগ দেওয়া একেবারেই সম্ভব হয়নি।

ভারতবর্ষের মত বিশাল উপমহাদেশে সর্ব্বজনীন আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করতে হলে নানা অসুবিধা দেখা দেওয়া আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু সেই অসুবিধা ও বাধাবিপত্তি সম্পর্কে ক্রমাগত পরীক্ষানিরীক্ষা ও গবেষণার ব্যাপক আয়োজন রাখা উচিত। ১৮৯৩ সালে আইনের সহায়তা প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলেও এ ধরণের গবেষণার কোনও সুষ্ঠু আয়োজন করা হয়নি। ফলে, এ বিষয়ে অগ্রগতির পরিমাণ সন্তোষজনক হতে পারেনি।

Q. 5. Discuss on the principle that compulsory education should first be introduced for boys and then extended to girls.

Ans. এদেশের আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রথম যুগে উদ্যোক্তাদের অভিমত ছিল এই যে, প্রথমে বালকদের প্রাথমিক শিক্ষা

আবশ্যিক করতে হবে, এবং যখন জনমতের সমর্থন পাওয়া যাবে, তখন ঐ ব্যবস্থা বালিকাদের জন্যেও প্রবর্ত্তন করা হবে। এই অভিমতের বিরোধিতা করা কঠিন; দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বালিকাদের শিক্ষা সম্পর্কে কুসংস্কার এতই প্রবল যে, বালিকাদের শিক্ষা আবশ্যিক করার আগে বালকদের আবশ্যিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করে এই নতুন বিধানের রীতিনীতি জনগণকে ভালভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। এ যাবৎ ভারতবর্ষের যতগুলি প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে, তাদের অধিকাংশতেই এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন নির্দ্দেশ নেই। ফলে, রাজ্য সরকারগুলি বালক অথবা বালিকা, কিংবা উভয়ের জন্যেই একসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করার পরিকল্পনা মত কাজ করেছেন এবং করছেন। মধ্যপ্রদেশে অবশ্য প্রথমে বালকদের প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করার কথা আইনে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত ছিল। পরে অন্যান্য রাজ্যেও এই নীতিকে গ্রহণ করার আগ্রহ দেখা যায়।

অবশ্য শহরাঞ্চলে যেখানে নারীশিক্ষা সম্পর্কে কুসংস্কার প্রবল নয়, সেখানে এই পার্থক্য অবলম্বন করার দরকার হয় না। তাছাড়া মাদ্রাজ, বোম্বাই, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন প্রভৃতি রাজ্যে, যেখানে নারীশিক্ষার পথে সামাজিক অন্তরায় নেই বললেই চলে, সেখানেও বালিকাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আবশ্যিক করার কাজ পিছিয়ে রাখার প্রয়োজন হয়নি।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যে বালিকাদের শিক্ষাকে আবশ্যিক করার কাজ অবশ্য অনেক পিছিয়ে রয়েছে। বিশেষতঃ উত্তর ভারতে এই অনগ্রসরতা প্রকট হয়ে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব্ব পাঞ্জাব, দিল্লী, ভূপাল, কাশ্মীর এবং মধ্য প্রদেশেও ব্যাপকভাবে বালিকাদের শিক্ষা আবশ্যিক করা হয় নি। বিহার উত্তর প্রদেশ, এবং উড়িষ্যায় বালকদের তুলনায় বালিকাদের আবশ্যিক শিক্ষার আয়োজন নিতান্ত সামান্য অগ্রসর হয়েছে।

বর্ত্তমানে সকল শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্ম্মী উপলব্ধি করেছেন যে, বালিকাদের শিক্ষাই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যিক হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমাদের দেশে এ বিষয়ে বিপরীতমুখী প্রগতি ঘটছে।

Q. 6. What are the physical obstacles to the progress of compulsory primary education in India?

Ans : ভারতে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পথে যে সকল প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অন্তরায় রয়েছে, সেগুলিকে মোটামুটি তিনটি পর্য্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা চলে। এগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিপর্য্যয়কর অন্তরায় হলো দেশের গ্রাম্য পরিবেশের প্রাধান্য। একথা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, শহরাঞ্চলে গণশিক্ষা প্রসারের কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ। অবশ্য শহরে স্কুলের উপযোগী ঘরবাড়ী, খেলার মাঠ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য; তবুও অন্যান্য সুবিধা ও

সুশিক্ষা দানের সুযোগাদির জন্য স্থানাভাবের অসুবিধার পরিপূরণ করা চলে। শহরের স্কুলগুলির আকার বৃহৎ, ভাল শিক্ষক এবং মহিলা শিক্ষক সহজে পাওয়া যায়, স্কুলগুলি নিয়মিত পরিদর্শনের সুবিধা থাকে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়াও সম্ভব হয়। কলের জল, ভাল জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা, হাসপাতাল প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাদি থাকার দরুণ স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি ব্যাপারে পরোক্ষভাবে সহায়ক হয়।

কিন্তু গ্রামাঞ্চলের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে স্কুলগুলি ক্ষুদ্র; উপযুক্ত শিক্ষকের আয়োজন করা প্রচুর ব্যয়সাধ্য; বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত এবং নির্ব্বাচিত না হলে অধিকাংশ শিক্ষকই গ্রাম্য পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেন না এবং শিক্ষকতা বৃত্তিতে আকৃষ্ট হতে পারেন না; গ্রাম্য পরিবেশে উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকলে শিক্ষিতা মহিলারা শিক্ষকতার কাজে আগ্রহবোধ করেন না; শিক্ষকরা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে থাকেন, বিভিন্ন মতাবলম্বী এবং প্রশাসন, পরিচালনা ও পরিদর্শন সংক্রান্ত বিষয়ে সমস্যা বহুতর; এবং শিক্ষার্থীদের স্কুলে যোগদান ও উপস্থিতি নিয়মিত করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই সঙ্গে যানবাহনের অসুবিধার কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে।

জগতের সর্ব্বত্রই আবশ্যিক শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে এই সকল অসুবিধা আছে, কিন্তু ভারতে ঐ অসুবিধাগুলি অতি প্রকট। কারণ ভারতীয়রা মূলতঃ গ্রাম প্রধান জাতি এবং এদেশের ৮৫% মানুষ গ্রামে বাস করে। আরও অসুবিধাজনক এই যে, ভারতের গ্রামগুলিতে প্রায় ½ অংশ অত্যন্ত ক্ষুদ্রায়তন। যে গ্রামে কমপক্ষে ৩০০ লোক বসতি আছে, সেখানে অন্তত ৪০ জন স্কুলে অধ্যয়নের উপযোগী বালকবালিকা পাওয়া যেতে পারে এবং স্কুল প্রতিষ্ঠা তখনই অর্থনৈতিক বিবেচনায় যুক্তিসঙ্গত হবে। কিন্তু ভারতের এমন হাজার হাজার গ্রামে আছে, যেখানে লোকবসতি ২০০ জনেরও কম। যদি কয়েকটি ক্ষুদ্র গ্রামের জন্যে একটি স্কুল স্থাপনা করা হয়, তাহলেও অসুবিধা হয় সে, গ্রামগুলি একটির থেকে অপরটি এত দূরে অবস্থিত যে, বালকবালিকাদের পক্ষে প্রতিদিন সেই দূরত্ব অতিক্রম করে স্কুলে যোগদান সম্ভব হয়ে ওঠে না। ঐ সকল অতি ক্ষুদ্র দূরে দূরে অবস্থিত গ্রামগুলিতে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা এক দুরূহ সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান করতে হলে মৌলিক চিন্তাধারা, আন্তরিক পরিকল্পনা ও প্রচুর অর্থবল প্রয়োজন।

এদেশে আবশ্যিক শিক্ষা প্রসারের পথে দ্বিতীয় ধরণের বাধা হল গ্রামাঞ্চলের সীমারেখার বাইরে বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমির প্রাকৃতিক অপচয়। সেখানে জীবনযাত্রা কঠোর। মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম বসতি থাকতে পারে, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন। কোন কোন অরণ্য অঞ্চলে গ্রাম

বলে কিছু নেই, মানুষ সেখানে যাযাবরের মতো জীবনযাপন করে—এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ব্যবসা করে বেড়ায়। এর ওপর আছে, অস্থির-প্রকৃতি জলবায়ু এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাপক রোগব্যাধি। এ সব অঞ্চলে স্কুল স্থাপনের মত কষ্টসাধ্য কাজ বোধহয় আর কিছুই হতে পারে না। কারণ অনুন্নত জনগণের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষককে কাজে নিয়োগ করা সম্ভব হয় না, স্কুল স্থাপিত হলেও তত্ত্বাবধান করা সহজ নয়। কারণ অরণ্য পরিবেশের কঠোর জীবন ও যানবাহনের অসুবিধা প্রবল প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

প্রাকৃতিক অন্তরায়ের তালিকায় অসহযোগী জলবায়ুর কথা আসে। ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর প্রভৃতি ব্যাধি কোন অঞ্চলে একেবারেই নিয়মিত ঋতুমত দেখা দেয়। ফলে সে সকল অঞ্চলে শিক্ষাপ্রসার বহুলাংশে ব্যাহত হয়। এই সব খারাপ জলবায়ু অঞ্চলে কাজ করার জন্য সরকারী কর্ম্মচারীদের বিশেষ ভাতা দিতে হয়। এই বিশেষ ভাতা সত্ত্বেও শিক্ষকরা ঐ সকল অঞ্চলে কাজ করতে আগ্রহ বোধ করেন না। কোন শিক্ষক কাজ গ্রহণ করলেও ঐ অঞ্চল থেকে বদলী হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন; স্থানীয় বালকবালিকাদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না।

বিভিন্ন অঞ্চলে এই সকল প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অন্তরায়ের তীব্রতা বিভিন্নরকম। আসাম ও উড়িষ্যার অরণ্য অঞ্চল সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের চেয়ে বেশি।

এই সকল সমস্যার প্রতিবিধানে সরকারী অর্থসাহায্য মঞ্জুরের নীতি নির্দ্ধারণ করতে হবে, যাতে অনুন্নত অঞ্চলগুলিকে যথাসম্ভব সুবিধা গড়ে ওঠে।

Q. 7. What are the social obstacles to the progress of compulsory primary education in India?

Ans: সর্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পথে সামাজিক অন্তরায়-গুলি বোধহয় প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক অপেক্ষাও বিপর্য্যয়কর। আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা মূলতঃ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে পরিকল্পিত হয়ে থাকে। সমাজের উচ্চনীচ প্রভেদের বিলোপ সাধন করে সমাজের সকল পর্য্যায়ের জনগণের মধ্যে স্বচ্ছন্দ আদানপ্রদানকে সহজ করে তোলাই এই ব্যবস্থার অন্যতম মহৎ উদ্দেশ্য। এই কারণেই যে সমাজ একীভূত, দৃঢ়নিবদ্ধ, যেখানে জনগণের মধ্যে সুস্পষ্ট সম্প্রদায়-ভেদ নেই এবং এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অপর সম্প্রদায়ের অবাধ সংমিশ্রণ অনুমোদিত ও স্বীকৃত হয়েছে, সেখানেই আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার দ্রুত প্রসার সহজসাধ্য হতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ, ভারতের সামাজিক অবস্থা সাম্প্রতিক কালে সম্পূর্ণ বিপরীত এবং তারই ফলে, সর্ব্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার মন্থরগতি এবং দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে।

প্রথমে, ভারতীয় সমাজ বহু বিচিত্র 'নানা ভাষা নানা মত' এবং বিবিধ আচারবিচারের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে। বহু জাতি, বহু ধর্ম্ম, বহু সভ্যতা এদেশে এসেছে এবং তাদের প্রভাব এদেশের সমাজের উপর স্থায়িভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে, এদেশের সামাজিক পরিবেশে বহু অসামঞ্জস্য পাশাপাশি অবস্থান করছে এবং সেগুলির মর্য্যাদা স্বীকৃত হয়েছে। জাতিগত বিচারে, এদেশে আর্য্যজাতির সঙ্গে আদিম অনুন্নত জাতিও বাস করছে। সাংস্কৃতিক দিক থেকে, এদেশে শতশতাব্দীর ঐতিহ্যপূর্ণ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পাশে সমাজে অবহেলিত অল্পশিক্ষিত আদিবাসীদেরও মানবিক মর্য্যাদা স্বীকৃত হয়েছে। ধর্মমত বিষয়ে, ভারতেই বোধহয় জগতের সকল দেশের ধর্ম্মাবলম্বী মানুষের বসবাস সম্ভব হয়েছে। হিন্দুধর্ম্মই এদেশে প্রধান, কিন্তু দুঃখের বিষয়, হিন্দুদের মধ্যেও দু হাজার সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে এবং এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবাহ বা পংক্তিভোজন পর্য্যন্ত সমাজস্বীকৃত হয়নি। ফলে হিন্দুধর্ম্মের লোকদের মধ্যেও সামাজিক ভাববিনিময়ের অবকাশ অযথা সঙ্কুচিত হয়ে আছে। সমাজে উচ্চস্তরে পুরোহিত বা যাজক শ্রেণীর বংশধরদের প্রতিপত্তি রয়েছে, তারাই বেশি সুবিধা ভোগ করছে। জমিদার, রাজা, প্রভৃতি ভূমি অধিকারীদের বংশধরদেরও সমাজে অপেক্ষাকৃত বেশি মাননীয় মনে করা হয়। শিল্প বিপ্লবের ফলে ধনী ও বণিক সম্প্রদায়ের সামাজিক মর্য্যাদাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শিল্পশ্রমিকদের সমাজের নিম্নতম স্তর নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের ফলেও কতকগুলি প্রশাসনিক পদমর্য্যাদা সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই সকল মর্য্যাদাসম্পন্ন পদাধিকারী ব্যক্তিবর্গ ও তাদের বংশধররা এক নতুন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছে। এই সকল নতুন সম্প্রদায়গত বিভেদের ফলে সামাজিক বৈষম্যের উদ্ভব হয়েছে এবং অবিশ্বাস্য সামঞ্জস্যহীনতা প্রকট হয়ে উঠেছে।

ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে সামাজিক সংস্কারের বহু প্রচেষ্টা হয়েছিল, একথা সত্য। এদেশের জনগণের সমাজ ব্যবস্থার নানাপ্রকার উন্নতির জন্য ব্রিটিশ শাসনাধীনে বহু আয়োজন ছিল, কিন্তু এগুলির সঙ্গে সঙ্গে আরও নতুন শ্রেণীভেদও সৃষ্টি হয়ে চলেছিল। ব্রিটিশ শাসকদের 'শ্রেণীভেদ ও শাসন' নীতিই এর মূলে ছিল। ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন নতুন মনোমালিন্য ও মতবিরোধ সৃষ্টি হতো। ব্রিটিশ শাসক-গোষ্ঠির বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার জন্য একটি অখণ্ড ভারতীয় জাতিরূপে এই সকল সম্প্রদায়গুলি জাতীয়তাবোধের পরিচয় দিতে পেরেছিল, একথা স্বীকার করলেও আমরা দেখি স্বাধীনতার পর আবার সাম্প্রদায়িক বিভেদগুলি নানা অসুবিধার সৃষ্টি করছে।

সমাজে বৈষম্য থাকলেও দুভাবে সর্ব্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতি সম্ভব হতে পারে: প্রথম, সমাজের উচ্চস্তরের শিক্ষিত ও বিত্তবান ব্যক্তিরা জনকল্যাণ

ব্রতের তাগিদে জনগণের সর্ব্বজনীন শিক্ষার পথ সুগম করতে পারে। দ্বিতীয়, জনগণই আপন সন্তানবর্গের শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে একতাবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রনায়কদের কাছে দাবী জানাতে পারে। ইংলণ্ডে এই দু'টি শক্তিই একযোগে কাজ করেছিল—জনকল্যাণ ও জনজাগরণ। কিন্তু ভারতে কোনটিই বিশেষ কার্য্যকরী দেখা যায় নি।

ভারতীয় সমাজের সতীদাহ প্রথা, বালবিবাহ, বালবিধবা, পর্দ্দাপ্রথা প্রভৃতি কারণে শিক্ষার অগ্রগতি অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছে। নারীসমাজে শিক্ষার হার অল্প থাকার দরুণ বালকবালিকারাও শিক্ষার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার বিশেষ সুযোগ লাভ করত না। দাম্পত্য সম্পর্ক এবং গৃহকর্ম্মের আনুষঙ্গিক কর্ত্তব্য ছাড়া নারী সম্প্রদায়ের আর সকল শিক্ষাকেই অপ্রয়োজনীয় এমনকি বিপজ্জনক বলে সমাজে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, বালিকাদের স্কুলে অধ্যয়ন করালে আশু বৈধব্য ঘটে! অধুনা নারীশিক্ষার বিশেষ প্রগতি সাধিত হয়ে থাকলেও ১৯৬১ সালের আদমসুমারীর হিসাবে দেখি, কোন কোন অঞ্চলে এখনো মাত্র শতকরা ৬ জন মহিলা সাক্ষরা। এখনো গ্রামাঞ্চলে নারীশিক্ষা সম্পর্কে জনসাধারণ দ্বিধাগ্রস্ত; প্রাথমিক স্কুলগুলিকে বালকদের তুলনায় বালিকাদের সংখ্যা অনেক কম; মহিলা শিক্ষিকা উপযুক্ত সংখ্যায় পাওয়া যায় না, কারণ মহিলাদের শিক্ষকতা-বৃত্তি সম্পর্কে সমাজের মনোভাব আকর্ষণীয় নয়। যে সব বালিকা স্কুলে পড়ে তাদের মধ্যে একটি বড় অংশ অকস্মাৎ পড়াশুনা বন্ধ করে দেয়; কারণ নারী-শিক্ষাকে অনেকেই অপ্রয়োজনীয় মনে করেন।

নারীসমাজের পরেই অস্পৃশ্য সমাজের কথা আসে। কেবল অস্পৃশ্য অপবাদ থাকার জন্যই শিক্ষাক্ষেত্রে এই সম্প্রদায়ের সন্তানদের সমান অধিকার দানের পথে প্রবল বাধার সৃষ্টি হয়ে আছে। এরা অত্যন্ত দরিদ্র, নিতান্ত অবহেলিত এবং প্রায় অর্দ্ধাহারে জীবনযাপন করে। লোকবসতির সর্ব্বাপেক্ষা অবহেলিত অঞ্চলে তাদের বাস এবং সমাজের সকল মানুষের কৃপার ওপর তারা নির্ভর করে থাকে। অস্পৃশ্যতা আইনতঃ দণ্ডনীয় স্বীকৃত হলেও এখনো বহু অঞ্চলে এর জের রয়েছে এবং সেখানে তাদের সর্ব্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত করার বাধা প্রচণ্ড।

ভারতের আদিবাসী ও পার্ব্বত্য অঞ্চলের উপজাতিদের অনুন্নত সমাজের কথাও ঐই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। শিক্ষাক্ষেত্রে এদের অনগ্রসরতা সর্ব্বজনবিদিত এবং এরা যে ভাষায় কথা বলে তার কোন বর্ণলিপি আজও ব্যবহার করতে শেখেনি। এদের শিক্ষা সমস্যা সেইজন্যও অত্যন্ত জটিল এবং তাদের সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিপুল অর্থ, ব্যাপক আইনিবিধি এবং বিশাল কর্ম্মীবাহিনীর প্রয়োজন। বর্ত্তমানে এগুলি পর্য্যাপ্ত না হওয়ায় তাদের সন্তানদের

জন্য অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা বিশেষ দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ভারতের জটিল সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সর্ব্বজনীন অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা বিক্ষিপ্তভাবে হলে ব্যর্থ হতে বাধ্য কারণ সমাজের প্রতিটি সম্প্রদায়ের নানাবিধ সমস্যার সঙ্গে শিক্ষাসমস্যার মূল গভীরভাবে জড়িত।

Q. 8. Discuss the cultural obstacles that impede the progress of compulsory primary education in India.

Ans : সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিবেচনা করলে, ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের দুটি প্রধান বাধা রয়েছে। এক, বিপুল বয়স্ক-অক্ষরহীনতা। তথ্যানুসন্ধানী অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদরা দেখেছেন, বয়স্ক শিক্ষার মান এবং প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র উপস্থিতির হার—এই দুটির মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুবন্ধ আছে। শিক্ষিত সাক্ষর অভিভাবক আপন সন্তানকে নিয়মিত স্কুলে প্রেরণের পক্ষপাতী। এই কারণেই ইংলণ্ড বা আমেরিকায় ৯০% ক্ষেত্রে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারে নিয়মিত ছাত্র উপস্থিতির জন্য আইন প্রয়োগ করতে হয় না। ভারতে বয়স্ক সম্প্রদায়ের মধ্যে সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্ত অল্প হওয়ার জন্য আবশ্যিক শিক্ষাও সফল হতে পারছে না।

সাংস্কৃতিক প্রতিকূলতার আর একটি দিক হল, এদেশের অগণিত ভাষা এবং উপভাষা। উপভাষাগুলির কতকগুলির কোন বর্ণমালা নেই এবং সেগুলির উন্নতি সাধন করা হবে বা লোপ সাধন করা হবে, সে বিষয়ে ১৮৮২ সাল থেকে আলাপ আলোচনা বিতর্ক চললেও আজও কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।

এমন কি অনুমোদিত প্রধান ভাষাগুলির সংখ্যাও এত বেশি যে, ছোটদের অধ্যয়নের উপযোগী সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে একাধিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়া এমন বহু দ্বিভাষী অঞ্চল আছে, যেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সন্তানরা মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেতে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করে। সমগ্র ভারতে মুসলমান বালকবালিকাদের এই সমস্যাটি বেশি, কারণ তাদের সংখ্যা কোন কোন অঞ্চলে এত অল্প যে, তাদের জন্য পৃথকভাবে উর্দু ভাষায় শিক্ষাদানের আয়োজন করা কোনমতেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। বিশেষতঃ দক্ষিণ-ভারতের মুসলমান বালকবালিকাদের এই অসুবিধাটি অত্যন্ত প্রকট। বহুভাষা সংক্রান্ত এই সকল সমস্যার ফলে অত্যন্ত তিক্ততার সৃষ্টি হয়ে থাকে, কিন্তু আজও এগুলির সমাধান হয়নি। এই সকল সমস্যার ফলে কেবল শিক্ষাক্ষেত্রে নয়, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

Q. 9. Discuss the political obstacles that impede the progress of compulsory primary education in India.

Ans. ভারতে এখন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত রয়েছে। এই ব্যবস্থার মধ্যে যে সকল রাজনৈতিক দল বা সম্প্রদায় রয়েছে, সেগুলি ক্ষমতা সম্পর্কে নানাবিধ ভেদাভেদ নিয়ে এতই ব্যস্ত যে, সর্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের বিষয়ে জনকল্যাণমূলক কাজে দলগুলি কোন কাজই করতে পারে না, বা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্ব্বজনীন ও আবশ্যিক করার ব্যাপারেও ক্ষমতাসীন সরকারকে চাপ দিতে পারে না। কংগ্রেস এখন একমাত্র রাজনৈতিক দল, যেটি ১৯৪৭ সাল থেকে ক্ষমতায় আসীন রয়েছে, কিন্তু রাজনৈতিক বিভেদ সংক্রান্ত সংগ্রামে মনোযোগী থাকতে গিয়ে শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ দিতে পারছে না। ১৯৪৭ সালের পর অবস্থার উন্নতি হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু দেশবিভাগ, কাশ্মীর সমস্যা, খাদ্য সঙ্কট, দেশীয় রাজ্যবিলোপ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে দেশের রাষ্ট্রনায়কদের চিন্তা নিবদ্ধ থাকায় আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসারের বিপুল কর্ম্মসূচী বিশেষ ব্যাহত হয়। প্রকৃতপক্ষে, আবশ্যিক শিক্ষার অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যায় এবং অবনতিও ঘটে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি থেকে এ-বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা করা যায় এবং দেখা যায় যে, আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। এমনকি, আবশ্যিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যরেখাও বস্তুতঃ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে।

অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও এইরকম মনোভাব অবলম্বন করেছে। আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তন সংক্রান্ত বিষয়টিতে মতবিরোধের অবকাশ নেই বলেই ঐ সকল রাজনৈতিক দলগুলি ভূমিসংস্কার, খাদ্যসঙ্কট, শিল্প রাষ্ট্রায়ত্তকরণ প্রভৃতি মতবৈষম্যমূলক বিষয়গুলি নিয়েই বিতর্কে মত্ত থাকে; কারণ ঐ ধরণের বিতর্ক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়।

এই ধরণের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শিক্ষাসংক্রান্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'স্বল্পপ্রয়োজনীয়' আখ্যা লাভ করেছে এবং সরকারী কর্ত্তব্য সূচীর নগণ্য অংশ গ্রহণ করে আছে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের উচিত আবশ্যিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রশ্নটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা এবং সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচীর মাধ্যমে সত্বর সর্ব্বজনীন শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত করা। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সেই সুসম্ভাবনা আশা করা যায় না।

Q. 10. Give an idea of the administrative obstacles that impede the progress of compulsory primary education in India.

Ans. আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার

সমস্যা হল প্রশাসনিক সমস্যা। সমগ্র দেশে সর্ব্বজনীন শিক্ষা প্রবর্ত্তন করতে হলে প্রয়োজন হবে সুনিপুণ ব্যাপক প্রশাসন ব্যবস্থা। যথেষ্টসংখ্যক প্রাথমিক স্কুল স্থাপনা ও তত্ত্বাবধান, স্কুলে যোগদানের বয়সোপযোগী ছেলেমেয়েদের স্কুলের তালিকাভুক্ত করানো, এবং আবশ্যিক শিক্ষাগ্রহণের বয়স পর্য্যন্ত তাদের উপস্থিতি অব্যাহত রাখার যাবতীয় আয়োজন করার জন্যই যথাযথ প্রশাসন ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন। প্রশাসন কাঠামোর মধ্যে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ের অগ্রাধিকার বিষয়ে এবং প্রাথমিক স্কুলগুলিকে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ বিষয়ে কতকগুলি সমস্যা আছে। যেমন, সরকারী দপ্তরগুলিতে শিক্ষা বিষয়কে অবহেলাই করা হয় এবং প্রাথমিক স্কুল সংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা সংস্থার কাজে সহযোগিতার পরিবর্ত্তে বাধা সৃষ্টিই করা হয়ে থাকে। কি পন্থায় আবশ্যিক শিক্ষানীতি প্রয়োগ করা হবে, প্রাথমিক স্কুলগুলির পরিবেশের সঙ্গে আবশ্যিক শিক্ষানীতির কিভাবে সামঞ্জস্য সাধন করা যাবে এবং প্রশাসন ও শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে কিভাবে গবেষণা পরিচালনা করা হবে—এ সকল বিষয়ে সুষ্ঠু আয়োজনের জন্যও প্রয়োজন সুপরিকল্পিত প্রশাসন ব্যবস্থা।

দুর্ভাগ্যবশতঃ, কতকগুলি বিষয়ে ভারতীয় প্রশাসন ব্যবস্থার কয়েকটি ত্রুটিপূর্ণ নীতির জন্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রগতির বিশেষ বিঘ্ন ঘটেছে। এই ত্রুটিপূর্ণ প্রশাসনিক নীতিগুলির মধ্যে প্রধান হল : (১) প্রশাসন ব্যবস্থায় শিক্ষার সামান্যতম গুরুত্বপ্রদান, (২) অন্যান্য শিক্ষা পর্য্যায়ের তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রাধিকার অগ্রাহ্য, এবং (৩) স্থানীয় সংস্থাগুলির কাছে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের দায়িত্ব হস্তান্তর। প্রতিটি ত্রুটির ফল সুদূরপ্রসারী।

বৃটিশ আমলে শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যাগুলির প্রতি খুবই অল্প দৃষ্টি দেওয়া হত। ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকমণ্ডলী শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে কিছুই উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেননি। পরেও রাজকীয় শাসনের আমলে আইন, পুলিশ, ডাক-তার প্রভৃতির তুলনায় শিক্ষা খাতে বিশেষ কিছুই ব্যয় করা হত না। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের হাতে যখন শাসনভার কিছু কিছু হস্তান্তরিত হল, তখন থেকে শিক্ষাখাতে অর্থব্যয় বৃদ্ধি পেতে সুরু করে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেশের শিক্ষাপ্রগতির দিকে যথোপযুক্তভাবে জাতীয় সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং ব্যাপক শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন সুরু হয়। কিন্তু এই আমলেও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় নিতান্ত অল্প। প্রশাসনিক কর্ত্তৃপক্ষের এই চিরন্তন অবহেলা এদেশে প্রাথমিক এবং সকল পর্য্যায়ের শিক্ষা প্রসারের প্রতিবন্ধক হয়ে আছে।

শিক্ষাখাতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয় থাকে, জগতের প্রগতিশীল দেশগুলিতে তার দুই-তৃতীয়াংশ এমনকি কোন কোন দেশে তিন-চতুর্থাংশ

পর্য্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ব্যয়িত হয়। ভারতে এই রীতি অন্যরকম; এখানে মাধ্যমিক এবং উচ্চতর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাখাতেই বেশি অর্থ ব্যয় করা হয়।

স্থানীয় সংস্থাগুলি, যেমন, মিউনিসিপ্যালিটি, ইউনিয়ন বোর্ড, প্রভৃতির অধীনে প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন দায়িত্ব স্থানান্তরিত করায় এদেশে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে আর এক অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়েছে। মহামান্য গোখেল এই কারণেই চেয়েছিলেন যে, স্থানীয় সংস্থাগুলি প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেও আর্থিক গুরুদায়িত্ব সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের কাছে থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই যুক্তি-সঙ্গত পরামর্শ অবহেলিত হয় এবং স্থানীয় সংস্থাগুলির উপর সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু স্থানীয় সংস্থাগুলির অর্থবল খুবই সীমাবদ্ধ থাকার দরুণ কাজকর্ম্ম আশানুরূপ হতে পারেনি। ফলে স্থানীয় সংস্থার উদ্যোগে এদেশে সর্ব্বজনীন আবশ্যিক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের সকল আশা ব্যর্থ হয়েছে। এই সঙ্কট থেকে মুক্তি পেতে হলে স্থানীয় সংস্থাগুলিকে প্রচুর সরকারী অর্থসাহায্য দিতে হবে। অথবা সকল দায়িত্ব সরকারী শিক্ষা দপ্তরের হাতে গ্রহণ করতে হবে।

Q. 11. What are the financial obstacles that impede the progre.s of compulsory primary education in India ?

Ans. প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের পথে সকল অন্তরায়ের প্রধান হল আর্থিক সমস্যা। ভারতের মত দরিদ্র দেশে এই সমস্যার ভয়াবহতা আরও বেশি। কোনও রাজ্যই সম্পূর্ণভাবে নিজরাজ্যের আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহ করতে পারে না। ১৯৩৮-৩৯ সালের দ্রব্যমূল্যের ভিত্তিতে ২৯ কোটি জনসংখ্যার হিসাবে সার্জেণ্ট রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছিল যে, ভারতবর্ষে সর্ব্বজনীন আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বাৎসরিক ২০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। বর্ত্তমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও জনসংখ্যাবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এই অর্থের পরিমাণ প্রায় ৮০০ কোটি টাকা হবে। দেশের সমস্ত রাজস্ব আদায় পরিপূর্ণভাবে নিঃশেষ হয়ে যাবে এই বিপুল ব্যয়নির্ব্বাহ করতে গেলে। অতএব, এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে, এদেশে সম্পূর্ণ সর্ব্বজনীন আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা বর্ত্তমানে প্রবর্ত্তিত হওয়া অসম্ভব।

তাছাড়া, অধিকাংশ অভিভাবক এমন শোচনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে দিনযাপন করে যে, রাষ্ট্রের খরচে যথেষ্ট পরিমাণে স্কুলভবন ও শিক্ষক নিয়োগ সম্ভব হলেও সন্তানকে পূর্ণদিনের জন্য স্কুলে পাঠাতে সক্ষম হবে না। কারণ নানা গৃহস্থালীর কাজ, চাষবাস প্রভৃতির কাজে সন্তানদের সহায়তা নিয়েই তাদের চলতে হয়। আবশ্যিক শিক্ষা সফল হতে পারে যদি জনগণের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনা সম্ভব

হয়। যে সমাজে অভিভাবকদের আয়ের পরিমাণ ব্যয়ের চেয়ে বেশি এবং একান্ত প্রয়োজনীয় গ্রাসাচ্ছাদনের পর কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, সেখানেই আবশ্যিক শিক্ষা আইন কঠোরভাবে কার্য্যকরী করা সম্ভব। বৃটিশ আমল সুরু হবার আগেও এদেশের সাধারণ অভিভাবকের সেই স্বচ্ছলতাটুকু ছিল না। বৃটিশ আমলে সেই আর্থিক তুরবস্থা নানা কারণে বৃদ্ধি পায়; জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কুটির-শিল্পের অবনতি, বৈদেশিক শোষণ এবং দেশের কৃষি ও শিল্পসম্পদের অবহেলা প্রভৃতি কারণ সেগুলির অন্যতম। ফলে, অভিভাবকরা নিজ নিজ সন্তানের যথাযথ শিক্ষার জন্য একেবারেই অর্থব্যয় করার উৎসাহ পায় না, তবে সন্তানের ৫।৬ বছর বয়স নাগাদ স্কুলে পাঠায় কেবলমাত্র তুরন্তপনা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য। সন্তান যখনই একটু বড় হয়, তখন স্কুলে পাঠানো বন্ধ করে কাজকর্ম্মে লাগায়। এই পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন করা সহজসাধ্য নয় এবং এর জন্য আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

দেখা গেছে, কোনও অঞ্চলে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হওয়ার পর স্থানীয় সংস্থা কর ধার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন; এমনকি স্থানীয় সংস্থা কর ধার্য্যের প্রস্তাব গ্রহণ করলেও স্থানীয় সরকার সে প্রস্তাব অনুমোদনে আগ্রহ প্রদর্শন করেন না, কারণ সরকারী অর্থসাহায্য মঞ্জুর করার মত অর্থবল নেই। আবার যখন স্থানীয় সংস্থা ও সরকার উভয়েই প্রস্তাব সমর্থন করেন, তখন নতুন অন্তরায় দেখা দেয়। প্রথম, আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থা বিপুল প্রয়োজনের তুলনায় কোন পক্ষই যথাযথ তৎপরতার পরিচয় দিতে পারেন না; কারণ আবশ্যিক শিক্ষা বলতে প্রবহমান এক ব্যবস্থাকেই বোঝায়, যেখানে নিয়তই নতুন স্কুল গঠন, নতুন শিক্ষক নিয়োগের কথা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করতে হয়। অর্থাৎ আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থার কর্ম্মসূচী এমন ধারাবাহিক সুনিয়মী হওয়া দরকার যাতে প্রতিটি শিশু স্কুলে যোগদানের বয়স লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ অনায়াসেই পেতে পারে। কিন্তু এই ব্যবস্থা বহু অঞ্চলেই করা সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ শহরগুলিতে, যেখানে ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার ফলে স্কুলের এবং উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়, সেখানে স্থানীয় সংস্থা ও সরকার উভয়েই সেই দাবী পূর্ণ করতে সক্ষম হন না। ফলে, জনসাধারণের স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগের উপরেই নির্ভর করে থাকতে হয় এবং প্রকৃতক্ষেত্রে, জনসাধারণের সমাজসেবী উদ্যোগেই সমস্যার বহুলাংশ সমাধা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় অন্তরায় হলো এই যে, দূরদৃষ্টির অভাবে বহুক্ষেত্রেই মধ্যপথে আবশ্যিক শিক্ষানীতি পরিত্যাগ করতে হয়। বিপুল উদ্দীপনার বশে সরকারী কর্তৃপক্ষ আবশ্যিক শিক্ষার যে ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, তা নথিপত্রে

ভালই দেখায়, কাজও ভালভাবে সুরু হয়; কিন্তু অচিরেই অর্থসঙ্কটের বিভীষিকার সম্মুখীন হয়ে সমস্ত পরিত্যক্ত হয়।

Q. 12. Discuss how the obstacles that impede the progress of compulsory primary education in India can be overcome.

Ans. ভারতের আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের প্রতিবন্ধকগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে সেগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। প্রথম শ্রেণীর প্রতিবন্ধকগুলি সহজেই অতিক্রম করা যায় এবং সেগুলি হলো প্রশাসন-সংক্রান্ত সমস্যা। জাতীয় পুনর্গঠনের পরিকল্পনায় শিক্ষা প্রসারের সর্ব্বাধিক গুরুত্বপ্রদান করা একান্ত প্রয়োজন এবং এর জন্য যথেষ্ট পরিমাণে রাজস্বলব্ধ অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিকে তদনুযায়ী সংশোধন করতে হবে। বর্ত্তমানে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার রাজস্বলব্ধ অর্থের মাত্র ১% শিক্ষাখাতে ব্যয় করে থাকেন; কিন্তু এ বিষয়ে সেণ্ট্রাল এডভাইসরী বোর্ড অব এডুকেশন ১০% ব্যয়বরাদ্দের সুপারিশ করেছেন। রাজ্য সরকারগুলি রাজস্বের ২০% শিক্ষাখাতে ব্যয় করবেন, সেণ্ট্রাল এডভাইসরী বোর্ডের সুপারিশ মত; কিন্তু গড়ে প্রতি রাজ্য বর্ত্তমানে মাত্র ১৫% রাজস্ব শিক্ষাখাতে ব্যয় করে থাকেন।

স্থানীয় সংস্থাগুলি শিক্ষাখাতে কি নীতিতে অর্থব্যয় করবেন, সে বিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট বিধি প্রণীত হয়নি; এবং এক্ষেত্রেও সুষ্ঠু ব্যয় পরিকল্পনার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। যথাযথভাবে এই বিষয়গুলির দিকে মনোযোগ দিলে যথেষ্ট রাজস্ব বরাদ্দের পরিপোষণায় শিক্ষাপ্রসার দ্রুততর হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, রাজ্য সরকারগুলিকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের দিকে অধিকতর মনোযোগ দিতে হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য রাজ্যের সামগ্রিক শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যয়ের অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশ বরাদ্দ করতেই হবে। পরিকল্পনার প্রারম্ভেই এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন না করলে বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক শিক্ষার মত জনপ্রিয় এবং অপেক্ষাকৃত মর্য্যাদাসম্পন্ন বিষয়েই বেশি খরচ হতে থাকবে এবং প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলিত হবে।

তৃতীয়তঃ, স্থানীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার যথার্থ সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করতে হবে। স্থানীয় সংস্থাগুলি আর্থিক অনটনের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তাদের উপর আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করা বিশেষ যুক্তিসঙ্গত নয়। এ বিষয়ে ভারতের সংবিধানে সুস্পষ্টনীতি নির্দ্ধারিত হয়েছে যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবৈতনিক আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব রাজ্য সরকারগুলির। অতএব রাজ্য সরকারগুলিকেই এ বিষয়ে পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, অথবা স্থানীয় সংস্থাগুলিকে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে মনস্থ

করলে সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে তা করতে হবে এবং ঐ খাতে সকল প্রকার অর্থমঞ্জুরও করতে হবে, যাতে সংস্থাগুলি যথাযথভাবে দায়িত্বপালন করতে পারে।

দ্বিতীয় ধরণের প্রতিবন্ধকগুলি অপসারণ করতে হবে গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সযত্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের প্রতিবন্ধকগুলি দূর করা একেবারেই অসম্ভব নয়। তবে খুব সহজে সেগুলি দূর করা সম্ভব, এমন মনে করাও ঠিক নয়। এ ধরনের একটি প্রতিবন্ধক হল এদেশের বহু ভাষা ও উপভাষাগুলি। এক্ষেত্রে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মত উদার নীতি গ্রহণ করতে হবে এবং ভাষা ও উপভাষাগুলির জাতীয় সংহতি সাধনের পথ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় গবেষণা সংস্থা গঠন করতে হবে। যে সকল উপভাষার বর্ণমালা নেই, সেগুলির বর্ণমালা উদ্ভাবন করতে হবে এবং সকল ভারতীয় ভাষায় প্রয়োজনীয় সাহিত্যসৃষ্টির সকল প্রকার আয়োজন করতে হবে।

তৃতীয় ধরণের অন্তরায়গুলি কোনও দিনই সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত করা যাবে না। যেমন, অরণ্যাঞ্চলে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের প্রাকৃতিক অসহযোগিতা আমাদের চিরকালই চিন্তিত করবে। এসব ক্ষেত্রে জনগণের সুখসুবিধার জন্য কতকগুলি উন্নত ধরণের জীবনযাত্রা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করতে হবে, যাতে প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও অরণ্যাঞ্চল বা দুর্গম অঞ্চলের সন্তানরা অক্লেশে স্কুলে পঠনপাঠনের আগ্রহ পেতে পারে।

চতুর্থ ধরণের প্রতিবন্ধকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিলও। যেমন, দারিদ্র্যজনিত ব্যাপক অনিচ্ছা, যার ফলে জনগণ প্রগতিশীল সর্ব্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার আশু উপযোগিতা উপলব্ধি করতে পারে না। এই অনিচ্ছা ও বীতরাগ জনগণকে ব্যাপকভাবে দেহমনে পঙ্গু করে রেখেছে এবং সকল প্রকার কৃষি ও শিল্প সংক্রান্ত প্রগতির পথে উদ্বুদ্ধ করতে পারছে না। এই জড়ত্বের ফলে দারিদ্র্য আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দারিদ্র্য থেকে জড়ত্ব ও জড়ত্ব থেকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবর্ত্তিত হয়ে ক্লিষ্ট হচ্ছে।

ভারতের সমাজব্যবস্থা অসংখ্য সম্প্রদায় নিয়ে সংগঠিত এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বহু অসামঞ্জস্যের সমন্বয়ে বিচিত্র। এরূপ সমাজ ব্যবস্থায় সুষ্ঠুভাবে সর্ব্বজনীন আবশ্যিক শিক্ষাপ্রসার দ্রুততর করা বিশেষ কষ্টসাধ্য। আবার সর্ব্বজনীন শিক্ষাপ্রসার দ্রুততর করা সম্ভব হচ্ছে না বলেই ঐ শ্রেণীবিভেদ ও অসামঞ্জস্য স্থায়িত্ব লাভ করার সুযোগ পাচ্ছে। দরিদ্র সমাজের শিশুরা আবশ্যিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না বলে যেমন বয়স্ক সাক্ষরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে না, তেমনি বয়স্ক সাক্ষরতার স্বল্পতার জন্য শিশুরা আবশ্যিক শিক্ষার সুযোগ গ্রহণে বাধা পাচ্ছে। কারণ যে সকল বয়স্ক ব্যক্তি সাক্ষর নয়, তারা সন্তানদের শিক্ষাগ্রহণের উপযোগিতা না বুঝে

স্কুলে যোগদানে বাধা সৃষ্টি করে থাকে। বয়ঃপ্রাপ্তির ভিত্তিতে ভোটদানের অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এখন উপলব্ধি করছেন যে, বয়স্ক শিক্ষা যত দ্রুততর করা যায়, ততই ভোটদাতাদের স্বমতে আনা সহজসাধ্য হবে। নেতৃবৃন্দ যতই এ বিষয়ে সচেতন হবেন, সমাজকর্ম্মীরা তৎপর হবেন, ততই বয়স্ক শিক্ষার প্রসার দ্রুততর হয়ে এই প্রতিবন্ধকতা দূর করবে। বয়স্কদের মধ্যে সমাজশিক্ষার ব্যাপক আয়োজনের মাধ্যমেই এই কাজে অগ্রসর হতে হবে। সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ দূরীকরণের জন্য আইনবিধি প্রণয়ন করে তা'র সাহায্যে সুফল পাওয়া যেতে পারে। হিন্দু কোড বিল, অস্পৃশ্যতা নিরোধ আইন, জমিদারী প্রথা বিলোপ আইন প্রভৃতি প্রচেষ্টা ইতিমধ্যে সমাজ-সচেতনতা আনয়ন করেছে।

Q. 13. What are the mistakes and consequences of commission and ommission on the part of educational administrators resulting in the slow progress of compulsory primary education in India?

Ans. নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকতার দরুন ভারতে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসার আশানুরূপ হয়নি, একথা সত্য। কিন্তু একথাও ঠিক যে, দেশের শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটির জন্যও শিক্ষাপ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি হল—(১) গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার প্রতি গুরুত্বের অভাব (বৃটিশ আমলের এই মনোভাবটি এখনো বজায় আছে) ; (২) ; বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী দেশের কতিপয় ব্যক্তিকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে সাম্রাজ্য কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে ব্যাপক গণশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়নি (এই মনোভাবটিও এখনো বহুলাংশে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত রূপে বর্ত্তমান আছে) ; (৩) দেশীয় স্কুলগুলির প্রতি অবহেলা, অর্থবলের অভাবে সরকারী প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস, স্থানীয় সংস্থা পরিচালিত স্কুলের স্বল্পতা এবং জনগণের স্বেচ্ছাসেবী প্রচেষ্টায় স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দীপনা বৃদ্ধির ব্যর্থতা প্রভৃতি কারণে সমগ্র দেশে ব্যাপকভাবে প্রাথমিক স্কুল স্থাপনার অসাফল্য ; (৪) গণশিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনায় ব্যর্থতা ; (৫) বৃটিশ আমলের 'গুণগত মানোন্নয়ন' (quality) এবং 'সংখ্যাগত প্রসার' (quantity) সম্পর্কিত বিরোধ আজও সমস্যা সৃষ্টি করে আছে ; এবং (৬) আবশ্যিক শিক্ষাপ্রসারের সামগ্রিক সমস্যার প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, যার দরুন প্রথমে বিষয়টি অবহেলিত হয় পরে তীব্র বিরোধিতা হয়, অবশেষে নিতান্ত অবহেলাভরে নীতিগত মানরক্ষাস্বরূপ অতি বিলম্বে ১৯৫০ সালে সংবিধানের ৪৫ ধারায় এটি স্বীকৃত হয়।

ভারতের প্রায় ৯০% লোক গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে অতএব এদেশের

সর্ব্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা মূলতঃই গ্রামীণ সমস্যা। এজন্য সরকারী উদ্যোগের সর্ব্বাগ্রে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার স্থান নির্দ্ধারণ করতেই হবে। গ্রামোন্নয়নের কর্ম্মসূচীকেও অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তা হচ্ছে না। বৃটিশ শাসকমণ্ডলী শহরের উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করেছিল। কারণ তারা শিল্পপ্রধান দেশের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এদেশের সমস্যাগুলিকে বিচার করেছিল। দ্বিতীয়তঃ, শাসনযন্ত্রকে দৃঢ়তর করবার জন্যেই শহরের প্রতি অধিকতর যত্ন নেওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত মনে করত; দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন তাদের কাম্য ছিল না। শহরগুলিকে বৃটিশ শাসকমণ্ডলী ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করতো; দরিদ্র জনসাধারণ ও কৃষিজীবী মানুষের সামাজিক উন্নতির চিন্তা করার ইচ্ছা তাদের ছিল না। ফলে, গ্রামগুলিতে উপযুক্ত রাস্তা ছিল না, পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল না, চিকিৎসা বা কোনও রকম সমাজসেবার যথেষ্ট আয়োজন ছিল না। তৃতীয়তঃ, বৃটিশ আমলের শিল্পবিপ্লব এবং কেন্দ্রীভূত অর্থনীতি ও প্রশাসন ব্যবস্থার কুফলস্বরূপ ভারতবর্ষের আত্মনির্ভর শান্তিপূর্ণ গ্রামগুলির ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য সমূলে বিনষ্ট হয়। বৃটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষে কতকগুলি পাশ্চাত্ত্য ধরণের শহর সৃষ্টি এবং অপরদিকে গ্রামগুলির দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে বিশাল সমাজের অব্যাহত জীবনযাত্রা ক্ষুণ্ণ করার কীর্ত্তি বিদেশীদের। এই ভ্রান্তনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমান বিধ্বস্ত সামঞ্জস্যহীন সমাজব্যবস্থায় দ্রুত প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সহজসাধ্য নয়।

১৯২১ সালে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ দেশশাসনের আংশিক দায়িত্ব প্রাপ্ত হবার পর এই ভ্রান্তনীতির পরিবর্ত্তন আশা করা গিয়েছিল। গান্ধিজীও বহুবার গ্রামোন্নয়নের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেন। কিন্তু দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ গ্রামের দিকে সযত্ন দৃষ্টি দেওয়ার আগ্রহবোধ করেনি। ফলে পূর্ব্বের মতই প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসার মন্থরগতিতে চলেছে।

আর একটি ভ্রান্তনীতি হলো বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারে অধিকতর মনোনিবেশ করে প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যার স্বল্প মর্য্যাদা দান। 'নিম্নমুখী পরিস্রুতি মতবাদ' এই ভ্রান্তনীতির জন্য অনেকাংশে দায়ী। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে ভারতবাসীকে প্রভাবান্বিত করার অত্যুগ্র প্রচেষ্টার জন্যেও বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষার চেয়ে অধিকতর মূল্যবান বলে মনে করা হতো। এইজন্যই ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যম করা হয় এবং শিশু শ্রেণী থেকেই বালকবালিকাদের ওপর ইংরেজী শিক্ষার গুরুভার ন্যস্ত হয়। ১৮৮২ সালে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব স্থানীয় সংস্থাগুলির কাছে হস্তান্তরিত হওয়ার দ্বারাও এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি রাষ্ট্রের অবহেলাই সূচিত হয়।

জনসাধারণের মধ্যেও আধুনিক ধরণের শিক্ষা গ্রহণের উদ্দীপনা জাগে, কারণ উকিল, ডাক্তার, শিল্পপতি, প্রভৃতি নতুন অর্থকরী পেশার জন্য পাশ্চাত্ত্য ধরণের

উচ্চতর শিক্ষাই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এজন্য জনসাধারণও প্রাথমিক শিক্ষার চেয়ে উচ্চতর শিক্ষাকেই গুরুত্বপূর্ণ বলে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হয়েছিল। ধনী ব্যক্তিদের দান ও চাঁদা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্যেই ঘোষিত হতো। জাতীয় নেতারাও প্রগতিশীল তরুণ কর্ম্মী সংগঠনের উদ্দেশ্যে উচ্চতর শিক্ষাপ্রসারে উদ্যোগী হন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, রাষ্ট্র, নেতৃবৃন্দ এবং জনগণ সকলেই একযোগে প্রাথমিক শিক্ষা ও গ্রামোন্নয়নের প্রতি যথাযথ মনোযোগ অর্পণ করেননি।

সমগ্র দেশে সর্ব্বজনীন আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা সফল করার পূর্ব্বে প্রয়োজন ব্যাপকভাবে প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা। এদেশের শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষ তা করেননি। ফলে, বাধ্যতামূলক শিক্ষাবিধি কোথাও সম্পূর্ণভাবে কার্য্যকরী করা যায়নি। এই ত্রুটির সঙ্গে আর একটি অধিকতর ত্রুটি যুক্ত হয়েছে, সেটি হলো দেশীয় স্কুলগুলির প্রতি অবহেলা ও সেগুলির বিলোপসাধন। অতি অল্প খরচে দেশীয় স্কুলগুলি যেভাবে ব্যাপকভিত্তিতে দেশের সর্ব্বত্র প্রাথমিক শিক্ষার সুষ্ঠু অথচ সহজ ব্যবস্থা প্রচলিত রাখতে পেরেছিল, দেশব্যাপী আইন প্রণয়ন দ্বারা তার অংশমাত্রও এখনো সম্ভব হয়নি। নূতন ধরণের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার জন্য প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠার মোহ দেশীয় স্কুলগুলির অবলুপ্তির প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং তার ফলে ব্যাপকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার সহজসাধ্য হচ্ছে না।

জনসাধারণের স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগে প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ব্যাপক হলে সরকারী প্রচেষ্টার অভাব অনেকাংশে পূরণ হতে পারতো। কিন্তু সরকারী অর্থসাহায্যনীতি আশানুরূপ এবং নিয়মিত নয় বলে জনসাধারণও এবিষয়ে উৎসাহবোধ করে না।

আবশ্যিক শিক্ষা বিষয়ে নানা সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা একান্ত প্রয়োজন। কারণ বিষয়টি বিশেষ জটিল। দুঃখের বিষয়, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বা সরকারী শিক্ষা দপ্তরগুলিতে নিয়মিতভাবে গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে এই সকল সমস্যাগুলি সম্পর্কে বিশেষ গবেষণার ব্যবস্থা করা হয়নি।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি হলো, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন এবং সংখ্যাগত প্রসার সম্পর্কে মতদ্বন্দ্ব। ব্যাপক প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো, দেশের জনগণের নিরক্ষরতা সম্পূর্ণরূপে দূর করা। শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, সন্দেহ নেই; কিন্তু নিরক্ষরতা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না হওয়ার পূর্ব্বে সে বিষয়ে চিন্তা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। ভারতবর্ষে এই নীতিটি সর্ব্বদাই অবহেলা করা হয়েছে। লর্ড কার্জ্জনের শিক্ষানীতি এই অবহেলাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিদান করে এবং তার ফলে সর্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে যায়।

Q. 14. Give an outline of the approximate cost of a scheme of universal compulsory free primary education in India.

Ans. দুঃখের বিষয়, যথাযথ গবেষণা ও ব্যাপক তথ্য সংগ্রহের অভাবে ভারতে আবশ্যিক সর্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য আনুমানিক কি পরিমাণ অর্থব্যয় হবে, তার সুনির্দ্দিষ্ট ও সম্পূর্ণ হিসাব পাওয়া দুঃসাধ্য। সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনায় অনুমিত হয় যে, দেশের ৬-১৪ বছর বয়সের সকল ছেলেমেয়ের আবশ্যিক শিক্ষার জন্য ২০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এই হিসাবের কিছু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে এখন ঐ আনুমানিক অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ হবে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি তথ্য উল্লেখযোগ্য :—

(ক) জনসংখ্যা : বর্ত্তমানে প্রায় ৪৩ কোটি

(খ) আবশ্যিক শিক্ষার উপযোগী শিশু সংখ্যা : ৬-১৪ বছর বয়সের শিশু সংখ্যা হবে মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০% এবং ৬-১১ বছর বয়সের শিশু-সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১৫%।

এই হিসাবে :

বয়স	শিশুসংখ্যা
৬-১১ বছর	৬ কোটি
১১-১৪ „	২ „
৬-১৪ „	৮ „

(গ) প্রতি শিক্ষার্থীর শিক্ষা ব্যয় : শিক্ষক-প্রতি ব্যয় এবং শিক্ষক-প্রতি শিক্ষার্থী সংখ্যা—এই দুটি তথ্যের ওপর শিক্ষার্থী-প্রতি শিক্ষা ব্যয় নির্ভর করে। বিভিন্ন রাজ্যে এই অনুপাত বিভিন্ন। যেমন—

শিক্ষণহীন শিক্ষক—টা. ৩৫—১—৪০৲

শিক্ষণপ্রাপ্ত „ —টা. ৪০—১—৫০—২—৯০৲

এছাড়া শিক্ষকরা মহার্ঘ্যভাতা পান প্রায় ৩৫ থেকে ৪৫৲ টাকা হিসাবে। সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনা মত বেতনের ১০% বাসস্থানের ভাতা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা হয়নি। বেতন, মহার্ঘ্যভাতা, বাসস্থান ভাতা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের চাঁদা ও অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যয়সাকুল্যে প্রতি শিক্ষকের জন্য বছরে প্রায় ১৫০০৲ টাকা প্রয়োজন হবে।

(১)	বেতন গড়ে	৬০৲ × ১২ = ৭২০৲
(২)	মহার্ঘ্যভাতা	৪০৲ × ১২ = ৪৮০৲
(৩)	বাসস্থান ভাতা	৬৲ × ১২ = ৭২৲
(৪)	প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড চাঁদা	= ৪৫৲
		১৩১৭৲
(৫)	১১½% প্রশাসনিক ব্যয়	
		১৪৬৪৲

শিক্ষক-প্রতি গড়ে ৩০ জন শিক্ষার্থী হলে শিক্ষার্থী-প্রতি শিক্ষাব্যয় হয় বার্ষিক ৫০৲ টাকা।

(ঘ) আবশ্যিক শিক্ষার সামগ্রিক ব্যয়ঃ ভারতে আবশ্যিক সর্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার পরিকল্পনার সামগ্রিক ব্যয় সম্পর্কে এইভাবে ধারণা করা সম্ভব :—

বয়স	শিশুসংখ্যা	শিক্ষার্থী-প্রতি ব্যয়	পরিকল্পনার মোট ব্যয়
৬—১১	৬ কোটি	টা. ৫০৲	টা. ৩০০ কোটি
১১—১৪	২ কোটি	টা. ৫০৲	টা. ১০০ কোটি
৬—১৪	৮ কোটি	টা. ৫০৲ .	টা. ৪০০ কোটি

এই ব্যয় ভারতের বর্ত্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের পক্ষে বহন করা অসম্ভব। অবশ্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের অনুমান অনুসারে আবশ্যিক শিক্ষাখাতে বিভিন্ন বছরে ব্যয়ের পরিমাণ এইরকম হওয়ার কথা :—

১৯৬০—৬১···টা. ২২৬, ৩৪, ০০, ০০০৲
১৯৬১—৬২···টা. ২৫১, ২৫, ৩৮, ০০০৲
১৯৬২—৬৩···টা. ২৬৩, ৪৮, ৩৬, ০০০৲
১৯৬৩—৬৪···টা. ২৭৬, ৩২, ৪৯, ০০০৲
১৯৬৪—৬৫···টা. ২৮৮, ২৬, ৯৩, ০০০৲

কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, দ্রব্যমূল্য ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ এই ব্যয়ের পরিমাণ ৮০০ কোটি টাকাও হতে পারে।

বাস্তবিকপক্ষে, আবশ্যিক শিক্ষাব্যয়ের সঠিক অনুমান করা দুঃসাধ্য। কারণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাতের হ্রাসবৃদ্ধি, অন্যান্য আনুষঙ্গিক শিক্ষাব্যয়ের হ্রাসবৃদ্ধি প্রভৃতি একাধিক বিষয়ের ওপর আবশ্যিক শিক্ষাব্যয় নির্ভর করে আছে।

Q. 15. Discuss the financial practicability of the estimates of the cost of universal compulsory free primary education

Ans. (সংক্ষেপে Q.14-এর উত্তর সমেত) কেবলমাত্র শিক্ষকদের বেতনের ভিত্তিতে ভারতে আবশ্যিক শিক্ষার ব্যয় অনুমান যদি প্রায় ৮০০ কোটি টাকা হয়, তাহলে স্কুলভবন, শিক্ষা সরঞ্জাম ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ প্রভৃতির ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করলে হাজার কোটি টাকারও বেশি প্রয়োজন হবে। ভারত সরকারের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ প্রায় ৮০০ কোটি টাকা এবং এথেকে কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই অধিকাংশ অর্থ ব্যয় করার কথা চিন্তা করাও যায় না। এই কারণেই বৃটিশ আমল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অনাদৃত

হয়ে আসছে। তখন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বৃটিশ সরকারের শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করতেন ; এখন সেই নেতৃবৃন্দ ক্ষমতাসীন হয়েও সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যয়ের জন্য অর্থসংস্থান বা অপরপক্ষে স্বল্পতম ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার—কোনটিই জাতীয় সরকার করে উঠতে পারছেন না। সমস্যা পূর্ব্বের ন্যায় জটিল রয়েছে ; ভারতীয় সংবিধানে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে যে রাজ্য সরকারগুলি আবশ্যিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন জন্য 'চেষ্টা' করবেন। সংবিধানের এই নমনীয় নির্দ্দেশ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, ৬—১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের আবশ্যিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা অর্থ নৈতিক বিচারে অসম্ভব।

শিক্ষাবিদগণ আদর্শ শিক্ষার ভাবধারায় বিপুল ব্যয়বহুল আবশ্যিক শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন এবং এই পরিকল্পনার বিফলতার দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করতে চান না। কারণ, স্বভাবতই তাঁরা অর্থের জন্য বিত্তবান জনসমাজকে দায়ী করেন। রাষ্ট্রনায়করাও জনসাধারণের সামনে বিপুল ব্যয়বহুল শিক্ষা পরিকল্পনা ও তার সমস্যাগুলি প্রকট করে বিষয়টি সম্পর্কে যথাসম্ভব দায়িত্বস্খালন করতে চান বলেও অনেকে মনে করেন। বাস্তব সমস্যাক্ষেত্রে শিক্ষা দপ্তরের কর্ত্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকায় সমস্যার আর্থিক গুরুত্ব সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তাঁদের নেই। স্বল্পতম ব্যয়ে বিভিন্ন শিফ্‌টে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের যুক্তি তাঁরা গ্রহণ করেননি। ভারতের অর্থ নৈতিক দীনতা বিবেচনা করে অন্তবর্ত্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে শিফ্‌ট আয়োজন করা বিশেষ আপত্তিকর হত না। এ ছাড়া, রাষ্ট্রনায়ক ও শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণেতাগণ ঋণ সংগ্রহ করে শিক্ষাব্যয় নির্ব্বাহ করার যে যুক্তি করেছিলেন, সেটিও ছিল অবাস্তব। জনগণের সঞ্চিত ধন পরিমাণ বেশি হলে তবেই ঋণসংগ্রহ সহজ হয় ; ভারতের মত ঘাটতিমূলক অর্থনীতির দেশে সে সম্ভাবনা খুব অল্প। যদিও কিছু ঋণ সংগৃহীত হয় তবে তা আগে কৃষি, সেচ, শিল্প, বিদ্যুৎ প্রভৃতি বিষয়েই ব্যয়িত হবে এবং হচ্ছে।

এইসব কারণেই বনিয়াদী শিক্ষানীতি এবং পার্টটাইম স্কুল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই সকল ব্যবস্থার ফলে আবশ্যিক শিক্ষার ব্যয় অনেক হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এবং অল্পসময়ে সর্ব্বজনীন শিক্ষা পরিকল্পনাকে সফল করে তোলা যাবে।

Q. 16. Elucidate the feasibility of Basic education in the field of universal compulsory primary education in India.

Ans. মহাত্মা গান্ধী ভারতে আবশ্যিক শিক্ষার বিপুল ব্যয়ভারের সমস্যা উপলব্ধি করেই বনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। তিনি

আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার মাধ্যমে আবশ্যিক শিক্ষাব্যয় হ্রাস করবার পরামর্শ দেন। জাকীর হুসেন কমিটিও গান্ধিজীর পরিকল্পনার সমর্থনে স্বীকার করেন যে, বনিয়াদী শিক্ষানীতি অন্ততঃ 'আংশিকভাবেও' শিক্ষাব্যয় হ্রাস করতে পারবে শিল্পসৃষ্টি ও বিক্রয়ের মাধ্যম। তবে এই কমিটি স্বয়ংসম্পূর্ণতা অপেক্ষা শিক্ষার উৎকর্ষের প্রতিই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। পরে সেণ্ট্রাল এডভাইজরী বোর্ড অব এডুকেশন আরও বিবেচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বনিয়াদী শিক্ষানীতির মধ্যে শিল্প প্রভৃতির প্রাধান্য থাকার ফলে ঐ শিক্ষা ব্যবস্থা অধিকতর ব্যয়বহুল হবে ; ব্যয় হ্রাস করতে পারবে না।

সেবাগ্রামে বনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রে অবশ্য শিল্পমাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা স্কুলের সাজসরঞ্জাম ক্রয়ের অর্থসংস্থান করা সম্ভব হয়েছে। তবে সেবাগ্রামে বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে যা সম্ভব হয়েছে, সাধারণ স্কুলে সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের হাতে তা সম্ভব হওয়ার আশা নিতান্ত অল্প। কারণ, বনিয়াদী শিক্ষার শিক্ষককে নানা বিষয়ে সুনিপুণ হতে হয়। দীর্ঘদিনের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে যে গান্ধিজীর বনিয়াদী শিক্ষানীতিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। এই শিক্ষা-ব্যবস্থার দ্বারা কেবল শিক্ষা উপকরণ অল্পস্বল্প ক্রয় করা সম্ভব হতে পারে। অতএব বনিয়াদী শিক্ষার দ্বারা ভারতে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসার দ্রুততর করা সম্ভব হবে, এ আশা অমূলক।

[বনিয়াদী শিক্ষা সংক্রান্ত পরবর্ত্তী অধ্যায়টিও দ্রষ্টব্য]

Q. 17. Elucidate the feasibility of part-time instruction and other alternatives in the field of universal compulsory primary education in India.

Ans. ভারতে আবশ্যিক শিক্ষাব্যয় হ্রাস করার যুক্তিতে বনিয়াদী শিক্ষা-নীতি ছাড়াও আংশিক সময়ের (পার্ট টাইম) শিক্ষাদানের নীতিও উদ্ভাবিত হয়েছে। আংশিক সময়ের শিক্ষানীতির উদ্ভাবকগণ বনিয়াদী শিক্ষাবিদদের মত উচ্চ আদর্শমোহগ্রস্ত নন। দেশের আর্থিক সঙ্গতি যখন অল্প, তখন যৎসামান্য শিক্ষার আয়োজনও অভিনন্দনযোগ্য। ১৯৩৪ সালে পারুলেকর আংশিক সময়ে শিক্ষাদাননীতি প্রচার করে জনপ্রিয় হন। তিনি বলেন, পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে প্রথমে শিক্ষার সংখ্যাগত প্রসারের দিকেই মনোযোগ দেওয়া হতো, পরে গুণগত উৎকর্ষ সাধন সুরু হয়। জগতের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ইতিহাসের নীতিগ্রহণ করতে হলে প্রথমে ভারতেও যেভাবে সম্ভব সকল শিশুর কাছে ন্যূনতম শিক্ষার সুযোগ পৌছে দিতে হবে।

পারুলেকর তাঁর প্রস্তাবে বলেন, সাত বছর আবশ্যিক শিক্ষাপর্য্যায়কে দুটি ভাগে বিভক্ত করতে হবে। প্রথম চার বছর এমনভাবে ভাষাশিক্ষা দেওয়া

হবে, যাতে সাক্ষরতা দৃঢ়স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে এবং নাগরিকবোধ জাগ্রত হয়। পরবর্ত্তী তিন বছরে উচ্চতর শিক্ষাদান চলবে। প্রথমেই ১৪ বছর পর্য্যন্ত আবশ্যিক শিক্ষার বিপুল পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার সময় এখন নয়।

শিক্ষাব্যয় হ্রাস করতে হলে শিক্ষার্থী-প্রতি ব্যয় সঙ্কোচ করা দরকার। শিক্ষক-প্রতি শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করলেই এই সমস্যা সহজে সমাধা হয়। শিফ্‌ট ব্যবস্থায় শিক্ষাদানের আয়োজন করলে একজন শিক্ষক বিভিন্ন শিফটে বহুসংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করতে পারবেন; শিক্ষার্থী-প্রতি ব্যয় হ্রাস পাবে। অথবা একজন শিক্ষক দুটি শিক্ষার্থী-শ্রেণীকে একদিন অন্তর শিক্ষাদানের আয়োজন করতে পারেন; অর্থাৎ একটি শ্রেণী সপ্তাহে তিনদিন একটি শিক্ষকের শিক্ষাদানের সুযোগ পাবে। মনিটর বা সর্দ্দার-পড়ুয়া ব্যবস্থার মাধ্যমেও একজন শিক্ষক ৬০ জন পর্য্যন্ত শিক্ষার্থীর পড়াশুনার আয়োজন করতে পারেন।

পার্ট টাইম ও শিফ্‌ট ব্যবস্থায় শিক্ষাদানের জন্য পাঠক্রম সহজ করতে হবে। নতুন পাঠক্রমে পঠন, লিখন ও গণিতের প্রাধান্যই থাকবে। বাধ্যতা-মূলক শিক্ষাগ্রহণের বয়স ৬ বছর থেকে ৭ বছর করাও যুক্তিসঙ্গত কারণ শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষাগ্রহণ ও সংরক্ষণের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়, ফলে শিক্ষা অপচয় অনেকাংশে দূর হতে পারে।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, পারুলেকরের প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের সাক্ষরতা বৃদ্ধি করা এবং এই উদ্দেশ্য সর্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যের সমান। শিফ্‌ট ব্যবস্থা ও পার্ট টাইম শিক্ষার দ্বারা সেই লক্ষ্যে উপনীত হতে গেলে শিক্ষার ব্যয় অনেক হ্রাস পাবে এবং ১২৫ কোটি টাকায় এই বিপুল সমস্যা সমাধা হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এই কারণেই পার্ট টাইম শিক্ষানীতি বাস্তব যুক্তিসম্মত। তবে আদর্শমোহগ্রস্ত শিক্ষাবিদ্‌গণ এ নীতি গ্রহণ করতে সম্মত নন; গ্রহণ করলে এতদিনে দেশের কোটি কোটি শিশু ন্যূনতম সাক্ষরতার সুযোগ পেতে পারতো।

Q. 18. "The greatest bar to universal education in India is the poverty of the average parent." Elucidate the statement with suggested remedial measures.

Ans. ভারতে আবশ্যিক সর্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পথে রাষ্ট্রের অর্থাভাব একটি প্রধান অন্তরায় সন্দেহ নেই। তবে সাধারণ অভিভাবকের আর্থিক অনটন এবিষয়ে প্রধানতম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্র কোন-না-কোন উপায়ে যথেষ্টসংখ্যক স্কুল প্রতিষ্ঠা, শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পারে; কিন্তু সাধারণ অভিভাবক নিদারুণ অর্থসঙ্কটের মধ্যে নিজ সন্তানকে ৬/৭ বছর বয়স থেকে ১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত দিনের সর্ব্বক্ষণ স্কুলে পাঠিয়ে দিতে চাইবেন কিনা সন্দেহ আছে।

ছেলেমেয়েরা ৮।৯ বছর বয়সে পৌছুলেই দরিদ্র অভিভাবক তাদের ঘরের কাজে লাগিয়ে দিয়ে থাকেন এবং এটি একান্ত প্রয়োজন অর্থনৈতিক সঙ্কট লাঘব করার জন্য। এই সমস্যাটির সমাধান হল পার্টটাইম শিক্ষার প্রবর্ত্তন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জে. পি. নায়েক এই সমস্যা সম্পর্কে গ্রামাঞ্চলে তথ্যানুসন্ধান করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তা সংক্ষেপে এই :

(১) জনগণের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি না পেলে কেবল রাষ্ট্রীয় অর্থসাহায্যের দ্বারা সর্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা সমাধা হবে না।

(২) অভিভাবকদের দারিদ্র্যের জন্য তিনটি দিক থেকে সর্ব্বজনীন প্রাথমিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হচ্ছে। প্রথমতঃ, পারিবারিক কাজকর্ম্মে প্রয়োজন হয় বলে বহু ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠানো হয় না। দ্বিতীয়তঃ, ৮।৯ বছর বয়স হলেই দরিদ্র অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেন; ফলে শিক্ষাদানের অপচয় ঘটছে। তৃতীয়তঃ, অভিভাবকদের নিদারুণ দারিদ্র্যের জন্যই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলক স্কুলে যোগদান সংক্রান্ত আইনবিধি প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। যে অভিভাবক সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে সক্ষম, কিন্তু পাঠাতে ইচ্ছুক নন, সেখানে আইনপ্রয়োগ বা জরিমানা আদায় করা সম্ভব। কিন্তু দীনহীন সাধারণ অভিভাবকরা জরিমানাও দিতে অক্ষম। সেখানে আইন সফল হয় না।

(৩) সন্তানকে স্কুলে পাঠালে পারিবারিক কাজকর্ম্মের ক্ষতিপূরণের জন্য রাষ্ট্র থেকে দরিদ্র অভিভাবকদের অর্থসাহায্য দেওয়া হবে। এই প্রতিশ্রুতি দিলে অভিভাবকরা উৎসাহিত হতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রের আর্থিক সামর্থ্য সীমিত হওয়ার দরুণ এ ধরনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয়। সন্তানরা শিক্ষা-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ উপার্জ্জন করতে পারবে, এমন ব্যবস্থাই অভিভাবকদের মনোমত হতে পারে।

(৪) প্রতিদিন প্রায় তিন ঘণ্টা স্কুলের শিক্ষাদানের সময় নির্দ্ধারণ করে বা অন্যান্য সামঞ্জস্য বিধানের সাহায্যে বিভিন্ন অঞ্চলের দরিদ্র অভিভাবকদের সন্তানদের আবশ্যিক শিক্ষার আওতায় আনবার চেষ্টা করতে হবে।

এই সকল সিদ্ধান্তের সমর্থনে শ্রী জে. পি. নায়েক বলেন, (১) এই ধরণের সহযোগিতামূলক ব্যবস্থার ফলে দরিদ্র অভিভাবকরা সানন্দে সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী হবেন। (২) স্কুলের দৈনিক সময়সূচী হ্রাস না করলে দরিদ্র অভিভাবকদের সন্তানদের আবশ্যিক শিক্ষার সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। অভিভাবকদের মধ্যে বৈষম্য দূর করার জন্যই আবশ্যিক শিক্ষানীতির জন্ম। কিন্তু যেসব ছেলেমেয়ে স্কুলে যোগ দেয় না, তাদের অতি অল্পজন অভিভাবকের মধ্যেই প্রকৃত বৈষম্য থাকে। স্কুলে অনুপস্থিত ছেলেমেয়েদের অধিকাংশ অভিভাবকই দারিদ্র্যের জন্য দিনে ছয় ঘণ্টা যাবৎ সন্তানদের স্কুলে ছেড়ে রেখে

পারিবারিক কাজকর্ম্মে সহায়তা থেকে বঞ্চিত হতে ইচ্ছুক নন। এক্ষেত্রে আইনের বিধি অচল।

(৩) প্রাথমিক শিক্ষা পর্য্যায়ে পঠন, লিখন ও গণিত শিক্ষার জন্য দৈনিক তিন ঘণ্টা সময় পর্য্যাপ্ত।

(৪) একজন শিক্ষক ছয় ঘণ্টা যাবৎ কয়েকটি প্রাথমিক শ্রেণীতে একাদিক্রমে অধ্যাপনা করলে প্রকৃত শিক্ষাদান সম্ভব হয় না। শিক্ষার্থীরা নিরুৎসাহিত হয়। স্বল্পসময়ের শিক্ষাদান ব্যবস্থা শিশুদের সজীব রাখে, শিক্ষামানের কিছুমাত্র হানি ঘটে না।

(৫) অভিভাবকরা যে সময়টুকু ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে চান, কেবল সেই সময়টুকুর জন্যই স্কুলের কার্য্যসূচী নির্দ্ধারণ করলে ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা অবিচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যেতে পারে এবং শিক্ষার অপচয় বন্ধ হয়।

(৬) স্কুলের সময় হ্রাস পেলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাতও বৃদ্ধি পাবে এবং শিক্ষার্থী-প্রতি শিক্ষাব্যয়ও অনেকাংশে হ্রাস পাবে। ফলে, সর্ব্বজনীন শিক্ষা প্রসার দ্রুততর হবে।

শ্রী পারুলেকর ও শ্রী নায়েকের অভিমত ভিন্নমুখী হলেও তাঁদের পরামর্শ মূলতঃ একই সমস্যার সমাধান প্রয়াসী। পারুলেকর রাষ্ট্রের অর্থাভাবের দিক থেকে সমস্যার পর্য্যালোচনা করেছেন, আর নায়েক অভিভাবকদের অর্থাভাব স্মরণে রেখে সমস্যাটিকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন।

বুনিয়াদী শিক্ষা সফল হলে শিল্পসৃষ্টি বিক্রয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রের অর্থসঙ্কট কিছুটা লাঘব হতে পারে, অথবা ছেলেমেয়েরা শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে উপার্জ্জন করে অভিভাবকদের অর্থকষ্ট কিছুটা মোচন করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র ও অভিভাবক উভয়ের অর্থসঙ্কট মোচন করতে বুনিয়াদী শিক্ষা অক্ষম। পার্টটাইম শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে গৃহীত হলে উভয়েরই অর্থসঙ্কট লাঘব হবে।

Q. 19. Devise some of the ways and means of raising the necessary funds for the universal free primary education in India.

Ans. ভারতে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের বিপুল ব্যয় সঙ্কোচের জন্য গান্ধিজীর বুনিয়াদী শিক্ষা নীতি, পারুলেকরের ও নায়েকের পার্টটাইম শিক্ষানীতি কার্য্যকরী করা হলেও ন্যূনপক্ষে ১২৫ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। এই ন্যূনতম অর্থ সংগ্রহ করাও সহজসাধ্য নয়। যে সকল উপায়ে শিক্ষাখাতে অর্থসংস্থান সম্ভব, সেগুলির প্রত্যেকটিকেই সর্ব্বাত্মকভাবে কাজে লাগাতে হবে।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসংস্থান সামর্থ্য। আবশ্যিক

সর্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থনৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবহিত করতে হবে, কারণ ১৯৪৯ সালে খের কমিটির সুপারিশে বলা হয়েছিল, সমগ্র দেশে আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থার জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তার অন্ততঃ ৩০% কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া কর্ত্তব্য। এই প্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য, বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিভিন্ন বিষয়ে আদায়ীকৃত রাজস্ব যা কেন্দ্রীয় ধনভাণ্ডারে জমা পড়ে তার উদ্বৃত্ত অর্থ রাজ্যগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ব্যয়িত হওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই অর্থ আবশ্যিক শিক্ষার জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট হয় না।

মোটামুটিভাবে একথা সর্ব্বজনস্বীকৃত হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় কোষ থেকে আবশ্যিক শিক্ষার জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অর্থব্যয় করতে হবে। তবে কি নীতিতে এই অর্থ কেন্দ্রীয় সাহায্যরূপে বণ্টিত হবে, তা নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। খের কমিটির সুপারিশমত বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষাখাতে ব্যয়ের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য দেওয়ার কথা। কিন্তু এই নীতি অভ্রান্ত নয়; এর ফলে অপেক্ষাকৃত বিত্তবান রাজ্যগুলিই অধিকতর পরিমাণে কেন্দ্রীয় অর্থবরাদ্দ ভোগ করবে, অপরপক্ষে স্বল্পবিত্ত রাজ্যগুলির ভাগ্যে সামান্য অর্থসাহায্য লাভ সম্ভব হবে। এজন্যই অনেকে মনে করেন যে, সমতা রক্ষার নীতিতে এই অর্থবরাদ্দ করাই যুক্তিযুক্ত। অর্থাৎ, স্বল্পবিত্ত রাজ্যগুলি বেশি পরিমাণে কেন্দ্রীয় অর্থ পাবে, এবং বিত্তবান রাজ্যগুলি পাবে অল্প।

কেন্দ্রীয় সরকারের পর রাজ্য সরকারের অর্থব্যয়ের কথা। বর্ত্তমানে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে কোন রাজ্যেই সুনির্দ্দিষ্ট এবং সমান নীতি অবলম্বন করা হয় না। এই সামঞ্জস্যহীন ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে হলে এমন নীতি গ্রহণ করা উচিত, যার ফলে প্রত্যেক রাজ্য নিজ রাজস্ব আদায়ের অন্ততঃ ২০% শিক্ষাখাতে ব্যয় করতে এবং শিক্ষাখাতে ব্যয়ের অন্ততঃ ৭৫% প্রাথমিক শিক্ষা-খাতে বরাদ্দ করতে বাধ্য হয়। এই ধরনের নীতি অবলম্বন করা হলে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে রাজ্যসরকারগুলির অর্থবরাদ্দের পরিমাণ অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে।

স্থানীয় সংস্থাগুলিও বিভিন্নরাজ্যে বিভিন্নভাবে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে অর্থ-বিনিয়োগ করে। এক্ষেত্রে সংস্থাগুলিকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থব্যয়ের জন্য যথাসাধ্য বাধ্য করা উচিত। এজন্য রাজ্য সরকার থেকে সংস্থাগুলিকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নিয়মিত অর্থসাহায্য দেওয়া প্রয়োজন।

অবশ্য একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাথমিক শিক্ষাব্যয়ের একটি বিপুল অংশ শিক্ষার্থীদের বেতন থেকে নির্ব্বাহিত হয়ে থাকে; আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থা যে সকল অঞ্চলে প্রবর্ত্তিত করা হয়েছে, সেখানে শিক্ষার্থীর বেতন থেকে অর্থসংগ্রহের পথ যদিও বন্ধ হয়েছে তথাপি বেতন সম্পর্কে নিম্নোক্ত নীতিগুলি বিবেচনার যোগ্য:

(১) আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হলেই কোন ছেলেমেয়েকে বেতন দিতে হবে না। অন্য সকল পর্য্যায়ের শিক্ষার্থীদের বেতন দিতে হবে। অর্থাৎ আবশ্যিক শিক্ষা গ্রহণের বয়স হওয়া সত্ত্বেও কোন শিক্ষার্থী প্রাথমিক পর্য্যায়ের ঊর্দ্ধে অধ্যয়ন করলে সে বেতন দেবে। অপরপক্ষে, আবশ্যিক শিক্ষাগ্রহণের বয়স অতিক্রম করার পরেও কোন কারণে কোন শিক্ষার্থী প্রাথমিক পর্য্যায়ে অধ্যয়নরত থাকলে বেতন অব্যাহতি পাবে। এই উদার নীতির অর্থ শিক্ষার অপচয় নিবারণ করা।

(২) আবশ্যিক শিক্ষা অঞ্চলে প্রাইভেট স্কুলগুলিতে বেতন আদায় করা চলবে। স্বচ্ছল পরিবারের অভিভাবকরা প্রাইভেট স্কুলে বেতন দিয়ে নিজ সন্তানকে পড়ানোর সুযোগ পাবেন। এই ধরনের শিক্ষার্থীদের বেতন অব্যাহতি দেওয়ার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। তবে সতর্ক থাকতে হবে, সরকারী অবৈতনিক স্কুলে কোন ছেলেমেয়ে অধ্যয়নের সুযোগ চাইলেই যেন পায়। এই নীতির ফলে প্রতিটি দরিদ্র অভিভাবক আপন সন্তানের জন্য অবৈতনিক শিক্ষার অধিকার পাবেন, আবার বেতন দিয়ে প্রাইভেট স্কুলে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-গ্রহণের সুযোগ থাকায় রাষ্ট্রের অর্থব্যয় অন্ততঃ কিছু পরিমাণে এবিষয়ে লাঘব হবে।

(৩) আবশ্যিক শিক্ষা অঞ্চলের প্রাইভেট স্কুলগুলি যাতে কিছু কিছু দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের বিনা বেতনে শিক্ষাদানের সুযোগ দেয়, সে বিষয়ে স্কুলগুলিকে সম্মত করানোর প্রয়োজনীয় মর্য্যাদা ও ক্ষমতা স্থানীয় সংস্থাগুলির থাকা দরকার। সরকারী অবৈতনিক স্কুলগুলিতে স্থানাভাব হলে এ-ধরনের নীতি যথেষ্ট সহায়ক হবে। অবশ্য এর জন্য প্রাইভেট স্কুলগুলিকে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থসাহায্য দিতে হবে।

(৪) যখন কোন অঞ্চলে সরকারী অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না, তখন সেই অঞ্চলের প্রাইভেট স্কুলের বেতনপ্রথার বিলোপ করতে হবে এবং ঐ স্কুলের সকল ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য উদারভাবে সরকারী অর্থসাহায্য বরাদ্দ করতে হবে।

এইভাবে আবশ্যিক শিক্ষা বিধি প্রণয়ন করা হলে দরিদ্র অভিভাবকদের সন্তানদের জন্য আবশ্যিক সর্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার সহজতর হবে এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে ব্যাপক সাফল্য সম্ভব হবে। অর্থাভাবের সমস্যা বহুলাংশে সমাধা হবে। এ-ছাড়া চাঁদা, সাধারণের দান প্রভৃতি উপায়ে অর্থ-সংগ্রহের সনাতন রীতিও পুনঃপ্রবর্ত্তন করতে হবে।

Q. 20. Discuss the major steps to be taken in preparing the ground for compulsory education in India.

Ans. কোন অঞ্চলে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত করার

সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তা করতে হবে, সেই অঞ্চলটিতে আবশ্যিক শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে কিনা। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষাপ্রগতির মান বিভিন্নপ্রকার; রাজ্যগুলির বিভিন্ন জেলাতেও শিক্ষা উন্নয়নের অগ্রগতি সমান নয়। সমগ্র দেশে সমান গতিতে আবশ্যিক শিক্ষা প্রসার সম্ভব করতে হবে, এই কারণেই সকল অঞ্চলে সমান পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক রাজ্য সরকারের প্রাথমিক কর্ত্তব্য হওয়া উচিত, রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলে ব্যাপক তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে বিশদ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এই পরিকল্পনায় থাকবে কত ছেলেমেয়েকে আবশ্যিক শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে, তার সংখ্যা; কতগুলি স্কুল বর্ত্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ দিতে পারবে; আবশ্যিক শিক্ষার জন্য কি পরিমাণে স্কুলভবন, সরঞ্জাম, শিক্ষক, পরিদর্শক এবং আনুষঙ্গিক উপকরণাদির প্রয়োজন হবে ও তার জন্য কি পরিমাণে এক-কালীন ও পৌনঃপুনিক ব্যয় হবে, তার খসড়া। সাধারণের জ্ঞাতার্থে ঐ পরিকল্পনা প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে। এই ধরনের পরিকল্পনা কি রকমের হবে এবং তার মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে নমনীয়তার প্রয়োজন সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পথনির্দ্দেশ দিতে হবে। সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে ঐ পরিকল্পনা রচনা হলে প্রকৃত পরিস্থিতি সম্যক্‌ভাবে বোঝা যায় এবং অপেক্ষাকৃত সুনিশ্চিতভাবে সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হওয়া যায়।

আবশ্যিক শিক্ষা প্রসার সংক্রান্ত প্রস্তুতির প্রথম পর্য্যায়েই দ্রুত স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্কুল ভবন, শিক্ষা ও পরিদর্শক সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে সর্ব্বাত্মক মনোনিবেশ করতে হবে। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতে এই ধরনের উন্নয়ন ও প্রসারের কাজ দ্রুততর করতে হবে। অনেকে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসারের প্রারম্ভে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকসংখ্যা বৃদ্ধির দিকে সযত্ন হওয়া প্রয়োজন মনে করেন; এই নীতি আদর্শসম্মত হলেও এর দ্বারা লক্ষ্যে উপনীত হতে বহু বিলম্ব হবে। বরং সর্ব্ব উপায়ে প্রসারের দিকে মনোযোগী হওয়াই বাস্তবসম্মত, অবশ্য সেই সঙ্গে গুণগত মানোন্নয়নের দিকেও সমভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। জগতের সকল দেশের প্রাথমিক শিক্ষা বিবর্ত্তনের ইতিহাসে এই নীতি অনুসৃত হয়েছে বলে দেখা যায়। অতএব শিক্ষকতা বৃত্তির দিকে ন্যূনতম প্রবেশিকা পরীক্ষা-উত্তীর্ণ তরুণদের আকৃষ্ট করতে হবে; পরে শিক্ষক-শিক্ষণের প্রশ্ন আসবে।

স্কুলভবনের সমস্যাটি বিশেষ করে শহরাঞ্চলেই জটিল। সেখানে স্কুলভবনের স্থানাভাব, ভবন নির্ম্মাণের অর্থাভাব, এমন কি ভবন নির্ম্মাণের উপকরণাদিরও শোচনীয় অনটন রয়েছে। ভাড়াবাড়ীও সন্ধান করা দুষ্কর। অনেকে বলেন, স্কুল-ভবন নির্ম্মাণের জন্য সরকারী উদ্যোগে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সংগ্রহ করা উচিত। কিন্তু বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটে ঋণ সংগ্রহেরও সীমা আছে; দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ

বিষয় যথা কৃষি, শিল্পসংক্রান্ত বিষয় প্রভৃতিতে ঋণদান করার পরে শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে ঋণ লগ্নী করার মত উদ্বৃত্ত অর্থ জনগণের কাছে স্বভাবতই থাকে না। তবে জনসাধারণের কাছ থেকে সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মিত পরিকল্পনা অনুসারে স্বেচ্ছামূলক দান সংগ্রহ করে স্কুলভবন নির্ম্মাণের অর্থসংগ্রহ করা সম্ভব। জনসাধারণ এইভাবে ভবন নির্ম্মাণের ¼ অংশ ব্যয় বহন করলে বাকী ¾ অংশ সরকারী তহবিল থেকে সাহায্যরূপে মঞ্জুর করা যেতে পারে। কোন দাতা ভবন নির্ম্মাণ ব্যয়ের অর্দ্ধেক বহন করলে তাঁর ইচ্ছামত স্কুল ভবনটির নামকরণ হবে। বোম্বাইতে এ ধরনের পরিকল্পনা অনুসরণ করে আশানুরূপ ফল পাওয়া গেছে। অল্পব্যয়ে স্কুলভবন নির্ম্মাণ বিষয়ে গবেষণার দিকেও মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। একই স্কুলভবন বিভিন্ন শিফ্‌টে ব্যবহার করলেও সমস্যার অনেকাংশে সুরাহা হওয়া সম্ভব। এছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের অর্থও স্কুলভবন নির্ম্মাণে লগ্নী করে ৪% হারে সুদ দেওয়ার প্রস্তাব করলেও যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হতে পারে।

আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের প্রধান দুটি প্রয়োজন হলো, শিক্ষক ও স্কুলভবন। উপকরণ, পরিদর্শক প্রভৃতি সমস্যার সমাধান তত জটিল নয়। উল্লিখিত পরিকল্পনামত অগ্রসর হলে সমস্যার মূল জটিলতা অনেকাংশে মুক্ত হবে।

আবশ্যিক শিক্ষাপ্রসারের প্রস্তুতি স্বরূপ আরও একটি কর্ম্মসূচী গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তা হলো আবশ্যিক শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা এবং সন্তানদের স্কুলে পাঠিয়ে পারিবারিক কাজকর্ম্মে অসুবিধা ভোগ করার সার্থকতা সম্বন্ধে অবহিত করা। এর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের দিকেও মনোযোগ দিতে হবে।

III

BASIC EDUCATION

[Background—Present position—Merits and demerits—Emphasis on manual work—Self sufficiency—Principles of correlation—Selection of crafts—Conversion of existing primary schools—Economics of the scheme—Trained teachers—Teaching of English.]

Q. 1. Trace briefly the origin and development of Basic Education theory in India.

Ans. আধুনিক ভারতের শিক্ষাসংস্কৃতির ক্ষেত্রে গান্ধিজীর সর্বশেষ এবং সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান অবদান হলো বুনিয়াদী শিক্ষানীতি। ১৯৩৭ সালে ভারতের কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব পাওয়ার সময় দেশবাসীর কাছে প্রতিশ্রুতি দান করেন যে, তাঁরা সমগ্র দেশে সর্ব্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করবেন। কিন্তু অর্থাভাবে এই আদর্শ প্রস্তাব কার্য্যকরী করা অসম্ভব বিবেচনা করে গান্ধিজী নূতন শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন। এই শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষাব্যবস্থাকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করা। শিক্ষাব্যবস্থা থেকেই শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ হবে, এই ছিল প্রাথমিক উদ্দেশ্য। গান্ধিজী আরও চেয়েছিলেন যে, সকল স্তরের পরিবারের ছেলেমেয়েদের পুঁথিবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর শক্তি ও অনুরাগ অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের সংশ্লিষ্ট বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার, যাতে শিক্ষার্থীর মন ও দেহের সুসমঞ্জস বিকাশ ঘটে, তাঁর ব্যক্তিত্ব যথাযথভাবে স্ফুরিত হতে পারে। বুনিয়াদী শিক্ষানীতির মূলে ছিল একটি বিশেষ শিল্প শিক্ষার তাগিদ, যেটিকে কেন্দ্র করে অন্যান্য পাঠ্যবিষয়ের শিক্ষাদান করা হবে। পরিকল্পনা ছিল এই যে, বুনিয়াদী স্কুলে শিল্পশিক্ষার সময়ে শিক্ষার্থীরা যে সকল শিল্প সৃষ্টি করবে, সেগুলি বিক্রয় করে শিক্ষাদানের ব্যয় নির্ব্বাহ হবে।

এই নূতন শিক্ষা পরিকল্পনাটি প্রগতিশীল মহলে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু শিক্ষাবিদমহলে এ সম্পর্কে কিছু কিছু সমালোচনা হতে সুরু হল। প্রথমেই সমালোচকরা বললেন, বুনিয়াদী শিক্ষানীতির স্ব-নির্ভরশীলতার আশ্বাসটি অমূলক। শিক্ষার্থীদের পরিশ্রমে যে শিল্প সৃষ্টি হবে, তা বিক্রয়যোগ্য হবে কিনা এবং তা আদৌ বিক্রয় করা নীতিসম্মত হবে কিনা, সে বিষয়ে তাঁরা ঘোরতর সন্দেহ জ্ঞাপন করলেন। বাস্তবিক পক্ষে, উদ্দেশ্যটি মহৎ হলেও এর কার্য্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

গান্ধিজীর এই বুনিয়াদী শিক্ষানীতির প্রথম সুনির্দ্দিষ্ট রূপ দেওয়া হয়

১৯৩৭ সালে জাকির হুসেন কমিটির রিপোর্টে। ১৯৩৮ সালে এই রিপোর্টটি হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে বিশদভাবে আলোচিত হওয়ার পরে বুনিয়াদী-নীতিকে মোটামুটিভাবে গ্রহণ করা হয় এবং ওয়ার্দ্ধায় বিদ্যামন্দির ট্রেনিং স্কুল স্থাপন করে বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষক শিক্ষণ কর্ম্মসূচীর সূচনা হয়। বলা যায়, জাতীয় শিক্ষা সংস্কারের অন্যতম পরিকল্পনারূপে বুনিয়াদী শিক্ষানীতির গুরুত্ব এইভাবে স্বীকৃত হল। পরিকল্পনাটিকে আরও সুষ্ঠুরূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে সমন্বয় সাধনের জন্য ১৯৩৯ সালে গঠিত হল হিন্দুস্তানী তালিমী সঙ্ঘ।

এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ জাকির হুসেন কমিটির রিপোর্টটির কিছু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। এই রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, বুনিয়াদী শিক্ষার মূল বিষয় হবে একটি বিশেষ শিল্প শিক্ষা। পুঁথিগত শিক্ষার পরিপূরকরূপে শিল্প শিক্ষা দেওয়া হবে, এমন কথা এতে বলা হয়নি; বস্তুতঃ সমগ্র শিক্ষাধারাকে শিল্প শিক্ষার মাধ্যমে প্রবাহিত করাই হবে বুনিয়াদী শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য। মূল শিল্পশিক্ষার আয়োজন এমন সুসমন্বিত হবে, যার ফলে শিক্ষার্থী অন্য সকল পাঠ্যবিষয়ের প্রতি আগ্রহ সঞ্চারের প্রেরণা ঐ একটি মাত্র শিল্পশিক্ষার মাধ্যমে গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। এছাড়া, বুনিয়াদী শিক্ষানীতি এমনই হবে যাতে শিক্ষকের বেতনটুকু সম্পর্কে স্ব-নির্ভর হতে পারবে; অর্থাৎ শিল্প বিক্রয় থেকেই শিক্ষকের বেতন ব্যয় নির্ব্বাহ হবে। বুনিয়াদী শিক্ষার শেষে শিক্ষার্থীরাও আত্মনির্ভরযোগ্য হয়ে উঠবে, এই নূতন শিক্ষানীতির অন্যতম লক্ষ্য হবে তাই। কায়িক পরিশ্রমের উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা পরবর্ত্তী জীবনে নিজ নিজ জীবিকা অর্জ্জনে অসুবিধা বোধ না করে। অহিংস-ভাবে বিদ্বেষহীন মনোভাব নিয়ে দুষ্ট প্রতিযোগিতার প্রভাবমুক্ত হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতা অর্জ্জন করে, সেই উদ্দেশ্যে বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে বৃহৎ শিল্পায়নের কোন প্রচেষ্টা থাকবে না এবং যন্ত্র ব্যবহারের দ্বারা কোনও ব্যক্তি অপরের গ্রাসাচ্ছাদন অপহরণের প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হবে না। বুনিয়াদী শিক্ষা শিশুর জীবনের সঙ্গে, তার গৃহ পরিবেশ ও গ্রামের সঙ্গে, গ্রামীণ শিল্পব্যবস্থা ও বৃত্তির সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত থাকবে। এই নতুন শিক্ষাধারায় শিশুকে ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিকরূপে যথাযথভাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সমবায় ভিত্তিতে সমাজ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাখা হবে, যাতে নিজ দায়িত্ব এবং অধিকার সম্পর্কে শিশু সচেতন হতে পারে।

কংগ্রেস মন্ত্রিসভার প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে জাকির হুসেন কমিটির রিপোর্টে ৭-১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করা হয়েছিল। মাতৃভাষার মাধ্যমে ইংরেজী ভাষাকে পরিত্যাগ করে প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যবিষয়গুলি শিক্ষাদানের সুপারিশ করা হয়েছিল।

বলা বাহুল্য, গান্ধিজীরও এইরকম ইচ্ছা ছিল। এই অনুসারে বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল নিম্নলিখিত বিষয়গুলি :—

১। যে কোন একটি মূল শিল্প, যেমন : সুতাকাটা ও বয়ন ; কাঠের কাজ, ফল-শাকসব্জীর বাগান করা ; কৃষিবিদ্যা ; চর্ম্মশিল্প ; অথবা স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষাশ্রয়ী অন্য কোন শিল্প শিক্ষা

২। সুতাকাটা ও ঝাড়াই সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান

৩। মাতৃভাষা শিক্ষা

৪। অঙ্ক

৫। সমাজবিদ্যা (ভারতবর্ষের ইতিহাস, সামাজিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ, সমাজ জীবনের শিক্ষা)

৬। সাধারণ বিজ্ঞান

৭। সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কণ মাধ্যমে শিল্প ও রুচিবোধ বিকাশ

৮। হিন্দুস্তানী ভাষা শিক্ষা (উর্দু এবং দেবনাগরী লিপিতে)।

কেবলমাত্র বুনিয়াদী (মূল) শিল্পের মাধ্যমে অন্য সকল পাঠ্য বিষয়গুলি শিক্ষাদানের বহু অসুবিধা দেখা দেওয়ার ফলে পরবর্ত্তীকালে শিশুর সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশকেও বুনিয়াদী শিক্ষাধারার মূল পটভূমিকারূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

এই রিপোর্টের সুপারিশ অনুসারে বিহার, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও উত্তরপ্রদেশে বহু বুনিয়াদী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়, পরীক্ষামূলকভাবে সমগ্র নীতি কার্য্যকরী করার প্রচেষ্টা সুরু হয়।

১৯৩৮ সালে খের কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষার কর্ম্মসূচী ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পুনরায় আলোকপাত করে। এই কমিটির রিপোর্টে বুনিয়াদী শিক্ষাধারাকে দুটি স্তরে বিভক্ত করার প্রস্তাব ঘোষিত হয়। স্তর দুটি হলো (১) নিম্নবুনিয়াদী স্তর (জুনিয়র বেসিক স্টেজ) অর্থাৎ ৬-১১ বছর বয়সের শিশুদের জন্য ; এবং (২) উচ্চবুনিয়াদী স্তর (সিনিয়র বেসিক স্টেজ) অর্থাৎ ১১-১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য। প্রথম স্তরটিতে ৫ বছর এবং উচ্চতর স্তরটিতে ৩ বছর— মোট ৮ বছর বুনিয়াদী শিক্ষাকাল নির্দ্ধারিত হয়।

১৯৪৪ সালের সার্জেন্ট কমিটির রিপোর্টেও বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনাটিকে সমগ্র দেশের প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কারের কর্ম্মসূচীরূপে গ্রহণ করার প্রস্তাব করা হয়।

সেবাগ্রামে ১৯৪৫ সালে যে শিক্ষা ও জাতীয় কর্ম্মী সম্মেলনের অধিবেশন হয়, তাতে বুনিয়াদী শিক্ষার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায় ; কারণ ঐ সম্মেলনে গান্ধিজীর সংশোধিত পরিকল্পনামত বুনিয়াদী শিক্ষানীতিকে 'জীবনের

শিক্ষানীতি'-রূপে মর্য্যাদাসম্পন্ন করা হয় এবং এই শিক্ষাধারাকে চারটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করা হয় :—

১। বয়স্কশিক্ষা পর্য্যায়

২। পূর্ব-বুনিয়াদী পর্য্যায়-৭ বছরের কম বয়সের শিশুদের জন্য

৩। বুনিয়াদী তালিম পর্য্যায়—৭-১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য

৪। উত্তর-বুনিয়াদী পর্য্যায়—১৪ বছরের বেশি বয়স্কদের জন্য।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মতৎপরতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫১ সালে সর্ব্বভারতীয় বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলনে প্রস্তাবিত হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও বুনিয়াদী শিক্ষানীতি প্রয়োগ করা হবে। বস্তুতঃ ১৯৪৯ সালের রাধাকৃষ্ণন কমিশনের রিপোর্টে এ ধরনের প্রস্তাব ছিল এবং সেই সুপারিশ অনুসারে সেবাগ্রামে একটি গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাও বিবেচিত হয়। ১৯৫৩ সালে মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্য্যায়েও বুনিয়াদী শিক্ষানীতি অনুসরণের সুপারিশ করা হয়। ১৯৫৫ সালে ভারত সরকার বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি নির্ণয়ের জন্য একটি এসেসমেণ্ট কমিটি নিয়োগ করেন ; এই কমিটির রিপোর্টে বলা হয়, উচ্চ বুনিয়াদী স্তরেও ইংরেজী ভাষাশিক্ষার আয়োজন করা দরকার।

বুনিয়াদী শিক্ষানীতির উত্তরোত্তর বিকাশ সম্পর্কে নিয়মিত গবেষণার উদ্দেশ্যে দিল্লীতে ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব বেসিক এডুকেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নূতন শিল্পনীতির পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করাই এই ইনষ্টিটিউট স্থাপনার উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে, বুনিয়াদী শিক্ষানীতির পরীক্ষানিরীক্ষামূলক পর্য্যায় এখনো শেষ হয়নি।

Q. 2. Give an account of the present position of Basic Education in India.

Ans : বর্ত্তমানে দেশের যে সকল প্রতিষ্ঠানে বুনিয়াদী শিক্ষানীতি অনুসরণ করে শিক্ষাদান চলেছে, সেই প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকাংশই রাষ্ট্রীয় অর্থসাহায্যপুষ্ট। রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতিও এখন এই যে, ৬-১৪ বছর বয়সের সকল বালকবালিকার শিক্ষা বুনিয়াদী শিক্ষানীতি অনুসরণ করেই দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এইজন্য রাষ্ট্রের শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে প্রচলিত প্রথার প্রাথমিক স্কুলগুলিকে বুনিয়াদী ধরনের স্কুলে পরিবর্ত্তিত করার কাজ চলেছে। এছাড়া, নূতন বুনিয়াদী স্কুল প্রতিষ্ঠা, অ-বুনিয়াদী স্কুলে বুনিয়াদী শিল্পশিক্ষার প্রবর্ত্তন করা, বুনিয়াদী শিক্ষাধারা সম্পর্কে পথনির্দ্দেশের জন্য পুস্তকাদি প্রণয়ন ও প্রকাশ করা, এবং বুনিয়াদী স্কুলের বিশেষ ধরনের শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন ও পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ব্যাপৃত আছেন। ১৯৫৫ সালের এসেসমেণ্ট কমিটির রিপোর্টে যে সকল বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছিল,

সেগুলি মোটামুটিভাবে গৃহীত হয়েছে এবং তদনুযায়ী কর্ম্মসূচী অনুসরণ করা হচ্ছে। তবে বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি মোটেই আশানুরূপ নয়; এবিষয়ে সকল পরীক্ষানিরীক্ষাই এখনো প্রাথমিক পর্য্যায়ে রয়েছে বলা যেতে পারে। বুনিয়াদী স্কুলগুলিকে ঠিকমত পরিচালনা করার জন্য যে পরিমাণ অর্থ এবং বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্ম্মী প্রয়োজন তার অভাব এখনো দূর করা সম্ভব হয়নি।

উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষা সংক্রান্ত কর্ম্মসূচী ১০।১২ বছর যাবৎ অনুসৃত হচ্ছে; তা সত্বেও ১৯৬০ সাল পর্য্যন্ত মাত্র ৩৪টির বেশি উত্তর-বুনিয়াদী স্কুল সমগ্র দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয়নি। শিক্ষাদপ্তরগুলিতে উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে এখনো আলোচনা-বিবেচনা চলেছে, এই পর্য্যায়ের শিক্ষাধারা ও সঠিক কর্ম্মসূচী সম্পর্কে এখনো সুনির্দ্দিষ্ট নীতি নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয়নি বলেই মনে হয়। বুনিয়াদী শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষারই একটি নতুন ধরনের পদ্ধতি বলেই আজও মনে করা হয়। উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষা পর্য্যায়ে যে সকল বালকবালিকা শিক্ষাগ্রহণ করবে, তাদের শৈশবের শিক্ষাগ্রহণও হওয়া উচিত বুনিয়াদী ধারায়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে তা সম্ভব হয়নি। প্রচলিত প্রথায় শিশু শ্রেণীতে শিক্ষাগ্রহণ করে যে সকল বালিকা উচ্চতর পর্য্যায়ে উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষাগ্রহণেচ্ছু হয়, তারা নতুন শিক্ষাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানে বিশেষ অসুবিধা বোধ করে। দেশের যে সকল অঞ্চলে, বিশেষতঃ বিহার রাজ্যে, উত্তর-বুনিয়াদী স্কুলগুলিতে শিক্ষার্থীসংখ্যা এই কারণেই হ্রাস পেয়েছে। উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার এই ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে সরকারী অভিমত এই রকম:—

১। ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার সার্টিফিকেটের প্রতি শিক্ষার্থীরা আজও অধিকতর আকৃষ্ট রয়েছে বলে বুনিয়াদী শিক্ষার স্কুলের চেয়ে প্রচলিত প্রথার হাইস্কুলেই শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করতে চায়;

২। উত্তর-বুনিয়াদী স্কুলগুলি এখনো সংগঠনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, সেই কারণে সমস্যার সকল বিষয়গুলি বর্ত্তমানে বিবেচনার সুযোগ অল্প; এবং

৩। উত্তর-বুনিয়াদী স্কুল থেকে শিক্ষাগ্রহণ শেষ করলে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ মর্য্যাদা সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় নীতি এখনো সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়নি।

অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার কাজ মোটামুটি ভালই চলছে। ১৯৬০ সালে সমগ্র দেশে মোট ৭৪২টি বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (৬০১টি পুরুষদের জন্য এবং ১৪১টি মহিলাদের জন্য) প্রতিষ্ঠিত বা রূপান্তরিত হয়েছে। তুলনামূলক হিসাবে, প্রচলিত প্রথার প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ঐ বছরে ছিল ২৯২টি। বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে ১৯৬০ সালে ৮২, ৮৫২ জন (৬৩,৭০৬ জন পুরুষ ও ১৯,১৪৬ জন মহিলা) শিক্ষা গ্রহণ

করেছেন। তুলনামূলক হিসাবে ঐ বছরে প্রচলিত শিক্ষাধারায় প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ১৭,১১৬ জন মাত্র। এই হিসাব থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণের কর্ম্মসূচী সন্তোষজনকভাবেই অগ্রসর হচ্ছে, কিন্তু দেশের সমস্যার বিপুলতার পরিপ্রেক্ষিতে সেই অগ্রসরকে সর্ব্বদাই সামান্য বলে মনে হয়।

উত্তর-বুনিয়াদীর পর বুনিয়াদী তালিম স্কুলের সংখ্যা ১৯৬০ সালের হিসাবমত ছিল, ১৩,৫৫৪টি (১২,২৫২টি বালকদের এবং ১,৩০২টি বালিকাদের) এবং পূর্ব্ব-বুনিয়াদী স্কুল ৬১,৭৫৭টি (৫৬,৫২৬টি বালকদের এবং ৫,২৩১টি বালিকাদের জন্য)। উত্তর-বুনিয়াদী স্কুলগুলির শিক্ষার্থী সংখ্যা মোট (১৯৬০ সালে) ৪,৩৯৪ জন (৩,৪১০ জন বালক এবং ৯৮৪ জন বালিকা) ছিল। বুনিয়াদী তালিম পর্য্যায়ের স্কুলে ২৯,৯১,২৮৩ জন শিক্ষার্থী (২১,৫২,৩০০ জন বালক এবং ৮,৩৮,৯৮৩ জন বালিকা) অধ্যয়নরত ছিল এবং পূর্ব্ব-বুনিয়াদী স্কুলের শিক্ষার্থী-সংখ্যা ছিল ৬০,০৯,৬২২ জন (৪৬,১২,২২০ জন বালক এবং ১৩,৯৭,৪০২ জন বালিকা)।

উত্তর-বুনিয়াদী স্কুল-শিক্ষার জন্য সমগ্র দেশে অর্থব্যয়ের পরিমাণ (১৯৬০ সালের হিসাবে) টা. ৪,৮৫,২২৭৲ ; বুনিয়াদী-তালিম স্কুলের জন্য টা. ১০,৯৯, ১৭,৯৯৯৲ এবং পূর্ব্ব-বুনিয়াদী স্কুলের জন্য টা. ১৩,৯২,৬৭,২৮১৲। অর্থাৎ মোট টা ২৪,৯৬,৭০,৫০৭৲ ব্যয় হয়েছে কেবলমাত্র বুনিয়াদী স্কুলগুলি পরিচালনার জন্য। এই হিসাবের মধ্যে পরিদর্শন, ভবননির্ম্মাণ, ছাত্রবৃত্তি, ছাত্রাবাস প্রভৃতি আনুষঙ্গিক গৌণ ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়নি। প্রতি বছর প্রায় ২৫ কোটি টাকার বিপুল ব্যয়ে বুনিয়াদী স্কুলগুলি পরিচালিত হলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সমগ্র দেশে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার এখনো নিতান্ত নগণ্য।

Q. 3. What are the merits and demerits of Basic Education scheme ?

Ans : শিক্ষানীতি হিসাবে বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনার অনেকগুলি **বৈশিষ্ট্য** রয়েছে। গান্ধিজী যখন এই নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করেন তখন তিনি দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের জটিল সমস্যাগুলির কথা চিন্তা করেছিলেন এবং শোচনীয় দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা, গ্রাম্যজীবনের অবনতি, শহর ও গ্রামের বিভেদ এবং শিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত সমাজের পারস্পরিক বিদ্বেষজনিত সমস্যাগুলি সমূলে বিনাশ করার গুরুত্বই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। দেশের প্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য যত প্রচেষ্টাই হোক, সবই বিধ্বস্ত হবে, যদি নিরক্ষরতা ও অজ্ঞানতা দূর করার প্রচেষ্টা সর্ব্বাগ্রে সফল না হয়।

এই সকল সমস্যায় বিচলিত হয়ে সেগুলির সত্যকার সমাধানের প্রয়াসে গান্ধিজীই সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষের শিশুদের জন্য সাত বছরের আবশ্যিক শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। তিনি দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি-গুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন এবং একথা সত্য যে, প্রচলিত শিক্ষারীতির কোন সৃজনমূলক বৈশিষ্ট্য নেই। এই শিক্ষা শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক নয়। প্রচলিত শিক্ষারীতি মূলতঃ পুঁথিকেন্দ্রিক এবং প্রকৃত জ্ঞানের বহিরাবরণটুকুই শিশুর কাছে উপস্থাপিত করে মাত্র। বুনিয়াদী শিক্ষা হল শিশুকেন্দ্রিক এবং কর্ম্মের মাধ্যমেই শিশু এই শিক্ষাধারায় গড়ে ওঠে।

এই নয়ীতালিম বা নূতন বুনিয়াদী শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হলো দেশের সামাজিক তথা অর্থনৈতিক জীবনের বনিয়াদকে পুনর্গঠিত করা এবং বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদবুদ্ধির মোচন করে কুসংস্কারের বন্ধন মুক্ত করা। বুদ্ধিজীবী ও ধনী সম্প্রদায় যাতে কায়িক শ্রমের মর্য্যাদা উপলব্ধি করতে পারে, তার জন্যও বুনিয়াদী শিক্ষার উপযোগিতা অল্প নয়। অর্থনৈতিক দিক থেকে এই বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য গ্রাম পুনর্গঠন এবং নীরবে শিল্পবিপ্লব সংঘটন ও বেকার সমস্যার সমাধান। বুনিয়াদী শিক্ষানীতি চায় প্রতিটি শিশুকে জীবনের উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে—যে শিক্ষা পরিবেশ ও বংশগতির বৃত্তিসমূহের সঙ্গে সহজে সামঞ্জস্য বিধানের উপায় শিশুকে দেখাতে পারে। শিশুর আপন প্রকৃতির পক্ষে যা প্রয়োজন, সে বিষয়ে গভীর ও যথাযথ উপলব্ধির পর বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রম প্রণীত হবে। শিক্ষকের ক্লান্তিকর উপদেশের শাসন থেকে মুক্তি পেয়ে বুনিয়াদী শিক্ষার শিক্ষার্থী সৃজনমূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে সকল শিক্ষা গ্রহণ করবে। বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রম এই জন্যই ব্যাপকভিত্তিক।

বুনিয়াদী শিক্ষার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাচর্চ্চা। ভারতের মত বহু ভাষাভাষী উপমহাদেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার দাবী সমর্থন করে বুনিয়াদী শিক্ষানীতি জনসাধারণের বিপুল সমর্থন লাভ করেছে।

যে বুনিয়াদী (মূল) শিল্পশিক্ষার মাধ্যমে বুনিয়াদী শিক্ষানীতির কর্ম্মসূচী অগ্রসর হয়, সেই শিল্পটির সৃজনমূলক বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক উপযোগিতার দরুণ শিশু-শিক্ষার্থী অল্প বয়স থেকে সমাজের কল্যাণ-ব্রতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার সুযোগ লাভ করে। এছাড়া, শিল্পশিক্ষার সময়ে যে সকল জিনিষ উৎপন্ন হয়, সেগুলি বিক্রয় করে শিক্ষাব্যয়ের অন্ততঃ কিয়দংশ নির্ব্বাহ করা সম্ভব হয়, যাতে শিক্ষাব্যবস্থা স্ব-নির্ভর হতে পারে।

শিল্প ও সৃজনমূলক কর্ম্মের মাধ্যমে বুনিয়াদী শিক্ষা বিতরিত হয় বলে শিক্ষার্থী প্রতিটি সৃষ্টির আনন্দ উপভোগের সুযোগ পায়। তাতে শিক্ষা যেমন

প্রীতিকর হয়, তেমনি তার স্থায়িত্বও দীর্ঘ হয়। সমবেতভাবে কাজ করার ফলে শিশুর মনে সহযোগিতার শুভবুদ্ধিও সদাজাগরূক থাকে।

প্রচলিত শিক্ষাধারার অন্যতম প্রধান ত্রুটি হলো বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়গুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা হয় না, শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে সংহতি সাধনের প্রচেষ্টা থাকে না। বুনিয়াদী শিক্ষাধারায় একটি মূল (বুনিয়াদী) শিল্পশিক্ষার সাহায্যে অন্যান্য সকল পাঠ্যবিষয় অনুবন্ধ (correlation) প্রণালীতে অধ্যাপনার আয়োজন থাকায় শিশু স্কুল-শিক্ষার সঙ্গে জীবন-শিক্ষার গভীর সম্পর্ক সহজেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

এ সকল বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার যথেষ্ট বিরূপ সমালোচনা হয়ে থাকে, তার কারণ এই নূতন শিক্ষানীতির কতকগুলি ত্রুটিও আছে। প্রথমেই ধরা যাক্, বুনিয়াদী শিক্ষার স্ব-নির্ভরতার বিষয়টি। মূল পরিকল্পনায় ধারণা করা হয়েছিল, শিক্ষার্থীর তৈরী শিল্প-দ্রব্য বিক্রয় করে শিক্ষকের বেতন ব্যয় নির্ব্বাহ করা সম্ভব হবে, কিন্তু শিশুর শিক্ষানবীসী হাতের তৈরী শিল্পদ্রব্য বাজারে ভাল দামে বিক্রয়ের যথেষ্ট অসুবিধা তখন উপলব্ধি করা হয়নি। এই প্রস্তাবটি অবাস্তব ও নীতিবিরুদ্ধ। এর ফলে স্কুলকে কারখানায় পরিণত হতে দেখা যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এরপর মূল শিল্পের মাধ্যমে সকল বিষয়ে শিক্ষাদানের প্রস্তাবটির ত্রুটি হলো, এর ফলে শিক্ষার্থীর কর্ম্মপ্রেরণা ও সৃজনদক্ষতা কেবলমাত্র একটি শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে বিকশিত হয়ে অন্যান্য সম্ভাব্য শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে অবহেলিত হতে পারে।

অনুবন্ধ (কো-রিলেশন) পদ্ধতিতে বুনিয়াদী শিক্ষাদানের নীতিটি তথ্যের বিচারে উচ্চস্তরের হলেও বাস্তবক্ষেত্রে এই পদ্ধতির কার্য্যকারিতা বিশেষ সন্দেহজনক। কারণ, সকল ক্ষেত্রেই সহজ-সরলভাবে অনুবন্ধ প্রণালীতে পাঠদান সম্ভব নয় এবং সম্ভব করা গেলেও তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল, সময়সাপেক্ষ এবং অবাস্তব হয়ে পড়ে। তাছাড়া এই প্রণালীতে শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ উচ্চশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রয়োজন এবং তার অভাব এদেশে সুপ্রকট।

সকল শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে দেওয়ার নীতি বুনিয়াদী শিক্ষাধারার অন্যতম প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য হলেও একথা অনস্বীকার্য্য যে, শিক্ষার্থী পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করতে অত্যন্ত অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

বুনিয়াদী শিক্ষাক্রমে দৈনিক ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট শিল্পমূলক কাজের আয়োজন থাকে এবং মাত্র দু'ঘণ্টা সময় পুঁথিগত শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে। এর ফলে অবশ্যই সকল বিষয়ের শিক্ষার প্রতি যথাযথ মর্য্যাদা দেওয়া হয় না।

দোষেগুণে মিলিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষাধারা নিঃসন্দেহে জগতের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি বিশেষ অবদান। অন্ততঃপক্ষে এদেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিগুলি জনসমক্ষে সুস্পষ্টভাবে উত্থাপিত করার কৃতিত্ব এই নূতন শিক্ষানীতিটি

অবশ্যই দাবী করতে পারে। জগতের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ সকলেই স্বীকার করেছেন যে, গান্ধিজীর বুনিয়াদী শিক্ষানীতি রুশো থেকে ডিউঈ পর্য্যন্ত সকল প্রখ্যাত শিক্ষাবিদের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই রচিত হয়েছে। ডিউঈর "প্রজেক্ট পদ্ধতি"-ও বুনিয়াদী শিক্ষার মত কর্ম্মকেন্দ্রিক।

Q. 4. Discuss the problems relating to the emphasis on manual work in Basic Education scheme and the cautions to be observed in this regard.

Ans : বুনিয়াদী শিক্ষাধারায় স্বপ্রণোদিত কর্ম্ম প্রচেষ্টার নীতি গৃহীত হয়েছে, কারণ শিশু তার কর্ম্মপ্রচেষ্টা, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমেই বিকাশলাভ করে, এই মনোবৈজ্ঞানিক সত্য বুনিয়াদী শিক্ষায় স্বীকৃত হয়েছে। বাস্তবিকই, বুনিয়াদী শিক্ষার এই কর্ম্মপ্রচেষ্টা নীতির ফলে শিশু তার স্বাভাবিক আগ্রহ ও অনুরাগ বিকাশের সহজ পথের সন্ধান পায়। কৃত্রিম কর্ম্মসূচী বা অর্থহীন চিন্তামূলক প্রচেষ্টার অনাবশ্যক গুরুভারে বুনিয়াদী শিক্ষার ছাত্রছাত্রীরা যাতে পীড়িত না হয়, সেজন্যই গান্ধিজী এই নূতন নীতির প্রবর্ত্তন করেন ; অবশ্য জগতের অন্যান্য শিক্ষাবিদ্‌রাও ইতিপূর্ব্বে এই নীতির উপযোগিতা স্বীকার করে গেছেন। কায়িক পরিশ্রমের গুরুত্ব বুনিয়াদী শিক্ষাক্ষেত্রে মর্য্যাদা পাওয়ার ফলে শিশুর দেহ ও মন একই সঙ্গে কর্ম্মক্ষম থাকতে পারবে এবং সকল প্রকার কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হওয়ার প্রয়োজনীয় সামর্থ্য অর্জ্জনের সুযোগ পাবে এবং তার সম্যক্ ব্যক্তিত্ব বিকাশ সুগম হবে।

তবে এই কর্ম্মপ্রচেষ্টা উদ্দেশ্যমূলক এবং উৎপাদনশীল হওয়া প্রয়োজন। শিশুরা স্বভাবতঃই কর্ম্মচঞ্চল। তারা যে কোন কাজে অফুরন্ত প্রেরণার অধিকারী হতে পারে, যদি সেই কাজে তাদের আগ্রহ এবং অনুরাগ থাকে। অতএব কর্ম্মের মাধ্যমে শিশুর শিক্ষা অর্জ্জনের সুযোগ দেওয়ার আদর্শকে সার্থক করতে হলে তার আগ্রহ, অনুরাগ এবং মানসিক ও দৈহিক প্রয়োজনের দিকে শিক্ষক ও অভিভাবকদের সযত্ন মনোযোগ দিতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষার কর্ম্মপ্রচেষ্টা নীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করার প্রাথমিক পর্য্যায়ে শিশুর কর্ম্মপ্রচেষ্টার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং তার শিক্ষামূলক উপযোগিতা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। শিশুর যে কাজে উদ্দেশ্যের অভাব হবে, যে-কাজে অনুরাগের অভাব হবে, সে কাজ যতই শিক্ষামূলক হোক, শিশুর কাছে তা অনাবশ্যক গুরুভার বোধ হবে। একথা ঠিক যে, বাস্তব জগতের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে ছোটখাট সৃজনমূলক কাজের সমাধানের মধ্যেই বুনিয়াদী শিক্ষার কর্ম্মপ্রচেষ্টা নীতির সার্থকতা নিহিত রয়েছে। কিন্তু সেই সমস্যা শিশুর নিজের সমস্যা হওয়া দরকার, যাতে তার সমাধানের আন্তরিক উদ্দীপনা বিনা আয়াসেই শিশুর মনে জাগতে পারে। বুনিয়াদী শিক্ষার কর্ম্মপ্রচেষ্টা নীতির অসুবিধার

কথা এইখানেই বোধ করা যায়। কারণ স্কুলশিক্ষার মধ্যে বিভিন্ন শিশুর বিভিন্ন সমস্যামূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন করা প্রায় অসম্ভব।

অতএব পরোক্ষভাবেই শিক্ষকের পুর্ব্বপরিকল্পিত কর্ম্মসূচী বা প্রজেক্টের মধ্যে শিশুর স্বাধীন নিত্যনূতন সমস্যাকে সামঞ্জস্য করাতে হবেই। উদ্দেশ্যমূলক কর্ম্মের উদ্দেশ্যটুকু বিভিন্ন শিশুর জন্য বিভিন্ন হতে দেওয়া চলবে না, সেগুলিকে একটি সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রধাবিত করতে হবে। কর্ম্মপ্রচেষ্টা নীতির এই বিষয়টিও সহজসাধ্য নয়।

কায়িক পরিশ্রমের ওপর বুনিয়াদী শিক্ষায় অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের উদ্দেশ্য এই যে, সমাজের সকল স্তরের ছেলেমেয়েরা শ্রমের মর্য্যাদা উপলব্ধি করে উচ্চনীচ ভেদবুদ্ধি থেকে মুক্তি লাভ করতে পারলে সামাজিক ঐক্য বন্ধন সুদৃঢ় হবে। শিশুরা শিক্ষার মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি প্রস্তুত করতে সক্ষম হলে স্কুল পরিচালনার কিছু কিছু ব্যয়ভার লাঘব হবে এবং শিশুরাও ভবিষ্যত জীবনে স্বনির্ভর হওয়ার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হবে। অন্ততঃ শিশুর তৈরী শিল্পসৃষ্টি বিক্রয়ের অর্থাগম থেকে শিক্ষকের বেতনটুকুও নির্ব্বাহ করা সম্ভব হতে পারে।

বলা বাহুল্য, কায়িক শ্রম, কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও শিল্প উৎপাদন সম্পর্কে বুনিয়াদী শিক্ষাধারায় যে পরিমাণ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে, তাতে শিক্ষাবিদ্ মহলে এর উপযোগিতা এবং ঔচিত্য সম্বন্ধে প্রবল প্রতিকূল মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই মনোভাবের ফলে বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রসারও বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

অল্পবয়স্ক শিশুর স্কুল শিক্ষার মধ্যে এত অধিক পরিমাণে কায়িক শ্রমের ব্যবস্থা রাখার ফলে শিশুরা ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারে এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণেই অর্থকরী হয়ে উঠতে পারে। বস্তুতঃ বুনিয়াদী শিক্ষাধারায় শিশুকে যে ধরনের কর্ম্মপ্রচেষ্টায় নিযুক্ত রাখার চিন্তা করা হয়েছে, তার মধ্যে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ খেলার প্রবৃত্তি সকল সময়ে মুক্তি পেতে পারে না, যদিও নীতিগতভাবে ধারণা করা হয়েছে যে, শিল্পসৃষ্টির মধ্যে শিশু খেলার তৃপ্তিই পাবে। কিন্তু উৎপাদনের জন্য বিক্রয়-উপযোগী শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিশুকে খেলার স্বাধীনতা যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া সম্ভব নয় কোন মতেই। এই কারণেই স্বাধীনতা, খেলার তৃপ্তি এবং বিক্রয়-যোগ্য শিল্পসৃষ্টি—এই তিনটি বিষয়কে একই সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষাধারায় সম্ভব করে তোলার সমস্যাটি প্রকট হয়ে রয়েছে। বাস্তবক্ষেত্রে, বুনিয়াদী স্কুলগুলিতে রুটিনমত শিল্পশিক্ষাই প্রচলিত হয়ে রয়েছে।

বুনিয়াদী শিক্ষাধারায় কায়িক পরিশ্রমের গুরুত্ব সংক্রান্ত এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য কয়েকটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন একান্ত প্রয়োজন। শিশুকে যে সকল কাজে ব্যাপৃত রেখে শিক্ষাদান কার্য্য সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করা

হবে, সে সকল কাজের উদ্দেশ্য ও সামাজিক উপযোগিতা সম্পর্কে শিশুকে কোনোমতেই সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে সচেতন করা চলবে না। এই সচেতনতা পরোক্ষভাবে ধীরে ধীরে শিশু নিজেই যাতে উপলব্ধি করে, তার জন্যই সুশিক্ষণ-প্রাপ্ত ধৈর্য্যশীল শিক্ষককে সদাসতর্ক থাকতে হবে। বলা বাহুল্য, এবিষয়ে মতদ্বৈধ আছে এবং সম্ভবতঃ সেই মতদ্বৈধের ফলেই বুনিয়াদী শিক্ষায় কায়িক শ্রমের উপযুক্ত স্থান আজও নির্দ্ধারিত হয়নি।

শিশুকে ভবিষ্যৎ জীবনে কি প্রকার কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করতে হবে, সেবিষয়ে যেমন স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়, তেমনি শিশুকে কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট ধরনের কায়িক শ্রমে অভ্যস্ত করাও উচিত নয়। কার্য্যক্ষেত্রে, বুনিয়াদী স্কুলের পরিমিত সামর্থ্য ও অর্থাভাবের দরুণ শিশুকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাত্র দুএকটি নির্দ্দিষ্ট কায়িক শ্রমেই ক্রমাগত ব্যাপৃত থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে আজও। শিশুর আগ্রহ ও অনুরাগ অনুসারে কায়িক শ্রমের আয়োজন যদি বুনিয়াদী স্কুলে করা সম্ভব না হয়, তাহলে শিশু অবশ্যই শ্রমের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়বে এবং তা একান্তই ক্ষতিকর হবে।

পরিশেষে একথা স্মরণ করা যায় যে, বুনিয়াদী শিক্ষানীতি আধুনিকতম সকল কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষানীতির সারসম্বলিত এবং এই কারণেই এই শিক্ষানীতির সফলতা নির্ভর করছে উচ্চশিক্ষিত এবং সুশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর ওপর। শিক্ষাক্ষেত্রে কায়িক শ্রমের গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য, কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে শিশুর সামর্থ্য, প্রয়োজন ও অনুরাগ বিচার করে কায়িক শ্রমের মাধ্যমে শিক্ষাবস্তু পরিবেশনের জন্য সুদক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন খুবই অধিক। অনভিজ্ঞ শিক্ষকের মাধ্যমে কর্ম্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষার কুফল হতে পারে সুদূর-প্রসারী।

Q. 5. Discuss the problems of accommodation in Basic Education scheme, with suggested remedial measures.

Ans : যে কোন সৎ কাজের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ ও স্থান। শিক্ষাক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। বুনিয়াদী স্কুলে শিশুরা শিক্ষা অর্জ্জনের জন্যই সমবেত হয়, অতএব স্কুলভবনের উপযোগিতা চিন্তা করতে হবে। বুনিয়াদী স্কুলভবনের পরিকল্পনা আদর্শসম্মত না হলে এই নূতন শিক্ষাধারার উদ্দেশ্য বহুলাংশে ব্যাহত হবে।

প্রতিটি বুনিয়াদী স্কুলে একটি গ্রন্থাগার তথা পাঠকক্ষ, একটি প্রদর্শনী তথা সংগ্রহ কক্ষ (মিউজিয়াম), প্রধান শিক্ষকের একটি অফিস কক্ষ, শিক্ষকমণ্ডলীর কক্ষ, উপকরণ মজুত কক্ষ এবং সভাসমিতি, প্রার্থনা প্রভৃতির জন্য একটি বড় হল থাকা একান্ত দরকার। একটি, আট-শ্রেণীবিশিষ্ট বুনিয়াদী স্কুলে অন্ততঃপক্ষে

পাঁচটি শ্রেণীকক্ষ থাকা দরকার। অন্য তিনটি শ্রেণী গাছের তলায়, বা মুক্ত অঙ্গণে পড়াশুনা অথবা অন্যান্য কাজে নিযুক্ত থাকতে পারে।

বুনিয়াদী শিক্ষানীতি সফল হওয়ার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন আবাসিক স্কুল। অতএব আবাসিক স্কুলসংলগ্ন ছাত্রাবাস ও শিক্ষকদের বাসস্থানের ব্যবস্থাও আনুষঙ্গিকভাবে অপরিহার্য্য। আবাসিক বুনিয়াদী স্কুলের পরিকল্পনাটি আদর্শ-সম্মত এবং একান্ত প্রয়োজন বোধ হলেও সমগ্র ভারতে এ ধরনের স্কুলের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। এজন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ভবন নির্ম্মাণ প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সমবায় ভিত্তিতে স্কুলভবন, ছাত্রাবাস প্রভৃতি নির্ম্মাণ বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে ; অবশ্য একাজে সরকারী পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের কারীগরি সহযোগিতা অপরিহার্য্য। এই পরামর্শটি আপাতদৃষ্টিতে কঠিনসাধ্য প্রতীয়মাণ হলেও কার্য্যক্ষেত্রে খুবই প্রযোজ্য এবং বাস্তবসম্মত। বস্তুতঃ, বহুক্ষেত্রেই গ্রামবাসী, স্থানীয় অধিবাসী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অর্থসাহায্য ও শ্রমদানের ভিত্তিতে স্কুলভবনের অংশবিশেষ মেরামতী ও পুনর্গঠনের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। হিন্দুস্তানী তালিমী সঙ্ঘের উদ্যোগে এভাবে বহু বুনিয়াদী স্কুলভবন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সমবায় ভিত্তিতে গঠিত হওয়া সম্ভব হয়েছে। এই ভাবে বুনিয়াদী স্কুলভবনের সমস্যা দূর করা যেতে পারে।

অবশ্য ভারতের মত দরিদ্র দেশে স্কুলভবনের বিলাসিতার প্রতি খুব বেশি মনোযোগ দেওয়ার সার্থকতা নেই। স্কুলভবনের জন্য অপেক্ষা না করে গাছের ছায়ায় বুনিয়াদী স্কুলের কাজ সুরু করা যেতে পারে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপরিকল্পনা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

বর্ত্তমানে ভারতের অধিকাংশ বুনিয়াদী স্কুলই ভাড়াবাড়ীতে অবস্থিত। এই সব বাড়ীগুলি স্কুলের পক্ষে একেবারেই উপযোগী নয়। এগুলিতে পর্য্যাপ্ত আলোবাতাসের অভাব এবং স্থানাভাব শিশুদের স্বাস্থ্যহানির কারণ হয়ে আছে। খেলাধুলার প্রাঙ্গণ বা মাঠও এসব স্কুলে আশা করা যায় না। সরকারী অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত বুনিয়াদী স্কুলভবনগুলির সংখ্যা নগণ্য। সরকারী শিক্ষাবিভাগগুলি এবিষয়ে সচেতন থাকলেও অর্থ ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে সমস্যার আশুসমাধান দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। একটি আঞ্চলিক তথ্যসংগ্রহের হিসাব নীচে দেওয়া হল, যা থেকে বোঝা যাবে, বুনিয়াদী স্কুলগুলি কি রকম ভবনে অবস্থিত :—

কি ধরনের স্কুলভবন

১।	ভাড়া বাড়ী	৩৬%
২।	সরকারী বাড়ী	২৮%
৩।	গ্রামবাসীদের দ্বারা নির্ম্মিত স্কুলভবন	৬.৬৭%
৪।	গ্রামের বারোয়ারী তলা	১.৩৩%

৫। দানরূপে প্রাপ্ত স্কুলভবন ৭'৯৯%

৬। স্থানাভাবের দরুণ কিছুটা সরকারী স্কুলভবন ও কিছুটা ভাড়াবাড়ীতে ১'৩৩%

৭। সরকারী স্কুলভবনের কিছুটা গ্রামবাসীদের দ্বারা নির্ম্মিত ৫'৩২%

৮। পরিত্যক্ত ভবন '৬৭%

এই হিসাব থেকে দেখা যায়, ভাড়াবাড়ীর পরেই সরকারী স্কুলভবন এবং গ্রামবাসীর উদ্যোগে নির্ম্মিত স্কুলভবনের সংখ্যা বেশি। সম্পূর্ণ সরকারী ব্যয়ে অথবা সম্পূর্ণ গ্রামবাসীদের ব্যয়ে স্কুলভবন নির্ম্মাণ সম্ভব না হলে সমবায় ভিত্তিতেও একাজে সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

পূর্ব্বে বলা হয়েছে, একটি বুনিয়াদী স্কুলের জন্য অন্ততঃপক্ষে ৫খানি শ্রেণীকক্ষ প্রয়োজন। অবশ্য এই প্রয়োজন মাত্র ১২৫ জন শিক্ষার্থীর পক্ষেই যথেষ্ট; কিন্তু একটি বুনিয়াদী স্কুলের বর্ত্তমান শিক্ষার্থীসংখ্যা গড়ে প্রায় ১৪৬ জন এবং প্রতি বছরেই এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। অতএব একথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বুনিয়াদী স্কুলগুলিতে স্থানাভাব ক্রমশঃই প্রকট হয়ে উঠছে এবং স্থান সঙ্কুলানের জন্য আশু চিন্তা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

এই পরিস্থিতিতে বুনিয়াদী স্কুলগুলিতে যথাযথভাবে শিল্পশিক্ষা, ছাত্র সমাবেশ, গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ পরিচালনা, শিল্প বিপণি, প্রদর্শনী বা সংগ্রহ কক্ষ সংগঠন, এমনকি প্রধান শিক্ষকের অফিস কক্ষেরও উপযুক্ত সংস্থান করা সম্ভব হচ্ছে না। কতগুলি স্কুলে কোন্ কোন্ কর্ম্মসূচী পালন করা সম্ভব হচ্ছে, তার একটি হিসাব নিচে দেওয়া হল:

	কর্ম্মসূচী	স্কুলের সংখ্যা
১।	শিল্পশিক্ষা	২৮'৬৬%
২।	ছাত্র সমাবেশ	২০'৬৬%
৩।	গ্রন্থাগার	২৪%
৪।	শিল্প বিপণি	৪৮%
৫।	প্রদর্শনী	১২'৬৬%
৬।	সংগ্রহ কক্ষ (মিউজিয়াম)	১০%

এই হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে, স্কুলের শিক্ষার্থীদের সৃষ্টি শিল্প-কাজগুলিকে মজুত রাখার জন্য শিল্পবিপণির আয়োজন ৪৮% স্কুল মাত্র করতে পেরেছে। অর্থাৎ অর্দ্ধেকেরও বেশি স্কুলে শিল্পসৃষ্টির অপচয় ঘটছে। প্রত্যেক স্কুলে প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে একটি মজুত কক্ষ থাকা একান্ত দরকার। নতুবা শিশু শিক্ষার্থীরা তাদের সৃষ্ট শিল্পদ্রব্যগুলি অবহেলিত হতে দেখলে শিল্পসৃষ্টির প্রতি আগ্রহ হারাতে পারে।

সমস্যার বিপুলতা বিচার করে প্রদর্শনী কক্ষের প্রয়োজন হ্রাস করা যেতে পারে। প্রদর্শনীর সময় সমগ্র স্কুলভবনটিকে ব্যবহার করলেও চলে এবং তার ফলে একটি বিশেষ কক্ষকে বছরের সমস্ত দিন বন্ধ করে রাখার দরকার হয় না। এছাড়া, শিল্পশিক্ষার কাজ ছাত্রসমাবেশের হলে করা চলে অর্থাৎ একটি বড় ঘরকে দুটি কাজেই ব্যবহার করা চলে। কারণ, ছাত্রসমাবেশের সময় শিল্পকাজ সম্ভব নয় এবং ঐ দুটি কাজ কখনই একসময়ে করার প্রয়োজন হয় না। এই ব্যবস্থায় আরও একটি কক্ষের প্রয়োজন কমে। আরও বিবেচনা করলে দেখা যায়, ছাত্রসমাবেশের জন্য একটি বিরাট হলের আয়োজন না করে প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে পৃথকভাবে পৃথক পৃথক শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্রার্থনা, আলোচনা প্রভৃতি পরিচালনা করা চলে। সমগ্র স্কুলের শিক্ষার্থীদের কোনও সমাবেশ প্রয়োজন হলে একসঙ্গে মুক্ত অঙ্গনে করা চলতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে গ্রন্থাগারের কাজও প্রধান শিক্ষকের কক্ষের একাংশে করা চলে; অর্থাৎ গ্রন্থের আলমারীগুলি প্রধান শিক্ষকের কক্ষে থাকবে এবং ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কোন সংলগ্ন শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের বই লেনদেনের কাজে নিয়োজিত রাখবেন। এই সকল পরামর্শ অভিজ্ঞ শিক্ষকদের কাছ থেকেই সংগৃহীত এবং এগুলির কার্য্যকারিতা সুপ্রমাণিত।

বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ স্কুলগুলির স্থানাভাব সমস্যা আরও প্রকট। এই শিক্ষণ স্কুলগুলি অবশ্যই আবাসিক হওয়া উচিত। গ্রামাঞ্চলে তা সম্ভব হলেও শহরাঞ্চলে কোন কোন ক্ষেত্রে এবিষয়ে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়। শহরের স্থানাভাব দরুণ শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্ম্মসূচী শহরের বিভিন্ন প্রান্তে আয়োজন করতে হয়; শিক্ষকদের বাসস্থানও স্কুলসংলগ্ন হওয়া বহুক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তবে বুনিয়াদী স্কুলগুলি অপেক্ষা শিক্ষণ স্কুলগুলির স্থানাভাব সমস্যা দ্রুত সমাধা হচ্ছে।

স্কুলভবনের সমস্যার সঙ্গে আর একটি সমস্যা রয়েছে। তা হলো কৃষিকার্য্যের জন্য জমির অভাব। শহরাঞ্চলে এর অভাবের কথা বলাই বাহুল্য, এমনকি গ্রামাঞ্চলেও অভিযোগ শোনা যায়, কোন কোন বুনিয়াদী স্কুল পার্শ্ববর্ত্তী অপর কোন ব্যক্তির জমিতে শিক্ষার্থীদের কৃষিকার্য্য শিক্ষার আয়োজন করতে বাধ্য হয়েছে—উপযুক্ত নিজস্ব ক্ষেত্রের অভাবে। কোন কোন স্কুলের জমি আছে. কিন্তু কৃষিকার্য্যের পক্ষে তা অনুপযুক্ত। এসকল বিষয় সমাধানের জন্য স্কুলের সংগঠকদের সচেষ্ট হওয়া যেমন প্রয়োজন তেমনি সরকারী দপ্তরেরও কর্ত্তব্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। সরকারী শিক্ষাবিভাগ এবিষয়ে আশানুরূপ কর্ম্মোদ্যোগের পরিচয় এযাবৎ দেননি। ভূদান, সম্পত্তিদান, শ্রমদান আন্দোলন প্রভৃতিতে উৎসাহদানের মাধ্যমে রাষ্ট্র এবিষয়ে স্কুল সংগঠকদের সঙ্গে পরোক্ষভাবেও সহযোগিতা করতে পারেন। প্রতিটি উচ্চ-বুনিয়াদী স্কুলের

জন্য অন্ততঃপক্ষে ১০ একর পরিমাণ জমির সংস্থান না করা পর্য্যন্ত রাষ্ট্রের উদ্যোগ স্তিমিত হওয়া চলবে না।

Q. 6. Discuss the problems relating to the administration and supervision of Basic Education scheme, with suggested remedial measures.

Ans : বুনিয়াদী শিক্ষাধারার মূল উদ্দেশ্য সহযোগিতা ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে এক নূতন সমাজব্যবস্থার সূচনা করা এবং সেই সহযোগিতা ও গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ সংগঠন ও স্কুলগুলির পরিচালনা, পরীক্ষা ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত বিষয়েও অক্ষুণ্ণ থাকবে, যার ফলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, প্রধান শিক্ষক, পরিদর্শক, এবং স্থানীয় অধিবাসী—সকলের মধ্যে এক নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হতে পারে। বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার এই আদর্শ স্মরণে রেখেই এই শিক্ষাধারার পরিচালন ও তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত সমস্যাগুলির পর্য্যালোচনা করা চলে।

প্রথমেই দেখা গিয়েছিল, বুনিয়াদী শিক্ষানীতি সম্পর্কে জনসাধারণের, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারী প্রশাসন কর্ম্মচারী ও সংগঠকদের মনেও কোনও সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। এই অস্পষ্ট ধারণার ফলে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার আশানুরূপ হওয়া সম্ভব হয়নি, এখনও হচ্ছে না। সমস্যার আর একটি দিক হলো, বুনিয়াদী শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে সরকারী শিক্ষা দপ্তরের বহু উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর ঘোরতর বীতরাগ অথবা অতি সামান্য জ্ঞান। ফলতঃ, বুনিয়াদী শিক্ষার যথাযথ প্রসারের ব্যাপারে তাঁরা কখনই উপযুক্ত যত্ন নেওয়ার কাজে উৎসাহ বোধ করেননি এবং যতটুকু করেছেন, পূর্ণ দায়িত্ববোধসহ করেননি। বুনিয়াদী শিক্ষার যুগান্তকারী সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁরা চিন্তার অবসরও পান না এবং এই নূতন শিক্ষানীতির প্রবর্ত্তকদের মূলচিন্তার সঙ্গেও তাঁরা সম্যক্‌ভাবে পরিচিত হতে পারেন নি। সরকারী কর্ম্মচারীরা মনে করেন, এই নূতন শিক্ষানীতির দ্বারা দেশের কোনও প্রকৃত হিতসাধন হবে না। অথচ অন্য কোনও অপেক্ষাকৃত কার্য্যকরী শিক্ষাধারার মাধ্যমে দেশের সমস্যাগুলির সংস্কার করার কথাও তাঁরা চিন্তা করেন না। ভারত সরকার নিয়োজিত এসেসমেণ্ট কমিটি (১৯৫৬)-র রিপোর্টে স্পষ্টই বলা হয় যে, ত্রুটিপূর্ণ প্রশাসন ব্যবস্থার জন্যই বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ধীরগতি হচ্ছে, বিপথগামী হচ্ছে এবং বহুলাংশে অপচয় হচ্ছে। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলিকে চিন্তা করতে হবে, তাঁদের শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্বশীল কর্ম্মচারী নিয়োগ যথাযথ হচ্ছে কিনা।

এছাড়া, শিক্ষাদপ্তরের কাঠামো এমনই যে, যথেষ্ট সংখ্যক সহকারী কর্ম্মীর অভাবে কাজ চালাতে হয়। বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব সঠিকভাবে

উপলব্ধি করতে পারলে সরকারী কর্ণধারগণ নিশ্চয়ই এই নূতন ব্যবস্থার জন্য অভিজ্ঞ যথেষ্ট সংখ্যক দায়িত্বশীল কর্ম্মচারী নিয়োগ করতেন। বুনিয়াদী শিক্ষানীতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর হাতে স্বভাবতঃই সকল কাজ ব্যাহত হয়ে থাকে।

শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কেও বিচক্ষণতার অভাব দেখা যায়। সরকারী দপ্তরের যে বিভাগটি বুনিয়াদী স্কুলের শিক্ষক বিনিয়োগের ভারপ্রাপ্ত, তার কর্ম্মচারীরা অনেক সময় এমন শিক্ষক নিয়োগ করেন, যিনি আঞ্চলিক ভাষাটি পর্য্যন্ত ভালভাবে জানেন, না। শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাবে বহুক্ষেত্রেই অল্পশিক্ষিত শিক্ষকও নিয়োজিত হয়ে থাকে। যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষণপ্রাপ্ত উপযুক্ত শিক্ষক সংগৃহীত না হলে কোন অঞ্চলে বুনিয়াদী স্কুল স্থাপনা অনুচিত। অন্ততঃপক্ষে শিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক না হলে কোনও বুনিয়াদী স্কুলই সুরু করা উচিত নয়। শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে আরও একটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত; বুনিয়াদী শিক্ষককে যদি নিজ বাসভূমির কাছাকাছি অঞ্চলে নিয়োগ করা হয়, তবে তাঁর পক্ষে বেশিদিন কাজ করা সম্ভব হয়। কিন্তু সরকারী নিয়ম অনুসারে শিক্ষককে দূরস্থানে বদলী করা হলে তিনি শিশু কল্যাণের আকর্ষণ হারান এবং একথা সত্য যে, নূতন পরিবেশে শিক্ষক কাজে মন দেওয়ার ব্যাপারে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করেন। তাছাড়া, নিজ অঞ্চলের বিশেষ ধরনের সমস্যা, অভিভাবক ও শিশুদের বৈশিষ্ট্য, সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হওয়ার ফলে তাঁর পক্ষে আরও আন্তরিক ও নিপুণভাবে কাজ করা সম্ভব হবে।

নূতন বুনিয়াদী শিক্ষার সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে উপযুক্ত তত্ত্বাবধান ব্যবস্থার ওপর। নূতন বুনিয়াদী স্কুলগুলিতে যেমন সুদক্ষ সুশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রয়োজন, তেমনি তাঁদের কাজে সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধনের জন্য নিয়মিত সহৃদয় তত্ত্বাবধান অপরিহার্য্য। তত্ত্বাবধান যিনি করবেন, অর্থাৎ পরিদর্শক, তাঁকেও অন্ততঃপক্ষে বুনিয়াদী শিক্ষকের সমান মর্য্যাদাসম্পন্ন ও শিক্ষিত হতে হবে; তাঁর অন্ততঃ দু'বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকা চাই, প্রশাসন অভিজ্ঞতা থাকাও বাঞ্ছনীয়। যথেষ্টসংখ্যক পরিদর্শক ও তত্ত্বাবধায়ক যদি বুনিয়াদী স্কুলের শিক্ষকদের নেতৃত্বে উপযুক্ত সহায়তার জন্য সদাপ্রস্তুত থাকেন, তাহলে বুনিয়াদী শিক্ষাজগতে নূতন প্রেরণা আসবে এবং বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার দ্রুত হবে।

সরকারী দপ্তরের কর্ম্মচারীদের সহযোগিতা ছাড়াও একটি করে আঞ্চলিক বুনিয়াদী শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি থাকাও দরকার। এসেসমেণ্ট কমিটির রিপোর্টে এ বিষয়ে বলা হয় যে, আইনসিদ্ধ উপদেষ্টা কমিটিগুলি বেসরকারী উপদেষ্টা হিসাবে সরকারী দপ্তরের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। বিভিন্ন

রাজ্যে এ ধরনের উপদেষ্টা কমিটি আছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারী শিক্ষা দপ্তরগুলি কমিটির উপদেশ গ্রাহ্য করেন না। এই সমস্যা আইন বা নির্দ্দেশ দ্বারা সমাধান হয় না; এর জন্য প্রয়োজন সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি।

প্রশাসন ব্যবস্থা আরও সুদক্ষ করতে হলে অনেকে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের অনুরূপ বুনিয়াদী শিক্ষা পর্ষৎ প্রতি রাজ্যে স্থাপনের প্রস্তাব করে থাকেন। যদিও এই প্রস্তাব ব্যয়সাপেক্ষ, তবুও স্বীকার করতেই হবে যে, বুনিয়াদী শিক্ষানীতির মতো একটি সম্পূর্ণ বিশেষ ধরনের ব্যবস্থাকে দ্রুত কার্য্যকরী করতে হলে সুদক্ষ কর্ম্মীদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া উচিত এবং এজন্য বুনিয়াদী শিক্ষা বোর্ড স্থাপনা যুক্তিসঙ্গত। এই বোর্ড বুনিয়াদী শিক্ষার পরীক্ষাব্যবস্থা পরিচালনারও দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার উপযোগী বিশেষ ধরনের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, অনুমোদন ও প্রচার সম্পর্কিত ব্যবস্থার তত্ত্বাবধানের গুরুত্বও বিবেচনার যোগ্য। অবশ্য বুনিয়াদী শিক্ষা ধারায় পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না কারণ পুঁথিকেন্দ্রিক শিক্ষার ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর স্বাধীন কর্ম্মোদ্যোগ যে ব্যাহত হয় একথা স্মরণে রেখে তার প্রতিকারার্থেই বুনিয়াদী শিক্ষানীতির উদ্ভব, তবে পুঁথি ছাড়াও শিক্ষাদান চলতে পারে না, কারণ ডঃ জাকির হুসেন কমিটির রিপোর্টেই বলা হয়েছে যে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের, বিশেষ করে শিক্ষকদের, জন্য উপযুক্ত পুস্তক ও উপকরণাদির ব্যবস্থা না থাকলে বুনিয়াদী শিক্ষাধারার শিল্প শিক্ষা, পাঠক্রমের অনুবন্ধ নীতি এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি কার্য্যকরী করা আদৌ সম্ভব কিনা সন্দেহ। সম্পূর্ণ নূতন ধরনের পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজন এবং সচিত্র সহায়ক পুস্তিকার মাধ্যমে শিক্ষকদের এই নূতন শিক্ষানীতির কর্ম্মপদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনমত গবেষণা ও তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে একটি সেন্ট্রাল ইনষ্টিটিউট অব ন্যাশনাল এডুকেশন স্থাপনের সুপারিশও ডঃ জাকির হুসেন কমিটির রিপোর্টে করা হয়েছিল। প্রতিটি রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরেও এ বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থার মধ্যে যাতে কোন দুর্নীতি না থাকে, তার জন্য যথাযথ দৃঢ়তা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে ট্রেনিং কলেজগুলির শিক্ষণরত শিক্ষকরা পরীক্ষানিরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের পর যে সকল পুস্তক ও উপকরণ সৃষ্টি করবেন, সেগুলি একটি কেন্দ্রীয় কমিটির অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে পেশ করা যেতে পারে। শিক্ষকদের জন্য যে সকল সহায়ক পুস্তিকা প্রকাশিত হবে, সেগুলিও এভাবে প্রণয়ন ও প্রকাশ করা চলতে

পারে। সহায়ক পুস্তিকাগুলি ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত সমস্যা-গুলি নিয়ে আলোচনার জন্য মাঝে মাঝে আঞ্চলিক ভিত্তিতে আলোচনাচক্রের আয়োজনও বাঞ্ছনীয়।

গবেষণা ও পরীক্ষানিরীক্ষার সুবিধার জন্য সরকারী বুনিয়াদী স্কুলের শিক্ষক ও পরিদর্শকদের পুনঃপুনঃ বদলী করা সঙ্গত হবে না। অন্ততঃ তিন বছর একটি কর্ম্মস্থলে কর্ম্মরত থাকার সুযোগ না পেলে কোনও কর্ম্মীর পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কোন পরীক্ষানিরীক্ষা সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না।

বলা বাহুল্য, সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থাটি এজন্য সদাসতর্ক এবং আন্তরিকভাবে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। যে সময়ে যেটি প্রয়োজন হবে, লাল ফিতার দীর্ঘসূত্রতা বর্জ্জন করে সেটি যথাসময়ে করতে হবে। বিশেষ করে, বুনিয়াদী স্কুলে শিল্পশিক্ষার এবং অন্যান্য পাঠক্রম উপকরণাদি সরবরাহ ব্যপারে এই সতর্কতা বিশেষভাবে অবলম্বন করা প্রয়োজন।

বুনিয়াদী স্কুলের বিবিধ ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরের জন্য স্থানীয় কর্ম্মচারীদের যথেষ্ট ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে, যার ফলে কোন অর্থ যথাসময়ে ব্যয়ের কোন অসুবিধা না ঘটে। অর্থাৎ, আর্থিক বিষয়গুলির সুষ্ঠু সম্পাদনার উদ্দেশ্যে অর্থ মঞ্জুরী প্রশাসন ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া স্থানীয় জনসাধারণের আস্থা ও সহযোগিতা অর্জ্জন করাও সহজ হবে না। বুনিয়াদী শিক্ষাসংক্রান্ত এসেস্‌মেণ্ট কমিটির রিপোর্টেও এই রকম সুপারিশ করা হয়েছে। এই কমিটি এমনও সুপারিশ করেন যে, প্রত্যেক জেলায় বুনিয়াদী শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ের সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানের জন্য ডিষ্ট্রিক্ট এডুকেশন্যাল অফিসারকে আহ্বায়ক নিযুক্ত করে এবং স্থানীয় ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ঐ কমিটির সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত করে স্থানীয় অভিভাবকদের সদস্যরূপে গ্রহণ করে একটি করে জেলা কমিটি গঠন করা উচিত। স্থানীয় যতগুলি বুনিয়াদী স্কুল আছে, সেগুলির সর্ব্বপ্রকার ব্যয়ের সত্বর মঞ্জুরী করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে এই কমিটির সভাপতি অর্থাৎ ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের। এর ফলে বুনিয়াদী স্কুলগুলির যখন যা প্রয়োজন, সেগুলি বিলম্ব না করেই সরবরাহের ব্যবস্থা সহজতর হবে।

Q. 7. Discuss the problems relating to the content and organisation of Basic school in India, with suggested measures of efficient implementation of the scheme.

Ans : একটি বুনিয়াদী স্কুলের শিক্ষাধারা ও তার সুষ্ঠু সংগঠন সম্পর্কে আলোচনার প্রারম্ভেই জানা দরকার, বুনিয়াদী স্কুলের পক্ষে কোন্ কোন্ বিষয় অপরিহার্য্য। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে যে নীতি অনুসরণ করে থাকেন, সেই অনুযায়ী ধরা গেলে

১। নূতন ভাবধারায় বুনিয়াদী স্কুলগুলি সামাজিক কর্ম্মসূচী ও শিল্পশিক্ষায় সম্পূর্ণ নিরত থাকবে।

২। এর জন্য বুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকা চাই বুনিয়াদী স্কুলগুলিতে।

৩। স্কুলের প্রয়োজনমত শিল্পশিক্ষার উপকরণাদি নিয়মিত সরবরাহের আয়োজন থাকা দরকার।

৪। মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের তৈরী শিল্পদ্রব্যগুলির যথাযথ মূল্যায়ন ও বিক্রয়াদির ব্যবস্থা থাকা দরকার।

৫। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ সকল কাজের যথাযথ হিসাব রক্ষা করবেন।

৬। সহজে উপলব্ধি ও সুফল ভোগ করা যায়, এমন লক্ষ্য নির্দ্ধারণ করাই উচিত, যার ফলে গ্রামবাসীরা সন্তুষ্ট হবেন যে, বুনিয়াদী ধরনের শিক্ষা তাঁদেরই সন্তান সন্ততিদের কল্যাণার্থে প্রণয়ন ও প্রচার করা হচ্ছে।

৭। বুনিয়াদী শিক্ষাধারার স্বল্পতম লক্ষ্যে উপনীত হতে গেলেই উপযুক্ত স্কুলভবন, ক্রীড়া প্রাঙ্গণ, কৃষিক্ষেত্র এবং কৃষিকার্য্যের জন্য পর্য্যাপ্ত জল সরবরাহের আয়োজন থাকা উচিত।

৮। সর্ব্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন, যাঁরা বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁদের গভীর বিশ্বাস এই নূতন শিক্ষানীতির প্রতি।

কিন্তু দেখা গেছে সরকারী বুনিয়াদী স্কুলগুলিতেই এই নীতিগুলির একটিও যথাযথভাবে অনুসরণ করে চলা সম্ভব হচ্ছে না।

বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার সুফল ও সার্থকতা লাভ করতে হলে শিক্ষার্থীদের আদর্শ পরিবেশে নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসর যাবৎ নিয়মিত শিক্ষণ লাভ করতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষা আন্দোলনের প্রারম্ভে মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাব করেছিলেন, অন্ততঃ ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সকল বালকবালিকার সাত বৎসর ব্যাপী অবৈতনিক সর্ব্বজনীন শিক্ষার আয়োজন থাকবে বুনিয়াদী ধারায়। এই সাত বৎসরব্যাপী শিক্ষার মান ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সমান হবে এবং শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। পাঠক্রমে ইংরেজী ভাষা থাকবে না, তার পরিবর্ত্তে থাকবে একটি বৃত্তিমূলক বিষয় শিক্ষার সুযোগ। তিনি আশা করেছিলেন, এই ধরনের পাঠক্রম যদি বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে কার্য্যকরী করার চেষ্টা হয়, তাহলে সকল বিষয়ের শিক্ষাদানই সুসম্পন্ন হতে পারবে।

কিন্তু খের কমিটি সুপারিশ করেন যে, বুনিয়াদী বাধ্যতামূলক শিক্ষাকাল ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত হওয়া উচিত, অর্থাৎ শিক্ষাকাল আট বৎসর করার প্রস্তাব হয়। গ্রামাঞ্চলে আবার শিশুদের মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই স্কুলে পাঠানোর আগ্রহ দেখা যায়। এজন্য পূর্ব্ব-বুনিয়াদী ক্লাশের আয়োজন করা উচিত।

গান্ধিজী বুনিয়াদী শিক্ষাক্রম দুইটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করার কথা চিন্তা করেন নি। কিন্তু খের কমিটি বলেন, আট বছরের বুনিয়াদী শিক্ষাক্রমে দুইটি পর্য্যায় থাকা উচিত—(১) পাঁচ বছরের জুনিয়র পর্য্যায়, এবং (২) তিন বছরের সিনিয়র পর্য্যায়। এর ফলে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় এক সঙ্কটের সূচনা হয়েছে, কারণ সরকারী শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে প্রাথমিক স্কুলের পাঁচটি শ্রেণীকে নিয়ে জুনিয়র বুনিয়াদী স্কুলে রূপান্তরিত করা হচ্ছে, কিন্তু তার পরের উচ্চতর সিনিয়র বুনিয়াদী শ্রেণীর কথা চিন্তা করাই হচ্ছে না। এই কারণে স্বভাবতঃই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার মন্দগতি হয়ে পড়েছে। জুনিয়র বুনিয়াদী স্কুলগুলিও অসম্পূর্ণ শিক্ষাক্রম নিয়ে কাজ করছে। অর্থনৈতিক দিক থেকেও এতে অপচয় ঘটছে। যেমন পূর্ব্ব-বুনিয়াদী স্কুলের অভাব, তেমনি সিনিয়র বেসিক স্কুলেরও অভাব থাকার জন্য অভিভাবকরা বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দিহান হওয়ার অবকাশ পাচ্ছেন। কোনও শিশু যদি বুনিয়াদী ধারায় শিক্ষা সুরু করে, তবে সেই ধারায় শিক্ষাসোপানের শেষ স্তর পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার সর্ব্বপ্রকার আয়োজন ও সুযোগসুবিধাও প্রয়োজন।

কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে বুনিয়াদী স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রামবাসীদের সহযোগিতা আহ্বান করে সরকারী পক্ষ থেকে অর্থদান দাবী করা হচ্ছে। এই ধরনের অর্থদান আহ্বান করা ভারতীয় সংবিধানবিরোধী বলে মনে হয়, কারণ সংবিধানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রাথমিক পর্য্যায়ে ১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষাদানের প্রতিশ্রুতি বিধিবদ্ধ হয়েছে। জনসাধারণের সহযোগিতা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়, স্কুল প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই এ ধরনের আর্থিক সহযোগিতা দাবী করলে বুনিয়াদী শিক্ষার দ্রুত প্রসার অসম্ভব হবে।

বহুসাধক (মালটিপারপাস) স্কুল ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে যে উদ্যম নিয়োজিত হচ্ছে, দুঃখের বিষয়, তার ভগ্নাংশমাত্রও উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য নিয়োজিত হতে দেখা যাচ্ছে না। বুনিয়াদী শিক্ষাকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে হলে উত্তর-বুনিয়াদী স্কুল প্রবর্ত্তন একান্ত অপরিহার্য্য। বুনিয়াদী স্কুলে শিশুকে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য প্রস্তুতি শিক্ষা দেওয়ার পরে উত্তর-বুনিয়াদী স্কুলে স্বনির্ভরতার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের আয়োজন করতে হবে। মালটিপারপাস স্কুল প্রবর্ত্তন ও পরিচালনার জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে, তা বহুলাংশে হ্রাস করা যায় যদি আরও অনেক উত্তর-বুনিয়াদী স্কুল প্রতিষ্ঠা করে সেগুলির মধ্যে মালটিপারপাস শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্যগুলিও প্রবর্ত্তিত করা হয়। বহুসাধক (মালটিপারপাস) স্কুলের শাখা বা বিভাগরূপে উত্তর-বুনিয়াদী স্কুলের প্রবর্ত্তনের চেষ্টা না করে উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষাধারাতেই বহুসাধক শিক্ষাক্রম প্রবর্ত্তনের চেষ্টা প্রশংসনীয় হবে। বহুসাধক স্কুলের মত

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রবাহ (ষ্ট্রীম) উত্তর-বুনিয়াদী স্কুলেই থাকবে এবং এন. সি. সি., স্কাউটিং প্রভৃতি শিক্ষণের আয়োজনও রাখা চলবে। এইভাবে যত্নসহকারে বুনিয়াদী শিক্ষা সংগঠনে মনোযোগী হলে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনাও সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এবং বুনিয়াদী শিক্ষার প্রাথমিক পর্য্যায়ে শিক্ষাদানের উপযোগী বহু দক্ষ শিক্ষকও পাওয়া সহজ হবে।

যে কোনও 'বাধ্যতামূলক' নীতি জনসাধারণের মনঃপূত হয় না এবং এই কারণেই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক তথা বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতিও জনসাধারণের আপত্তি দেখা যায়। এর জন্য জনসাধারণকে সর্ব্বজনীন শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করানোর উদ্দেশ্যে সরকারী প্রচার ব্যবস্থাকে সক্রিয় করতে হবে এবং স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থাকে শিশু ও অভিভাবকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার সর্ব্বপ্রকার আয়োজন করা আবশ্যক। বালকবালিকারা স্কুলে যাওয়ার ফলে গ্রামের দরিদ্র অধিবাসীদের অর্থোপার্জ্জনে সাহায্যকারীর অভাব ঘটে; এই বিবেচনায় গ্রামবাসীদের বিবিধ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন বৃদ্ধির পথনির্দ্দেশ দিতে হবে। প্রয়োজন হলে শিফ্‌ট্ ব্যবস্থায় স্কুল পরিচালনা করতে হবে।

বুনিয়াদী স্কুলের বিশেষ ধরনের পাঠ্য পুস্তকের অভাব থাকার দরুণ প্রচলিত প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্যপুস্তকই অধিকাংশ বুনিয়াদী স্কুলে পড়ানো হয়ে থাকে। শিক্ষকদের জন্য সহায়ক-পুস্তিকারও বিশেষ কোন বন্দোবস্ত নেই, যার ফলে শিক্ষকবৃন্দ নূতন বুনিয়াদী শিক্ষাধারায় পাঠদানের নীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হতে পারেন না। পুস্তক প্রকাশকরা এবিষয়ে উৎসাহ বোধ না করলে সরকরী শিক্ষা দপ্তরকেই তৎপর হতে হবে।

বহু রাজ্যে বুনিয়াদী স্কুলের পাঠক্রম অনুসারে সুনির্দ্দিষ্ট পাঠ্যসূচী ঘোষণা করা সম্ভব হয় নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাকির হুসেন কমিটি বা হিন্দুস্তানী তালিমী সঙ্ঘের প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচীটুকুও বিনা সংশোধনে নির্ব্বিচারে অনুসরণ করে চলা হচ্ছে। যদিও শিক্ষাদপ্তরগুলি ধীরে ধীরে প্রয়োজন অনুসারে পাঠ্যসূচীর বিকাশ সাধন করতে চেষ্টা করছেন, তবুও একথা অবশ্যই বলা যায় যে, সেই প্রচেষ্টার গতি খুবই সামান্য। তাছাড়া, এই সকল পাঠ্যসূচী বিকাশের পিছনে উপযুক্ত গবেষণা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষারও যথেষ্ট আয়োজন বা উৎসাহ আছে বলে মনে হয় না; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারী নির্দ্দেশনামার অধীনেই পাঠ্যসূচীর পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন বা পরিমার্জ্জন হয়ে চলেছে। ফলে, সমাজের সকল প্রকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বুনিয়াদী শিক্ষাধারা সংগঠিত হওয়ার যে পরিকল্পনা ছিল, তা কার্য্যকরী হচ্ছে না।

বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রমকে বর্ত্তমানে পুঁথিগত ও শিল্পমূলক—দুটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে এবং এই শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণভাবে বুনিয়াদী শিক্ষাধারার বিরোধী। কারণ বুনিয়াদী শিক্ষাধারায় পুঁথির শিক্ষা ও শিল্পশিক্ষাকে

একীভূত করার পরিকল্পনা ছিল ; একটিকে অপরটির পরিপূরকরূপে কার্য্যকরী করতে হবে। এজন্য মাতৃভাষা, গণিত, সমাজ বিদ্যা সাধারণ বিজ্ঞান, গৃহবিজ্ঞান, রন্ধনবিদ্যা, ধোলাই, সূচীশিল্প, কৃষি ও তৎসংক্রান্ত বিদ্যা, এবং হিন্দীভাষা শিক্ষার সঙ্গে কোনও একটি মূল শিল্প,—যেমন—বুনন, কাগজ শিল্প, কাঠের কাজ প্রভৃতিকে একীভূত করে তুলতে হবে। এইভাবে শিক্ষার্থীকে স্বনির্ভর ও উপার্জ্জনক্ষম করে তোলা সহজ হবে এবং তার শ্রমবিমুখতা দূর করা সম্ভব হবে।

শিল্পকে কেন্দ্র করে অন্য সকল বিষয়ে শিক্ষাদানের উপযোগী পাঠক্রম প্রণয়ন করতে হলে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা ও সহযোগিতা করতে হবে এবং তাঁদের পরামর্শের যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিতে হবে। শিক্ষকরা যাতে সমাজের সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার গভীরতম সংযোগ সৃষ্টি করতে পারেন, এজন্য পরীক্ষা নিরীক্ষার সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা তাঁদের দিতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষার শেষে স্কুল ফাইনালের মত সাধারণ পরীক্ষার আয়োজন না করে শিক্ষকের সুপারিশ মতো সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে কিনা বিবেচনা করা দরকার। স্কুলে সাময়িক সাধারণ পরীক্ষার বাহুল্য হ্রাস করে হাতেকলমে কাজের প্রতি অধিকতর মনোনিবেশের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ দেওয়া উচিত।

বালিকাদের জন্য পৃথক বুনিয়াদী স্কুল প্রতিষ্ঠার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ বুনিয়াদী শিক্ষাকে সহশিক্ষার ভিত্তিতে সংগঠিত করারই পরিকল্পনা হয়েছে। বালিকাদের জন্য গৃহবিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির কিছুটা আয়োজন রাখলেই চলবে।

বুনিয়াদী শিক্ষাধারায় মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিশুকে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাদানের নীতি নির্দ্ধারিত হয়েছে বলে হিন্দীভাষাকে অবহেলা করা উচিত হবে না। এই সর্ব্বভারতীয় ভাষাটিকে অন্ততঃ তৃতীয় শ্রেণী থেকেও বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষাদানের আয়োজন করা উচিত বলে অনেকে মনে করেন। ইংরেজী ভাষাকে প্রথমতঃ বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা না হলেও এখন একথা ক্রমেই স্বীকৃত হচ্ছে যে এই আন্তর্জ্জাতিক ভাষাটিকে অন্ততঃ ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ঐচ্ছিক বিষয়রূপে পরিগণিত করা উচিত। কোনও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকেই এই ভাষা শিক্ষার সুযোগটি সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত করা চলে না।

কোন কোন ক্ষেত্রে মূল শিল্পশিক্ষার নীতি অনুসারে কৃষিবিদ্যা, বয়নবিদ্যা প্রভৃতির প্রতি এত বেশি সময় ব্যয় করা হচ্ছে যে, বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যান্য সমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি, যেমন, সমাজ জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ সাধন, সমাজ সেবা প্রভৃতি অবহেলিত হচ্ছে। এই জন্যই বুনিয়াদী শিক্ষা সংগঠকদের এই নূতন শিক্ষাধারার পাঠক্রমকে সম্যক্‌দৃষ্টিতে বিবেচনা করতে হবে।

Q. 8. What are the difficulties in fixing up an ideal routine or time-table of a Basic School? Discuss fully with suggestions for improvement in this respect.

Ans : বুনিয়াদী শিক্ষাধারার সাফল্য কেবলমাত্র এর পাঠক্রমের ওপরেই নির্ভর করে না ; স্কুল কর্তৃপক্ষ ও প্রধান শিক্ষকের সুদক্ষ পরিকল্পনায় আদর্শ কার্য্যকরী কর্ম্মসূচী প্রণয়নের ওপরেও তা' অনেকখানি নির্ভরশীল। ডক্টর জাকির হুসেন কমিটির রিপোর্টে বুনিয়াদী স্কুলের একদিনের কর্ম্মসূচী কিভাবে পরিকল্পিত হবে তার একটি মোটামুটি নির্দ্দেশ আছে—সেটি এইরকম :—

বিষয়	সময়
বুনিয়াদী (মূল) শিল্প	৩ ঘণ্টা ২০ মিঃ
সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কণ ও গণিত	৪০ মিঃ
মাতৃভাষা	৪০ মিঃ
সমাজবিদ্যা ও সাধারণ জ্ঞান	৩০ মিঃ
শারীর-শিক্ষা	১০ মিঃ
বিরাম	১০ মিঃ

এ-ছাড়াও ক্লাশের বাইরে বহির্পাঠ্য বিষয়গুলি, যেমন, শিক্ষামূলক অভিযান, সঙ্ঘভোজ গ্রামসংযোগ, প্রার্থনা, স্বায়ত্তশাসন কর্ম্মসূচী, নাগরিক ও সামাজিক বোধ অনুশীলন, স্কাউটিং, রেডক্রস কার্য্যপদ্ধতি, প্রভৃতির আয়োজনও করতে হয়। এজন্য উল্লিখিত সময়সূচীর প্রয়োজনমত রদবদল একরূপ অপরিহার্য্যই বলতে হয়। এই সময়সূচীর বিপক্ষে মূল সমালোচনা এই যে, এর মধ্যে শিল্পশিক্ষার জন্য অত্যধিক সময় নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। অবশ্য এই সমালোচনার উত্তরে বুনিয়াদী শিক্ষা সংগঠকরা বলেন যে, নির্দ্ধারিত সময়ের সমস্তক্ষণই শিল্প শিক্ষার কারিগরী দিক নিয়ে শিক্ষক ব্যস্ত থাকবেন না, কারণ বুনিয়াদী শিক্ষার মূল নীতিই হলো শিল্পশিক্ষার সঙ্গে অন্য সকল শিক্ষার অনুবন্ধ (কোরিলেশন) সাধন করা। কিন্তু সমালোচকরা বলেন, শিল্পশিক্ষার সঙ্গে অনুবন্ধ প্রণালীতে অন্য সকল বিষয় শিক্ষাদানের নীতি অনুসারেই যদি উক্ত সময়সূচী নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে, তবে অন্য বিষয়গুলির জন্য সময়সূচীতে আবার পৃথক সময় নির্দ্ধারণ করার যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। এরও উত্তরে বুনিয়াদী শিক্ষা-উদ্যোক্তাগণ বলেন, অনুবন্ধ প্রণালীতে অন্য সকল বিষয় শিক্ষাদান সত্ত্বেও বিষয়গুলির বহু অংশ পৃথকভাবে শিক্ষাদানের প্রয়োজন থাকবে ; এবং এ কারণেই সময়সূচীতে বিভিন্ন পুঁথিগত বিষয়ের জন্য পৃথক সময়ের ব্যবস্থা রাখা একান্তই যুক্তি-সঙ্গত।

উল্লিখিত সময়সূচীতে ১০ মিনিট বিরাম সময় ধার্য্য হয়েছে। যে সকল বুনিয়াদী স্কুল দিবাভাগে অনুষ্ঠিত হয় এবং মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য শিক্ষার্থীদের

বাড়ী যেতে হয়, সেখানে এই সময়সূচী যে একেবারেই অচল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশে বলা হয়েছে যে, স্কুলেই শিক্ষার্থীদের মধ্যাহ্ন ভোজন দেওয়া হবে, তাতে বেশি সময় ব্যয় হবে না। বলা বাহুল্য, এই ধারণাটিও বাস্তব বিবেচনাসম্মত নয়, কারণ স্কুলে মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা থাকলেও তা মাত্র ১০ মিনিটে সমাধা হতে পারে না। এর জন্য অন্ততপক্ষে পূর্ণ এক ঘণ্টা সময়ের ব্যবস্থা রাখতেই হবে। এ ছাড়াও শিক্ষার্থীদের বিশ্রাম ও অবসর প্রমোদনের আয়োজন আবশ্যক। অর্থাৎ আদর্শ বুনিয়াদী স্কুলে বিরাম সময় ত্ব'ঘণ্টা ধার্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই কারণেই বুনিয়াদী স্কুলের আদর্শ সময়সূচী হওয়া উচিত সকাল ৮টা থেকে বেলা ১২টা এবং আবার বেলা ২টা থেকে বিকাল ৪টা পর্য্যন্ত; এর মাঝে ২ ঘণ্টা বিরাম আছে এবং পরেও ২ ঘণ্টা সম্মিলিত ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন রাখতে হবে।

বুনিয়াদী স্কুলের সময়সূচী সম্পর্কে যে সকল অসুবিধার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা হয়েছে, সেগুলি উপযুক্ত মর্য্যাদায় বিবেচিত ও প্রচারিত হয় না বলে বহু ক্ষেত্রেই ত্রুটিপূর্ণ সময়সূচী অনুসরণ করেই কাজ চলেছে। সরকারী কর্ম্মচারী-দের তৎপরতা ও দায়িত্ববোধের অভাবেই এই ত্রুটি চলে আসছে। তাঁরা মনে করেন, শিক্ষকরা সরকারী শিক্ষাদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্যসূচী ক্রয় করে পড়ে নেবেন এবং সেইমত কাজ করলেই চলবে। কিন্তু প্রকৃত সংগঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, পাঠক্রম, পাঠনির্দ্দেশ ইত্যাদি সম্বলিত পুস্তিকা ও প্রচার পত্রিকাদি নিয়মিতভাবে স্কুলে স্কুলে শিক্ষকদের জন্য সরকারী দপ্তর থেকে বিনামূল্যে প্রেরণ করা উচিত, কারণ শিক্ষাসংগঠনের দায়িত্ব কেবল শিক্ষকদেরই নয়। তাছাড়া, অধিকাংশ বুনিয়াদী স্কুলের শিক্ষক উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত নন, সেজন্য তাঁদের সম্পূর্ণ নির্দ্দেশ সহজভাবে নিয়মিত না সরবরাহ করলে তাঁরা কোনোমতেই সুষ্ঠুভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে সক্ষম হবেন না।

বুনিয়াদী স্কুলের আদর্শ কর্ম্মসূচী কখনই কঠোরভাবে অপরিবর্ত্তনীয় হবে না। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায়, অতি উৎসাহী এবং সাধারণতঃ শিক্ষাহীন (আন্‌ট্রেণ্ড) শিক্ষকগণ বুনিয়াদী স্কুলের প্রতিটি কর্ম্মধারার মধ্যে অকারণে কঠোর বিধিনিয়ম প্রবর্ত্তন করবার চেষ্টা করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, কোন কোন বুনিয়াদী শিক্ষক ভাষাশিক্ষার কর্ম্মসূচীকে একাধিক পর্য্যায়ে বিভক্ত করে রুটিন প্রস্তুত করেন এবং তাতে হাতের লেখা, শ্রুতিলেখা, প্রশ্নোত্তর, সরব পাঠ, কবিতা, গদ্য, আবৃত্তি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ সময় ধার্য্য থাকে। স্বাভাবিক ভাবে সকল দিক থেকে ভাষাশিক্ষার উন্নতির জন্য যা করা উচিত, সেগুলি সর্ব্বাঙ্গীণ ও সম্যক্‌ভাবে অনুসৃত না হলে

কঠোর সময়বিভাগ করে শিশুর শিক্ষাকে আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ করা যায় না। বুনিয়াদী শিক্ষার মূল নীতি অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে শিক্ষকগণ সমগ্র শিক্ষাধারাকে কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্যে অব্যাহতগতিতে প্রবহমান রাখতে চেষ্টা করবেন—বিভিন্ন বিষয়ের অনুশীলনের মধ্যে একটি অচ্ছেদ্য সম্পর্ক পরিস্ফুট করে তোলাই এই নূতন শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য, সেকথা স্মরণ রাখতে হবে। বিভিন্ন পিরিয়ডে বিভিন্ন শিক্ষক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পাঠদান করলে শিশুর পক্ষে সমগ্র জ্ঞানবস্তুর সম্যক্ ধারণা করা দুরূহ হয়ে পড়ে এবং বুনিয়াদী শিক্ষা তথা যে কোন আদর্শ শিক্ষার উদ্দেশ্য এইভাবেই ব্যর্থ হতে বাধ্য। প্রকৃতপক্ষে, বুনিয়াদী স্কুলের আদর্শ সময়সূচী এমন হওয়া উচিত, যাতে শিশু সমগ্র জ্ঞান-অনুশীলনের কৃত্রিম পরিধি-বিভাগ যেন চিন্তা করার সুযোগ না পায়; বস্তুত, ঐ কৃত্রিম-পরিধি বিভাগ কেবলমাত্র শিক্ষকদের পরিকল্পনার সুবিধার জন্যই পথনির্দ্দেশরূপে তাঁরা ব্যবহার করবেন।

বুনিয়াদী স্কুলের সময়সূচী প্রণয়নের সঙ্গে আরও একটি বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগ অর্পণ করতে হবে, তা হলো শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কাজের হিসাব রাখার সুব্যবস্থা। বুনিয়াদী শিক্ষা শিল্পকেন্দ্রিক ও কর্ম্মভিত্তিক হওয়ার দরুণ এই বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। বুনিয়াদী স্কুলে এইজন্য নিম্নলিখিত হিসাব রাখার ব্যবস্থা থাকার কথা :—

(১) ডায়েরী বা দিনপঞ্জী রাখা
(২) দৈনিক কর্ম্মপ্রগতির হিসাব রাখা
(৩) শিল্পদ্রব্য সৃষ্টির পৃথক হিসাব রাখা
(৪) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আত্ম-পর্য্যবেক্ষণের হিসাব রাখা
(৫) শিক্ষার্থীর মাসিক বা ত্রৈমাসিক প্রগতির হিসাব রাখা

শিক্ষার্থী কি কাজ করবে, ডায়েরী বা দিনপঞ্জীতে তার মোটামুটি পরিকল্পনা করার অভ্যাস করবে এবং দৈনিক কর্ম্মপ্রগতির হিসাবে শিক্ষার্থী কতটুকু কাজ করতে পেরেছে, তার বিবরণ লেখার অনুশীলন করবে। এই দুটি হিসাব থেকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই পরিকল্পিত কাজের উন্নতি-অবনতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করতে সক্ষম হবেন অনায়াসেই। শিল্পদ্রব্য সৃষ্টির হিসাবটিও এই কারণে প্রয়োজন এবং আত্মপর্য্যবেক্ষণের হিসাব থেকে শিক্ষার্থীর অর্জ্জিত জ্ঞানের ক্রমবর্দ্ধমান পরিধি সম্পর্কে স্বচ্ছ অনুমান করা সম্ভব হবে। শিল্পসৃষ্টির হিসাব থেকে শিক্ষার্থীর স্বনির্ভরতার উন্নতি-অবনতি সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য আহরণ করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের পিরিয়ড অনুসারে কাজের বাইরেও নিয়মিত গ্রন্থাগারে অনুশীলনের অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে এবং যত বেশী সম্ভব বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থপাঠের সুযোগ ও অবসর দিতে হবে।

কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায়, এই ধরনের আদর্শ কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করা

বহু স্কুলের পক্ষেই সম্ভব হয় না, কারণ এর জন্য ব্যাপক প্রশাসন ও দপ্তর ব্যবস্থা অপরিহার্য্য। ফলতঃ, প্রায় ৬০% স্কুলেই উপরিউক্ত প্রণালীতে বিবিধ রকম হিসাব রাখার ব্যবস্থা করা হয় না; কেবলমাত্র শিল্প উপকরণের হিসাবটিই অধিকাংশ স্কুলে থাকে। এই কারণেই মনে হয়, বিভিন্নপ্রকার হিসাব রাখার গুরুভার হ্রাস করে শিক্ষকরা যাতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আত্মিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে পারেন, সেদিকেই অধিকতর যত্নবান হওয়া যুক্তিসঙ্গত।

Q. 9. Discuss the principles of discipline and punishments in Basic schools and their related problems.

Ans. উচ্চতর মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যায়ের শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থী-দের সুনিয়ম বা ডিসিপ্লিন রক্ষা যে রকম সমস্যা, বুনিয়াদী শিক্ষাক্ষেত্রে অবশ্য ততখানি সমস্যা হওয়ার কথা নয়। বুনিয়াদী স্কুলে শিক্ষার্থীকে প্রথম থেকেই সমাজায়িত পরিবেশের মধ্যে অভ্যস্ত করার প্রয়াস থাকে বলে শিক্ষার্থী স্বাভাবিক সুনিয়ম শেখে; কারণ সমাজায়িতকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানই হলো সুনিয়ম। কিন্তু শিক্ষার্থীর নিজস্ব আগ্রহ-অনুরাগের ওপর স্কুলের সুনিয়ম সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থাগুলি যেন প্রভাব বিস্তার করে বিকৃত করার কোনরূপ সুযোগ না পায়, সেদিকে অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

বুনিয়াদী স্কুলে সমাজবিদ্যা শিক্ষার মাধ্যমে স্বাভাবিক সুনিয়ম পালনে শিক্ষার্থীদের অভ্যস্ত করে তোলার ব্যাপক সম্ভাবনা আছে বলে এ ধরনের স্কুলে ঐ বিষয়টির গুরুত্ব সমধিক। এদিক থেকে বিচার করলে বুনিয়াদী স্কুলের সমাজবিদ্যা শিক্ষকদের দায়িত্ব অল্প নয়। তাঁরা সুপরিকল্পিত উপায়ে বুনিয়াদী শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করতে পারলে তবেই সহজ সুনিয়ম শিক্ষা সম্ভব; নতুবা কৃত্রিম উপায়ে বাহ্যিক সুনিয়ম আরোপ করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না।

সামাজিক অনুষ্ঠানাদির সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট উপদল ভিত্তিতে কায়িক শ্রমের কর্ম্মসূচীও বুনিয়াদী স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে গভীর সুনিয়মবোধ জাগ্রত করার সহায়ক, সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। এই ধরনের সমষ্টিগত বহির্পাঠ্য কর্ম্মসূচীর মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা দলের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে আচরণ ও সমন্বয় সাধনের সমস্যাগুলি আপন প্রয়াসেই অতিক্রম করার মূল্যবান সুযোগ লাভ করতে পারে। কোন কোন শিক্ষক মনে করেন, এ ধরনের কর্ম্মসূচী ছাড়াও স্কাউটিং, গার্লস গাইড, মণিমেলা, সব পেয়েছির আসর প্রভৃতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্যক্তিগত সংযোগ সাধন প্রভৃতির মাধ্যমেও সুনিয়মবোধ জাগ্রত করা সম্ভব হয়ে থাকে।

মূল কথা শিক্ষার্থীর মনের মধ্যে সুনিয়মের বীজ স্ফুরিত করতে হবে এবং

এর জন্য মানসিক ও আত্মিক অনুশীলনের জন্য শিক্ষার্থীকে সর্বদা সুনিয়মী অথচ চিত্তাকর্ষক পরিবেশের মধ্যে থাকার সুযোগ দিতে হবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে স্কুলের শিক্ষক প্রায় বদলী হলে শিক্ষার্থীদের মনে শিক্ষকের সুপ্রভাব বিস্তারিত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পায় না। এ কারণে, একই সুনিয়মী শিক্ষকের পর্যবেক্ষণে শিক্ষার্থীরা যত বেশিদিন অধ্যয়নের সুযোগ পায়, ততই মঙ্গল।

বুনিয়াদী স্কুলে সুনিয়ম সংক্রান্ত সমস্যা শহরাঞ্চলেই বেশি, সেজন্য উল্লিখিত বিষয়গুলি শহরের স্কুলগুলির ক্ষেত্রে অধিকতর যত্ন সহকারে কার্য্যে পরিণত করার উদ্যোগ প্রয়োজন।

বুনিয়াদী স্কুলের শিল্পশিক্ষা ও কায়িক শ্রমসূচীর ব্যাপকতার জন্য বহু শিক্ষার্থী তাদের অভিভাবকদের কাছে অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে। অভিভাবকরাও অনেকে মনে করেন, তাঁদের সন্তানদের যে ধরণের কায়িক শ্রমের অনুশীলন দেওয়া হচ্ছে, তা' অনেকক্ষেত্রেই নীচ এবং সেজন্য তাঁরা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছে আপত্তিও জানিয়ে থাকেন। সুতরাং, শিক্ষকরা যদি অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের কায়িক শ্রম ও বুনিয়াদী শিল্পশিক্ষার উপযোগিতা ও ফললাভ সম্পর্কে যথাযথভাবে প্রভাবান্বিত করতে না পাবেন, তাহলে বুনিয়াদী শিক্ষাজগতে অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। এর জন্য শিক্ষক অভিভাবক সহযোগিতা ও সংযোগ দৃঢ় করতে হবে।

বলা বাহুল্য, শিক্ষার্থী স্বেচ্ছায় যে সুনিয়মে নিজেকে আবদ্ধ করে, সেই সুনিয়মই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী বলে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে স্বীকৃত হয়েছে। এই কারণেই বুনিয়াদী স্কুল ব্যবস্থায় স্বায়ত্তশাসন বিধির উপযোগিতা অল্প নয়। বুনিয়াদী স্কুলে শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে একজনকে 'প্রধানমন্ত্রী' মনোনীত করে তার ওপর বিভিন্ন কার্য্য তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করার যে নীতি প্রচলিত আছে, তা অল্পবয়স থেকেই নেতৃত্ববোধ ও দায়িত্বজ্ঞান পরিপোষণে বিশেষ সহায়ক। এই 'প্রধানমন্ত্রী' ব্যবস্থা স্কুল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষার্থী সমাজের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করে থাকে এবং কোনও শিক্ষার্থী অনিয়মী আচরণ করলে 'প্রধান মন্ত্রী'র উদ্যোগে 'স্কুল মন্ত্রিসভা'ই তার সমাধান করার প্রয়াস পায়।

এই স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থার ফলাফল সম্পর্কে কোন কোন মহলে এরূপ ধারণা আছে যে, এর ফলে বুনিয়াদী স্কুলের শিক্ষকরা ক্রমেই শিক্ষার্থীদের উপর প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব ক্ষমতা হারাচ্ছেন; শিক্ষার্থীরা অধিকতর স্বনির্ভর হওয়ার ফলে সকল বিষয়ে নিজ মত অনুসারে কাজ করতে ইচ্ছুক হয়। অবশ্য এই সমস্যাটি অতিক্রম করার উপায় শিক্ষকেরই হাতে আছে; নির্দ্দেশকের ভূমিকা ত্যাগ করে শিক্ষককে উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষার স্বাধীনতাপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতির ফলে শিক্ষার্থীরা ক্রমশঃই

উচ্চতর আদর্শ থেকে চ্যুত হচ্ছে, এমন আশঙ্কাও যাঁরা করে থাকেন, তাঁদের একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে, শিক্ষক যদি দৃঢ় আদর্শ সম্পন্ন হন, তাহলে কোমলমতি বালকবালিকারা তাঁকে অনুসরণ ও অনুকরণ না করে অন্যথা করতে পারে না। অতএব শিক্ষকের আদর্শের দৃঢ়তা বুনিয়াদী শিক্ষাজগতে সম্ভবতঃ অন্যতম অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা।

বুনিয়াদী স্কুলে বালকবালিকাদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থাটি আজও গতানুগতিক রয়ে গেছে। কোনও শিক্ষার্থী নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচী ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সম্পূর্ণ করতে না পারলে তার জন্য তাকে এমন শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন, যা হবে শিক্ষামূলক। কোন কর্তব্যে অবহেলা করলে তাকে কিছু অতিরিক্ত কাজের ভার দেওয়া উচিত এবং সেই অতিরিক্ত কাজ কি ধরণের হবে, তা' বুনিয়াদী স্কুলের 'মন্ত্রিসভা'র সদস্য-শিক্ষার্থীরাই মনস্থ করবে। অথবা যে শিক্ষার্থী অন্যায় করেছে, তার বিবেকবোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে তার ইচ্ছামতই কোন একটি শাস্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অল্পবয়স থেকেই বালকবালিকারা যাতে জনসমক্ষে আপন অন্যায় স্বীকার করে সততার পরিচয় দেওয়ার সৎসাহস অর্জ্জন করতে সক্ষম হয়, সেজন্য প্রভূত উৎসাহ প্রদান কর্তব্য।

Q. 10. Discuss the principles and problems of correlation of studies in Basic Education.

Ans. বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার সংগঠকদের পরিকল্পনামত সকল শিক্ষার কেন্দ্রে শিল্পকাজের আয়োজন থাকার কথা। এই নীতির ফলে সমগ্র শিক্ষা-দান পদ্ধতির উপর যে প্রভাব বিস্তারিত হয়েছে, সেই অনুসারে কোরিলেশন বা অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদানের এক নবতম ভাবধারার প্রবর্ত্তন হয়েছে। পূর্ব্বের প্রচলিত শিক্ষাদান পদ্ধতির বিরুদ্ধে যে সকল সমালোচনা করা হতো বা এখনো করা হয়, সেগুলির মধ্যে একটি হলো এই যে, স্কুলের পাঠ্যবিষয়গুলি যথেচ্ছভাবে নির্বাচিত হয় এবং প্রায়ই তাদের একটির সঙ্গে অপরটির সম্পর্ক বোধগম্য হয় না। এই কারণে কোন শিক্ষার্থী ইতিহাস, মেকানিক্স ও সংস্কৃত অধ্যয়নের সময় এগুলির শিক্ষালাভের কোন উপযোগিতা সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করতে পারে না; এমন কি, বহুক্ষেত্রে শিক্ষকেরও এবিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকে না। বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় এই ত্রুটিটুকু দূরীভূত করার প্রয়াসে বিভিন্ন স্কুলপাঠ্য বিষয়গুলিকে একটি বিশেষ শিল্পশিক্ষার মাধ্যমে অধ্যয়নের আয়োজন করে বিষয়গুলির অন্তর্নিহিত মূল উপযোগিতাটুকু শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাছে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অবশ্য, এই কোরিলেশন বা অনুবন্ধ প্রণালীর ভাবধারা একেবারেই নূতন নয়। শিক্ষার্থীর মানসিক জীবনের ঐক্যবোধের বিকাশ ঘটাতে হলে

পাঠ্য-বিষয়গুলির মধ্যে এ ধরণের সংহতি ও সমন্বয় যে একান্ত প্রয়োজন, একথা সম্পূর্ণ বিপরীত মতাবলম্বী শিক্ষাবিদ্‌রাও একবাক্যে স্বীকার করেছেন। বিবিধ কর্ম্মধারা ও প্রয়োজনের তাগিদের সঙ্গে অবিরত সামঞ্জস্য বিধান করাই হলো মানুষের জীবন। এই সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয়, যদি একটি কর্ম্মধারার সঙ্গে অপর কর্ম্মধারাগুলির যথাযথ অনুবন্ধ না থাকে। এই কারণে শিশুকে অল্পবয়স থেকেই তার আগ্রহ ও অনুরাগগুলির মধ্যে অনুবন্ধ ও সামঞ্জস্য সাধনের অনুশীলন দেওয়া বাঞ্ছনীয়। সুতরাং বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা একটি যুক্তিসঙ্গত শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত নীতির ভিত্তিতেই বিভিন্ন স্কুল পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ স্থাপনে গুরুত্ব আরোপ করেছে।

অবশ্য, একটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন এই প্রসঙ্গে। যদিও শিল্পশিক্ষার মাধ্যমে পাঠ্যবিষয়গুলির সঙ্গে পরিবেশের অনুবন্ধ সংস্থাপনের নীতির পক্ষে সবকিছুই বলা চলে, তবুও এই নীতিকে অতিরিক্ত উৎসাহের বশে উদ্ভট পর্য্যায়ে টেনে নিয়ে যাওয়া বাতুলতামাত্র। নূতন নীতির প্রাথমিক প্রচেষ্টা এ ধরণের অতি উৎসাহের আশঙ্কা অল্প নয়, বরং সেটাই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ, বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার দৃঢ় সমর্থকদের অনেকে মনে করেন যে, মূল শিল্পশিক্ষার মাধ্যমে সাধারণ গণনা থেকে সুরু করে জটিল থার্মোডাইনামিক্স পর্য্যন্ত শিক্ষাদান সম্ভব। এ ধরণের দাবী একান্তই অতিরঞ্জিত এবং অল্প বিবেচনা করলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, এই অনুবন্ধ নীতি প্রকৃতপক্ষে সীমিত। স্কুল পর্য্যায়ের বীজগণিত স্বভাবতঃ শিল্পশিক্ষার মাধ্যমে অনুশীলন সম্ভব নয়; সম্ভব করতে হলে নিশ্চয়ই কৃত্রিম ও বিকৃত অনুবন্ধ পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে। তাছাড়া, উচ্চতর শিক্ষাপর্য্যায়ে পদার্থবিজ্ঞান বা দর্শনশাস্ত্র, রসায়নবিজ্ঞান বা তর্কবিজ্ঞান অনুবন্ধ প্রণালীর মাধ্যমে শিক্ষাদান কল্পনাই মাত্র।

স্কুল যে সমাজ ও পরিবেশের সেবায় ব্রতী আছে, সেই সমাজের সঙ্গে পাঠ্যবস্তুর অনুবন্ধ সাধন করতে হবে। স্কুলেই সমাজের প্রকৃত প্রতিফলন এজন্য যে শিল্পের সঙ্গে স্থানীয় সমাজের যোগসূত্র আছে, এমন শিল্পই বুনিয়াদী শিক্ষার্থীকে শেখানো সঙ্গত। যে শিল্পের স্থানীয় পরিচিতি বা উপযোগিতা নেই, শিল্পের মাধ্যমে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হলে নিশ্চিত বুনিয়াদী শিক্ষার একটি প্রধান উপকারিতা হ্রাস পাবে। শিশুর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্টগুলি শিল্পচর্চ্চা ও কায়িক শ্রমের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে পূর্ণ বিকাশলাভের সুযোগ পাবে, বুনিয়াদী শিক্ষার এই উদ্দেশ্য। তবে এ ধরণের শিক্ষা বিশেষ সুপরিকল্পিত, সুনিয়মী ও পর্য্যায়ক্রমিক হওয়া উচিত এবং মূল (বুনিয়াদী) শিল্পটি শিক্ষার্থীর পরিবেশে সুপরিচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নূতন কোন শিল্পের মাধ্যমে অনুবন্ধ সাধনের চেষ্টা করলে অবশ্যই তা শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও

কর্মক্ষমতার উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করবে। এই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন না করলে অনুবন্ধ প্রণালী নিশ্চিতরূপে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ ব্যাহত করবে।

Q. 11. Discuss the problems relating to teachers and their training in Basic education scheme.

Ans. বুনিয়াদী শিক্ষার সফলতা বিশেষভাবে নির্ভর করে উপযুক্ত শিক্ষকের হাতে। সুতরাং এই নূতন শিক্ষা ব্যবস্থাকে সফল করার উদ্দেশ্যে সরকারী শিক্ষা দপ্তর যদি যথার্থই আন্তরিক হন, তাহলে উপযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলী গড়ে তোলার দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন হবে না। একথা মনে রাখতে হবে যে, উৎসাহী সেবাব্রতী শিক্ষকরা যেমন শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত করেন, অতৃপ্ত অসন্তুষ্ট শিক্ষকমণ্ডলীর হাতে তেমনই সমগ্র শিক্ষাসৌধ ধূলিসাৎ হতে পারে। বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে এই কথা অধিকতর প্রযোজ্য, কারণ এই শিক্ষানীতি নূতন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। এই জন্যই বুনিয়াদী শিক্ষক নির্ব্বাচন ও নিয়োগ সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন।

অনেকে বলেন, বুনিয়াদী শিক্ষক নির্ব্বাচনের জন্য অন্ততঃ চারদিনের শিবির (ক্যাম্প) জীবনযাপনের আয়োজন করা উচিত। বিহারে এ ধরণের ক্যাম্পের মাধ্যমে শিক্ষক নির্ব্বাচনের ব্যাপারে সুফল পাওয়া গেছে। শিক্ষকদের ক্যাম্প-জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্দ্দেশ দেওয়ার পর তাঁদের অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে ক্যাম্পে কাজ করার ধারা লক্ষ্য করা হয়, তাঁদের সামাজিক সমন্বয় ক্ষমতার প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের চেষ্টা করা হয়। যে সকল শিক্ষক সমন্বয় বা সামঞ্জস্য সাধনে অক্ষম, তাঁদের অনুপযুক্ত বলে গণ্য করা হয়। বিহারের গবেষণায় দেখা গেছে, এভাবে নির্ব্বাচিত ও নিয়োজিত শিক্ষকরা সন্তোষজনকভাবে কাজ করতে পারেন।

বহু রাজ্যেই বুনিয়াদী শিক্ষক নির্ব্বাচন ও নিয়োগের জন্য এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হয় না এবং গতানুগতিক ধারায় এডুকেশন অফিসার শিক্ষকদের ইণ্টারভিউ গ্রহণ করে নির্ব্বাচন সমাধা কবে থাকেন। নির্ব্বাচিত ও মনোনীত শিক্ষকদের মধ্যে জুনিয়র স্কুল পর্য্যন্ত শিক্ষিত প্রার্থীও থাকেন এবং তাঁদের অনেককেই বিনা প্রশিক্ষণে (ট্রেণিংএ) স্কুলে নিযুক্ত করা হয়। কোন কোন রাজ্যে অবশ্য শিক্ষকবৃত্তি গ্রহণের পূর্ব্বে ট্রেণিং বাধ্যতামূলক এবং আনট্রেণ্ড শিক্ষক বুনিয়াদী স্কুলে নিয়োজিত হলেও সরকারী ব্যয়ে ট্রেণিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ট্রেণিং সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত এই সকল শিক্ষকের চাকুরীর স্থায়িত্ব হয় না। তবে স্নাতক (গ্রাজুয়েট) শিক্ষকদের জন্য উচ্চতর ট্রেণিং ব্যবস্থার সুযোগ সকল রাজ্যে সমান নয়, বহু রাজ্যেই গ্রাজুয়েটদের জন্য বেসিক ট্রেণিং কলেজ নেই। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্য বি. এড ও বি. টি. পাঠক্রমে বুনিয়াদী শিক্ষানীতি অধ্যাপনার ঐচ্ছিক আয়োজন করা হয়েছে, কিন্তু সকল

রাজ্যে বুনিয়াদী শিক্ষানীতি বিষয়ে শিক্ষকদের সম্যক্‌ভাবে অবহিত করার আবশ্যিক আয়োজন না করার দরুণ বুনিয়াদী স্কুলে ট্রেণিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব আজ পর্য্যন্ত দূর করা সম্ভব হয়নি।

ট্রেণ্ড বুনিয়াদী শিক্ষকের অভাব অচিরে দূর করার জন্য জরুরী ব্যবস্থা স্বরূপ এক বছরের ট্রেণিং কোর্স প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য, যাতে অল্পসময়ে বুনিয়াদী শিক্ষানীতির মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে শিক্ষকদের যথাযথভাবে অবহিত করা সম্ভব হয়। অবশ্য একথা সত্য যে, বুনিয়াদী শিক্ষার মত বিশেষ ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষকদের সম্যক্‌ভাবে প্রশিক্ষণ (ট্রেণিং) দান করতে হলে অন্ততঃপক্ষে তিন বছরের কোর্স একান্ত প্রয়োজন।

বুনিয়াদী ট্রেণ্ড শিক্ষকের সংখ্যা উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি না পাওয়ার আর একটি কারণ সম্ভবতঃ শিক্ষকবৃত্তি গ্রহণেচ্ছু প্রার্থীদের ন্যূনতম বয়স সম্পর্কে বিধিনিষেধ। যদিও অল্পবয়স্ক শিশুদের বুনিয়াদী স্কুলে অধ্যাপনার জন্য যথেষ্ট বয়স্ক শিক্ষকের প্রয়োজন হয় না, তবুও দেখা যায়, তরুণ শিক্ষকদের উৎসাহ-দানের বিশেষ আয়োজন নেই এবং বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলনের সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও ১৮ বছর বয়স্ক প্রার্থীদের বিশেষ আমল দেওয়া হয় না। বর্ত্তমানে বুনিয়াদী শিক্ষাজগতে শিক্ষকের যে পরিমাণ অভাব, সেই বিবেচনায় এ ধরণের বিধিনিষেধ শিথিল করাই যুক্তিসঙ্গত এবং ১৮ বছর বয়স্ক তরুণদেরও বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ দান করে শিক্ষকতা বৃত্তিতে আকৃষ্ট করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

বুনিয়াদী শিক্ষাধারায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান করতে হলে যে সহযোগিতা-মূলক পরিবেশের ভিত্তিতে সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত, সেই সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম একমাত্র আবাসিক ট্রেণিং প্রতিষ্ঠান। এ ধরণের আবাসিক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট সংখ্যায় নেই এবং তা প্রতিষ্ঠা করাও যথেষ্ট ব্যয়বহুল। ফলে, গতানুগতিক ধারায় শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা নীতিগুলি পুঁথিগতভাবে শিক্ষালাভ করলেও আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পাচ্ছেন না। মূলতঃ শহরাঞ্চলেই এই সমস্যা গুরুতর। অবশ্য হিন্দুস্তানী তালিমী সঙ্ঘের অভিমত অনুসারে বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রাম্য পরিবেশেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ; কিন্তু শহরের দাবীও অবহেলা করলে বর্ত্তমান যুগে চলে না।

বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রম সম্পর্কেও আলোচনার অবকাশ আছে। বর্ত্তমানে সাধারণতঃ বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রম এইরূপ :—

১। বুনিয়াদী শিক্ষানীতি ও দর্শন
২। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান
৩। স্কুল সংগঠন ও স্বাস্থ্য

৪। শিক্ষার ইতিহাস
৫। নাগরিকত্ব ও স্কুল সমাজ বা সামাজিক কর্ম্মসূচী
৬। শিক্ষাদান পদ্ধতি : সাধারণ
৭। সমাজ বিদ্যা
৮। সাধারণ বিজ্ঞান
৯। অঙ্ক
১০। মাতৃভাষা
১১। রাষ্ট্রভাষা

এছাড়া একটি বা একাধিক শিল্পশিক্ষা করতে হবে। এই পাঠক্রম সত্য সত্যই গুরুভার এবং অনেকেই মনে করেন যে, মনোবিজ্ঞানের পাঠক্রম বহুলাংশে হ্রাস করে ন্যূনতম কার্য্যকরী নীতিগুলি অধ্যাপনার আয়োজনই যথেষ্ট হওয়া উচিত। শিক্ষানীতি এবং স্কুল সংগঠন নামক দুটি বিষয়কেও পাঠ্যতালিকায় একটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। স্কুলপাঠ্য বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাদানপদ্ধতি সম্পর্কে বিশদভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করে কেবলমাত্র সাধারণভাবে শিক্ষাদান ও শ্রেণী পরিচালনা বিষয়ে অধ্যাপনার আয়োজন রাখলেই চলে। অনেকের মতে, শিক্ষার ইতিহাস নামে বিষয়টির সম্পূর্ণ লুপ্তি বাঞ্ছনীয় এবং এই বিষয়ের কিছু কিছু প্রয়োজনীয় অংশ শিক্ষানীতি নামক বিষয়টির অন্তর্ভুক্ত হলেই সুসামঞ্জস হয়। এছাড়া, প্রচলিত ট্রেণিং কোর্সে শিল্পশিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে যে সকল বিস্তৃত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে, সেগুলিও বহুলাংশে হ্রাস করে কেবলমাত্র মূল তথ্যগুলি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাই যথেষ্ট এবং শিল্পশিক্ষার সঙ্গে অন্যান্য পাঠ্যবিষয়গুলির স্বাভাবিক অনুবন্ধ স্থাপনের দুরূহ বিষয়টি সম্পর্কেই অধিকতর বাস্তবানুগ প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণের আয়োজন বাঞ্ছনীয়।

উপযুক্ত প্রশিক্ষণ সত্ত্বেও বুনিয়াদী স্কুলের বহু শিক্ষক আন্তরিকভাবে কাজ করতে পারেন না, তার অন্য কয়েকটি কারণ আছে। শতকরা প্রায় ১২ জন বুনিয়াদী শিক্ষক বুনিয়াদী স্কুল ত্যাগ করে প্রচলিত প্রাইমারী স্কুলে নিযুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন বলে এক তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়। অনিচ্ছুক শিক্ষকের এই সংখ্যা খুব অল্প হলেও বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এই অল্পসংখ্যক অসন্তুষ্ট শিক্ষকের ক্রমাগত প্রভাবে আরও বহু শিক্ষকও বুনিয়াদী স্কুল সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির অবকাশ পেতে পারেন। ঐ সকল শিক্ষকদের এই কারণেই বুনিয়াদী শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অপসারিত করে প্রচলিত প্রাইমারী স্কুলে নিয়োজিত রাখা উচিত, যাতে তাঁরা মনোভাব সংশোধনের সুযোগ পান। এই সঙ্গে গভীরভাবে তথ্যানুসন্ধান করে জানার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি ঐসকল শিক্ষকদের বীতরাগ কেন। সম্ভবতঃ, অনিয়মিত বেতন ও অস্পষ্ট কর্ম্মসূচী কারণগুলির অন্যতম।

বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি উপযুক্ত শিক্ষকদের আকৃষ্ট করতে হলে যেমন নিয়মিত বেতন দান ও সুস্পষ্ট কর্ম্মসূচীর ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়, তেমনি প্রয়োজন তাঁদের বেতনহার বৃদ্ধির। এই সঙ্গে আবশ্যিক জীবনবীমা ব্যবস্থা, সঞ্চয় ব্যবস্থা প্রভৃতিও থাকা দরকার। মহিলা শিক্ষিকারা যাতে তাঁদের স্বজন ও স্বামীর কাছে থেকে কাজ করতে পারেন, সেদিকে দৃষ্টি রেখে তাঁদের দূরে বদলী করা অনুচিত। নূতন শিক্ষক নিয়োগের সময়, পুরানো শিক্ষকদের সন্তানদের অগ্রাধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য। শিক্ষকদের সন্তানদের স্বল্পবেতনে স্কুলে পড়ার সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষকদের বিনাব্যয়ে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত রাখতে হবে এবং অসুস্থতাবশতঃ অনুপস্থিতির জন্য চিকিৎসকের সার্টিফিকেট দাখিলের জন্য পীড়াপীড়ি করা বন্ধ করতে হবে ; মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের জন্য বহু ক্ষেত্রে দুর্নীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। উচ্চতর শিক্ষা ও শিক্ষণপ্রাপ্ত উপযুক্ত শিক্ষককে উচ্চতর বেতনহারে কর্ম্মনিয়োগ করা শোভনীয়। অল্প-বেতনভুক শিক্ষকদের স্বল্পসুদে অর্থ ঋণ দেওয়ার জন্য স্কুল রিজার্ভ ফাণ্ডের কিছু অর্থ বরাদ্দ রাখা ভাল। শিক্ষক সমবায় সমিতি সংগঠনের মাধ্যমে শিক্ষকরা যাতে অল্পদামে জিনিষপত্র ক্রয় করতে পারেন এবং সেইভাবে সমিতির মাধ্যমে লভ্যাংশবাবদ কিছু অর্থও উপার্জন করতে পারেন, সেরকম ব্যবস্থাও বিশেষ প্রয়োজন।

Q. 12. Discuss the problems relating to examination and evaluation systemin Basic Education with suggested remedial measures.

Ans : বর্ত্তমানে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের যে ধরণের পরীক্ষা গ্রহণের রীতি প্রচলিত রয়েছে, নিঃসন্দেহে তা সর্ব্বাংশেই ক্ষতিকর এবং একথা বহুবার বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে পর্য্যালোচনা প্রসঙ্গে ডক্টর জাকির হুসেন কমিটিও এবিষয়ে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, প্রস্তাবিত বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে উপযুক্ত শিক্ষায় শক্তিমান করে তুলতে হলে বর্ত্তমান পরীক্ষাগ্রহণ নীতির বিপজ্জনক পরিণতি সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। অর্থাৎ এই ধরণের প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রহণ করার ব্যাপারেই সতর্ক হতে হবে। সত্য সত্যই প্রচলিত পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের প্রগতির পরিমাপ করার পরিবর্ত্তে প্রগতির বিঘ্ন ঘটায় অধিকতর। স্কুল কলেজে পাঠদানের সময় কেবলমাত্র পরীক্ষাপাশের লক্ষ্যটিকেই বড় করে সামনে রেখে চলা হয় এবং শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, সামর্থ্য ইত্যাদির যথাযোগ্য মর্য্যাদার পরিবর্ত্তে যান্ত্রিক মুখস্থবিদ্যার প্রতিই অকারণ গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যাংশের কেবলমাত্র 'অতি প্রয়োজনীয়' অংশগুলিতেই

মনোনিবেশে অভ্যস্ত হয় এবং সমগ্র বিষয়টির সাধারণ জ্ঞান আহরণেও উৎসাহী হয় না। এর চেয়েও ক্ষতিকর অভ্যাস সৃষ্টি হয় যেগুলিতে সেগুলি হল পরীক্ষা-হলে অসৎ বৃত্তি, পরীক্ষককে প্রভাবান্বিত করা ইত্যাদি। নিঃসন্দেহে, এই সকল আচরণ শিক্ষানীতির পরিপোষক নয়।

তবে বুনিয়াদী স্কুলে শিক্ষার্থীরা পাঠগ্রহণে কতখানি অগ্রসর হচ্ছে সে বিষয়ে প্রগতি পরিমাপের উপযুক্ত সুষ্ঠু ব্যবস্থা যে থাকা দরকার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য ভ্রান্ত ধারণাবশতঃ কোন কোন শিক্ষক মনে করেন যে, যে হেতু বুনিয়াদী শিক্ষা কর্ম্মকেন্দ্রিক ও শিল্পমুখী এজন্য পরীক্ষাগ্রহণ ও কর্ম্মতত্ত্বাবধানের কোন প্রয়োজনই নেই—শিক্ষার্থীরা আপন প্রেরণায় অবশ্যই সুষ্ঠুভাবে কাজ ক'রে চলবে। তাঁরা মনে করেন, বুনিয়াদী শিক্ষানীতির নূতনত্বের জন্য এই শিক্ষানীতি সবকিছু সনাতন নীতিকেই বর্জ্জন করতে পারে।

বাস্তবক্ষেত্রে, কোন নূতন কর্ম্মধারার উপযুক্ত তত্ত্বাবধান ব্যতীত কথনই দ্রুত সাফল্য অর্জ্জন সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ, বুনিয়াদী শিক্ষানীতি যখন এক বহুপ্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে বিপ্লব সাধনের পরিকল্পনা-নুযায়ী রচিত হয়েছে, তখন এর জন্য সদাসতর্ক পরামর্শ ও পথনির্দ্দেশ যে অবশ্যই প্রয়োজন, তা বলা বাহুল্য।

গ্রামাঞ্চলে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার তত্ত্বাবধানের গুরুত্ব আরও বেশি কারণ, শহরের ন্যায় গ্রামে কোনও নূতন চিন্তাধারাকে দ্রুত জনপ্রিয় ও কার্য্যকরী করা যায় না। সেখানকার রক্ষণশীল মনোভাবকে তরল করে নূতন বুনিয়াদী শিক্ষানীতির বীজ ভালভাবে বপন করতে হলে নিয়ত সহানুভূতিসম্পন্ন তত্ত্বাবধান ও প্রগতি পরিমাপনের আয়োজন অপরিহার্য্যই বলতে হবে।

মূলকথা, বুনিয়াদী শিক্ষাকে সর্ব্বার্থসার্থক করে তুলতে হলে এক নূতন পরীক্ষাগ্রহণ ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান প্রণালী প্রবর্ত্তন প্রয়োজন।

বুনিয়াদী স্কুলগুলির শিক্ষাদানরীতির অভিনবত্বের জন্যই পরীক্ষাগ্রহণ ও প্রগতি পরিমাপনের নূতন ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ব্বে প্রয়োজন হবে প্রগতি পরিমাপনকারী উপযুক্ত উপকরণ সম্পর্কে যথাযথ ও ব্যাপক গবেষণা এবং পরীক্ষানিরীক্ষা।

প্রথমেই প্রয়োজন হবে বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন স্কুলপাঠ্য বিষয়ে, শিল্পবিষয়ে এবং অন্যান্য পাঠ্য ও বহির্পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রগতি পরিমাপনের উপযোগী এচিভমেণ্ট টেষ্ট প্রণয়ন ও তার ষ্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশন বা প্রমিতকরণ।

দ্বিতীয় প্রয়োজন, শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশের বিভিন্ন দিক, শারীরবিকাশের বিভিন্ন দিক্ সম্পর্ক নিয়মিত চার্ট ও হিসাব রক্ষণের উপযোগী ব্যবস্থার উদ্ভাবন এবং শিক্ষার্থীর প্রকৃত আগ্রহ, অনুরাগ ও কর্ম্মপ্রবণতা সম্পর্কে সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক মতে তথ্য সংগ্রহ।

তৃতীয়, প্রতিটি শিল্পশিক্ষার নৈর্ব্যক্তিক (অবজেকটিভ) উৎকর্ষ-মান নির্দ্ধারণ করার জন্য সেগুলির যথাযথ বিশ্লেষণ প্রয়োজন এবং তার ফলে শিল্পশিক্ষার যেমন উন্নতি হবে তেমনি শিক্ষাদানের সময়েরও যথাযথ সদ্ব্যবহার হবে।

চতুর্থ, বহির্পাঠ্য এবং সমষ্টিগত কর্ম্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর প্রগতি পরিমাপ সম্পর্কেও উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করতে হবে, যেহেতু বুনিয়াদী শিক্ষাধারায় এই বিষয়গুলির উপর অধিকতর মূল্য অর্পিত হচ্ছে।

পঞ্চম, শিক্ষার্থীর সামগ্রিক উন্নতির ও তার পরবর্তী ক্লাশে প্রোমোশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কিউম্যুলেটিভ প্রোগ্রেস বা ক্রমান্বয়ী প্রগতি চার্টেরও হিসাব রাখার ব্যবস্থাও অপরিহার্য্য।

প্রতিটি রাজ্যে এই সকল বিষয়ে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সরকারী উদ্যোগে যথাযথভাবে গবেষণাকেন্দ্র পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য। নচেৎ বুনিয়াদী স্কুলের অভিনব শিক্ষাধারার যথাযোগ্য প্রগতি পরিমাপ কোনোমতেই সুষ্ঠুভাবে সম্ভবপর নয়। বর্ত্তমানে এই সমস্যাটির প্রতি যে কোন কারণেই হোক উপযুক্ত মনোযোগ না দেওয়ার দরুণ কার্য্যক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা ও তার পরীক্ষা-গ্রহণ রীতি প্রচলিত ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থারই আশ্রিত হয়ে রয়েছে। কোন শিক্ষকও উন্নততর অবজেকটিভ টেষ্ট ব্যবস্থায় বুনিয়াদী শিক্ষাকে আধুনিকতম করে তোলার অবকাশ পাননি। ফলতঃ বুনিয়াদী শিক্ষাও ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ছে।

বর্ত্তমানে বুনিয়াদী স্কুলগুলিতে বিজ্ঞানসম্মত পাঠ-প্রগতি পরিমাপের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকায় কিভাবে প্রোমোশন দেওয়া হয়ে থাকে, সেবিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের ফলে নিম্নরূপ হিসাব পাওয়া যায় :—

প্রোমোশনের রীতি বা ভিত্তি	অনুসরণকারী স্কুল
১। প্রচলিত পদ্ধতিতে পরীক্ষাগ্রহণ	৪০%
২। নিয়মিত উপস্থিতি ও সময়ানুবর্ত্তিতা	১৮%
৩। আচরণ ও চরিত্র	১২%
৪। শিক্ষা ও জ্ঞানের সাধারণ প্রগতি	১০%
৫। স্কুলে দৈনিক পাঠ-প্রগতি	৭%
৬। ,, মাসিক ,, ,,	৭%
৭। ,, বার্ষিক ,, ,,	৭%

দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ স্কুলে আজও প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থাকেই অবলম্বন করতে হচ্ছে। নিয়মিত উপস্থিতি যদিও প্রগতির যথার্থ পরিচায়ক নয়, তবুও কোন কোন কারণে প্রোমোশনের ভিত্তিরূপে তা বিবেচিত হয়ে থাকে।

এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধনে অবিলম্বে সচেষ্ট না হলে বুনিয়াদী শিক্ষা আমাদের নূতন কোন উপকার করতে পারবে বলে মনে করা যেতে পারে না।

Q. 13. Elucidate the place of English language in the curriculum of Primary education.

Ans: স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর থেকে ভারতে যেন ইংরেজী ভাষাশিক্ষার দাবী বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ব্বে গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলিতে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার তেমন কোন আয়োজনই ছিল না। আজ গ্রামের স্কুলগুলিতে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার দাবী প্রায় সর্ব্বব্যাপী।

এর কারণ পূর্ব্বে সরকারী শিক্ষাদপ্তরগুলি শহরের শিক্ষার দিকেই মনোযোগ দিত বেশি, কিন্তু বর্ত্তমানে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার প্রতি সরকারী গুরুত্ব আরোপিত হওয়ায় শিক্ষাসুযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

স্বাধীনতার পূর্ব্বে দেশবাসী ইংরেজী ভাষা শিখতো কর্ম্মক্ষেত্রে সুবিধালাভের চাপে। কিন্তু বর্ত্তমানে সেরূপ কোন পরোক্ষ বাধ্যবাধকতা নেই; এখন গণতান্ত্রিক দাবীতে ইংরেজী ভাষার বিলোপ ঘটানো যায়। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, দেশবাসীর এক বিপুল অংশ ইংরেজী ভাষার প্রতি দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করছে।

ভারতে এখন উচ্চতর শিক্ষার আগ্রহ ক্রমবর্দ্ধমান হওয়ার দরুণ ইংরেজী ভাষার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্কুলের নিম্ন শ্রেণী থেকেই অনেকে উপলব্ধি করছেন। অবশ্য এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে।

অনেকে মনে করেন, ইংরেজী ভাষা শিক্ষার উপযোগিতা সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হলেও ঐ ভাষা মাধ্যমিক শিক্ষা পর্য্যায়ের নীচে থেকেই শিক্ষাদানের কোনও প্রয়োজন নেই। প্রাথমিক পর্য্যায়ের শিশুদের ইংরেজী ভাষা শিখতে বাধ্য করা হলে তাদের মাতৃভাষা পরিশীলনের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হতে পারে বলে তাঁরা আশঙ্কা করে থাকেন। প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা সময় ও শক্তির অপচয় বিবেচনায় গান্ধিজী প্রবর্ত্তিত বুনিয়াদী শিক্ষাধারাতেও ইংরেজী ভাষাকে বর্জ্জন করা হয়েছিল। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে ইংরেজী ভাষাকে ঐচ্ছিক বিষয়রূপে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যতালিকাভুক্ত করার প্রচেষ্টা হয়েছে এই যুক্তিতে যে, বুনিয়াদী শিক্ষার শেষে যে সব শিক্ষার্থী উচ্চতর ইংরেজী শিক্ষায় ব্যুৎপন্ন হতে চায়, তাদের যেন কোনরূপ অসুবিধা না হয়। এই ব্যবস্থা বিশেষ যুক্তিসঙ্গত, সন্দেহ নেই।

একদিকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা, অপরদিকে শিশু-শিক্ষার্থীদের উপর একাধিক ভাষা শিক্ষার গুরুভার সম্পর্কে বিবেচনা করতে গেলে সমস্যাটি জটিল বলে মনে হয়। অভিভাবকগণ অধিকাংশক্ষেত্রেই এমন দাবী জানিয়ে থাকেন যে, বৃটিশ আমলের মতোই একেবারে প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা সকল প্রাথমিক স্কুলে সুরু হোক। কিন্তু তাঁরা সমস্তে

সময়ে এমন অভিযোগও করে থাকেন যে, শিশুকে মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা (হিন্দী) এবং ইংরেজী ভাষা একই সঙ্গে শিক্ষাদানের উদ্যোগ বিশেষভাবে ক্ষতিকর। এই মতদ্বৈধের মধ্যে বর্ত্তমানে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ইংরেজী ভাষাশিক্ষার যথাযথ স্থান এখনো স্থির হয়নি।

তবে একথা ঠিক যে, ইংরেজী ভাষাকে এদেশ থেকে বর্জ্জন করার কথাটা যখন বাতুলতা, তখন শিশুর ভাষাবিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে যতশীঘ্র সম্ভব ইংরেজী ভাষা শিক্ষা সুরু করাই সমীচীন। শিক্ষাবিদদের মতে শৈশবেই কোন বিদেশীভাষা শিক্ষা সহজতর। প্রথম দুই শ্রেণী মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পর শিশুর যখন ভাবপ্রকাশের স্বচ্ছন্দগতি দেখা যায়, তখন ইংরেজী ভাষা শিক্ষা সুরু করলে চলতে পারে। যদিও এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দ্দেশ ছিল যে, পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরেজী শেখানো হবে, তবুও বাস্তবক্ষেত্রে বহু স্কুলেই অভিভাবকদের চাহিদা অনুসারে এযাবৎ তৃতীয় শ্রেণী থেকেই প্রাথমিক পর্য্যায়ের ইংরেজী শিক্ষা সুরু হয়ে যায়। সম্প্রতি সরকারী শিক্ষা দপ্তরও এই ব্যবস্থামত নতুন নির্দ্দেশনামা জারী করেছেন।

ইংরেজী ভাষা শিক্ষার দাবী ইদানীং এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, উচ্চশিক্ষার সুবিধালাভের জন্য ইংরেজী ভাষা ভালভাবে শেখার উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলের বহু শিক্ষার্থী শহরাঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ভীড় করছে এবং এর ফলে এক নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্যার সমাধান করতে হলে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক স্কুল থেকেই ভালভাবে ইংরেজী ভাষা চর্চ্চার সুব্যবস্থা করতে হবে এবং গ্রামের স্কুল ও শহরের স্কুলে ইংরেজী শিক্ষার যে কোন পার্থক্য নেই, একথা অভিভাবকদের বোঝাতে হবে।

অনেকে মনে করেন, প্রাথমিক স্কুল পর্য্যায়ে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হলে শিশুরা মাতৃভাষা চর্চ্চায় অবহেলা প্রদর্শন করতে পারে। এই অভিযোগ একাংশে সত্য, এবং সেজন্য প্রাথমিক পর্য্যায়ে ইংরেজী ভাষাচর্চ্চার সময় সর্ব্বদাই মাতৃভাষা চর্চ্চার সময়ের চেয়ে অল্প রাখতে হবে, যাতে মাতৃভাষা অবহেলিত হওয়ার অবকাশ না থাকে।

তবে অল্পসময়ে কার্য্যকরী ইংরেজীভাষা প্রাথমিক স্কুলেই শিক্ষা দিতে হলে অবশ্যই উন্নততম শিক্ষাদান পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে এবং এবিষয়ে শিক্ষক, শিক্ষণ ও শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্রগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষার যথেষ্ট আবশ্যক রয়েছে।

Q. 14. Discuss the problems relating to conversion of existing Primary Schools into Basic Schools.

Ans: ভারতে সরকারীভাবে বুনিয়াদী শিক্ষানীতি গৃহীত হওয়ার ফলে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে বুনিয়াদী ধরণে রূপান্তরিত করার নীতিও স্বীকৃত হয়েছে। বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাপর্য্যায়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে বুনিয়াদী

ধরণে রূপান্তরিত করার প্রয়োজনীয়তার উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে।

বুনিয়াদী স্কুলের বৈশিষ্ট্য হলো সেখানে সমগ্র শিক্ষাদান পদ্ধতিকে কর্ম্ম-কেন্দ্রিক ও শিল্পমুখী করতে হবে। এই নীতির যথাযথ মর্য্যাদা রক্ষা করে প্রচলিত প্রাথমিক স্কুলগুলিকে বুনিয়াদী স্কুলে রূপান্তরিত করতে হলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন—(১) শিল্পশিক্ষার সুষ্ঠু আয়োজন এবং (২) কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ।

বলা বাহুল্য, বর্ত্তমানে এদেশের অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুল যে সঙ্কীর্ণ পরিবেশ ও সুযোগের মধ্যে পরিচালিত হয়ে থাকে, সেখানে স্বল্পতম অতিরিক্ত ব্যয়েও শিল্প শিক্ষা সুরু করা সহজ নয়। শিশুশিক্ষার্থীরা অল্পপরিসর শ্রেণীকক্ষে ভালভাবে বসবার স্থানটুকুও পায় না; সেখানে কোনরকম কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলনের প্রস্তাব বাতুলতা মাত্র।

বুনিয়াদী শিক্ষানীতির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো শিল্পের সাথে অনুবন্ধ প্রণালীতে অন্য সকল পাঠ্যবিষয়গুলি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। ব্যবস্থাটি ভাল সন্দেহ নেই; তবে এই ব্যবস্থা অনুযায়ী সুষ্ঠু শিক্ষাদান পদ্ধতি পরিচালনা করতে হলে যে সুদক্ষ সুশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন, তার ব্যবস্থা করা দরিদ্র প্রাথমিক স্কুলগুলির পক্ষে একরকম অসম্ভব বলতে হবে। ফলে, প্রাথমিক স্কুলের নাম পরিবর্ত্তন করে 'বুনিয়াদী স্কুল' করলেও বহুক্ষেত্রেই বুনিয়াদী শিক্ষানীতির এই মূল ও মূল্যবান বৈশিষ্ট্যটুকুর মর্য্যাদা রক্ষা কোনমতেই সম্ভব হচ্ছে না।

বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে প্রতি বছর যে সংখ্যক শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক তৈরী হচ্ছেন, সমগ্র দেশে তার চেয়েও চাহিদা অনেক বেশি। দ্রুতগতিতে প্রাথমিক স্কুলগুলি বুনিয়াদী স্কুলে পরিণত হতে থাকলে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক তো দূরের কথা, প্রত্যেকটি রূপান্তরিত বুনিয়াদী স্কুলের জন্য একজন করে শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েট প্রধান শিক্ষকও সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হবে না।

সরকারী নির্দ্দেশ মতো বুনিয়াদী স্কুলের ভবন নির্ম্মাণের যে বিধি আছে, তাতে সাধারণ কুটিরে স্কুল পরিচালনার বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হয়নি। পাকা বাড়ী তৈরী করে স্কুল বসানোর যে বিপুল ব্যয়, তা বহন করার কোন আগ্রহ স্থানীয় অধিবাসীদের নেই, সরকারী শিক্ষাদপ্তর থেকেও সেই ব্যয় পুরোপুরি নির্ব্বাহ করা সম্ভব নয় বলেই মনে হয়।

এছাড়া বুনিয়াদী স্কুলে শিল্পশিক্ষায় ব্যবস্থা রাখার বিধি আছে। এইজন্য শিল্পের কাঁচা মালপত্র ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণের যে বিরাট দায়িত্ব আছে, তা যথাযথ প্রতিপালন করা একটি ছোট প্রাইমারী স্কুলের পক্ষে বিশেষ আয়াসসাধ্য।

এই সকল কারণেই বুনিয়াদী স্কুল ব্যবস্থা সম্প্রসারণের গতি খুব আশাপ্রদ হওয়া সম্ভব হয়নি। একদিকে ভারতীয় সংবিধানে অবৈতনিক সর্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে বুনিয়াদী শিক্ষার মত ব্যয়বহুল নূতন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে; ফলে ব্যয়াধিক্যের চাপে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ত্বরান্বিত করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এরূপ অবস্থায় প্রচলিত পদ্ধতির প্রাথমিক স্কুলগুলিকে বুনিয়াদী স্কুলে রূপান্তরিত করতে কতকগুলি বাস্তববুদ্ধিসম্মত পন্থা অবলম্বন করতে হবে এবং অযথা দ্রুত ফললাভের আশা করা উচিত হবে না। প্রথমতঃ, প্রাথমিক স্কুলগুলিতে বুনিয়াদী নীতির যেগুলি বিনা আয়াসে এখুনি প্রচলন করা সম্ভব, সেগুলি গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিল্পশিক্ষা ও শিল্পের মাধ্যমে অনুবন্ধ প্রণালীতে সকল পাঠ্যবিষয় শিক্ষাদানের আদর্শ পরিকল্পনাকে নিখুঁতভাবে কার্য্যকরী করার জন্য ব্যগ্র হবার আগে অল্পব্যয়ে সহজে যে সকল শিল্পকাজ স্কুলগুলিতে শেখানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে, সেদিকেই মনোযোগ দেওয়া উচিত।

বুনিয়াদী শিক্ষানীতির যেগুলি এখুনি অল্প আয়াসে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে প্রবর্ত্তন করা যায়, সেগুলির মধ্যে আরও কয়েকটি হলো স্কুল পরিচালনায় শিক্ষার্থীদের গণতন্ত্র, প্রদর্শনীর আয়োজন, সাফাই কাজ শিক্ষা, প্রার্থনানুষ্ঠান, শিক্ষার্থীদের দিনপঞ্জী রক্ষার শিক্ষা ইত্যাদি। এগুলির পরে আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সরকারী অর্থসাহায্যের বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট গ্রন্থাগার, বহির্পাঠ্য শিক্ষামূলক অভিযাত্রী, খেলাধুলার আয়োজন প্রভৃতি করা যেতে পারে।

অর্থাভাবে একেবারেই নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকার চেয়ে সামর্থ্যের অনুপাতে ধীরে ধীরে বুনিয়াদী স্কুলে রূপান্তরকরণের কাজ সুরু করাই যুক্তিসঙ্গত। বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার আদর্শকে রূপায়িত করার জন্য ভারতের মত দরিদ্র দেশের এছাড়া অন্য উপায় দৃষ্টিগোচর হয় না।

Q. 15. What are the sociological bases of Basic Education through work ?

Ans : মানুষ সামাজিক প্রাণী। মানুষের একটি সর্ব্বজনীন বৈশিষ্ট্য তার দলবদ্ধতা। সে চায় দল বেঁধে থাকতে, যে দল তাকে নিরাপত্তা দেবে এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সুযোগ পাবে। এবং এই সমষ্টিগত জীবনবৃত্তির জন্যই মানুষ আজ পূর্ণ বিকাশের পথে এত দ্রুতগামী।

শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সামাজিক নৈপুণ্য, অর্থাৎ মানুষের সার্থকতা সেইখানেই, যেখানে সে তার সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। গান্ধিজী তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষাধারার মধ্যে দিয়েই ভারত-বাসীকে তেমন ভাবেই গঠিত করতে চেয়েছিলেন, যাতে মানুষ এক অহিংস

সমাজব্যবস্থার পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে স্বচ্ছন্দে বিকশিত হতে শিখবে। সে সমাজ ব্যবস্থা হবে গণতান্ত্রিক এবং সেজন্যই সত্যকারের সহযোগিতার শিক্ষা প্রয়োজন প্রতিটি নাগরিকের জন্য। প্রত্যেক নাগরিককে বুঝতে হবে তাঁর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব কতখানি এবং কিভাবে তা প্রতিপালন করতে হবে। প্রত্যেক নাগরিককে গণতন্ত্রের সমস্যাগুলি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, যেমন পঞ্চায়েৎ, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতির কর্মপদ্ধতি সম্পর্কেও সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হতে হবে।

গান্ধিজীর উদ্দেশ্য ছিল শ্রেণীহীন বিভেদহীন সমাজ সৃষ্টি। এইজন্যই তিনি বুনিয়াদী শিক্ষাধারায় শিল্পের স্থান এত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন, কারণ তিনি মনে করতেন, শিল্পচর্চ্চার মাধ্যমে কায়িক শ্রমজীবি ও বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ দূর করা সম্ভব হবে। শিল্পচর্চ্চার এই সামাজিক উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে জাকির হুসেন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে: "সামাজিক দিক থেকে বিচার করলে রাষ্ট্রের সমস্ত শিশু যখন শিল্পচর্চ্চায় ব্যাপৃত হবে, তখন সমাজের কুসংস্কারগত বিভেদপ্রাচীর দূর হবে। শ্রমের প্রতি মর্য্যাদাবোধ ও মানবিক ঐক্যবোধের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হবে।"

স্কুল একটি ক্ষুদ্রায়তন সমাজই বলতে হবে। বৃহত্তর জীবনে সার্থক সফল জীবন যাপনের তালিম লাভের স্থান হলো এই স্কুল। শিশুর মনে সেজন্য অল্পবয়স থেকে স্বাভাবিক সুনিয়মবোধ জাগ্রত করার সহায়তা করতে হবে। এজন্য প্রতি বুনিয়াদী স্কুলে গণতান্ত্রিক সংস্থা সংগঠন ও পরিচালনার আবশ্যিক বিধি আছে। এই গণতান্ত্রিক বোধ জাগ্রত করার জন্য যে সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন, তার পক্ষে একান্ত সহায়ক এই শিল্পশিক্ষা।

গান্ধিজী ন্যায়, সত্য, প্রেম ও সহযোগিতার ভিত্তিতে শ্রমের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ও সাম্য রক্ষা করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সমাজে শ্রমের মর্য্যাদা যথাযথভাবে স্বীকৃত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রবর্ত্তিত শিক্ষাধারার মাধ্যমে তিনি নতুন আদর্শের নাগরিক সমাজ গঠিত করবার পরিকল্পনা করেছিলেন। যে শিক্ষা ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য বৃদ্ধি করে এবং সমাজের এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়ের গলগ্রহ করে তোলে, তেমন শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন গান্ধিজী। তাঁর শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য, স্বনির্ভর শ্রমশীল নাগরিক সমাজ গঠন এবং প্রতিটি নাগরিককে কোন না কোন কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। সমাজের প্রতিটি মানুষ যেন উপার্জ্জনক্ষম হয়ে সমাজকে দৃঢ় করতে পারে। এই সমাজকে গান্ধিজী "সর্ব্বোদয় সমাজ রূপে অভিহিত করেছেন। তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষাধারা এই জন্যই সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সমান মর্য্যাদায় সুখশান্তির পথে উন্নীত করতে চায়।

Q. 16. What are the economic bases of the Basic scheme of education ?

Ans : গান্ধিজী শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন অর্থ উপার্জ্জনক্ষম করতে চেয়েছিলেন, তার কারণ অনেকে খোঁজ করেন। ভারতবর্ষ নিতান্তই দরিদ্র দেশ। ১৯৩১ সালে এদেশের একজন লোকের বার্ষিক গড়পড়তা আয় ছিল মাত্র ৬২ টাকা। এতে অর্দ্ধাহারে জীবনযাপন চলতে পারত, কিন্তু উপযুক্ত বস্ত্র, আশ্রয় বা বিশ্রামের কোন অবকাশ থাকত না। দেশের অধিবাসীর আর্থিক অবস্থা যখন এতই শোচনীয়, তখন শিক্ষাবিষয়ে অর্থব্যয় তারা করতেই পারে না। অবশ্য, এটা রাষ্ট্রেরই কর্ত্তব্য—দেশের প্রতিটি শিশুকে অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ দেওয়া। কিন্তু গান্ধিজী জানতেন, রাষ্ট্র এবিষয়ে যথেষ্ট ইচ্ছুক নয় বা ইচ্ছুক হলেও উপযুক্ত অর্থ ব্যয়ে সক্ষম নয়। এইজন্যই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভারতের কোটি কোটি মানুষকে শিক্ষিত করতে হলে একটি স্বনির্ভর শিক্ষা পরিকল্পনাই একমাত্র উপায়। এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে স্বনির্ভর করতে হলে অর্থ উপার্জ্জনক্ষম শিল্পসৃষ্টির আয়োজনও শিক্ষার মধ্যে রাখতে হবে।

এই মূল নীতি অনুসারেই গান্ধিজী চেয়েছিলেন, ছেলেমেয়েদের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য তাদের শিক্ষা এমন একটি বৃত্তির মাধ্যমে দেওয়া উচিত যা অর্থ উপার্জ্জন করতে পারে। সেই বৃত্তি দুটি উদ্দেশ্য সাধন করবে—শিক্ষার্থীকে বৃত্তি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেবে এবং তার শিক্ষা ব্যয় নির্ব্বাহের উপযুক্ত অর্থও আহরণ করবে। অবশ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন, বা উপকরণাদির ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য শিক্ষার্থীর শ্রম উপার্জ্জিত অর্থ বিনিয়োগ বাঞ্ছনীয় নয়।

এই জন্যই গান্ধিজী দৃঢ়ভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, কোন শিল্পশিক্ষার মাধ্যমেই সকল অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের আয়োজন করতে হবে। পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিজ্ঞানীরাও কোন কর্ম্মপদ্ধতির মাধ্যমে যাবতীয় শিক্ষাদান ব্যবস্থার উপযোগিতা স্বীকার করেছেন। তবে গান্ধিজী এই নীতির আর এক স্তর উন্নত ভাবধারা প্রচার করে বলেছিলেন, সকল শিক্ষাই শিল্পের মাধ্যমে হবে। শিক্ষা-দর্শনের ইতিবৃত্তে এই নীতি এক নূতন অবদান সন্দেহ নেই। তাঁর মতে, এমন শিল্প শিক্ষা নির্ব্বাচন করতে হবে, যার একটা অর্থ নৈতিক মূল্য আছে, যার দ্বারা শিক্ষার্থীর শিক্ষাব্যয় পরিপূরিত হবে। গান্ধিজীর নীতি অনুসারে পুঁথিগত শিক্ষার একটি মাধ্যমরূপেই কেবল শিল্পচর্চ্চাকে স্থান দেওয়া হবে না; শিল্পশিক্ষাই হবে মূল লক্ষ্য। শিল্পকে এতখানি কেন্দ্রীয় মর্য্যাদা না দিলে শিল্পের অর্থ নৈতিক মূল্য হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা আছে। গ্রামের শিল্পগুলিকেই এজন্য অধিকতর মর্য্যাদা দেওয়া উচিত—যেমন,

তাঁত-বোনা, কৃষি, কাঠের কাজ ইত্যাদি। গান্ধিজীর অর্থনীতিতে কেন্দ্রায়িত শিল্প ব্যবস্থার কোন স্থান নেই।

গান্ধিজীর অর্থনীতিতে এমন সমাজ পরিকল্পিত হয়েছে, যেখানে কোনও মানুষ অন্য প্রতিবাসীকে ক্ষতিগ্রস্ত তো করবেই না, বরং প্রত্যক্ষভাবে সহায়তাই করবে। দেশের সমস্ত শিল্পব্যবস্থা বিকেন্দ্রায়িত থাকবে; কারণ ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সংস্থায় শিল্পী সমগ্র বিষয়টির সকল প্রকার সমস্যাকে ভালভাবে জানবার সুযোগ পায় এবং কাঁচামাল সংগ্রহ করা ও জনসাধারণের প্রকৃত চাহিদা জানার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। সকল সমস্যার সমাধানের জন্য তাকে গভীরভাবে চিন্তা করতে হয় বলে তার সমগ্র ব্যক্তিত্ব সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হওয়ার স্বাভাবিক সুযোগ লাভ করে। কেন্দ্রায়িত বৃহৎ শিল্পব্যবস্থায় শিল্পীর ব্যক্তিত্বের কোন মর্য্যাদা থাকে না; সে কেবল চাবি ঘোরায় এবং কাঁচামাল যন্ত্রে ভরে দেয় ও গুছিয়ে রাখে। এ ধরনের কাজে শিল্পীর ব্যক্তিগত উদ্দীপনা ক্রমশঃ জড়ত্বপ্রাপ্ত হয় এবং সমাজের অধিকাংশ মানুষ এই বৃহৎ শিল্পব্যবস্থার অন্তর্গত হলে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাই জড়ত্বপ্রাপ্ত হয়ে সর্ব্বনাশা পরিস্থিতির উদ্ভব করে। এইজন্য বুনিয়াদী শিক্ষায় যে বিকেন্দ্রায়িত শিল্প শিক্ষার পরিকল্পনা আছে, তা সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার সহায়ক।

এছাড়া গান্ধিজী উপলব্ধি করেছিলেন যে, সকল শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য্য অঙ্গ হওয়া উচিত কায়িক শ্রম অনুশীলন। বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় এমন কায়িক শ্রমের আয়োজন রাখা হয়েছে, যা হবে স্বনির্ভরশীলতার মূল উপাদান। এই স্বনির্ভরতা দুদিক দিয়ে মূল্যবান—এক, শিক্ষার্থী কায়িক শ্রমের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের ফলে সমাজে স্বনির্ভর জীবন যাপনের অনুপ্রেরণা পাবে; দুই, শিক্ষার্থী শিক্ষাকালে উপার্জ্জনক্ষম শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর করে তুলবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে শিল্পশিক্ষার প্রাধান্য থাকার ফলে বেকার সমস্যার অনেকাংশে সুরাহা হবে। শিক্ষার্থীকে গোড়া থেকেই সর্ব্বাঙ্গীনভাবে উপার্জ্জনক্ষম করে তোলা হবে। স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই তারা উপার্জ্জন সুরু করে স্বনির্ভর হতে পারবে।

বুনিয়াদী শিক্ষা স্বনির্ভর হবে আর একটি বিষয়ে—শিক্ষার্থীদের তৈরী শিল্পদ্রব্য থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারাই শিক্ষকের বেতন দেওয়া যাবে। অবশ্য, স্কুলভবন, আসবাবপত্র, বই এবং অন্যান্য উপকরণাদির ব্যয়ভার রাষ্ট্রই বহন করবেন।

অবশ্য বুনিয়াদী শিক্ষার এই স্বনির্ভরতার নীতি নানাকারণে বিরূপ সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে মনে করেন, এই নূতন

শিক্ষাব্যবস্থার ফলে স্কুলগুলি এক একটি কুটির শিল্পের কেন্দ্রই হয়ে উঠবে। শিক্ষককে শিক্ষার্থীর শিল্পসৃষ্টির উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করে থাকতে হবে এবং শিক্ষকের বেতনবৃদ্ধির সময়ে শিক্ষার্থীদের শোষণের আশঙ্কা থাকবে। তাছাড়া মনস্তত্ত্বের দিক থেকেও এটি অবাঞ্ছনীয় যে, শিক্ষার্থী সর্ব্বদা সচেতন থাকবে যে, তারই উপার্জ্জনে শিক্ষক প্রতিপালিত হচ্ছেন, অথবা শিক্ষক ভাববেন, শিক্ষার্থীর শিল্পসৃষ্টিই তাঁর অর্থাগমের উপায়।

এছাড়া আর একটি সমালোচনা হল এই যে, প্রকৃতপক্ষে অনভিজ্ঞ শিক্ষার্থীর হাতে শিল্পসৃষ্টির সময়ে লাভের চেয়ে লোকসানই হবে বেশি। শিক্ষার্থীর অদক্ষ শিল্পসৃষ্টি বাজারে সুদক্ষ শিল্পসম্ভারের সাথে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারবে না।

IV

CURRICULUM & CO-CURRICULAR ACTIVITIES

[Traditional curriculum—criticism of the existing school curriculum—subject curriculum and experience curriculum—need of unified curriculum.]

Q. 1. State the principles on which a curriculum should be framed.

Ans : যে কোন শিক্ষানীতি বা দর্শন সার্থক রূপ লাভ করে পাঠক্রমের মাধ্যমে। পাঠক্রম হলো শিক্ষা দর্শনের অগ্রগতির পথ, তবে লক্ষ্য নয়। পাঠক্রম নির্দ্ধারণের মূল নীতি হলো এই যে, শিক্ষার্থী যে সকল অভিজ্ঞতা সম্পদে সজ্জিত হলে জীবনসংগ্রামে সফল হতে পারবে, সেগুলির ব্যবস্থা থাকবে। অবশ্য এই অভিজ্ঞতার সম্পদ সম্পর্কে মান নির্দ্ধারিত হয়ে বয়স্ক ব্যক্তিদের বিবেচনা অনুসারে। অর্থাৎ বয়স্ক ব্যক্তিরা মনে করেন, তাঁরা ভবিষ্যতের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সম্পদে সুসজ্জিত এবং তাঁদের ধারণা অনুসারেই শিশুর পাঠক্রম সাধারণতঃ পরিকল্পিত হয়ে থাকে। বয়স্ক ব্যক্তিদের যে সকল অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক বলে তাঁরা মনে করেন, শিশু যে সকল বিষয়ে দক্ষ হওয়া উচিত বলে বয়স্ক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মনে হয়, সেগুলিই শিশু-শিক্ষার্থীর পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়। প্রাচীনকালে মানবজীবন ছিল সরল, সহজ। সেজন্য কেবলমাত্র গ্রন্থপাঠের শিক্ষাই যথেষ্ট ছিল। ক্রমে সমাজজীবন যত জটিল হয়েছে, ততই পাঠের সঙ্গে লেখা ও গণিত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা গেছে।

কিন্তু বর্ত্তমান সমাজ জীবনে অভিজ্ঞতার সম্পদে সজ্জিত হতে হলে কেবলমাত্র পঠন, লিখন, গণিত জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। শিশুকে তার ভবিষ্যতের সকল সম্ভাব্য প্রয়োজনের উপযোগী করে গড়ে ওঠায় সহায়তা করতে হবে। সেইজন্য পাঠ্যতালিকায় একটির পর একটি বিষয় সংযোজিত হয়ে চলেছে। শুধু তাই নয়, পাঠ্যতালিকার বহির্ভূত বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতালাভের জন্য বহির্পাঠ্য বিষয়ও উদ্ভাবিত হয়েছে।

এইরূপ ক্রমান্বয়ী পাঠ্যবিষয় সংযোজনের ফলে বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পাঠক্রম স্বভাবতঃই হয়ে পড়েছে গুরুভার। এজন্য এখন শিক্ষাবিদ্‌গণ চিন্তা করছেন, অল্প প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে পাঠক্রম থেকে হ্রাস করে অন্যভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যায় কিনা। তবে অনেকে আবার পাঠক্রম লঘু করার বিরোধিতা করে বলেন যে, মানুষের চিন্তাশক্তি যতই পরিশীলিত হবে, ততই তা' তীক্ষ্ণতর হতে থাকবে এবং মানব সভ্যতার সাফল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এই যুক্তির ভিত্তি অবশ্য মনোবিজ্ঞানের বিবৃতিবাদ (ফ্যাকাল্টি থিওরী)-এর

উপর। যদিও বহু পাঠ্যবিষয় আজ শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নয়, তবুও মননশক্তির পরিশীলনের যুক্তিতে সেগুলি আজও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উপরিউক্ত অভিজ্ঞতার সম্পদ সংগ্রহ নীতি ও মননশক্তি পরিশীলনের নীতি দুটির উপরেই ভিত্তি করে প্রচলিত পাঠক্রম নির্দ্ধারণ নীতি প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

প্রচলিত পাঠক্রমে এই কারণেই কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট বিষয়-সমষ্টি নির্দ্ধারিত থাকে এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য কিছু কিছু অধ্যয়নকাল বরাদ্দ থাকে। অর্থাৎ কোন একটি বিষয় শিশুকে স্কুলের কোন্ শ্রেণী থেকে কোন্ শ্রেণী পর্য্যন্ত কতখানি অনুশীলন করতে হবে, তা পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত থাকে। শিক্ষকদের নির্দ্দেশ দেওয়া হয় ঐ পাঠ্যবিষয়গুলি সম্পূর্ণরূপে অধ্যাপনার জন্য; কিভাবে অধ্যাপনা হবে, সেটি পরবর্তী সমস্যা। শিক্ষকরা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পাঠক্রম সম্পূর্ণরূপে অধ্যাপনার সহজ ও নিয়মতান্ত্রিক উপায় হিসাবে শিক্ষার্থীদের নির্দ্দেশ দিয়ে থাকেন পাঠ্য বিষয়বস্তুগুলি পাঠ্যপুস্তক থেকে মুখস্থ করার জন্যে; অথবা পাঠ্যবিষয়গুলিকে বিভিন্ন অংশে খণ্ড বিখণ্ড করে বার বার অনুশীলন করার নির্দ্দেশ দিয়ে থাকেন। যে সকল বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে শিশু শিক্ষার্থী তার প্রত্যক্ষ জীবনে কোনও কাজে লাগাতে পারে না, সেগুলিকেই অনুশীলন করার নির্দ্দেশ দিতে শিক্ষক একরূপ বাধ্য হন। পাঠক্রম শিক্ষার্থীর উপর চাপানো হয়।

শিক্ষাদর্শনগুলির মধ্যে প্রকৃতিবাদ (নেচার্যালিজ্‌ম), আদর্শবাদ (আইডিয়ালিজ্‌ম) এবং প্রয়োগবাদ (প্র্যাগম্যাটিজ্‌ম)-এ স্বীকৃত হয়েছে যে, শিশুকে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সম্পদ সরবরাহ করার জন্যই স্কুল এবং স্কুলের পাঠক্রম।

প্রকৃতিবাদী শিক্ষাবিদ্‌গণ বিশ্বাস করেন যে, স্কুলের শিক্ষাধারা এমন হওয়া উচিত যাতে শিক্ষার্থীর বর্ত্তমান অভিজ্ঞতা, আগ্রহ, অনুরাগ ও কর্ম্মপ্রেরণার পরিপোষক হতে পারে। বয়স্ক ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ, বাধা ও ভীতিপ্রদর্শন একেবারেই চলবে না। তবে কার্য্যক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদী শিক্ষানীতির সঙ্গে প্রয়োগবাদী শিক্ষানীতির সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়োজন হয় এবং যে বিষয়টি শিশু শিক্ষার্থীদের জীবনে প্রয়োগের উপযোগী, সেই বিষয়টিকেই প্রকৃতিবাদ অনুযায়ী পাঠক্রমভুক্ত করা হয়। হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে জীবনরক্ষাই শিক্ষার উদ্দেশ্য; অতএব পাঠক্রমে এমন বিষয় থাকা উচিত যা শিশুকে জীবনরক্ষার মূল তথ্যগুলি সম্পর্কে সচেতন করতে পারবে। এই দিক থেকে বিচার করলে সংস্কৃতিমূলক বিষয়গুলি স্কুলের পাঠক্রমভুক্ত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।

রুশো যে শিক্ষানীতি প্রচার করেন, সেই অনুসারে শিক্ষার্থীর পাঠক্রমে প্রথমেই শারীরশিক্ষার আয়োজন থাকা কর্ত্তব্য। যে কোন শিক্ষাদানের পূর্ব্বে শিশুর শরীর ও মন সুস্থ ও সবল হওয়া একান্ত আবশ্যক। শরীর

সুগঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর সর্ব্বপ্রকার সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে। শিশুকে সর্ব্বপ্রকারে স্বাধীনতা দিতে হবে এবং তাকে পুঁথিগত বিদ্যার বন্ধনে জড়িত করা হবে না। রুশোর শিক্ষানীতি অনুসারে শিশু প্রথমে শরীর গঠন করবে, পরে সংবেদনমূলক প্রত্যঙ্গগুলি পরিশীলন করবে। এরপর বিজ্ঞান, ভাষা, গণিত ও কায়িক শ্রমশিক্ষা দেওয়া হবে। সবশেষে নীতিশিক্ষা দেওয়া হবে। নীতিশিক্ষার সঙ্গে ইতিহাস, ভূগোল, যৌনশিক্ষা, কলাবিদ্যা প্রভৃতিও আলোচিত হবে।

আদর্শবাদী শিক্ষানীতিতে মানুষের মননরাজ্য ও আদর্শজগতের রূপায়ণের চেষ্টা করা হয়ে থাকে। আদর্শবাদী পাঠক্রমে সমগ্র মানবজাতির অভিজ্ঞতর প্রতিফলনের প্রয়াস থাকে। মানবজাতির অভিজ্ঞতা দ্বিমুখী : পরিবেশের সঙ্গে অভিজ্ঞতা এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে অভিজ্ঞতা। এইজন্য পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে জ্ঞানবিদ্যা শিক্ষাও প্রয়োজন।

প্লেটো বিশ্বাস করতেন যে, জীবনের সর্ব্বোচ্চ নীতি হল সর্ব্বোত্তম বা ঈশ্বরকে লাভ করা। সুতরাং যা কিছু উত্তম, সবই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই উচিত। শিক্ষার্থীর মনে সর্ব্বোত্তম ভাবধারার সৃষ্টি করাই আদর্শবাদী পাঠক্রমের লক্ষ্য হবে। প্লেটোর মতে মানবজীবনে তিনটি আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ অপরিহার্য্য ; সে তিনটি হলো—সত্য, সৌন্দর্য্য এবং উৎকর্ষ। এই তিনটি মূল্যবোধ থেকেই তিন শ্রেণীর মানুষ সমাজে গড়ে ওঠে—বুদ্ধিজীবি, কলাজীবি এবং নীতিজ্ঞ। এই সকল বিভিন্ন মূল্যবোধের জন্য বিভিন্ন পাঠ্য-বিষয় নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে এবং তাই-ই হল পাঠক্রম।

শিক্ষাবিদ্ রস্ বলেছেন, শিক্ষানীতি অবশ্যই ধর্ম্মমূলক, মননশীল এবং কলাশ্রয়ী হওয়া উচিত। সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্ব গঠিত করতে হলে এই তিনটি নীতির একটিকেও বাদ দেওয়া চলবে না। পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য যে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন প্রয়োজন, তার জন্য শারীরচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস, ভূগোল, কলাবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, ভাষাশিক্ষা, ধর্ম্মালোচনা, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিষয়ও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

প্রকৃতিবাদী শিক্ষাবিদ্গণ যেমন শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী, আদর্শবাদী শিক্ষাবিদ্রা তেমনই শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ সুনিয়মাধীন কর্ম্মপদ্ধতির সমর্থক। আদর্শবাদীরা মনে করেন সুনিয়ম (ডিসিপ্লিন) প্রতিপালন ভিন্ন শিক্ষার্থী আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে পারবে না। কেবলমাত্র কঠোর সুনিয়মের মাধ্যমেই শিক্ষার্থী জীবনের উচ্চতম মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। শিক্ষক এই সকল মূল্যবোধ শিক্ষার্থীর সম্মুখে উপস্থাপিত করবেন এবং শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত পথ প্রদর্শন করবেন। এ সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে সে বিপথগামী হবে। তবে সুনিয়মের নামে শিক্ষার্থীকে

অযথা পীড়নেরও সমর্থক ন'ন আদর্শবাদীরা, কারণ তার ফলে শিক্ষার্থীর স্বতঃপ্রণোদিত কর্ম্মপ্রচেষ্টা ব্যাহত হবে। শিক্ষাবিদ ফ্রোবেল এইজন্যই সকল প্রকার শারীরিক পীড়নের বিরোধিতা করেছেন। যুক্তিশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে সুনিয়মবোধ ও স্বাধীনতার যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে পাঠক্রমের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতি চর্চ্চার আয়োজন থাকাও এজন্য বাঞ্ছনীয়।

প্রয়োগবাদী শিক্ষানীতির মূল কথা হলো সকল শিক্ষার প্রয়োগমূলক উপযোগিতা থাকা চাই এবং পাঠক্রম প্রণয়নের সময় এই নীতিই স্মরণে রাখতে হবে। স্কুলে যে সকল অভিজ্ঞতা সম্পদ শিক্ষার্থীকে দেওয়া হবে, তা যেন কাজে লাগে। শিশুর বর্তমান ও ভবিষ্যত জীবনে যা কাজে লাগবে, এমন সব বিষয় নিয়েই তার পাঠক্রম প্রণীত হবে। বালকদের জন্য ভাষাশিক্ষা, স্বাস্থ্যবিদ্যা, গণিতচর্চা, ইতিহাস ও ভূগোল অধ্যয়ন, শারীরশিক্ষা, বিজ্ঞানচর্চা, কৃষিবিদ্যার আয়োজন থাকা দরকার এবং বালিকাদের জন্য প্রয়োজন গৃহবিজ্ঞান। পাঠক্রমে কিছু কিছু বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থাও থাকা উচিত।

প্রয়োগবাদী শিক্ষানীতি অনুসারে পাঠক্রম প্রণয়নের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, শিশুর বিকাশের বিভিন্ন পর্য্যায়ে তার স্বাভাবিক আগ্রহ ও অনুরাগের পরিপূরক যে সকল বিষয়, সেগুলিই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শিশুর নিজস্ব অভিজ্ঞতা, তার স্বচ্ছন্দ কর্ম্মপ্রণালীর ভিত্তিতেই পাঠক্রমের বুনিয়াদী স্থাপিত থাকবে। পাঠক্রমের মাধ্যমে শিশুকে যে সকল কাজ করতে হবে, তা যেন সমাজায়িত ও উদ্দেশ্যসাধক হয়, শিশু যেন স্বাধীন সমাজ জীবন যাপনের উপযুক্ত হতে পারে।

প্রয়োগবাদী পাঠক্রমের আর একটি লক্ষ্য হলো এই যে, সকল পাঠ্য-বিষয়কে একটি সর্ব্বাঙ্গীণ ঐক্যবদ্ধ বিষয়রূপে শিক্ষার্থীর সমক্ষে উপস্থাপিত করা। পাঠ্যবিষয়গুলিকে পৃথক পৃথক অধীতব্য বিষয়রূপে গণ্য করা হবে না। একটি উদ্দেশ্যসাধক অর্থপূর্ণ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথস্বরূপ সকল কর্ম্ম পদ্ধতিতে সুসমন্বিত করার প্রচেষ্টা আছে এই প্রয়োগবাদী নীতিতে।

আধুনিক শিক্ষাজগতে পাঠক্রম প্রণয়নের সময় এই সকল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নীতিগুলিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে এবং এইগুলির পরিপ্রেক্ষিতেই পুরাতন রীতির পাঠক্রম সংস্কারের প্রচেষ্টা চলেছে।

Q. 2. What are the drawbacks of the existing school curriculum ?

Ans. ভারতে স্কুল-পাঠক্রমের ত্রুটি সম্পর্কে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন নিম্নরূপ মন্তব্য করেন :

১। বর্ত্তমান পাঠক্রম সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির প্রতিফলক।

২। এই পাঠক্রম পুঁথিকেন্দ্রিক এবং অবাস্তব।

৩। এই পাঠক্রম গুরুভারগ্রস্ত কিন্তু মূল্যবান উপাদান এতে অল্পই আছে।

৪। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী কর্ম্মসূচীর ব্যবস্থা এই পাঠক্রমে নেই।

৫। তরুণ মনের আকাঙ্ক্ষা ও সামর্থ্যের উপযোগী কর্ম্মসূচীর অভাব আছে এই পাঠক্রমে।

৬। এই পাঠক্রমে পরীক্ষার প্রাধান্য অত্যধিক।

৭। এই পাঠক্রমে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার যথেষ্ট আয়োজন রাখা হয়নি।

বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পাঠক্রমকে সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির পরিচায়ক বলতে হচ্ছে এই জন্য যে কলেজের প্রবেশাধিকার দানের পূর্ব্বে পরীক্ষাগ্রহণের উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলার জন্যই পাঠক্রমের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এণ্ট্রান্স, ম্যাট্রিকুলেশন, স্কুল ফাইনাল ও স্কুল-লীভিং সার্টিফিকেট পরীক্ষার বর্ত্তমান মূল উদ্দেশ্যই শিক্ষার্থীকে উচ্চতর শিক্ষার প্রবেশাধিকার দান করা। ফলে হাইস্কুলের পাঠক্রম যেন বিশ্ববিদ্যালয় পাঠক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্যই প্রণয়ন করা হয়েছে বলে মনে হয়। চাকুরী ক্ষেত্রেও প্রবেশাধিকারের জন্য আজকাল অধিকাংশ স্থলেই স্কুল ফাইনাল পর্য্যায়ের পরীক্ষাকে তোরণদ্বাররূপে গণ্য করা হচ্ছে।

এছাড়া পাঠক্রম যে অহেতুক পুঁথিভারাক্রান্ত সে বিষয়ে আজ কোন মত ভেদ নেই। হাইস্কুল পর্য্যায়ে শিক্ষাব্যস্থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ভাবকেন্দ্রিক ও গুরুভারগ্রস্ত করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। গভীর ভাবকেন্দ্রিক চিন্তা ধারাকে হৃদয়ঙ্গম করার মতো চিন্তার পরিণতি ও বিকাশ স্কুলের শিক্ষার্থীদের হয় না। তাদের জন্য পৃথকভাবে পৃথক উদ্দেশ্যে পাঠক্রম রচিত হওয়া উচিত।

তা ছাড়া, এদেশের সকল শিক্ষার্থীই উচ্চস্তর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জন্য আগ্রহান্বিত ও উপযুক্ত মনোভঙ্গিসম্পন্ন নয়। স্কুলের শিক্ষার্থী মাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে যাবে, তা ও নয়।

বর্ত্তমান পাঠক্রমে হাতেকলমে কাজ করার এবং অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের অবকাশ প্রায় নেই বললেই চলে। সমাজ জীবন কিভাবে সংগঠিত হয়েছে এবং কি ভাবে এই জটিল মানবসমাজে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হয়, তা উপযুক্ত ভাবে শিক্ষার্থীর হৃদয়ঙ্গম করতে হলে তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা বেশি করে করতে হবে।

বর্ত্তমানে পাঠক্রমে অতিরিক্ত তত্ত্ব ও তথ্যের বিশদ বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করে গুরুভার করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। পাঠক্রম প্রণেতারা আপন আপন

পাণ্ডিত্যের হিসাবে বালক বালিকাদের পাঠ্যবস্তুকে স্ব স্ব মনোমত বিষয় দ্বারা পূর্ণ করে থাকেন এবং শিশুর আগ্রহ-অনুরাগ ও বিকাশ সম্পর্কে কোনরূপ সহৃদয়তা পোষণের প্রয়োজন বোধ করেন না।

তরুণ বয়সে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত রুচি, আগ্রহ এবং বিশেষ কতকগুলি সামর্থ্য বহুমুখী হয়ে পড়ে। কিন্তু বর্ত্তমান পাঠক্রম এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত বৈষম্যের যথোপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষা করে না। পাঠক্রম এমন হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে তরুণ শিক্ষার্থীদের বহুমুখী সামর্থ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের সহায়ক হতে পারে।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্য্যায়ে যে ধরণের শিক্ষাধারা প্রচলিত রয়েছে, তাতে পরীক্ষার অত্যধিক প্রাধান্য নিদারুণ ক্ষতিসাধন করছে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকমণ্ডলী পরীক্ষা ব্যবস্থাকে লক্ষ্য করে সমগ্র শিক্ষাধারাকে অনুসরণ করেন বলে প্রত্যহ সকলেই শিক্ষার নীরস পরিবেশের মধ্যে কাজ করে চলেছেন। পরীক্ষামুখী এই ব্যর্থ শিক্ষাধারার পেষণে শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক পাঠগ্রহণের সদভ্যাস জাগ্রত হওয়ার সুযোগ পায় না এবং বহু অসৎ উপায়ে পরীক্ষায় সফল হওয়ার কৌশল আয়ত্ত করে। অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী পরীক্ষায় সফল হলে শিক্ষকের দক্ষতা প্রমাণিত হয় বলে শিক্ষক মহলেও বহু দুর্নীতি সৃষ্টি হয়েছে। ত্রুটিপূর্ণ পাঠক্রম এই ব্যাপক অবস্থার জন্য বহুলাংশে দায়ী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ আজ নেই। শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই আজকাল মূল পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন না করে শিক্ষকদের প্রণীত সংক্ষিপ্ত সার, অতি প্রয়োজনীয় পরীক্ষার সম্ভাব্য বিষয়গুলিই কণ্ঠস্থ করার প্রয়াস পেয়ে থাকে।

গুরুভারগ্রস্ত পাঠক্রম এবং নির্ম্মম পরীক্ষাব্যবস্থার ফলে শিক্ষার্থীদের শারীরিক স্বাস্থ্যেরও ব্যাপক অবনতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। অহেতুক প্রতিযোগিতা ও না। বুঝে কণ্ঠস্থ করার প্রবৃত্তির ফলে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে; অধিকাংশই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইদানীং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতার মনোবৃত্তি মৃতপ্রায় এবং বিফল পরীক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার বৃদ্ধি আশঙ্কাজনক।

বর্ত্তমানে তরুণ বয়সের শিক্ষার্থীদের বহুমুখী আগ্রহের পরিপোষক পাঠক্রমের মাধ্যমে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নিতান্তই অল্প। দেশের শিল্পবাণিজ্যের অগ্রগতির সঙ্গে এই সকল বিশেষ শিক্ষার যথোপযুক্ত আয়োজন না থাকার ফলে বহু শিক্ষিত তরুণ বেকার জীবন যাপন করে উচ্ছৃঙ্খল আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। কর্ম্মঠ তরুণদের উপযুক্ত কর্ম্মে ব্যাপৃত রাখতে না পারলে সমাজে বিশৃঙ্খলা অপ্রতিরোধ্য। শুধু তাই নয়, কর্ম্মঠ তরুণ সমাজকে উপযুক্ত কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় আগ্রহী ও

সুদক্ষ করে তুলতে না পারলে জাতীয় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলিও সফল হতে পারে না।

Q. 3. Discuss how the Secondary Education Commission viewed the problems of curriculum construction.

Ans. এদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন পাঠক্রম প্রণয়নের সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত নীতিগুলি সুপারিশ করেন :

১। সম্যক্ অভিজ্ঞতা :—আধুনিক জগতের বিবিধ শিক্ষনীয় বিষয় যথাযথভাবে পাঠক্রমে স্থান দেওয়া এক দুরূহ সমস্যা, সন্দেহ নেই ; কিন্তু প্রতিটি বিষয়কে অল্প অল্প পরিমাণে শিক্ষাদানের আয়োজন করতে পারলেই কর্ত্তব্য সমাধা হয় না। যেহেতু শিক্ষা বলতে সম্যক্ অভিজ্ঞতা অর্জ্জনই বোঝায়, সেজন্য শিক্ষার্থী যাতে সকল প্রয়োজনীয় শিক্ষনীয় বিষয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে স্কুলে, ক্লাশে, ল্যাবরেটরীতে, খেলার মাঠে এবং বহু প্রকার পাঠ্য ও বহির্পাঠ্য-কর্ম্মসূচীর সহায়তায় আয়ত্ত করতে পারে, সেদিকে অধিকতর দৃষ্টিদান প্রয়োজন।

২। বৈচিত্র্য :—পাঠক্রমকে কঠিন নিয়মে আবদ্ধ না রেখে যথাসম্ভব বৈচিত্র্য ও প্রয়োজনীয় নূতন নূতন পরিবর্ত্তনের মাধ্যমে সর্ব্বদা চিত্তাকর্ষক শিক্ষা সূচীর সহায়ক করে তুলতে হবে এবং সেরকম আয়োজন ও সুযোগ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে থাকা খুবই দরকার। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিবৈষম্যের দরুণ যেন কোনরূপ অসুবিধার সম্মুখীন না হয়, সেজন্য সকল প্রকার শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুসারে পাঠক্রমে শিক্ষাসূচীর আয়োজন থাকা চাই। কোন কোন ক্ষেত্রে কৃত্রিম ডিসিপ্লিনের স্বার্থে বহুমুখী আগ্রহশীল শিক্ষার্থীদের একটি মাত্র নির্দ্দিষ্ট শিক্ষাসূচী অনুসরণ করতে বাধ্য করা হয়। নিঃসন্দেহে এই ধরণের প্রচেষ্টা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। যে শিক্ষাসূচী অনুসরণে শিক্ষার্থী অক্ষম বা অনিচ্ছুক তা অনুসরণে বাধ্য করা হলে পরিণামে যে ব্যর্থতা আসে, শিক্ষার্থী ও সমাজের পক্ষে সেটি অত্যন্ত ক্ষতিকর। অবশ্য এই বাস্তব জগতের যে সকল সাধারণ বিষয়গুলি সকলকেই জানতে হবে, সেগুলি গুণাগুণ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই যাতে সানন্দে শিক্ষালাভ করতে পারে, সেদিকেও পাঠক্রম প্রণয়নকারীর দৃষ্টি দিতে হবে।

৩। সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক :—শিক্ষাশাস্ত্রের উন্নতি ও প্রসঙ্গের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে যে, গতিষ্ণু (ডাইনামিক) সমাজের সঙ্গে নিয়ত সামঞ্জস্য ও পরিবর্ত্তন রক্ষা করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঠক্রম প্রণীত হয় নি। অর্থাৎ পাঠক্রম রচয়িতারা একটি নির্দ্দিষ্ট অনড় আদর্শের অনুপ্রেরণায় স্থিরসঙ্কল্প মনোভাব নিয়ে যে সব পাঠক্রম প্রণয়ন করেছেন, দেখা গেছে, ইতিমধ্যে সমাজের রীতিনীতি ও প্রয়োজনের ধারা বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ায় এবং

সদাসর্ব্বদা পরিবর্ত্তন চলতে থাকায়, সেই স্থির আদর্শ অনুসৃত পাঠক্রম থেকে শিক্ষার্থীরা কোন রকম অর্থপূর্ণ উপকার গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে না। এই ত্রুটির একটি মূল কারণ হল, পাঠক্রম রচয়িতারা আদর্শের দিকে স্থিরনিবদ্ধ দৃষ্টি রাখায় সমাজের ক্রমগতিষ্ণু জীবনধারাকে অবহেলা করে থাকেন। শতবর্ষ পূর্ব্বে সমাজের যে দাবী ছিল, এখন তা এমন ব্যাপকভাবে পরিবর্ত্তিত রূপ ধারণ করে চলেছে যে, পাঠক্রম যে দাবী পূরণ করতে পারছে না।

এই সমস্যার সমাধান করতে হলে পাঠক্রম রচয়িতাদের আদর্শ ও বাস্তব উভয়ের সুনিপুণ সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে। সমাজের মূলে যে সকল চিরন্তন আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকা দরকার সেগুলির পরিপোষণের সুব্যবস্থা যেমন থাকবে পাঠক্রমে, তেমনি থাকা দরকার গতিষ্ণু সমাজের অর্থ নৈতিক, সামাজিক, ব্যবহারিক, রাজনৈতিক এবং বিবিধ নিত্যনূতন সমস্যার প্রতি শিক্ষার্থীর সচেতনতা জাগ্রত করার সবল প্রয়াস। পাঠক্রম যখন এমনই গতিষ্ণু হতে পারবে, তখনই সমাজের প্রতিটি জন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সত্যিকারের প্রয়োজনীয় সংস্থা বলে মর্য্যাদা দেবে।

৪। অবসর যাপনের সদভ্যাস :—স্কুলের সময়ের পরে বালক-বালিকারা যেভাবে অবসর যাপন করবে, তার প্রভাব অবশ্যই অনেকাংশে প্রতিফলিত হয়ে থাকে তাদের সমগ্র ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপর। এজন্য উৎকৃষ্ট পাঠক্রম প্রণয়নের সময় এ কথাও অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, বালক-বালিকারা যেন পাঠক্রমের বিষয়বস্তুতে এমন বিবিধ আকর্ষণীয় কাজকর্ম্মের সন্ধান পায়, যা তার অবসর সময়ের স্বাস্থ্যকর উপাদান হয়ে উঠতে পারে। পাঠক্রম প্রণয়নের এই সমস্যাটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বলেন যে, একটি উৎকৃষ্ট পাঠক্রম শিক্ষার্থীর সামগ্রিক জীবনকে সুস্থ ও সার্থক করে তোলার জন্য সকল প্রকার স্বাস্থ্যকর কর্ম্মসূচীর সাথে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটিয়ে দিতে প্রয়াসী হবে। শিক্ষার্থীর বিকশমান বহুমুখী অনুরাগ ও আগ্রহের যথাযথ পরিপোষণের যথাসম্ভব ব্যাপকতর আয়োজন থাকবে যে পাঠক্রমে, সেই পাঠক্রমই উৎকৃষ্ট বলে গ্রহণ করতে হবে। এই ধরণের পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে অর্থপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক হয় এবং পুঁথিগত জ্ঞানার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সকলপ্রকার বহির্পাঠ্য বৃত্তিগুলিও উন্মেষ লাভ করে।

৫। পাঠ্যবিষয়গুলির পারস্পরিক সম্পর্ক : পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি যে এক সামগ্রিক অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানভাণ্ডারের সারমর্ম্ম, একথা শিক্ষার্থীদের হৃদয়ঙ্গম করানো পাঠক্রম প্রণয়নের আর এক দুরূহ সমস্যা। স্কুলের কার্য্যসূচী পরিচালনার সুবিধার জন্য শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে কয়েকটি পাঠ্যবিষয়ে বিভক্ত করা হয়েছে, কিন্তু বিষয়বস্তুর অখণ্ডতা রক্ষার বিশেষ কোন আয়োজন করা হয়নি। এই সমস্যার প্রতিকার করতে হলে

বিষয়বস্তুকে কয়েকটি ব্যাপক ভিত্তিতে নূতনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে এবং শিক্ষকমণ্ডলীকে সর্ব্বদা পাঠক্রমের এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের সম্পর্ক শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে হবে। অবশ্য শিক্ষকের এই কাজকে সুপরিকল্পিত করার উদ্দেশ্যে মূল পাঠক্রমেই এমনভাবে পাঠ্যবিষয় বিন্যাস করতে হবে, যাতে শিক্ষকের কাজ সহজসাধ্য হয়। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রতিটি পাঠ্যবস্তুর প্রত্যক্ষ অনুবন্ধ সাধনের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠক্রম রচনা করলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভবতঃ অনেকাংশে সহজ হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের এই সকল মন্তব্য সত্যই অনুধাবনযোগ্য এবং নিষ্ঠার সঙ্গে এই সকল বিষয়ে যত্নবান হলে শিক্ষার্থীদের জন্য উৎকৃষ্ট পাঠক্রম রচনা সম্ভব হতে পারে।

Q. 4. By what criteria the teacher must be guided in the choice of materials for curriculum construction ?

Ans. একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, পাঠক্রমে কোন্ কোন্ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে, তা নির্দ্ধারণ করা যথেষ্ট কঠিন। এজন্য শিক্ষক বা পাঠক্রম প্রণেতাকে কতকগুলি নীতি অনুসরণ করতে হবে।

১। পাঠক্রম প্রণেতাকে প্রথমেই শিশু-শিক্ষার্থীর প্রকৃতি ও মন সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবহিত হতে হবে। কিভাবে শিশুমন স্বাভাবিকভাবে বিকাশ লাভ করে, তা অনুধাবন না করতে পারলে পাঠক্রম ও শিক্ষা 'শিশু-কেন্দ্রিক' হতে পারে না। শিশুর স্বাভাবিক অনুরাগ ও প্রবৃত্তিগুলির স্বাস্থ্যকর বিকাশের দিকে সযত্ন দৃষ্টি রেখেই পাঠক্রম রচনা করতে হবে।

২। সমাজের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনগুলি সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে। কি ধরণের বৃত্তি সমাজে প্রয়োজন, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে কি ধরণের পেশা অধিকতর উগযোগী প্রভৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন না হলে উৎকৃষ্ট পাঠক্রম প্রণয়ন প্রায় অসম্ভব। পাঠক্রমের কোন অংশে কি ধরণের বৈচিত্র্য থাকা দরকার, তা' নির্ভর করে গ্রাম ও শহরের প্রয়োজন, উন্নত ও স্বল্পোন্নত সম্প্রদায়ের প্রয়োজন, বালক ও বালিকাদের প্রয়োজন এবং কৃষিজীবী ও শিল্পজীবী সম্প্রদায়ের প্রয়োজনের ভিত্তিতে। অর্থাৎ পাঠক্রমের বিশদ পরিকল্পনা করার সময়ে রচয়িতাকে অবশ্যই সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও পরিবেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনের কথা স্পষ্টভাবে স্মরণ রাখতে হবে।

৩। জাতির শিক্ষার আদর্শ, মানব ধর্ম্মের ধারণা এবং স্কুলে কি ধরণের নাগরিক গঠন করা প্রয়োজন, তার উপরেও নির্ভর করে পাঠক্রম প্রণয়নের নীতি। প্রতিটি নাগরিক যাতে কর্ম্মঠ, সহযোগিতাপূর্ণ, অধ্যবসায়ী, সমাজ-বোধসম্পন্ন এবং প্রীতিপূর্ণ হয়ে নিজ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্যজনের

বিকাশের সহায়ক হতে পারে, তেমন সুসমঞ্জস শিক্ষার আয়োজন সম্ভব করার জন্য পাঠক্রম অনুরূপভাবে রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪। মানবমনের অখণ্ডতা ও সামঞ্জস্যের প্রতি মর্য্যাদাবোধ জাগ্রত রেখে এমন পাঠক্রম রচনা করা উচিত, যা শিক্ষার্থীর মনের সেই স্বাভাবিক ধর্ম্ম অক্ষুন্ন রাখতে পারে এবং মানসিক দ্বিধা ও অহেতুক জটিলতার কবল থেকে মুক্তি পায়।

পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচন বিষয়ে পাঠক্রম প্রণেতা উপরিউক্ত নীতিগুলি অনুসরণ করলে উৎকৃষ্ট পাঠক্রম রচনা অনেকাংশে সহজসাধ্য সফল হতে পারে।

Q. 5. Discuss the principles of a correlated curriculum with its problems.

Ans. পাঠক্রমে অনুবন্ধ প্রণালী অনুসরণের কথা এদেশে বিশেষভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। কার্য্যতঃ, পাঠ্যবস্তুকে অনুবন্ধ প্রণালীতে অখণ্ড অভিজ্ঞতার রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা শিক্ষাক্ষেত্রের সর্ব্বস্তরেই সমানভাবে প্রযোজ্য। এই কারণেই অনুবন্ধ প্রণালীতে পাঠক্রম কার্য্যকরী করার বিষয়টির গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী।

অনুবন্ধ প্রণালীতে পাঠক্রম পরিচালনার মূল কথা হলো এই যে, সকল পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে অখণ্ড অভিজ্ঞতার যে সামগ্রিক ধারা প্রবহমান, সেই সত্যটুকু শিক্ষার্থীর হৃদয়ঙ্গম করানো। এই কাজটি সুসম্পন্ন করতে হলে শিশুর পরিবেশ এবং সৃজনী বৃত্তির সদ্ব্যবহার করা চলতে পারে। শিশুর সমাজ-পরিবেশ এবং সৃষ্টি করার অগ্রহকে সযত্ন দৃষ্টি দিয়ে পাঠক্রমের অনুবন্ধ সাধন করতে হবে। জগতের প্রত্যক্ষ পরিবেশের মধ্যে শিশু প্রতিপালিত হচ্ছে বলে স্বভাবতই তার আগ্রহ পরিবেশের প্রতি আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে। প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্যই হওয়া উচিত শিক্ষার্থীকে তার প্রত্যক্ষ পরিবেশের সকল প্রকার বৈশিষ্ট্যের সহিত পরিপূর্ণভাবে পরিচিত হতে সহায়তা করা। পাঠক্রমের বিষয়বস্তু যদি সেই লক্ষ্য নিয়ে নির্দ্ধারিত ও পরিকল্পিত হয়, তবে শিক্ষার্থী অবশ্যই গভীর স্বাভাবিক আগ্রহ ও অনুরাগ নিয়ে শিক্ষা গ্রহণে প্রবৃত্ত হতে পারবে। পাঠক্রমে সমাজশিক্ষার পর্য্যায়ক্রমিক সুব্যবস্থা থাকা এজন্য একান্ত আবশ্যক, পরিবেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতিও তার মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষার্থী কোনো শিক্ষা অর্জ্জনের পথে প্রথমে জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে এবং এ বিষয়ে তার প্রথম সোপান হলো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন। এর পরে সে অর্জ্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে উপলব্ধি করে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে চাইবে ; এই সময়ে প্রয়োজন প্রক্ষোভের সামঞ্জস্য সাধন। অতঃপর এই

জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করবে; তখন সুরু হবে কর্ম্মের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সামঞ্জস্য সাধনের পর্য্যায়। এই সময়ে শিক্ষার্থী আপন সামর্থ্য পরিশীলনে আগ্রহী হবে। যে পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণ প্রয়াসের এই তিন ধরণের সামঞ্জস্য-সাধনের যথাযথ আয়োজন না থাকে, সে পাঠক্রম অবশ্যই সুসমন্বিত নয়, স্বীকার করতে হবে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশের স্কুলগুলিতে পুঁথিকেন্দ্রিক পাঠক্রমেরই প্রাধান্য অর্থাৎ কেবলমাত্র তথ্য পরিবেশন করাই শিক্ষার লক্ষ্য হয়ে রয়েছে, কর্ম্মপ্রচেষ্টার যথাযথ সুযোগ সুবিধা নেই।

অভিজ্ঞতা অর্জ্জন, প্রক্ষোভের সামঞ্জস্য সাধন এবং অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার পরিশীলন—এই তিনটি বিষয়কে একসূত্রে গ্রথিত করার জন্যই অনুবন্ধ প্রণালীর প্রয়োজন। সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষা এই তিনটিকে ব্যাপকভাবে গ্রথিত করতে পারে বলে অনুবন্ধ শিক্ষাপ্রণালীতে এই পাঠ্যবিষয়টি অপরিহার্য্য। এই বিষয়টির মাধ্যমে পরিবেশ, ভূগোল, স্বাস্থ্যচর্চ্চা, প্রাথমিক শুশ্রূষা, সরল জ্যোতির্বিদ্যা এবং দৈনন্দিন জীবনের বহু জ্ঞাতব্য তথ্যের চিত্তাকর্ষক শিক্ষাদান সহজতর হয়ে ওঠে। এছাড়া, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও বিবিধ বিজ্ঞানের উচ্চতর জ্ঞানের প্রাথমিক বুনিয়াদ এই পাঠ্যবিষয়টির মাধ্যমে অনুবন্ধ প্রণালীতে যেমন সুন্দরভাবে শিক্ষার্থীদের হৃদয়ঙ্গম করানো যায়, তেমন আর কোন পাঠ্যবিষয়ের মাধ্যমে সম্ভবপর নয়।

অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদানের সহায়ক আর একটি পাঠ্যবিষয় হলো সমাজবিদ্যা। মানবজাতির সহযোগিতার ভিত্তিতে কেমন করে সভ্যসমাজ সংগঠিত হয়েছে এবং পরিচালিত হচ্ছে, তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য এই পাঠ্যবিষয়টির মাধ্যমে অন্যান্য পাঠ্যবিষয়ের শিক্ষাদান বেশ চিত্তাকর্ষকভাবে করা সম্ভব। এই বিষয়টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে ইতিহাস শিক্ষাদান ও সহজতর হয় এবং অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের এক সম্যক্ জ্ঞানলাভের পথ সুগম হয়।

শিল্পশিক্ষাকেও অনুবন্ধ প্রণালীর উপযোগী সহায়ক পাঠ্যবিষয় বলে গণ্য করা হয়ে থাকে, কারণ শিল্পশিক্ষার আগ্রহ শিক্ষার্থীকে কর্ম্মপ্রবণ করে তোলে এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতার অখণ্ডতা উপলব্ধিতে সহায়তা করে। শিল্পশিক্ষার আর একটি বিশেষ অবদান হলো, এর মাধ্যমে সমাজের পরিবেশের সঙ্গে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত পরিবেশের সামঞ্জস্য সাধন সহজসাধ্য হয়।

অতএব, সাধারণ বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা ও শিল্পশিক্ষা—এই তিনটি পাঠ্যবিষয়কে অনুবন্ধ পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে রাখা একান্ত প্রয়োজন।

অবশ্য অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদান সার্থক করার দায়িত্ব উপযুক্ত শিক্ষকেরই। একটি অনুশীলনীর মাধ্যমে একাধিক বিষয়ের শিক্ষাদান ও বিষয়গুলির মধ্যে সহজ স্বচ্ছন্দ সম্পর্ক পরিস্ফুট করে তোলা, শিক্ষকের পক্ষে কতখানি নৈপুণ্যের দ্বারা সম্ভব, তা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে

সম্পর্ক আছে, তা সহজভাবে শিক্ষার্থীকে উপলব্ধি করাতে হলে গভীর চিন্তা ও ব্যাপক পরিকল্পনা দরকার। বিনা পরিকল্পনায় অনুবন্ধ প্রণালীতে কোনও অনুশীলন দেওয়াই সম্ভব নয়। স্বভাবতই এজন্য উচ্চবেতনের সুদক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন।

অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদানের আর একটি সমস্যা হলো এই যে, শিল্পশিক্ষা এই পদ্ধতির অন্যতম সহায়ক বলে শিক্ষাদানের ব্যয় স্বভাবতই বেশি হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীরা অপরিণত প্রচেষ্টার মাধ্যমে পাঠ্যবস্তুকে অবলম্বন করে যে সকল শিল্প সৃষ্টি করে, তাতে বহু জিনিষপত্র অবশ্যই অপচয় হয়।

অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদানের একনিষ্ঠ সমর্থকরা অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্য পাঠের সঙ্গে গণিতের, জ্যামিতির সঙ্গে কবিতার অনুবন্ধ সাধনের অপপ্রয়াস করে থাকেন, কারণ সহজ স্বচ্ছন্দ অনুবন্ধ সৃষ্টির দক্ষতা তাঁদের অনেকেরই থাকে না। সত্য সত্যই কোন্ বিষয়টির কোন্ অংশের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের উপযুক্ত অংশের সাবলীল অনুবন্ধ সম্ভব, তা পরিকল্পনা করা এবং সেই পরিকল্পনা অনুসরণ করা সহজসাধ্য নয়।

প্রকৃতপক্ষে, অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদানের এই মতবাদটি শিক্ষাজগতে নতুন বলে স্বীকার করতে হবে এবং এইজন্যই এ নিয়ে এখনো যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষার অবকাশ রয়েছে। মনে হয়, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য উপযুক্ত অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদের সম্পাদনায় অনুবন্ধ প্রণালীতে রচিত কিছু কিছু পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের আয়োজন করলে এই নূতন শিক্ষা পদ্ধতি সফল হওয়া সহজতর হবে।

Q. 6. Discuss the problems of co-curricular activities in Indian schools of to-day.

Ans : শিক্ষার অর্থ জীবনসংগ্রামের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন। এই কারণেই মানবজীবনের প্রাথমিক পর্য্যায় থেকেই সকল প্রকার প্রয়োজনীয় এবং হিতকর অভিজ্ঞতার যথাযথ প্রত্যক্ষ স্বাদ গ্রহণের সুযোগ দানও আধুনিক শিক্ষারীতির অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়েছে। পূর্ব্বে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চতুঃসীমার মধ্যে শিক্ষকের নির্দ্দেশে পাঠ্যপুস্তকের সীমিত জ্ঞান অর্জ্জনের নামই ছিল শিক্ষা। বর্ত্তমানে বিংশ শতাব্দীর প্রগতির যুগে শিক্ষার সেই সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যা বর্জ্জিত হয়েছে।

অন্যভাবে বলতে গেলে, পুঁথির শিক্ষা ব্যতীত জগতে আরও বহু বিষয় শিক্ষার্থীর শিক্ষণীয়রূপে আজ গৃহীত হচ্ছে। পূর্ব্বে যে কাজকে শিক্ষার্থীর খেলা মনে করে, সময়ের অপচয় বলে ঘৃণা করা হতো, আজ সেই খেলা শরীর ও মনের বিকাশের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্যরূপে সর্ব্বজনগ্রাহ্য হয়েছে।

খেলাধুলা, বহির্ভ্রমণ, নৃত্যগীত অভিনয়, সাহিত্যচক্র, বিতর্ক সভা, পত্রিকা সম্পাদনা, হবি ক্লাব, স্কাউট, বা অনুরূপ শিশু কল্যাণকর কর্ম্মসূচীর মাধ্যমে

শিক্ষার্থীদের স্কুল-শিক্ষার সহায়তা করা সম্ভব হয় বলে এই ধরণের কাজকর্ম্মকে আজকাল সহপাঠ্য বা কো-কারিকুলার বিষয়রূপে গণ্য করা হচ্ছে। সহপাঠ্য কর্ম্মপদ্ধতির শিক্ষামূলক উপযোগিতা আজ স্বীকৃত হলেও আমাদের দেশের স্কুলব্যবস্থায় এগুলির যথাযথ আয়োজন করার বিপুল অসুবিধা রয়ে গেছে।

প্রথমেই খেলাধুলার সরঞ্জাম ও প্রাঙ্গণ সম্পর্কে স্কুলগুলিকে বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। গ্রামের স্কুলগুলির বিস্তীর্ণ ক্রীড়াঙ্গণ থাকে অনেক ক্ষেত্রেই, কিন্তু ক্রীড়া সরঞ্জাম সরবরাহ সম্ভব হয় না। শহরের স্কুলগুলির পক্ষে তো একখণ্ড ক্রীড়াঙ্গণ সংগ্রহ করাই দুঃসাধ্য ব্যাপার। ফলে, নীতিগতভাবে স্বীকৃত হলেও কার্য্যক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সহপাঠ্য বিষয়রূপে যথোপযুক্ত ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করা অনেকক্ষেত্রেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। এছাড়া উপযুক্ত ক্রীড়াশিক্ষক এবং স্কুল কর্ম্মসূচীর মধ্যে সময়ের অভাবও আর এক সমস্যা। শারীর শিক্ষায় বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব এতই প্রকট যে, বহু স্কুলে অদক্ষ শিক্ষকরাই ক্রীড়ানুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকেন। বলা বাহুল্য, সে ধরণের ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গত নয়, কেবল ক্রীড়া সরঞ্জাম ক্রয় করলেই ক্রীড়া ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা যায় না।

সহপাঠ্য শিক্ষাপদ্ধতির আর একটি মূল্যবান অঙ্গরূপে স্বীকৃত হয়েছে বহির্ভ্রমণ। কারণ পাঠ্যপুস্তকের তথ্যকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করার বহু সুযোগ এনে দেয় এই বিশেষ কর্ম্মসূচীটি। কিন্তু সমস্যা হলো এই যে, একটি বহির্ভ্রমণ যে শিক্ষা বিষয়ে কতখানি সহায়ক হতে পারে, সে বিষয়ে বহু অভিভাবক ও শিক্ষকের সম্যক্ জ্ঞান না থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই বহির্ভ্রমণগুলি 'শিক্ষামূলক' অভিহিত হলেও নিছক প্রমোদমূলক ভ্রমণে পর্য্যবসিত হয়ে পড়ে। একটি শিক্ষামূলক বহির্ভ্রমণের সার্থকতার মূলে শিক্ষকমণ্ডলীর সমবেত পরিকল্পনা ও সহযোগিতা না থাকলে এরকম হওয়া অসম্ভব নয়। বহির্ভ্রমণ কোথায়, কোন সময়ে হবে, কোন্ শ্রেণীর শিক্ষার্থী তাতে বেশি উপকৃত হবে, এবং তা থেকে কোন্ কোন্ পাঠ্যবিষয়ের সহায়তা হবে, সেগুলি অবশ্যই পূর্ব্ব-পরিকল্পনার দ্বারা নির্দ্ধারণ করে নিতে হবে। বহির্ভ্রমণের আরও সমস্যা রয়েছে ; যেমন, স্কুলের স্বাভাবিক কার্য্যসূচীর মধ্যে এর নিয়মিত ব্যবস্থা রাখা, যদিও পাঠ্যবিষয় সংক্রান্ত অধ্যাপনার সময়েরই নিতান্ত অভাব সম্পর্কে অভিযোগ রয়েছে। আরও চিন্তার কথা বহির্ভ্রমণের আর্থিক বিষয়টি। কারণ শিক্ষার্থীদের গাড়ীভাড়া, এবং দূরান্তরে হলে, থাকা-খাওয়ার খরচ খুব অল্প নয়। বহুক্ষেত্রেই এই আর্থিক বাধাটিই বহির্ভ্রমণের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এবিষয়ে সরকারী অর্থানুকূল্যের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই।

নৃত্যগীত অভিনয়, সাহিত্যচক্র, বিতর্ক সভা, পত্রিকা সম্পাদনা, স্কাউট সংগঠন প্রভৃতির আয়োজন ইদানীং বহু স্কুলেই করার চেষ্টা দেখা যায়। তবে

এগুলিরও যথেষ্ট অসুবিধা ও সমস্যা রয়েছে। নৃত্যগীত অভিনয়কে নিছক আনন্দ অনুষ্ঠানরূপে বিবেচনা করলেও সহপাঠ্য বিষয়রূপে এর তাৎপর্য্য অন্যরকম। আনন্দ অনুষ্ঠান যেন শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হয়; যে রুচি সমাজে আদরণীয়, তার প্রতি শিক্ষার্থীরা যাতে আকৃষ্ট হতে পারে, সহপাঠ্য বিষয়রূপে নৃত্যগীত অভিনয় অনুষ্ঠানগুলি তেমনভাবেই পরিকল্পিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষাসহায়ক ব্যক্তিত্ব-পরিপোষক নৃত্যগীত বা নাটকের যথেষ্ট অভাব দেখা যায় এবং শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের বিকাশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল বিচক্ষণ অনুষ্ঠান-পরিচালকের অভাব বোধ হয়। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে দেখা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি মনোবিজ্ঞানসম্মতভাবে সংগঠিত ও আয়োজিত না হওয়ার দরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্চমন্যতা, পারস্পরিক বিদ্বেষ, ও গ্রন্থভুক্ত পাঠ্যবিষয়ের প্রতি অবহেলা জন্মায়। এবিষয়ে সুশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-পরিচালকের হাতেই দায়িত্বভার অর্পণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমানে এদেশে মাল্‌টিপারপাস্ স্কুলব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ার দরুণ শিক্ষার্থীদের বহুমুখী প্রতিভার সন্ধানার্থে সহপাঠ্য কর্ম্মসূচীর অন্তর্গত হয়েছে হবি ক্লাবের সংগঠন। 'হবি' বলতে এমন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত খেয়াল বোঝায়, যা নিতান্তই অহেতুক নয় এবং তার মধ্য দিয়ে অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীদের প্রবণতা নিরূপণ করা সহজসাধ্য হয়। 'হবি ক্লাব' সংগঠন ও পরিচালনা করার জন্য বিশেষ দক্ষতা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের সকল প্রকার 'হবি'-কেই সমান মর্য্যাদা দান করা অনেক সময়েই শিক্ষকদের পক্ষে সম্ভব হলেও অভিভাবকদের পক্ষে সহজ হয় না। এছাড়া শিক্ষার্থীরাও অনেক ক্ষেত্রে আপন 'হবি'র কথা শিক্ষকদের গোচরে আনতে দ্বিধা করে। এই সমস্যার সমাধানে শিক্ষকদের যথেষ্ট বন্ধুত্বপূর্ণভাবে শিক্ষার্থীদের এক এক ধরণের 'হবি' গোষ্ঠিতে সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন 'হবি'-র পরিপোষণের জন্য যৎসামান্য ব্যয়বরাদ্দও প্রয়োজন হতে পারে। স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দে অনেক সময়ে সম্মত হন না। সেসব ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ শিক্ষার্থীদের 'হবি ক্লাবের' সভ্যপদের জন্য কিছু কিছু মাসিক চাঁদা দিতে বলা যেতে পারে।

সহপাঠ্য শিক্ষাসূচীর সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা এই যে, এই কর্ম্মসূচী শিক্ষার্থীদের বিপুলভাবে আকৃষ্ট করতে পারে এবং সহজেই আবিষ্ট করে রাখতে পারে বহুক্ষণ, বহুদিন। এই আকর্ষণী ক্ষমতাটুকুর যথাযথ সদ্ব্যবহার করতে পারলে সহপাঠ্য শিক্ষাসূচী অবশ্যই শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর কাছে পরম লোভনীয় বিষয়রূপে তুলে ধরে রাখতে পারবে।

সহপাঠ্য শিক্ষাক্ষেত্রে স্কুলের মিউজিয়াম আধুনিক শিক্ষাজগতের নূতন সংযোজন। বিজ্ঞান ও কারিগরী জগতের বহু রহস্য ও বিস্ময় শিক্ষার্থীদের

উপযোগী করে স্কুল-মিউজিয়ামে সংরক্ষিত থাকে। অবশ্য যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে সাধারণ কোনও স্কুলের পক্ষে মিউজিয়াম সংগঠন ও সংরক্ষণ স্বপ্নাতীত। তবে উৎসাহী স্কুল কর্তৃপক্ষগণ ছোট আকারে স্কুল-মিউজিয়াম করতে পারেন। স্কুল মিউজিয়ামের বিপুল অর্থব্যয়সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারেন সরকারী শিক্ষাদপ্তর। কোন বিশেষ অঞ্চলে কয়েকটি স্কুলের ব্যবহারের জন্য একটি করে ক্ষুদ্রাকার স্কুল-মিউজিয়াম ভবন তাঁরা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

স্কুলের শ্রেণীকক্ষে পুঁথির শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে সহপাঠ্য পদ্ধতিরূপে আজকাল চলচ্চিত্র ও বেতারের ব্যবহার সর্ব্বজনবিদিত। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বেতারবীক্ষণ বা টেলিভিশনের সাহায্যেও শিক্ষাদান পদ্ধতিকে মনোরম করে তোলা হচ্ছে। অবশ্য এদেশে আর্থিক সমস্যার জন্য আজও এই সহপাঠ্য কর্ম্মসূচীগুলি ব্যাপকতা লাভ করেনি। সরকারী শিক্ষা দপ্তর থেকে বহু স্কুলে বেতার গ্রাহকযন্ত্র ঋণ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু স্কুল-রুটিনে সময়াভাবের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান ছাত্রসমক্ষে উপস্থিত করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। এছাড়া বেতারে শিক্ষামুলক অনুষ্ঠানের একটি অসুবিধা হল অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীরা কেবলমাত্র কানে-শোনা অনুষ্ঠানে বহুক্ষণ মনোযোগী থাকতে পারে না। খুব দক্ষ বক্তা না হলে বেতারের অনুষ্ঠান সফল হতে পারে না, অবশ্য সঙ্গীত অভিনয়াদির ব্যাপারে অতখানি সমস্যার কারণ হয় না। এদিক দিয়ে সবাক চলচ্চিত্র অনেকাংশে শ্রেয়, কারণ শিক্ষার্থীর সামনে কোনও অভিজ্ঞতার জীবন্ত রূপ পরিস্ফুট হতে পারে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানীরা চলচ্চিত্রের শিক্ষামূলক উপযোগিতা স্বীকার করলেও একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, এই সহপাঠ্য কর্ম্মপদ্ধতিটি অধিক পরিমাণে কাজে লাগালে শিক্ষার্থীর চক্ষুরোগ ও শিরঃপীড়ার কারণ হতে পারে; শুধু তাই নয়, সুদক্ষ শিল্পী-শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রযোজিত না হলে এর বিন্দুমাত্র কুপ্রভাব শিক্ষার্থীর মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, একথা বহু গবেষণায় প্রতিপন্ন হয়েছে।

স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থপাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে বৃহত্তর জ্ঞানের জগতে উপনীত করা যায় বলে সহপাঠ্য কর্ম্মসূচীর অন্তর্গত হয়েছে গ্রন্থাগার। কারণ অক্ষরজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষার্থীর গ্রন্থপাঠের যে স্বাভাবিক আগ্রহ দেখা যায়, উপযুক্ত পরিবেশে সুপুষ্ট গ্রন্থাগারের আয়োজন থাকলে সেই আগ্রহের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী স্বল্প আয়াসে বিপুল জ্ঞান অর্জ্জনে সক্ষম হতে পারে।

তবে গ্রন্থাগার সংগঠন এবং অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য তার পরিচালনা সহজসাধ্য নয়। একটি সুপরিচালিত গ্রন্থাগার সংরক্ষণ করতে হলে সুদক্ষ

গ্রন্থাগারিক যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন উপযুক্ত গ্রন্থাগার কক্ষ ও পাঠগৃহ এবং যথেষ্ট পরিমাণে আসবাবপত্র। গ্রন্থাগারকে তরুণমনের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থাও করতে হবে।—যেমন, সাহিত্য-চক্র, প্রবন্ধ বা গল্প প্রতিযোগিতা। এই সকল ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সংগঠন শক্তিরও বিকাশ ঘটানো সম্ভব। মাঝে মাঝে তাদের গ্রন্থাগার পরিচালনার ভার দিতে পারা যায়।

তবে অধিকাংশ স্কুল কলেজেই গ্রন্থাগারগুলি যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয় না। শিক্ষার্থীরা গ্রন্থাগারিকের কাছে সহানুভূতিমূলক ব্যবহার পায় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থাভাবের দরুণ বহুক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারগুলি যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয় না এবং শিক্ষার্থী অতিরিক্ত গ্রন্থপাঠের আগ্রহ বোধ করে না।

PROBLEMS OF FINANCE, ACCOMMODATION AND EQUIPMENT

[Financial aid—Responsibilities of Centre and States—Sources of Revenue—Measures to relieve the cost—Open-air schools—Sites for buildings and playgrounds—legislation acquiring open spaces—Type and design of schools—construction of schools—research—audio-visual aids.]

Q. 1. Discuss the sources of revenue for educational purposes in India.

Ans: (এই বিষয়ে এই গ্রন্থের ১ম পরিচ্ছেদে পূর্ব্বেই আলোচনা হয়েছে) ভারতের সংবিধানমত, শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যয়ের অধিকাংশই বহন করার কথা রাষ্ট্রের। বিশেষ করে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যয়ভার সম্পূর্ণভাবে সরকারী তহবিল থেকেই বহন করা হবে, এমন নির্দ্দেশ আছে। বর্ত্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়ভার বহনের জন্য রাজ্যসরকারের অর্থসাহায্য, পৌরসমিতির অর্থসাহায্য, বেসরকারী দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষের অর্থসাহায্য এবং স্কুলের বেতনের উপরই নির্ভর করতে হয়। রাজ্য সরকারগুলি অনুমতি দিলে পৌরসমিতিগুলি বিশেষ শিক্ষা-কর ধার্য্য করে তাদের অর্থসাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে। এই শিক্ষাকর জমির উপর, বৃত্তির উপর অথবা শহরাঞ্চলে সম্পত্তির উপর ধার্য্য হয়ে থাকে। পৌরসমিতির এই শিক্ষা-কর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পরিমাণে ধার্য্য হয়ে থাকে এবং সর্ব্বোচ্চ হারে শিক্ষা-কর ধার্য্য করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বহুক্ষেত্রে নেতৃবৃন্দ জনপ্রিয়তা হারাবার আশঙ্কায় অল্প হারে শিক্ষা-কর ধার্য্য করে শিক্ষাব্যয় নির্ব্বাহের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে থাকেন।

রাজ্য সরকারগুলি শিক্ষাখাতে বিভিন্নভাবে অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকেন এবং বিভিন্ন রাজ্যে এই অর্থসাহায্যের পরিমাণ বিভিন্ন। যে সকল উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের অর্থসাহায্য মঞ্জুর করা হয়ে থাকে, সেগুলি এইরকম :—

১। শিক্ষকদের ট্রেণিং-এর জন্য বৃত্তি ;

২। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মেডিক্যাল অফিসারের ভাতা ;

৩। অনাথ শিক্ষার্থীদের জন্য হোষ্টেল, বোর্ডিং-এর ব্যয় ;

৪। স্কুলভবন বা আবাস নির্ম্মাণের ব্যয় ;

৫। আসবাবপত্র, শিক্ষা-উপকরণ, রসায়ন পদার্থ, বা গ্রন্থাগারের বই কেনা ;

৬। স্কুলভবন, হোষ্টেল বা ক্রীড়াপ্রাঙ্গণের জন্য জমি সংগ্রহ ;

৭। কারিগরী শিক্ষার কাঁচামালের জন্য ;

৮। স্কুলভবন ইত্যাদি মেরামতী ও সংরক্ষণের জন্য।

কিন্তু সকল রাজ্যেই উপরোক্ত সকল বিষয়ের জন্য অর্থসাহায্য বিতরিত হয় না। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সকল ব্যয়বহুল শিক্ষাব্যবস্থার জন্য অধিকতর পরিমাণে সরকারী অর্থানুকূল্যের প্রয়োজনও উপলব্ধি করা যাচ্ছে। যদি কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, প্রভৃতি বৃত্তিমূলক শিক্ষার পথ প্রশস্ত করতে হয়, তবে এমন বিধিব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক, যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল থেকে রাজ্য সরকারগুলি নিয়মিত অর্থসাহায্য পেয়ে সেই অর্থ রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতিকল্পে ব্যয় করতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাবিস্তারের আইনগত দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারেরই।

কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারের জন্য এবং তৎসংক্রান্ত ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য একটি বিশেষ 'শিল্পশিক্ষা কর' ধার্য্য করা উচিত। শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীদের কাচ থেকে এই কর আদায় করাই যুক্তিসঙ্গত। ভারতের রেল ও ডাকবিভাগের বিপুল আয়ের একাংশও এই খাতে জমা হওয়া উচিত।

জনসাধারণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অর্থদানের দিকেও মনোযোগ দেওয়া দরকার। এই ধরনের দান যাতে আরও বৃদ্ধি পায়, সেজন্য এই সকল দানের ওপর আয়কর রহিত করা একান্ত বাঞ্ছনীয় এবং সরকারী আইন বলে তা করাও হয়েছে। কারিগরা শিক্ষাখাতে যাঁরা দান করবেন, তাঁদের আয়কর রহিতের পরিমাণ এমনভাবে বৃদ্ধি করা উচিত, যাতে অনেকেই কারিগরী শিক্ষার জন্য অর্থদানে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন।

ধর্ম্মসংক্রান্ত এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলির বিপুল অর্থসম্ভার যাতে শিক্ষাক্ষেত্রে সদ্ব্যবহৃত হতে পারে, সেজন্যও ইদানীং সরকারী কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট হয়েছেন। অযথা আড়ম্বর অনুষ্ঠানে ধর্ম্মের নামে যে অর্থ অপচয় হয়ে থাকে, সে অর্থ আইন বলে শিক্ষার পবিত্রক্ষেত্রে ব্যয়িত হলে আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না।

যে সকল ব্যক্তি তাঁদের সম্পত্তি শিক্ষার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে যান, তাঁদের সম্পত্তির উপরেও সরকারী কর ধার্য্যের প্রয়োজন নেই। এই ব্যবস্থার ফলে বহু বিত্তবান ব্যক্তি শিক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁদের বিপুল অর্থসঞ্চয় দান করতে উৎসাহ পাবেন।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল থেকে শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণার জন্য, পাঠক্রম, পথনির্দ্দেশ (গাইড্যান্স), গ্রন্থপ্রণয়ন প্রভৃতি বিষয়ে গভীর তথ্যানুসন্ধানও উত্তরোত্তর উন্নয়নের জন্য অধিকতর অর্থ মঞ্জুর করা কর্ত্তব্য।

কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও বেসরকারী প্রচেষ্টার যথাযথ সহযোগিতা বর্ত্তমান থাকলে শিক্ষাক্ষেত্রে যত অর্থেরই প্রয়োজন হোক্ না কেন, অভাব হবে না বলেই মনে হয়।

Q. 2. Discuss some measures to relieve the cost of education in our country.

Ans : ইদানীং নানা কারণে শিক্ষাব্যয় ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্ত্তৃপক্ষ থেকে স্কুল ভবন বা তৎসংক্রান্ত সম্পত্তির উপর কর ধার্য্য করা হয়ে থাকে, ফলে শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি হওয়া ব্যতীত উপায় থাকে না। শিক্ষাবিস্তার যখন জাতীয় কর্ত্তব্য তখন স্কুলভবন বা ক্রীড়াপ্রাঙ্গণের উপর কোনরূপ কর ধার্য্য করা অনুচিত।

আমাদের দেশে যখন উপযুক্ত পরিমাণে উৎকৃষ্ট পর্য্যায়ের পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত হচ্ছে না, তখন বিনা শুল্কে বিদেশের কিছু কিছু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ও উপকরণ এদেশে আমদানীর অনুমতি দেওয়া উচিত। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম উপকরণাদির অভাবে অনেক ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট উপকরণাদি ব্যবহার করে অর্থের অপচয় ভোগ করতে দেখা গেছে। সরকারী উদ্যোগে উৎকৃষ্ট উপকরণাদি বিনাশুল্কে আমদানী করা যেতে পারলে এই অপচয় নিবারিত হতে পারে।

শিক্ষাব্যয় বৃদ্ধির আর একটি কারণ আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার পরিবেশে শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আঙ্গিক পরিপাটির দিকে অধিকতর অভিনিবেশ করেছেন। বিরাট অট্টালিকা নির্ম্মিত না হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ সুরু হবে না, এমন ধারণার বশবর্ত্তী হওয়ার ফলে প্রতি বছর আমাদের দরিদ্র দেশে কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজীর সরলতার আদর্শে সহজ পরিবেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত করার কথা চিন্তা না করতে পারলে এই বিপুল ব্যয় হ্রাস করা অসম্ভব।

এছাড়া, স্কুল ইউনিফর্ম, অত্যধিক সহপাঠ্য কর্ম্মসূচী, অগণিত পাঠ্যপুস্তকের জন্যও শিক্ষার্থীপিছু শিক্ষাব্যয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্কুল ইউনিফর্মের উপযোগিতা স্বীকার করলেও একথা অনস্বীকার্য্য যে, যেদেশে ন্যূনতম শিক্ষার আয়োজন আজও সম্ভব হয়নি, সে দেশে এ ধরনের ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করা সমীচীন নয়। শিক্ষার্থীরা সহজ পরিচ্ছন্ন পোষাকে স্কুলে আসার অনুমতি পেলে তাদের শিক্ষার ব্যয় যে কিছু পরিমাণে হ্রাস পাবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সহপাঠ্য কর্ম্মসূচীর নামে বহু প্রতিষ্ঠানে ইদানীং বিপুল অর্থের ব্যয় হয়ে থাকে। অথচ যথেষ্ট সন্দেহ আছে, এই সকল সহপাঠ্য কর্ম্মসূচীগুলি কতখানি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় অথবা কতখানি প্রকৃত শিক্ষার পরিপোষণা করে। এগুলি হ্রাস করা বাঞ্ছনীয়।

পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার সহায়ক, কিন্তু অত্যধিক পাঠ্যপুস্তক অবশ্যই শিক্ষার

সংহারক। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পাঠ্য পুস্তকের তালিকা বৃদ্ধি না করে যদি সুদক্ষ শিক্ষক নিয়োগের দিকে যত্নবান হতে পারে, তাহলে শিক্ষার ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে সদ্ব্যবহৃত হয়।

Q. 3. Discuss the merits and possibilities of open-air schools to tackle the problems of accommodation of India's education.

Ans. বিপুল ব্যয়ে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করার যজ্ঞসদৃশ আয়োজনের সমালোচনা করে অনেকেই বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে থাকেন, বিশেষতঃ এই দরিদ্র দেশে। সত্যসত্যই শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পনার প্রথম স্তরেই অট্টালিকার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, মুক্ত-অঙ্গন স্কুলের প্রতিষ্ঠা ও প্রবর্ত্তনের দ্বারা আমরা এদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্থান সঙ্কুলানের বিপুল সমস্যা অনেকাংশেই লাঘব করতে পারি। বৃক্ষছায়ায় অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ঐতিহ্য আমাদের দেশে নূতন নয় এবং এখনও পর্যান্ত বিশ্বভারতী, ওয়ার্দ্ধা প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রে এই ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের বহু মন্দির সংলগ্ন প্রাঙ্গনে আজও শিক্ষাদীক্ষার কাজ চলেছে।

মুক্ত-অঙ্গন স্কুলের একটি উল্লেখযোগ্য উপকারিতা হলো এই যে, শিক্ষার্থীরা মুক্ত আলোবাতাসের মধ্যে কাজ করতে পায়। অবশ্য এর প্রধান অসুবিধা হলো, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ বা রুক্ষতার জন্য নিয়মিতভাবে মুক্ত-অঙ্গন অধ্যাপনা চালানো সম্ভব হয় না।

মুক্ত-অঙ্গন স্কুল প্রবর্ত্তনের ক্ষেত্রে দুএকটি কথা স্মরণ রাখতে হবে। (১) এই শিক্ষাপদ্ধতিতে অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীকে নিয়ে অধ্যাপনা চালাতে হয় এবং যথেষ্ট পরিমাণে ছায়াযুক্ত প্রশস্ত প্রাঙ্গণ প্রয়োজন হয় এবং (২) পুঁথিগত বা নীতিমূলক অধিকাংশ শিক্ষাদান মুক্ত-অঙ্গন স্কুলে সম্ভব হলেও এমন অনেক শিক্ষনীয় বিষয় আছে, যার জন্য বিশেষ পরিবেশের প্রয়োজন হয়—যেমন, ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গ্রন্থাগারে পুস্তক চর্চ্চা বা কর্ম্মশালায় শিল্পসৃষ্টির জন্য মুক্ত-অঙ্গন স্কুল উপযুক্ত নয়। অবশ্য যদি ক্ষুদ্রাকারে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার্থীদের প্রতি ব্যক্তিগত যত্ন নেওয়ার শুভ উদ্দেশ্যে অল্প ব্যয়ে স্কুল পরিচালনার কথা চিন্তা করা যায় তাহলে ছোট একটি অতি প্রয়োজনীয় স্কুল ভবনের সঙ্গে বৃক্ষ ছায়াযুক্ত প্রয়োজনমত প্রাঙ্গণসহ মুক্ত অঙ্গন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রবর্ত্তনের দিকে মনোযোগ দিলে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটানো অসম্ভব হবে না।

Q. 4. Discuss the problems regarding school buildings and playgrounds in India.

Ans. স্কুলভবন নির্ম্মাণের পরিকল্পনার সময় কি ধরনের ভবন হবে, সে কথা চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে আরও যে সকল কথা স্মরণ করতে হবে, সেগুলি হলো (১) স্কুলভবন ও ক্রীড়াপ্রাঙ্গণের উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন; (২) কতখানি জমি প্রয়োজন, তা সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ ; (৩) ভবনের নক্সা প্রস্তুত এবং (৪) স্কুলে যাতায়াতের সহজতম উপায় আছে কিনা।

স্কুলভবনের স্থান নির্ব্বাচন করার সময়ে গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের স্কুলের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনগুলি ভাবতে হবে। গ্রামাঞ্চলে স্কুলভবন নির্ম্মাণ করতে হবে এমন অঞ্চলে যেখানে যথেষ্ট লোকবসতি আছে বা লোকবসতি থেকে শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের অসুবিধা হবে না। স্কুলের শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা ও সহপাঠ্য কর্ম্মসূচীর জন্য স্কুল সংলগ্ন প্রশস্ত ক্রীড়াক্ষেত্র থাকা চাই। যদি গ্রামাঞ্চলে আবাসিক স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা থাকে, তাহলে ছাত্রাবাস ও শিক্ষকদের আবাস নির্ম্মাণের জন্য যথেষ্ট স্থান থাকা দরকার। যেহেতু আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে স্কুলভবনকে সমাজশিক্ষার অন্যতম কেন্দ্ররূপে মর্য্যাদা দেওয়া হচ্ছে, সে কারণে প্রতিটি স্কুলভবনে যাতে প্রতিবেশী সমাজের সকল লোক প্রয়োজনমত সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে সম্মিলিত হতে পারে, তার ব্যবস্থা করে রাখা বাঞ্ছনীয়।

শহরাঞ্চলে স্কুলভবন নির্ম্মাণের স্থান নির্ব্বাচন সংক্রান্ত বিষয়টি জটিলতার সৃষ্টি করে থাকে। কারণ জনাকীর্ণ শহরে স্থানাভাব নিতান্তই সুপ্রকট, তবে গ্রামাঞ্চলে আবাসিক স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে শহরের স্কুলভবনগুলির স্থানাভাব হ্রাস পাবে বলে অনেক আশা করেন। সে যাই হোক্, বর্ত্তমানে শহরাঞ্চলে কোন নূতন স্কুলভবন নির্ম্মাণের প্রশ্ন উঠলেই প্রথমে বলতে হয়, ভবনটি যেন জনাকীর্ণ অথবা শিল্পপ্রধান অঞ্চল থেকে যথেষ্ট দূরে নির্ম্মিত হয়। অবশ্য ভবনটি শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার পথে স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদিও শান্ত পরিবেশ অধিকতর বাঞ্ছনীয়। খুব দূরবর্ত্তী স্থানে স্কুলভবন স্থাপিত করতে বাধ্য হলে বহু স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজেরাই যানবাহনের ব্যবস্থা করে থাকেন। অবশ্য তাতে শিক্ষাব্যয় বৃদ্ধি পায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে রেল কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য যানবাহন কর্তৃপক্ষ স্বল্পহারে যাতায়াতের সুবিধা শিক্ষার্থীদের দিতে পারেন। শহরাঞ্চলে প্রশস্ত ক্রীড়াঙ্গনের অসুবিধা দূর করার জন্য কয়েকটি নিকটবর্ত্তী স্কুলের জন্য একটি সম্মিলিত ক্রীড়াক্ষেত্র সংরক্ষণের সমবায়মূলক আয়োজন করা চলতে পারে কিনা চিন্তা করা যেতে পারে।

শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা এবং অবসর বিনোদনের জন্য ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ অপরিহার্য্য। শহরে সম্ভব না হলেও গ্রামাঞ্চলে প্রশস্ত ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ বিরল নয়।

শহরে যে দুএকটি ভাগ্যবান্ স্কুলের ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ আছে, তা সমবায় ভিত্তিতে ব্যবহার করা সমীচীন। প্রত্যেক শহরে এই ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ সমস্যা সম্পর্কে সদাজাগ্রত মনোযোগ নিবদ্ধ রাখার জন্য একটি করে কমিটি গঠিত হওয়া উচিত, যে কমিটিতে স্কুল কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি, প্রধান শিক্ষক, পৌর প্রতিনিধি এবং শরীর শিক্ষায় আগ্রহশীল বিশেষজ্ঞ শিশু-কল্যাণকামীদের নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা হতে পারে কিভাবে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় 'ক্রীড়াকেন্দ্র' আন্দোলন চালিয়ে শহরের প্রতি অঞ্চলে সুপরিচালিত ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা যায়। এই ব্যবস্থা আন্তরিকতার সঙ্গে প্রবর্ত্তিত হলে জনাকীর্ণ শহরের মধ্যেও শিশু-শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার জন্য প্রাঙ্গণের অভাব ততখানি থাকবে না বলে মনে হয়।

শহরাঞ্চলে যে সকল উন্মুক্ত জমি এখনো রয়েছে, সেগুলি যাতে সরকারী অনুমতি ভিন্ন ভবন নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হতে না পারে, সেজন্য উপযুক্ত আইনবিধি প্রণয়ন ও প্রবর্ত্তন করা দরকার। বৃটেনে এরূপ বিধি ১৯১২ সাল থেকেই আছে, তার ফলে লণ্ডনের মত জনাকীর্ণ শহরেও স্কুলের জন্য ভবন বা ক্রীড়া-প্রাঙ্গণের অভাব এত প্রকট নয়। আমাদের দেশে সরকারী তত্ত্বাবধানে সকল শহরাঞ্চলে উন্মুক্ত জমির একটি বিশদ তথ্য সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করে অবিলম্বে আইন প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এই ব্যবস্থা এখনো অবলম্বন করা গেলে স্কুলের জন্য ভবন ও ক্রীড়াপ্রাঙ্গণের ভয়াবহ অভাব অনেকাংশে দূরে হবে।

Q. 5. Discuss the problems relating to the type and design of school accommodation in India.

Ans. স্কুলে শিক্ষার্থীদের স্থান সঙ্কুলানের জন্য বর্ত্তমানে অনেকগুলি সরকারী নিয়মকানুন আছে। নিয়মে বলা হয় যে, স্কুলভবনে যথেষ্ট পরিমাণে আলো বাতাস থাকা চাই, বর্ষার দিনে উপযুক্ত আচ্ছাদন থাকা চাই এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য কমপক্ষে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্থান বরাদ্দ থাকা চাই। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন মনে করেন, শিক্ষার্থী-প্রতি অন্ততঃপক্ষে ১০ বর্গফুট স্থান সঙ্কুলান থাকা আবশ্যক।

স্কুলে ছাত্রছাত্রী সংখ্যার অনুপাতে স্কুলভবনে স্থান সঙ্কুলানের পর্য্যাপ্ত আয়োজন রাখা উচিত, এবিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। তবে কোন রাজ্যে একটি শ্রেণীতে ৩০ জন শিক্ষার্থী, আবার কোন রাজ্যে ৫০ জন পর্য্যন্ত শিক্ষার্থী নেওয়া হয়ে থাকে। সে যাই হোক্, স্কুলের শ্রেণীকক্ষগুলি এমনভাবে নির্ম্মিত হওয়া উচিত, যাতে বহুসাধক স্কুলে রূপান্তরিত হলে কোন অসুবিধা না হয়। বর্ত্তমানে স্কুলব্যবস্থার যে দ্রুত সংস্কার এদেশে চলেছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক স্কুলেই বহুসাধক স্কুলের সম্প্রসারণের উপযুক্ত আয়োজন করে রাখা উচিত। কর্ম্মশালা, ল্যাবরেটরী, অঙ্কন বা সঙ্গীত কক্ষ প্রভৃতির জন্য ব্যবস্থা

থাকা ভাল। স্কুলভবনের নক্সা এমনভাবে করা উচিত, যাতে ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের সময় এই সকল পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন সহজসাধ্য হয়। যদি একান্ত বহুসাধক স্কুলে সম্প্রসারণ করা না-ও হয়, তবুও প্রত্যেক স্কুলে একটি করে কর্ম্মশালা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম সমেত।

বহু স্কুলের বিরাট অট্টালিকা থাকায় সহস্রাধিক শিক্ষার্থী, এমনকি ২০০০/২৫০০ পর্য্যন্ত শিক্ষার্থী ভর্ত্তি করতে দেখা গেছে। এই ধরনের স্কুলে শিক্ষার্থীদের প্রতি ব্যক্তিগত যত্ন নেওয়া একেবারেই সম্ভব হয় না, শিক্ষার মান নিকৃষ্ট হয়ে পড়ে, নিয়মানুবর্ত্তিতা নষ্ট হয় এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আত্মিক সংযোগ ক্ষুণ্ণ হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রতিবেশীদের চাপে প্রধান শিক্ষক বাধ্য হয়ে অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী গ্রহণ করে সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলেন। এই সমস্যার প্রতিকারার্থে দু'তিনটি শীফ্‌টে কাজ করতে হয় এবং স্কুলগুলি কারখানায় পরিণত হয়। এজন্যই বৃহৎ স্কুলকলেজ প্রতিষ্ঠার সর্ব্বপ্রকার বিরোধিতা করা উচিত। ক্রমবর্দ্ধমান শিক্ষার্থী সংখ্যার অনুপাতে নূতন নূতন ছোট ছোট স্কুল যাতে দ্রুত সংগঠিত হয়, সেজন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা সম্মিলিত হওয়া কর্তব্য।

Q. 6. Discuss the problems relating to construction of school buildings and importance of research in this respect.

Ans. প্রতিটি স্কুলে অন্ততপক্ষে থাকা দরকার (১) শিক্ষার্থীদের জন্য বিনোদন কক্ষ, শৌচাগার, ভোজন কক্ষ এবং বালিকাদের বিশ্রাম কক্ষ; (২) শিক্ষকদের বিশ্রাম কক্ষ; (৩) পাঠকক্ষ ও গ্রন্থাগার; (৪) দর্শনার্থীদের বসবার ঘর, (৫) প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের ঘর এবং অফিস ঘর; এবং (৬) ল্যাবরেটরী ও কর্ম্মশালা (এইগুলি অবশ্যই শিক্ষার্থীসংখ্যার অনুপাতে নির্ম্মিত হবে)।

শিক্ষার্থীদের বিনোদন কক্ষে বেতার গ্রাহক যন্ত্র থাকা ভাল এবং ঐ কক্ষেই শিক্ষামূলক বেতার অনুষ্ঠানের ক্লাশ বসতে পারে। পাঠকক্ষ ও গ্রন্থাগার এমনভাবে নির্ম্মিত হওয়া উচিত, যাতে শিক্ষার্থীরা শান্ত পরিবেশে গ্রন্থচর্চ্চায় মগ্ন হওয়ার সুযোগ পায়। স্কুল সময়ের পরে এই পাঠকক্ষ সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিরাও যাতে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারেন, তেমন ব্যবস্থা রাখা দরকার। ল্যাবরেটরী ও কর্ম্মশালা নির্ম্মাণের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, কারণ প্রায়ই এই সকল কক্ষে শিক্ষার্থীরা দুর্ঘটনায় পতিত হয়। এই সকল কক্ষে যাতে প্রচুর আলো বাতাস থাকে, এবং কর্ম্মরত শিক্ষার্থীরা স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে, সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রেখে স্কুলভবনের নক্সা প্রস্তুত করতে হবে।

অধুনা স্কুলভবন নির্ম্মাণ-বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন যে, স্কুলভবন দ্বিতলের বেশি উঁচু না হওয়া উচিত। কারণ সু-উচ্চ অট্টালিকায় ওঠানামা করার জন্য শিশুশিক্ষার্থীদের অকারণ শক্তিক্ষয় হয়ে থাকে। কিন্তু দ্বিতল স্কুলভবন নির্ম্মাণের সমস্যা এই যে, এর জন্য অল্পপরিসর জমি হলে চলে না—বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রয়োজন হয়—শহরাঞ্চলে যার অভাব সর্ব্বজনবিদিত। এই সমস্যার কথা মনে রেখেই ত্রিতল পর্যন্ত স্কুল ভবন নির্ম্মাণ অনুমোদন করা চলে, তবে উচ্চতম তলায় উচ্চতর ক্লাশের বয়স্ক শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষ রাখাই সমীচীন হবে।

শ্রেণীকক্ষগুলি এমনভাবে নিম্মিত হওয়া উচিত যাতে প্রত্যেক কক্ষে দিনের কোন সময়ে রৌদ্রালোক প্রবেশ করে এবং সে আলো শিক্ষার্থীদের চক্ষুপীড়ার কারণ না হয়। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সূর্য্যালোকের প্রখরতার জন্য প্রাকৃতিক আলোক-উদ্ভাসিত শ্রেণীকক্ষের অসুবিধা সহজেই অনুমান করা যায়। এজন্য ভবন নির্ম্মাণের সময় সূর্য্যালোক প্রবেশের পথগুলিতে এমনভাবে 'ব্লাইণ্ড' বা কার্ণিশ বসানো উচিত, যাতে সূর্য্যালোকের তীক্ষ্নতা হ্রাস পেয়ে কেবল উজ্জ্বলতাটুকু শ্রেণীকক্ষকে আলোকিত করে রাখতে পারে। বর্ষাকালে যাতে শ্রেণীকক্ষে বৃষ্টি না আসে এবং জানলা দরজা বন্ধ করে দিলে অন্ধকার-গুমোট না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রেখে কাঁচের জানালা ও যথেষ্ট বায়ু সঞ্চালন পথ রাখা দরকার।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে স্কুলভবন নির্ম্মাণের বিপুল ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয়ের কথাও চিন্তা করতে হবে। কি উপায়ে অল্পব্যয়ে আদর্শ স্কুলভবন নির্ম্মাণ করা যায়, তা গবেষণা করতে হবে। ব্যয় হ্রাসের জন্য এক-একটি কক্ষ যাতে নানাবিধ কাজে ব্যবহার করা যায়, তেমন ব্যবস্থা করা চলতে পারে। যেমন, একটি বড় হলঘরে প্রার্থনা, পরে ব্যায়াম শিক্ষা, পরে বেতার ক্লাস এবং অন্য সময়ে সভা অধিবেশন করা চলতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে পাঠকক্ষ বা গ্রন্থাগারেও ক্লাশ বসাবার ব্যবস্থা করে রাখা যায়। তাতে একটি শ্রেণীকক্ষের কাজ চলে যায়।

শহরাঞ্চলে সাধারণতঃ পাকাবাড়ীই নির্ম্মিত হয়। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে কত অল্পব্যয়ে মাটি বা অনুরূপ সহজলভ্য জিনিষে স্কুলভবন নির্ম্মাণ করা যায়, তা নিয়ে গবেষণার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কিভাবে ভবন নির্ম্মাণ করলে ঘরের স্নিগ্ধতা রক্ষা করা যায়, পোকামাকড়ের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, সে সকল বিষয়েও আমাদের দেশে গবেষণা না হলে পাশ্চাত্ত্য অনুকরণে ব্যয়বহুল স্কুলভবন নির্ম্মাণ করে কেবল অপচয় বৃদ্ধিই হতে থাকবে।

Q. 7. Discuss the problems relating to the equipment necessary for an educational institution in India.

Ans. স্কুলের সরঞ্জাম ও উপকরণাদির আয়োজন করার জন্য বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। উপযুক্ত শিক্ষা সহায়ক সরঞ্জামাদি আমাদের দেশের বহু স্কুলেই রাখা সম্ভব হয় না অর্থাভাবে এবং পরিকল্পনার অভাবে। আবার বহু স্কুলে বিজ্ঞানমূলক পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য যে ল্যাবরেটরী থাকে, সেখানে মূল্যবান উপকরণাদি গুদামঘরের মত স্তূপীকৃত অবস্থায় অযত্নে পড়ে থাকে, অপচয় হয়। অর্থাৎ সদ্ব্যবহৃত হয় না। ফলে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের বক্তৃতার মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। ভূগোল শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত মানচিত্র না থাকলে, পদার্থবিদ্যা অধ্যাপনার সময়ে উপকরণ, নক্সা ও মডেল পাওয়া না গেলে এবং রসায়ন বিজ্ঞানের জন্য ল্যাবরেটরী না হলে এই সকল বিষয়ে শিক্ষাদান খুবই অর্থহীন ও নীরস হয়ে পড়ে।

যদিও স্কুল অনুমোদনের প্রাথমিক সর্ত্তাবলীতে এসকল বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ দেওয়া আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও অনবধানতার জন্য বহু স্কুলেই ঐ সকল সর্ত্ত প্রতিপালিত হয় না। বর্ত্তমানে বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্ত্তিত হওয়ায় স্কুলে শিক্ষাসরঞ্জাম ও উপকরণাদির প্রয়োজন ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে ; তবে অর্থাভাবে বহু স্কুলেই উপযুক্ত শিক্ষাসরঞ্জামাদি ক্রয় করা সম্ভব হয় না। রাজ্য সরকারী শিক্ষা দপ্তর থেকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারী শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারকল্পে উপকরণাদি ক্রয়ের জন্য বিপুল পরিমাণে অর্থ মঞ্জুরীকৃত হয়ে থাকে। কিন্তু সরকারী লালফিতার বিপাকে সে অর্থ যথাসময়ে সদ্ব্যবহৃত হতে পারে না বহু ক্ষেত্রেই। এই সমস্যার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে সরকারী বিধিব্যবস্থাকে সংস্কার করা ছাড়া উপায় নেই।

বিজ্ঞান শিক্ষার সূক্ষ্ম উপকরণাদির আর একটি সমস্যা হলো দুষ্প্রাপ্যতা। আমাদের দেশে এখনও ঐ ধরনের নিখুঁত উপকরণাদি যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হয় না বলে বিদেশী উপকরণের সন্ধান করতে হয়। কিন্তু আমদানী নিয়ন্ত্রণের জটিল বিধিব্যবস্থার দরুণ সকল সময় সে সকল উপকরণ সহজলভ্য হয় না। ফলে অর্থবরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও উপকরণ ক্রয় করা সম্ভব হয় না, অথবা নিকৃষ্ট উপকরণ ক্রয়ে বাধ্য হতে হয়।

বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বিবিধ প্রকার শ্রুতি-দৃশ্য (audio-visual) শিক্ষা উপকরণ, যেমন—রেডিও, সিনেমা, টেপ রেকর্ডার, গ্রামোফোন, ছবির এলবাম, প্রভৃতির প্রচলন হয়েছে। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশে অতি অল্প স্কুলেই এসকল উপকরণ রাখা সম্ভব হয়েছে এবং এগুলির ব্যবহার জানার জন্য শিক্ষকদের যে বিশেষ দক্ষতা থাকা দরকার, তাও অনেকের থাকে না।

ফলে, এজাতীয় উপকরণ আছে এমন বহু স্কুলে এগুলি একেবারেই অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকে। অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকার আরও কারণ আছে। শিক্ষামূলক বেতার অনুষ্ঠান স্কুল-সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের শোনানোর যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় না, সিনেমা যন্ত্র থাকলেও উপযুক্ত ফিল্ম পাওয়া যায় না, গ্রামোফোন রেকর্ডে ভারতীয় ভাষায় শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান বিরল বলা চলে। এসকল বিষয়ে শিক্ষাবিদ্, ব্যবসায়ী ও সরকারী উদ্যোগের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার।

উপকরণাদির আলোচনা প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের আসবাবপত্রের সমস্যাও আসে। এদেশে পাশ্চাত্ত্য ধরনের শিক্ষারীতি প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টেবিল চেয়ার, বোর্ড ইত্যাদি ব্যবহারের রেওয়াজ অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে। এগুলি শ্রেণীকক্ষের অনেকখানি স্থান অধিকার করে থাকে এবং কক্ষ পরিচ্ছন্ন রাখার বহু সমস্যার সৃষ্টি করে। এজন্য কেমন আসবাবপত্র হলে স্বল্পতম স্থান অধিকার করবে এবং কক্ষের উন্মুক্ততা রক্ষা হবে, তা বিবেচ্য। অল্প বয়সের শিশু-শিক্ষার্থীদের স্কুলে আসবাবপত্র সম্পর্কে আরও কতকগুলি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। তাহারে দৈহিক গঠনের উপযোগী ছোট হাল্কা চেয়ার টেবিল তৈরী করানোই বাঞ্ছনীয় বলে অনেকে মনে করেন।

এছাড়া চেয়ার টেবিলের বা বেঞ্চের উচ্চতা, আসনাংশ ও পশ্চাৎ-অংশ কিরকম হলে শিক্ষার্থীর শরীর ও মনের অপকার হবে না, সহজে ক্লান্তি আসবে না—এগুলিও বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য। বহু স্কুলে শিক্ষার্থীদের বসবার বেঞ্চ ও সামনের বই রাখার বেঞ্চের মধ্যে উচ্চতার এমন অসঙ্গত পার্থক্য থাকে যে, শিক্ষার্থীদের চোখ থেকে মাত্র ৬ বা ৮ ইঞ্চি দূরে বই বা খাতা রাখতে হয়। বলা বাহুল্য, এর ফলে শিক্ষার্থীদের চোখের ক্ষতি হয় এবং অল্পেই ক্লান্তি আসে।

আমাদের দেশে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই বিদেশী ধরনের চেয়ার-টেবিলের রীতি ত্যাগ করে মেঝের ওপর বসে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা আছে। শান্তিনিকেতন ও ওয়ার্দ্ধার শিক্ষাপ্রচেষ্টা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

সত্য সত্যই, শিক্ষাকে চিত্তাকর্ষক করে তোলার জন্য আধুনিক জগতে বিভিন্ন প্রকার উপকরণ ব্যবহারের রেওয়াজ হলেও আমাদের দরিদ্র দেশে সেগুলি আজও বাহুল্য বলে মনে করা হয়ে থাকে এবং মনে হয়, শিক্ষাব্যয় হ্রাসের জন্য উপকরণ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি সম্পর্কে একটি করণীয় হলো উপকরণের বাহুল্য হ্রাস করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আত্মিক যোগ বৃদ্ধির দিকে সচেষ্ট হওয়া। আসবাবপত্রের দিক থেকেও যথাসম্ভব অনাড়ম্বর ও সরল ব্যবস্থা অবলম্বন করা যুক্তিসঙ্গত।

VI

PROBLEMS OF CONTROL AND MANAGEMENT

[Need of coordination—Supervision and inspection—existing defects—Control over opening of schools—conditions for recognition of schools.]

Q. 1. Discuss the part played by different agencies in Indian education and the need of co-ordinating the functions of such agencies.

Ans. (বর্ত্তমানে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বিশদ আলোচিত হয়েছে) কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, শিক্ষা দপ্তর, স্থানীয় পৌর প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থার প্রচেষ্টায় আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়াও, বহু ব্যক্তিগত ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টাও আছে। তবে মূলতঃ, শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব রাষ্ট্রের, অতএব সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার যথাযথ সমন্বয় সাধন করাও রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য। রাজ্য সরকার সমূহের শিক্ষা দপ্তরগুলি যেমন স্কুলের শিক্ষা বিষয়ে দায়িত্ব বহন করে থাকেন, তেমনি অন্যান্য মন্ত্রী-দপ্তরের তত্ত্বাবধানেও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কৃষি মন্ত্রী দপ্তর, শিল্পবাণিজ্য মন্ত্রীদপ্তর, পরিবহন ও সংযোগ মন্ত্রী দপ্তর, শ্রম মন্ত্রী দপ্তর প্রভৃতির নিজস্ব তত্ত্বাবধানে এবং প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে উল্লিখিত স্কুলগুলির কর্ম্মসূচী সম্পর্কে কোন সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা নেই, কারণ মন্ত্রী দপ্তরগুলি পরস্পরের কর্ম্মসূচীর সংযোগ রক্ষা করতে পারে না। ফলে, বহু অপচয় ঘটে থাকে।

এইজন্য এমন একটি সংস্থা বা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, যার মাধ্যমে মন্ত্রী-দপ্তরগুলির এই সকল শিক্ষা প্রচেষ্টা যথাযথভাবে সমন্বিত হতে পারে। যে সকল শিক্ষাপর্য্যায়ে একাধিক মন্ত্রী-সভার উদ্যোগ অপরিহার্য্য, সে সকল ক্ষেত্রে উক্ত সমন্বয়-সাধক ব্যবস্থা থাকলে প্রচেষ্টার অপচয় সম্ভব হবে না। বিভিন্ন দপ্তরের জন্য দক্ষ কর্ম্মীদের বিশেষ কর্ম্মনিপুণতা শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ স্কুল বা তদ্রূপ শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনা না করে বহু মন্ত্রী দপ্তরের অধীনে তাদের কর্ম্মচারীদের সন্তানদের জন্য সাধারণ পর্য্যায়ের মাধ্যমিক স্কুল পরিচালিত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, পরিবহণ দপ্তরের তত্ত্বাবধানে একটি সাধারণ পর্য্যায়ের প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুল পরিচালিত হওয়া অপেক্ষা একটি ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিবহণ দপ্তরের উপযোগী দক্ষ কর্ম্মী সৃষ্টির আয়োজন হওয়াই অধিকতর বাঞ্ছনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। রেল দপ্তরের অধীনে

কর্ম্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য বহু স্কুল আছে ; কিন্তু এই বিপুল পরিবহন সংস্থাটির ক্রমবর্দ্ধমান দক্ষ কর্ম্মীর প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর কর্ম্মী-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের স্থাপনাই আশু প্রয়োজন।

অবশ্য বৃত্তিমূলক বা কারিগরী শিক্ষার আয়োজনের সঙ্গে যাতে উপযুক্ত পরিমাণে সাধারণ শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা থাকে, সে বিষয়েও সযত্ন হওয়া প্রয়োজন। যেমন, শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রী-দপ্তরের অধীনে বহু কর্ম্মী-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ছিল, যেগুলিতে বিগত যুদ্ধকালীন প্রয়োজনে কেবল কারিগরী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষণ দেওয়া হতো, কিন্তু শিক্ষণরত কর্ম্মীদের সাধারণ শিক্ষার কোনও আয়োজন না থাকায় তাঁদের সম্যক্ ব্যক্তিত্ব স্ফুরণ সম্ভব হতো না। সম্ভবতঃ এখনো অনেক কারিগরী শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে, যেগুলিতে সাধারণ শিক্ষা অবহেলিত হয়ে আসছে। কিন্তু ইদানীং সমগ্র জগতে শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যে, বিজ্ঞানোন্নত বর্ত্তমান বিশ্বসভ্যতার তাগিদে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় বিপুল চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার সমন্বয় যথাযথভাবে সাধিত না হলে ধীরে ধীরে সমগ্র মানবজাতির আত্মিক অবনতি ঘটতে পারে এবং মানব সভ্যতার বহু মূল্যবান বৈশিষ্ট্য ক্রমে বিকৃত ও বিলুপ্ত হতে পারে।

এই সকল বিষয়ে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরে একটি বিশেষ কমিটি সংগঠিত হওয়া উচিত। রাজ্য সরকার পর্য্যায়েও এরকম সমন্বয় কমিটি থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই শ্রেণীর কমিটিতে বিভিন্ন মন্ত্রীরা থাকবেন এবং তাঁরা মাঝে মাঝে মিলিত হয়ে স্ব স্ব মন্ত্রী দপ্তরের পরিপূর্ণ অবদান একত্রিত করে সকল প্রকার শিক্ষা বিস্তারের পথ সুগম করতে পারবেন। এই ব্যবস্থা আন্তরিকভাবে প্রবর্ত্তিত হলে শিক্ষাক্ষেত্রে বহু অপব্যয় নিবারিত হতে পারবে। এই কমিটির সভাপতি হবেন শিক্ষা মন্ত্রী এবং কর্ম্মসচিব হবেন রাজ্যের শিক্ষাসচিব।

মন্ত্রী পর্য্যায়ে সমন্বয় কমিটি গঠিত হওয়ার পরে শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন দপ্তরের মুখ্য কর্ম্মসচিবদের নিয়েও একটি সমন্বয় কমিটি সংগঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিভাবে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কারিগরী, বৃত্তিমূলক, কৃষিসংক্রান্ত, ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিবিধ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার হতে পারে, সেবিষয়ে এই সচিব সমন্বয় কমিটি আলোচনা-পর্য্যালোচনা করবেন এবং কর্ম্মসূচী প্রণয়ন করবেন। এই কমিটির আহ্বায়ক হতে পারেন শিক্ষা অধিকর্ত্তা (ডিরেক্টর-অব এডুকেশন) এবং সহ-শিক্ষা অধিকর্ত্তা হবেন কর্ম্মসচিব। এই সমন্বয় কমিটির কর্ত্তব্য হবে সমগ্র দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের অবদানের পরিমাপ করা এবং একই প্রচেষ্টা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে অনুসরণ করে যে অপচয় হয়, তা রোধ করা। এই কমিটি এমন একটি মূল পরিকল্পনা

প্রণয়ন করবে, যার দ্বারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদান ব্যবস্থার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার সম্ভব হয় এবং সকল প্রকার প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা সহজলভ্য হয়। কোনও দপ্তর যদি কোনও বিশেষ ধরনের শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করতে প্রস্তাব করে, তবে সেই প্রস্তাব সর্ব্বপ্রথম সমন্বয় কমিটির কাছে দাখিল করা হবে এবং কমিটি সমগ্র দেশে শিক্ষাদান সুযোগগুলিকে একটি সুন্দর সুনিয়মী ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে। জনসাধারণও কমিটি মারফৎ সকল প্রকার শিক্ষাগ্রহণের সঠিক তথ্যাদি সহজে পাবে এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা গ্রহণে সুবিধা হবে।

এছাড়া, রাজ্য বোর্ড অব এডুকেশন, বোর্ড অব টিচার্স ট্রেণিং, সেণ্ট্রাল এডভাইসরী বোর্ড অব্ এডুকেশন, রাজ্য এড্ভাইসরী বোর্ড অফ্ এডুকেশন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার মাধ্যমে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ম্মধারাকেও সমন্বিত করার চেষ্টা বাঞ্ছনীয়। উল্লেখযোগ্য এই যে, এবিষয়ে আমাদের দেশের শিক্ষা-কর্ত্তৃপক্ষেরা অনেকখানি অগ্রসর হতে পেরেছেন এবং আশা করা যায়, বেসরকারী পর্য্যায়ে শিক্ষা সমন্বয় সরকারী পর্য্যায়ের চেয়ে বর্ত্তমানে বহুলাংশেই আশাপ্রদ।

Q. 2. Discuss the existing defects and problems of supervision and inspection of schools in India, with suggestions for improvement.

Ans. বর্ত্তমানে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের যে ব্যবস্থা প্রচলিত, তার বিরুদ্ধে বহুভাবেই সমালোচনা হয়ে থাকে। প্রথমতঃ, পরিদর্শনের সমগ্র কাজটুকুই যেন নিতান্ত মামুলী কর্ম্মসূচী অনুসরণের তাগিদেই সমাধা করা হয়ে থাকে এবং যতটুকু সময় ব্যয় করে স্কুলের অসুবিধাগুলি ভালভাবে উপলব্ধি করা দরকার, তা কোন পরিদর্শকই করেন না। যে সকল পরিদর্শক অধিকক্ষণ একটি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে সময় কাটান, দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা হিসাব নথিপত্র এবং স্কুল পরিচালনার বিশদ পর্য্যালোচনায় এত সময় ক্ষেপণ করেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত শিক্ষাদান বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেন না। পরিদর্শকগণ শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন না, ফলে শিক্ষকগণ কিভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করতে চান এবং তার কি অসুবিধা, তাঁদের কি প্রয়োজন, রাষ্ট্র তাঁদের কিভাবে সহায়তা করতে পারে, সে সব কিছুই জানার চেষ্টা করা হয় না।

এই অবহেলার একটি কারণ হলো এই যে, একটি অঞ্চলে যতগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, সেই অনুপাতে পরিদর্শকের সংখ্যা খুবই অল্প। পরিদর্শক সকল প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে পারেন না, করলেও পরিদর্শন সুষ্ঠু হয় না। তাছাড়া, সরকারী নিয়মবিধি এমনই যে, কোনও পরিদর্শক স্কুল কর্ত্তৃপক্ষকে

নিজ অভিমত অনুযায়ী স্কুল পরিচালনা বা শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে কোন প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার অধিকারী ন'ন; স্কুল পরিচালনার যে সকল নির্দিষ্ট বিধি ঘোষিত আছে, কেবলমাত্র সেইগুলি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা লক্ষ্য করা ও বিবরণী দাখিল করাই তাঁদের কর্ত্তব্য। প্রায়ই এমন শোনা যায় যে, পরিদর্শক স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে সহানুভূতি না দেখিয়ে তীক্ষ্ণ সমালোচনার দ্বারা স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের বিরাগভজন হয়ে থাকেন এবং ফলতঃ পরিদর্শকরা এই সব কারণে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিরূপেই পরিগণিত হয়ে থাকেন।

প্রকৃতপক্ষে, পরিদর্শককে উপদেষ্টারূপেই কাজ করতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আন্তরিকভাবে উপলব্ধির চেষ্টা করে। সেই সমস্যার মধ্যেও কিভাবে বিভাগীয় বিধি নিয়মাদি অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি করা যায়, পরিদর্শকের উচিত সেই বিষয়েই সহযোগিতা করা এবং প্রয়োজনমত পরামর্শ দান করা। এ ছাড়া শারীর শিক্ষা, গৃহবিজ্ঞান শিক্ষা, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলির বিশেষ ধরনের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে যাতে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে যথার্থ সহযোগিতা করতে পারেন, সেজন্য মাঝে মাঝে ঐ সকল বিষয়ে পারদর্শী বিশেষ পরিদর্শককে স্কুল পরিদর্শনে পাঠানো উচিত। একজন পরিদর্শক সকল বিশেষ বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞ হতে পারেন না।

পরিদর্শক নির্ব্বাচন ব্যাপারেও বর্ত্তমানে ত্রুটি আছে। কোন কোন রাজ্যে কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী হলেই পরিদর্শকের যোগ্যতা আছে বলে স্বীকৃত হয়। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষণ ডিগ্রীও থাকা দরকার এবং অন্ততঃ পক্ষে দশ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। যে সকল প্রার্থী অন্তত-পক্ষে তিন বছর প্রধান শিক্ষকতা করেছেন অথবা শিক্ষক শিক্ষণ কলেজে অধ্যাপনা করেছেন, তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়া বাঞ্ছনীয়। মুদালিয়র কমিশনের বিবরণীতে এমন কথাও বলা হয়েছে যে, অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষক-শিক্ষণ অধ্যাপকদের তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্য পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত করে আবার স্ব-পদে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলে শিক্ষক ও পরি-দর্শকের অসুবিধা ও সমস্যাগুলি সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি অনেকাংশে হ্রাস পেতে পারে।

পরিদর্শকের কর্ত্তব্য দুরকম: (১) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা সম্পর্কীয় এবং (২) শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কীয়। প্রথমটির মধ্যে পড়ে স্কুলের খাতাপত্র, হিসাব, কার্য্যসূচী প্রভৃতি এবং এর জন্য পরিদর্শকের প্রয়োজন কিছু দক্ষ সহকারী। সহকারীরা ঐ সকল খুঁটিনাটি বিষয়ে মনোযোগ দিলে পরিদর্শক নিজে শিক্ষাদান সম্পর্কিত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিন্তার অবকাশ পাবেন। বর্ত্তমানে

শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকার পাঠ্যবিষয় প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, একজন পরিদর্শকের পক্ষে সকল বিষয় সম্পর্কে শিক্ষাদানের সমস্যা উপলব্ধি করা সহজসাধ্য হয় না। এজন্য মুদালিয়র কমিশনের পরামর্শানুযায়ী দক্ষ শিক্ষাবিদ্গণের একটি কমিশন প্রতি তিন বছর অন্তর প্রতিটি স্কুল পরিদর্শন করে বিবরণী দাখিল করলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত চিত্র উদ্ঘাটিত হওয়া সম্ভব হবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও উপকৃত হবে।

Q. 3. Describe the several types of school management in India.

Ans. ভারতে স্কুল পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্ত্তৃপক্ষ আছেন। রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে যে সব স্কুল আছে সেগুলির সংখ্যা খুবই কম। মুলতঃ, আদর্শ স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই সরকারী স্কুলগুলি স্থাপিত হয়ে থাকে, কিন্তু শিক্ষার্থী সংখ্যা সর্ব্বক্ষেত্রেই বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ আদর্শ মান অক্ষুণ্ণ রাখা প্রয়াই সম্ভব হচ্ছে না।

সরকারী স্কুলের প্রচেষ্টা খুব সীমিত হওয়ার দরুণ অন্যান্য বিবিধ কর্ত্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানেও বহু বেসরকারী স্কুল আছে এবং সেগুলির পরিচালকগণ ক্রমবর্দ্ধমান শিক্ষার্থী সংখ্যার দাবী পূরণে উৎসাহী হলেও বহুক্ষেত্রেই তাঁরা স্কুলের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা ও পরিচালন রীতিনীতি সম্পর্কে সম্যক্ অবহিত নন। বেসরকারী স্কুল বলতে বোঝায়:

(১) ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত স্কুল;
(২) ধর্ম্মমূলক প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক পরিচালিত স্কুল;
(৩) রেজেষ্ট্রিকৃত অছি পরিষদ কর্ত্তৃক পরিচালিত স্কুল;
(৪) অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা পরিচালিত স্কুল; এবং
(৫) ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় পরিচালিত স্কুল।

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত স্কুলগুলির শিক্ষামান সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করে থাকেন এবং এই সকল স্কুলের পরিচালন ব্যবস্থা সাধারণতঃ খুবই শিথিল হয়ে থাকে। এই শিথিলতা দূর করার জন্য স্কুলগুলি পরিচালনার উদ্দেশ্যে এডুকেশন অফিসার বা তাঁর মনোনীত সহকারী সচিবকে নিয়ে একটি করে পরিচালন সমিতি প্রত্যেক স্কুলে থাকা উচিত। এডুকেশন অফিসার অবশ্যই নিয়মিতভাবে প্রতিটি স্কুল স্বয়ং পরিদর্শন করবেন।

ধর্ম্মমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি বহু স্কুল পরিচালনা করে থাকে এবং এদের শিক্ষা-ক্ষেত্রে অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্ম্মমূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালিত স্কুলগুলির পরিচালন ব্যবস্থাও মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক। অবশ্য এমন অনেক স্কুল আছে, যা' ধর্ম্মমূলক প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক পরিচালিত হলেও অত্যধিক শিক্ষার্থী সংখ্যা, অপর্য্যাপ্ত শিক্ষকমণ্ডলী প্রভৃতি দোষে দুষ্ট। আবার এই শ্রেণীর

কোন কোন স্কুলে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির চর্চ্চা হয়ে থাকে বলে শিক্ষার সুফল দেখা যায় না।

রেজিষ্ট্রিকৃত অছি পরিষদ বা ট্রাষ্ট বোর্ড কর্ত্তৃক পরিচালিত স্কুলগুলি সাধারণতঃ কোনও দাতার বিশেষ ইচ্ছাপূরণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই জন্যই অছি পরিষদের নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তানুযায়ী স্কুল পরিচালিত হয় এবং স্কুলের সুযোগ-সুবিধা বহু ক্ষেত্রে সমাজের বৃহত্তর অংশের উপকারে আসে না। আইন প্রণয়নের দ্বারা অছি পরিষদ পরিচালিত স্কুলগুলির এইসব অসুবিধা দূর করে সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনে সেগুলি উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা করা উচিত। সঙ্কীর্ণ মনোভাবসম্পন্ন কোন স্কুলকে সরকারী অর্থসাহায্য দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠান অগণিত স্কুল পরিচালনা করে থাকেন এবং সেগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানগুলি রেজেষ্ট্রিকৃত হওয়া উচিত।

ব্যক্তিগত পরিচালনাতেও বহু মালিকানা-সত্ত্বসম্পন্ন স্কুল এদেশে আছে। শিক্ষার ক্রমবর্দ্ধমান দাবী পূরণে এই স্কুলগুলির অবদান কোনক্রমেই তুচ্ছ নয়। তবে এই প্রতিষ্ঠানগুলির একটি রেজেষ্ট্রিকরণের ব্যবস্থা থাকলে ন্যূনতম শিক্ষামান অক্ষুণ্ণ রাখা সহজ হতে পারে। এই সকল মালিকানা স্কুলগুলির বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা এই যে, এগুলি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু একথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, একজন আন্তরিক শিক্ষাবিদ্ আপন উদ্যোগে একটি স্কুল স্থাপনা ও পরিচালনা করে আপন গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থানে সচেষ্ট হলে সেটা কোনমতেই দোষনীয় নয়। বরং বহুক্ষেত্রেই দেখা যায়, মালিকানা স্কুলগুলিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা সীমিত হয় বলে ব্যক্তিগত যত্নে শিক্ষাদান ও পরিচালনার মান যথেষ্ট উন্নত হয়ে থাকে।

Q. 4. Discuss the needs and methods of control over the opening of schools.

Ans. ইদানীং স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় নূতন স্কুল সুরু করার সর্ত্তাদির বহু শিথিলতা আনা হয়েছে। এমন বহু স্কুল আছে, যেগুলি সরকারী অনুমোদিত নয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মালিকানা পরিচালিত। এইধরনের স্কুলগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট সহযোগিতা করে, একথা ঠিক। কিন্তু অনেক স্কুল পুরোপুরি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে থাকে এবং শিক্ষার মূল লক্ষ্য অবহেলিত হয় বলে আশঙ্কা করা হয়। এই সব স্কুলের অনেক ক্ষেত্রেই ভাল স্কুলভবন থাকে না এবং শিক্ষার্থীরা খুবই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অধ্যয়ন করতে বাধ্য হয়। সম্ভবতঃ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অভাবেই স্থানীয় ব্যক্তিরা এইধরনের উদ্যোগে এগিয়ে আসেন এবং যথাযথ উৎসাহ ও পথনির্দ্দেশ পেলে এসব স্কুলগুলিই আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হতে পারে।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ছাড়া বেসরকারী স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগেই সহজে শিক্ষাপ্রসার সম্ভব। সেজন্য বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করা বাঞ্ছনীয়, তবে স্কুলগুলি অবশ্যই কতকগুলি ন্যূনতম বিধি ও সর্ত অনুসরণ করতে বাধ্য থাকবে, নতুবা প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য কখনই সাধিত হবে না। এইজন্য রাষ্ট্রীয় নির্দ্দেশানুযায়ী স্কুলগুলিকে অনুমোদিত বা রেজেষ্ট্রিকৃত হতে হবে।

অনেকে মনে করেন, সকল নূতন স্কুল খোলার দায়িত্ব রাষ্ট্রেরই গ্রহণ করা উচিত এবং সকল বেসরকারী স্কুলগুলিকেও রাষ্ট্রায়ত্ত করা কর্ত্তব্য। বিভিন্ন বাস্তব সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রস্তাব আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তাতে কেন্দ্রায়ত্ত পরিচালনার কর্ত্তৃত্বময় ত্রুটি এবং অর্থনৈতিক সমস্যা বৃদ্ধি পাবে মাত্র। গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টাকেই অধিকতর মূল্যবান বলে গণ্য করা শ্রেয়।

সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত স্কুলগুলির পাশে পাশেই বেসরকারী স্কুল চলার ব্যবস্থা থাকলে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর উন্নতির পথ উন্মুক্ত থাকে। অবশ্য যেসকল বেসরকারী স্কুল ন্যূনতম সর্ত্তাদি অনুসরণ করতে পারবে না, সেগুলির অনুমোদন তো বাতিল করা উচিতই এবং তাদের পরিচালনা ভারও রাষ্ট্রায়ত্ত করা উচিত, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য।

রাষ্ট্র যদি বেসরকারী স্কুলগুলির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান, অনুমোদন ও রেজেষ্ট্রি-করণের গুরুভার বহনে অক্ষম হয়, তাহলে কোনও বেসরকারী জনপ্রিয় শিক্ষাকল্যাণ সংস্থা (যেমন, শিক্ষক সমিতি) বা শিক্ষাবিদ সমিতির তত্ত্বাবধানে সকল বেসরকারী স্কুল রেজেষ্ট্রিকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

Q. 5. Suggest certain general standards and conditions for recogni ion of schools.

Ans. স্কুল অনুমোদন সংক্রান্ত নিয়মকানুন ও সর্ত্তাদি বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম। তবে সাধারণভাবে অনুমোদন বিষয়ে যে সকল ন্যূনতম বিধি পালন করা উচিত, সেগুলি এইরকম :

(১) ব্যক্তিগত ও মালিকানা পরিচালিত সকল স্কুলকে রেজেষ্ট্রিভুক্ত করা দরকার। কমিটি দ্বারা পরিচালিত সকল স্কুলকেও এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ দেওয়া উচিত যে, কমিটিগুলিকে এসোশিয়েশন আইনমতে রেজেষ্ট্রিকৃত হতে হবে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। কোনও স্কুল কমিটিতে ১৫ জনের বেশি সদস্য থাকবে না। এই সকল কমিটিতে প্রধান শিক্ষক অবশ্যই একজন সদস্য থাকবেন। কমিটিতে রাষ্ট্রীয় শিক্ষাদপ্তরের মনোনীত একজন সদস্যও থাকবেন। তিনি মূলতঃ উপদেষ্টারূপে কাজ করবেন এবং অনুমোদন সর্ত্তাদি সম্পর্কে স্কুল ও রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টিতে তিনি সহায়তা করতে পারবেন।

(২) স্কুল কমিটির কোনও সদস্য স্কুলের আভ্যন্তরীণ পরিচালনা, শিক্ষার্থীদের সুনিয়ম ও শিক্ষকদের কর্ত্তব্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না।

(৩) যে ক্ষেত্রে কোনও বড় শিক্ষাকল্যাণ সংস্থার অধীনে স্কুল পরিচালিত হয়, সেক্ষেত্রে একটি ছোট কমিটির হাতে প্রকৃত পরিচালনার ভার অর্পণ করা বাঞ্ছনীয়।

(৪) কমিটি স্কুলের বাজেট প্রণয়ন করবেন, শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং স্কুলের সুবন্দোবস্ত, শিক্ষক নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে আত্মনিয়োগ করবেন। শিক্ষকদের বেতন, কর্ম্মবিধি, ছুটির নিয়ম ইত্যাদি সম্পর্কে যথাযথ সর্ত্ত পালনের আয়োজন করবেন স্কুল কমিটি। প্রত্যেক শিক্ষক নিয়োজিত হওয়ার সময়ে কমিটির নিয়োগ-পত্র পাবেন।

(৫) প্রত্যেক স্কুল কমিটির একটি নির্দ্দিষ্ট সংরক্ষিত তহবিল থাকা দরকার। এই তহবিলে কি পরিমাণ অর্থ থাকবে, তা নির্ভর করবে, স্কুলের পাঠ্যবিষয়, পাঠক্রম প্রভৃতির উপর। স্কুলের হিসাবপত্র সঠিক রাখার দায়িত্ব এই কমিটির এবং হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ করবেন এই কমিটি।

(৬) স্কুল পরিচালনার জন্য যতটুকু স্থান সঙ্কুলান প্রয়োজন, তা আছে কিনা সে বিষয়ে স্কুল কমিটি শিক্ষা দপ্তরকে যথাযথভাবে অবহিত করবেন। স্কুলে ক্রীড়াঙ্গণ, অবসর কক্ষ, ভোজন কক্ষ থাকাও বাঞ্ছনীয়। সহশিক্ষা স্কুলে বালিকাদের জন্য পৃথক অবসর কক্ষ থাকা দরকার। প্রত্যেক স্কুলের শিক্ষক-মণ্ডলীতে কিছু কিছু শিক্ষিকা থাকা বাঞ্ছনীয় এবং শিক্ষকদের আবাসস্থান যাতে স্কুলের কাছাকাছি হয়, সেবিষয়েও স্কুল কমিটি সচেষ্ট হবেন।

(৭) স্কুল কমিটি লক্ষ্য রাখবেন যাতে শিক্ষকমণ্ডলীর সকলেই যথাযথ সুশিক্ষিত এবং শিক্ষণপ্রাপ্ত সচ্চরিত্র হন এবং শিক্ষাদপ্তরের নির্দ্দেশিত বিধি অনুযায়ী তাঁরা যেন শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। একই রাজ্যের সকল জেলায় শিক্ষক নিয়োগের সর্ত্তাদি একই রকম হওয়া দরকার, নতুবা শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ জাগতে পারে।

(৮) স্কুলের স্থান সঙ্কুলান অনুসারে প্রতি শ্রেণীতে শিক্ষার্থী সংখ্যা সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। কোন স্কুলে সর্ব্বসমেত ৫০০ থেকে ৭৫০ জনের বেশি শিক্ষার্থী থাকা উচিত নয়। অবশ্য যে সকল স্কুলে বহুসাধক পাঠক্রম প্রবর্ত্তিত হবে, সেখানে শিক্ষার্থী সংখ্যা ১০০০ হতে পারে এবং কোন শ্রেণীতে ৪০ জনের বেশি শিক্ষার্থী থাকবে না। বর্ত্তমানে স্কুলগুলিতে প্রতি শ্রেণীর শিক্ষার্থী সংখ্যার কোন সীমা নেই এবং একটি শ্রেণীর বহু সেকশনও খোলা হয়ে থাকে। প্রতি শ্রেণীর সেকশন সংখ্যাও সীমিত হওয়া দরকার, নতুবা অল্প পরিসরে অল্প শিক্ষকের অত্যন্ত কাজের চাপ বৃদ্ধি পায়। বহু সেকশনের ফলে অসম প্রতিযোগিতা জন্মে এবং স্কুলের সুনিয়ম বিঘ্নিত হয়।

(৯) বর্ত্তমানে স্কুলের শিক্ষার্থী-বেতন হার বিভিন্ন রকম। যদিও বেতন-হার একরকম করার অনেক অসুবিধা আছে, তবুও এমন ব্যবস্থা করা যায় যে, বেতন-হার প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে শিক্ষাদপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। নচেৎ নির্ব্বিচারে স্কুলের বেতন বৃদ্ধি পাওয়া রোধ করা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, অসম বেতন হারের জন্য স্থানীয় স্কুলগুলির মধ্যে অকারণ অস্বাস্থ্যকর বিদ্বেষ ও প্রতিযোগিতা দেখা যায়, যা কোনমতেই শিক্ষার সহায়ক নয়। বহু স্কুলে "অন্যান্য বেতন" হিসাবে নানাপ্রকার বেতন ধার্য্য ও আদায় করা হয়, যেগুলির সমষ্টি প্রায় মাসিক বেতনের অর্দ্ধেক। বেশি বেতন বা অন্যান্য বেতন গ্রহণের ফলে যে অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চিত হচ্ছে, তা' যে প্রকৃতপক্ষে স্কুলের উন্নয়নের কাজেই সদ্ব্যবহৃত হচ্ছে, তা শিক্ষা দপ্তরকে যথাযথভাবে বোঝাবার দায়িত্ব থাকবে স্কুল কমিটির।

(১০) ধর্ম্মমূলক সংস্থা কর্ত্তৃক পরিচালিত স্কুলগুলিতে যাতে কোনরকম সাম্প্রদায়িক শিক্ষা না দেওয়া হয় এবং শিক্ষক নিয়োগ ও ছাত্র ভর্ত্তি ব্যাপারে কোনরকম সাম্প্রদায়িক ভেদ চিন্তা না করা হয়, সে বিষয়ে স্কুল কমিটি অবশ্যই শিক্ষা দপ্তরকে প্রতিশ্রুতি দেবেন।

(১১) স্কুলে আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য স্কুল কমিটি সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা সরঞ্জাম সংগ্রহের আয়োজন করবেন, তবে যে সকল স্কুলে বহুসাধক পাঠক্রম অনুসারে কারিগরী ও কৃষিবিদ্যা প্রবর্ত্তিত হবে, সেখানে মূল্যবান শিক্ষা সরঞ্জামাদি সরবরাহের দায়িত্ব রাষ্ট্রেরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

VII

PROBLEMS OF TEACHING PERSONNEL

[Need for improving the general conditions of teachers—methods of recruitment—Qualifications—triple benefit scheme for teachers—Problem of additional employment—Training of teachers—training institutions—research]

Q. 1. Discuss the general conditions of teachers in schools at present in India and the need for improving them.

Ans. সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির মূলে যাঁর উপস্থিতি ও আন্তরিকতা অপরিহার্য্য, তিনি হলেন শিক্ষক। শিক্ষকের গুণপনা, নৈপুণ্য, অভিজ্ঞতা, বিশেষ শিক্ষণ এবং সামাজিক মর্য্যাদা—এ সকলই শিক্ষাপ্রসারের পক্ষে একান্তই প্রয়োজন। কোনও স্কুলের সুনামও নির্ভর করে শিক্ষকমণ্ডলীর বৈশিষ্ট্যের ওপরেই। এই কারণেই শিক্ষকদের সামাজিক মর্য্যাদা ও সন্তুষ্টির জন্য যা করা উচিত, তা অনতিবিলম্বেই করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাঁদের ওপর শিক্ষার ভার অর্পিত, আজ তাঁরাই সম্ভবতঃ সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা অবহেলিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। একই শিক্ষাদীক্ষা-সম্পন্ন ব্যক্তি অন্য জীবিকায় নিযুক্ত থেকে সমাজে যে মর্য্যাদা পেয়ে থাকেন, সমান শিক্ষাসম্পন্ন একজন শিক্ষক তা পান না। আগেকার দিনে শিক্ষক সমাজের যতটুকু সম্মান ছিল, আজ তা'ও নেই। তাঁদের কর্ম্মস্থলে কর্ম্মনিয়োগের নিশ্চয়তা নেই, স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের কাছে সদ্ব্যবহার নেই। শিক্ষক সমিতিগুলি এই সমস্যা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করে থাকেন, কিন্তু কোন প্রতিকার করতে পারেন না।

অবশ্য ইদানীং বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষকদের বেতন হার, কর্ম্মনিয়োগের সর্ত্তাদির বহুবিধ সুবিধা ও উন্নতি সাধন করা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে শিক্ষকসমাজের অবস্থার উন্নতি তাতে হয়নি। কারণ দেশের জনসাধারণের জীবনধারণের ব্যয় প্রতিনিয়তই ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। একথাও সত্য যে, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বহুবিধ নূতন নূতন সমস্যার ফলে এবং অর্থনৈতিক চাপে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেও শিক্ষকদের অবস্থা উন্নয়নের বিশেষ প্রচেষ্টা দেখা যায় না। ফলে শিক্ষকদের জীবন ধারণের জন্য স্কুলে অধ্যাপনা ছাড়াও আরও বহুপ্রকার কাজকর্ম্মের মাধ্যমে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করতে হয় এবং তার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রকৃত শিক্ষার প্রতি তাঁদের মনোযোগ ও আন্তরিকতা স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পেয়ে থাকে। গৃহশিক্ষকতা,

কোচিং প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, অল্পমূল্যে নোটবুক রচনা প্রভৃতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জ্জন করে শিক্ষকগণ কোনরকমে দিনপাত করেন বটে, কিন্তু তার ফলে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমেই ব্যবসায়ভিত্তিক হয়ে পড়েছে। এই সর্ব্বনাশা গতি থেকে শিক্ষকসমাজ তথা শিক্ষাব্যবস্থাকে রক্ষা করতে হলে অবিলম্বে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, সম্মানবৃদ্ধি, সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দিকে অভিভাবক, শিক্ষার্থী, এবং রাষ্ট্রের মনোযোগ ও কার্য্যকরী প্রচেষ্টা নিবদ্ধ হওয়া দরকার।

Q. 2 What should be the method of recruitment of teachers in schools ?

Ans. বর্ত্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষক নির্ব্বাচন ও নিয়োগের বিভিন্ন বিধি প্রচলিত আছে। তবে মনে হয়, শিক্ষকতা ক্ষেত্রে সুযোগ্য ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করার উপায়গুলি সর্ব্বক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয় না। এজন্য মেধাবী ব্যক্তিদের বিশেষ বৃত্তি উপহার দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে শিক্ষকতা ক্ষেত্রে আকৃষ্ট করা যায় কিনা, বিবেচনা করা যেতে পারে। বহু স্কুলে এখনও বহু শিক্ষণহীন শিক্ষক আছেন এবং স্কুল কর্ত্তৃপক্ষগণ সম্ভবতঃ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারেন না যে, শিক্ষণহীন শিক্ষকদের কাছে নবীন শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভ কতখানি বিপজ্জনক। অনেক স্কুলে বিভাগীয় নির্দ্দেশ অনুসারে শিক্ষণহীন শিক্ষকদের বরখাস্ত করে নূতন শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের চেষ্টা করে থাকেন। এই ব্যবস্থা অবশ্যই অবাঞ্ছনীয়। যে শিক্ষক শিক্ষকতা করছেন, তাঁর সেই আগ্রহকে সঞ্জীবিত করার জন্য তাঁকে শিক্ষণ গ্রহণের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা ও অনুপ্রেরণা দিতে হবে। অবশ্য শিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা আমাদের দেশে এখনও অপর্য্যাপ্ত এবং আরও অধিকসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া দরকার। কিন্তু তাহলেও, যতটুকু সুযোগ-সুবিধা বর্ত্তমান, তাও স্কুল পরিচালকগণ সম্পূর্ণরূপে সদ্ব্যবহার করার বলে মনে হয় না।

শিক্ষক নির্ব্বাচন ও নিয়োগ সম্পর্কে সর্ব্বত্র মোটামুটি একই রকম বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সরকারী এবং বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ বিষয়ে বিশেষ কোনও পার্থক্য থাকবে না। সরকারী স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ ব্যাপারে পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং শিক্ষাসচিবই দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন। বেসরকারী স্কুলে কোথাও সেক্রেটারী, কোথাও বিশেষ নিয়োগ কমিটি, কোথাও বা প্রধান শিক্ষক নিজেই শিক্ষক নির্ব্বাচন ও নিয়োগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রধান শিক্ষককে সদস্যরূপে নিয়ে একটি বিশেষ নিয়োগ কমিটির দ্বারাই বেসরকারী স্কুলগুলিতে শিক্ষক নির্ব্বাচন ও নিয়োগের কার্য্য সমাধা হওয়া উচিত বলে মনে হয়। এছাড়া, স্কুল কমিটিতে তো শিক্ষাদপ্তরের মনোনীত একজন সদস্য থাকবেনই। কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি

বা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড পরিচালিত স্কুলগুলিতে শিক্ষক নির্ব্বাচন ও নিয়োগ ব্যাপারে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অনুরূপ কোন সংস্থা থাকলে খুবই ভাল হয়।

শিক্ষক নিয়োগের পর কিছুকাল অবেক্ষাধীন (probationary) থাকার রীতি আছে। এই অবেক্ষা কাল সাধারণতঃ এক বছর হয়ে থাকে এবং তারপর নিয়োগ সন্নিযুক্ত (confirmed) হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সন্নিযুক্তির পূর্ব্বে এক বছরেরও বেশি অবেক্ষাধীন রাখা হয়। এই অবেক্ষা কাল বিভিন্ন রাজ্যে একই রকম হওয়াই উচিত।

Q. 3. Discuss the minimum qualifications required for the appointment of teachers in schools.

Ans. প্রাথমিক শিক্ষা পর্য্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ও বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ চলতে পারে বলে মুদালিয়র কমিশন অভিমত প্রকাশ করেছিলেন এবং ঐ কমিশনের মতে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্য্যায়ে একমাত্র শিক্ষণপ্রাপ্ত স্নাতকোত্তীর্ণ শিক্ষকদেরই নিযুক্ত করা দরকার। তবে মাধ্যমিক পর্য্যায়ে বহুসাধক স্কুলগুলিতে টেকনিক্যাল বিষয়াদির পাঠক্রম অনুসারে শিক্ষকদের যোগ্যতা সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ গুণ প্রয়োজন হতে পারে। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে বহুসাধক পাঠক্রমের যে বিশেষ বিষয়টির জন্য শিক্ষক প্রয়োজন, সেই বিষয়টিতে স্নাতক উপাধিধারী ব্যক্তিদেরই নিয়োগ সম্পর্কে কেবলমাত্র বিবেচনা করা উচিত। অবশ্য এছাড়া বিশেষ শিক্ষক শিক্ষণও থাকা দরকার।

অবশ্য বর্ত্তমানে উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত আগ্রহশীল শিক্ষকের অভাবে বহু স্কুলেই আণ্ডার গ্রাজুয়েট আনট্রেণ্ড শিক্ষক নিয়োগ করা হয়ে থাকে এবং এই সকল আনট্রেণ্ড শিক্ষকরা যাতে তাঁদের যোগ্যতা বৃদ্ধি করবার সুযোগ পান, সেজন্য অবসর সময়ে অধ্যয়ন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জ্জনের উৎসাহ ও সুবিধা তাঁদের দেওয়া কর্ত্তব্য। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য এরকম সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। স্কুল কর্ত্তৃপক্ষও এই ধরনের উৎসাহী শিক্ষকদের কিছু কিছু বৃত্তি দান বিবেচনা করতে পারেন।

বর্ত্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্য্যায়টি উচ্চতর মাধ্যমিক হওয়ায় ১১ বছরের পাঠক্রম প্রবর্ত্তিত হয়েছে এবং তার ফলে শিক্ষকদের যোগ্যতা সম্পর্কিত বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রাথমিক পর্য্যায়তেও বুনিয়াদী ধরনের নূতন শিক্ষানীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে ঐ পর্য্যায়ের শিক্ষকদেরও যোগ্যতা সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। উচ্চতর মাধ্যমিক পর্য্যায়ে বহু সাধক পাঠক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে পথনির্দ্দেশ করার পক্ষে একমাত্র সুশিক্ষিত ও শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরই প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে; অনুরূপভাবেই, প্রাথমিক পর্য্যায়ে বুনিয়াদী শিক্ষার শিল্পকেন্দ্রিক

ও অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করার জন্যও শিক্ষণপ্রাপ্ত প্রগতিশীল সহানুভূতিসম্পন্ন শিক্ষকমণ্ডলীর একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

পাঠক্রমের এই সংস্কার ও প্রসারতার জন্যই উচ্চতর মাধ্যমিক ও নব প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগের পূর্ব্বে যোগ্যতা সম্পর্কে বিশেষভাবে যত্ন নেওয়া দরকার। উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে বিভিন্ন পাঠক্রম প্রবাহের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে এম. এ., এম. এসসি বা বি.এ. বি. এসসি অনার্স শিক্ষক নিয়োগে নির্দ্দেশ দিয়ে থাকেন বিভাগীয় শিক্ষা দপ্তর। বর্ত্তমান উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাপর্য্যায়ের শেষ দুটি শ্রেণীতে পূর্ব্বতন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টার-মিডিয়েট পর্য্যায়ের পাঠক্রম সমন্বিত হওয়ায় ঐ শ্রেণীগুলিতে অধ্যপনার জন্য অবশ্যই ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদেরই নিযুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত। সেইমত অনার্স স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরই নিয়োগ ব্যবস্থা যথাযথই হয়েছে বলা চলে। প্রথম শ্রেণীর স্নাতক ও শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরও নিয়োগ করা যেতে পারে। এম. এ. শিক্ষক পাওয়া না গেলে শিক্ষাতত্ত্বে ডিগ্রীধারী শিক্ষকদেরও নিয়োগ করা যেতে পারে। কলেজে অধ্যাপনায় অভিজ্ঞ শিক্ষকদেরও নিয়োগ করা চলে।

Q. 4. Discuss certain important conditions of service for teachers which merit consideration.

Ans. শিক্ষকদের বেতন, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও পেন্‌সন্ সংক্রান্ত বিষয়গুলি শিক্ষকদের চাকুরীর ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল সর্ত্তাদি অপেক্ষা বর্ত্তমানে অধিকতর আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষকদের বেতনহার এতই অল্প যে, শিক্ষকমহলে সর্ব্বপ্রকার অসন্তোষের মূল কারণ হয়েছে এই বিষয়টিই। যদিও বহু কমিটি ও কমিশন শিক্ষকদের ন্যূনতম বেতন হার নির্দ্ধারণের সুপারিশ করেছেন, সেণ্ট্রাল পে কমিশন, সেণ্ট্রাল এডভাইসরী বোর্ড অব এডুকেশন ও খের কমিটির রিপোর্টে এবিষয়ে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত হয়েছে, তবুও আজও পর্য্যন্ত সন্তোষজনক ব্যবস্থা কিছুই করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য শিক্ষকদের বেতন সকল রাজ্যেই কিছু কিছু বর্দ্ধিত হয়েছে এবং শিক্ষক সমিতিগুলি এ নিয়ে অবিরামভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, তা সত্ত্বেও ক্রমবর্দ্ধমান ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির অনুপাতে সামান্য বেতনবৃদ্ধির কোনও সুফলই বোধগম্য হচ্ছে না। একারণেই শিক্ষক বেতন সম্পর্কিত বিষয়টির জরুরী বিবেচনা হওয়া দরকার।

শিক্ষাদপ্তর কর্ত্তৃক শিক্ষকদের জন্য যে ন্যূনতম বেতন নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে, সাধারণতঃ সেগুলি সকল সরকারী ও সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী স্কুলে অনুসরণ করা হয়। তবে বেসরকারী প্রায় কোন স্কুলেই রাষ্ট্র নির্দ্দেশিত শিক্ষক বেতন হার অনুসরণ করা হয় না। একই যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক

যাতে সরকারী বা বেসরকারী যে কোন স্কুলে সমান বেতন পাওয়ার মর্য্যাদা লাভ করতে পারেন, অন্ততঃ সেই ব্যবস্থাটুকুও রাষ্ট্রের উদ্যোগে হওয়া উচিত। বিভিন্ন রাজ্য সরকারের শিক্ষাদপ্তর থেকে শিক্ষকদের বেতনের বিভিন্ন হার নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে। এটিও বাঞ্ছিত নয়, কারণ এর ফলে বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষকদের বৈষম্যবোধ জাগ্রত হয়ে জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা। অবশ্য বিভিন্ন রাজ্যের মূল্যমান ও রাষ্ট্রীয় তহবিলের সামর্থ্যের ওপরই নির্ভর করে সেই সেই রাজ্যের শিক্ষক-বেতনের হার নির্দ্ধারণের প্রশ্নটি এবং সেইজন্যই সকল রাজ্যে একই হারে শিক্ষক বেতন দেওয়ার সুপারিশ করাও যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে সকল রাজ্যের শিক্ষাসচিব, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ ও শিক্ষক-প্রতিনিধিদের এক সম্মিলিত কমিটিতে এই বিষয়ে নিয়ত আলোচনা হওয়া দরকার, যাতে বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষক বেতন হারের পার্থক্য বিষমভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অস্বস্তিকর না হয়।

যথেষ্ট পরিমাণে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করা ছাড়াও শিক্ষকদের সামাজিক ও পারিবারিক উদ্বেগ দুশ্চিন্তা দূর করার অন্যতম উপায় হিসাবে তাঁদের জন্য প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা আরও ভাল হওয়া দরকার। শিক্ষকরা যাতে চাকুরী সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁদের নাগরিক দায়িত্বগুলি যথাযথভাবে পালনের দিকে মনোযোগী হতে পারেন, সেজন্য প্রত্যেক রাজ্যেই শিক্ষকদের জন্য প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা অবশ্য আছে। ঐ সকল ফাণ্ডে সরকার, স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের চাঁদার পরিমাণ অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন ; তবে সাধারণতঃ শিক্ষক তাঁর বেতনের ৬$\frac{1}{4}$% এবং স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ তৎপরিমাণ অর্থ প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে জমা দিয়ে থাকেন। ফাণ্ডের সমগ্র অর্থ কোন নিরাপদে ক্ষেত্রে লগ্নী করা হয় এবং চাকুরীর শেষে শিক্ষক সেই অর্থ ফেরৎ পান। কোন শিক্ষক এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে বদলী হলে তাঁর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সঞ্চিত অর্থও স্থানান্তরিত হতে পারে। কোন কোন রাজ্যে শিক্ষকের চাঁদার সমপরিমাণ অর্থ কর্ত্তৃপক্ষ দেন না—কোথাও কম, কোথাও বেশি দেওয়া হয়।

সরকারী স্কুলের শিক্ষকরা পেনশন পেয়ে থাকেন, বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকরা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বহু ক্ষেত্রে দরিদ্র শিক্ষকের মৃত্যুর পরে তাঁর পরিবারবর্গ শোচনীয় দুরবস্থার সম্মুখীন হন, এমনকি শেষকৃত্য সম্পাদনের সামর্থ্যও তাঁদের পরিবারবর্গের থাকে না। এইজন্যই বেসরকারী স্কুলের অল্প বেতনের শিক্ষকরাও দীর্ঘদিন আন্তরিক শিক্ষকজীবন অতিবাহিত করার পর শেষ জীবনে যাতে কিছু বার্দ্ধক্য ভাতা পেতে পারেন, সেরকম সুব্যবস্থা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অবশ্যই করা উচিত এবং তার ফলে বহু কৃতী ব্যক্তি শিক্ষকবৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন।

Q 5. What is Triple Benefit Scheme for teachers ?

Ans. শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা বিবেচনা না করলে কেবল বর্দ্ধিত হারে বেতন দিলেই তাঁদের কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়। এই কারণে শিক্ষকদের দুরবস্থা দূর করার উদ্দেশ্যে ত্রিমুখী কল্যাণ ব্যবস্থা (ট্রিপ্‌ল বেনেফিট স্কীম) প্রচলনের কথা বর্ত্তমানে আলোচিত হচ্ছে। এই ব্যবস্থায় শিক্ষকদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, পেনশন ও জীবনবীমা একই সঙ্গে প্রবর্ত্তিত হবে, অর্থাৎ এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হলে প্রতিটি শিক্ষকের ত্রিমুখী কল্যাণ সাধিত হবে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মচারীদের জন্য এই ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই প্রচলিত হয়েছে। শিক্ষকদের প্রফুল্ল মনে জাতিগঠনের ব্রতে উদ্বুদ্ধ করতে হলে সকল রাজ্যে ত্রিমুখী কল্যাণ ব্যবস্থা আশু প্রবর্ত্তন প্রয়োজন, সেবিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

স্কুলের প্রত্যেকটি স্থায়ী শিক্ষক ত্রিমুখী কল্যাণ ব্যবস্থার সুবিধা ভোগ করবেন। শিক্ষকের বেতনের গড়পড়তা এক-চতুর্থাংশ **পেনশন** হবে এবং চাকুরীর শেষ তিন বছরের বেতন হারের ওপরই নির্ভর করবে পেনশন হার। অবশ্য চাকুরীর সময় দৈর্ঘ্যও এ বিষয়ে বিবেচিত হবে। মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পেনশনের হার হবে নিম্নরূপ :—

চাকুরী কাল		পেনশন হার
১৫ বছর	...	গড়পড়তা বেতনের $\frac{১৫}{১২০}$ অংশ
১৬ "	...	" " $\frac{১৬}{১২০}$ "
১৭ "	...	" " $\frac{১৭}{১২০}$ "
১৮ "	...	" " $\frac{১৮}{১২০}$ "
১৯ "	...	" " $\frac{১৯}{১২০}$ "

এইভাবে ২৪ বছর চাকুরী-কাল পর্য্যন্ত হিসাব হবে। ২৫ বছর বা তার বেশি চাকুরী হলে গড়পড়তা বেতনের $\frac{৩০}{১২০}$ অংশ পেনশন হার নির্দ্ধারিত হবে। পেনশন বণ্টনের জন্য সরকারী তত্ত্বাবধানে শিক্ষাসচিবের অধীনে একটি পেনশন তহবিল গঠিত হবে। প্রত্যেক শিক্ষকের পেনশন তহবিলে প্রত্যেক কর্ত্তৃপক্ষ শিক্ষকের বেতনের ৫% হিসাবে জমা দেবেন এবং শিক্ষাসচিবের তদারকে পেনশন তহবিলে এই অর্থ প্রতিমাসে সঞ্চিত হবে। শিক্ষকের চাকুরী কাল শেষ হলে এই তহবিল থেকেই পেনশন দেওয়া হবে।

প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে প্রত্যেক শিক্ষকের চাকুরীকালে তাঁর মাসিক বেতনের অন্ততঃ ৬১/৪% জমা দিতে হবে এবং বেতনের ১২১/২% এর বেশি জমা দেওয়া চলবে না। শিক্ষক নিজেই এই হারে আপন সামর্থ্য অনুসারে চাঁদার হার ধার্য্য করবেন প্রতি বছর এবং বছরের শেষে তাঁর চাঁদার পরিমাণ সঠিকভাবে কর্ত্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেবেন। শিক্ষক যখন ছুটিতে থাকবেন, সেই সময়ের

বেতনের ওপর তিনি কোনও প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের চাঁদা না দিতেও পারেন প্রত্যেক স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের হিসাব রক্ষা করবেন এবং সঞ্চিত তহবিল ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে অথবা সরকারী কাগজে গচ্ছিত রাখতে হবে। সরকারী তহবিল থেকে শিক্ষকের বেতনের ৫% হিসাবে চাঁদা নির্দ্ধারিত হবে এবং ঐ টাকা প্রতি বৎসরান্তে অথবা চাকুরী শেষে শিক্ষকের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড হিসাবে জমা পড়বে। সরকারী চাঁদা ও তদুপরি স্থদ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে পূর্ণভাবে দেওয়া হবে :

(১) শিক্ষক ১৫ বছরের চাকুরীর পর অবসর গ্রহণ করলে ;
(২) শিক্ষক নিতান্ত অক্ষম হয়ে অবসর গ্রহণ করলে ,
(৩) স্কুলের ব্যয়হ্রাসের জন্য শিক্ষকের চাকুরী শেষ হলে ; বা
(৪) শিক্ষকের মৃত্যু হলে।

যদি ১০ বছরের বেশি কিন্তু ১৫ বছরের কম সময় চাকুরী হয়, তাহলে শিক্ষকের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে সরকারী চাঁদা ও স্থদ নিম্নরূপ হবে :—

১০ বছরের চাকুরী হলে	$\frac{১০}{১৫}$ অংশ
১১ „ „ „	$\frac{১১}{১৫}$ „

এইভাবে ১৪ বছর পর্য্যন্ত হিসাব করতে হবে।

প্রত্যেক স্থায়ী শিক্ষককে সন্নিযুক্তির (কনফারমেশন) সঙ্গে সঙ্গে জীবনবীমা করতে হবে। জীবনবীমার পরিমাণ হবে নিম্নরূপ :—

(১)	মাসিক বেতন টা. ৪৫ এর কম হলে	টা. ৫০০	জীবনবীমা হবে
(২)	„ „ টা. ৪৫ থেকে টা. ৯০ হলে	টা. ১০০০	„ „
(৩)	„ „ টা. ৯১ „ টা ১৫০ „	টা. ২০০০	„ „
(৪)	„ „ টা ১৫১ „ টা ২৫০ „	টা. ৩০০০	„ „
(৬)	„ „ টা. ২৫০ এর বেশি হলে	টা. ৫০০০	„ „

যে শিক্ষকের জীবনবীমা হওয়া সম্ভব নয় বলে বীমা কোম্পানী অভিমত দেবেন অথবা যে শিক্ষকের ৪০ বছর বয়স হয়েছে, তাঁকে জীবনবীমা করতে হবে না। এই ব্যবস্থামত কোনও শিক্ষকের জীবনবীমা বাজেয়াপ্ত হবে না।

Q 6. Discuss the importance of security of tenure of teachers' services, their age of retirement and other essential amenities that deserve consideration.

Ans. ভারতের শিক্ষক সমাজ সর্ব্বদাই চাকুরীর নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন থাকেন। বহু রাজ্যে এখন বহু ব্যক্তি স্কুল পরিচালনা করেন যাঁরা শিক্ষার গুরুত্ব অল্পই বোঝেন এবং তাঁরা শিক্ষার পুরোহিত স্বরূপ শিক্ষকদের সঙ্গে অত্যন্ত নীচভাবে ব্যবহার করেন। ফলে, শিক্ষক সমিতিগুলি দাবী

করেন যে, সকল বেসরকারী স্কুল সরকারী অধীনে আনা হোক্। যাই হোক একথা আজ সর্ব্বজনবিদিত যে, শান্তিপ্রিয় শিক্ষকদের অযথা সামান্য কারণে বরখাস্ত করা এবং অন্যান্য বিবিধ উপায়ে শাস্তি দেওয়া বহু স্কুল কর্ত্তৃপক্ষেরই স্বভাবজাত হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, শিক্ষকদের মর্য্যাদা এবং সুখসুবিধা ন্যূনতম ভাবে স্বীকৃত না হলে এদেশে কোনপ্রকার শিক্ষাপ্রসার পরিকল্পনা কোনদিন সফল হবে না।

শিক্ষকদের কাজের মধ্যে দোষত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু সেবিষয়ে যথাযথ অনুসন্ধান না করে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা, বেতনবৃদ্ধি বাতিল করা বা অন্য অঞ্চলে বদলী করা যুক্তিসঙ্গত নয়। এতে শিক্ষকের মনের প্রফুল্লতা নষ্ট হয়। শিক্ষকের দোষ সম্পর্কে বিচার বিবেচনার জন্য শিক্ষাদপ্তরের তত্ত্বাবধানে একটি সালিসী বোর্ড বা কমিটি থাকা দরকার। এই বোর্ড শিক্ষকদের দোষত্রুটি সম্পর্কিত অভিযোগাদি নিয়ে তদন্ত ও বিচার করবেন এবং এঁদের অভিমত অনুসারেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। এই বোর্ডে থাকবেন শিক্ষাসচিবের মনোনীত প্রতিনিধি, স্কুল পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিনিধি এবং শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি। বালিকাদের স্কুলের ক্ষেত্রে বোর্ডে পরিদর্শিকা দপ্তরের মনোনীতা একজন মহিলা প্রতিনিধি থাকবেন।

বর্ত্তমানে শিক্ষকরা যে বয়সে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন, তা বৃদ্ধি করে ৬০ বা ৬৫ বছর বয়স করা প্রয়োজন। কারণ অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ সক্ষম ও কর্ম্মঠ থাকলে কেবল অযৌক্তিক আইনবিধি মতে তাঁদের মূল্যবান সেবা থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বঞ্চিত করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সাম্প্রতিক কালে জীবনধারণের মেয়াদ সত্য সত্যই বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়ে থাকে যখন, তখন শিক্ষাদপ্তরের অনুমোদনক্রমে কর্ম্মঠ শিক্ষকদের ৬৫ বছর বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষকতা করার সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। এতে বর্ত্তমানকালের শিক্ষক অভাব সমস্যারও কিছু লাঘব হতে পারে।

শিক্ষকতা-বৃত্তিতে যাতে উপযুক্ত ব্যক্তি আকৃষ্ট হন, সেজন্য আরও অন্যান্য সুখসুবিধা তাঁদের দেওয়া উচিত, যেমন :—

(১) **শিক্ষক সন্তানদের বিনাব্যয়ে শিক্ষা** :—সংবিধান অনুসারে ১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত সকল বালকবালিকার শিক্ষাদানের দায়িত্ব রাষ্ট্রেরই, অতএব শিক্ষক সন্তানদের বিনাব্যয়ে শিক্ষাদান সংবিধানসম্মত দাবী। কোন কোন রাজ্যে এই নীতি ইতিমধ্যেই অনুসরণ করা হচ্ছে এবং যতশীঘ্র সম্ভব সকল রাজ্যে প্রবর্ত্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(২) **শিক্ষকদের বাসসংস্থান** :—শিক্ষকদের উপযুক্ত বাসসংস্থান না থাকায় শহর ও গ্রামে শিক্ষক সংগ্রহে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। মহিলা শিক্ষিকার ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও প্রকট। সরকারী স্কুলের শিক্ষিকাগণ

এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে বদলী হলে এই সমস্যার প্রকৃত রূপ সম্যক্ উপলব্ধি করা যায়। শিক্ষিকাগণ উপযুক্ত বাসস্থান না পেলে কিছুতেই কাজ করতে সম্মত হন না। এইজন্যই অল্পভাড়ায় সমবায় ভিত্তিতে স্কুলের কাছেই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য আরামপ্রদ আবাস সংস্থান করা উচিত। এর ফলে স্কুলে যাতায়াতের বহু সময়ব্যয় হ্রাস পাবে এবং শিক্ষকগণ সেই সময় শিক্ষার কাজে নিয়োজিত করতে সক্ষম হবেন।

(৩) **রেলভ্রমণ স্নুবিধা** :—শিক্ষকদের উৎসাহিত করা উচিত যাতে তাঁরা রাজ্য সরকার বা শিক্ষক সমিতি আয়োজিত শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনা চক্র, রিফ্রেসার কোর্স বা আঞ্চলিক ও সর্ব্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন প্রভৃতিতে যোগদান করে শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে উদার মনোভাব সৃষ্টি করতে পারেন। এছাড়া শিক্ষকরা পারিপার্শ্বিক জগত সম্পর্কে যাতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে পারেন, স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বিদেশ-অবকাশ যাপন করতে পারেন, তার জন্যও অর্দ্ধেক ভাড়ায় রেল ভ্রমণের সুযোগ তাঁদের দেওয়া উচিত।

(৪) **অবকাশ শিবির ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র** :—শিক্ষকদের দীর্ঘ অবকাশের সময় তাঁরা স্বাস্থ্যপূর্ণ বিশ্রাম যাতে গ্রহণ করতে পারেন, সেজন্য অল্পব্যয়ে স্বাস্থ্যকর স্থানে অবকাশ ভবন স্থাপন করা দরকার। রাষ্ট্র ও স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের সহযোগিতায় এরকম ব্যবস্থা করা মোটেই কঠিন নয়।

(৫) **চিকিৎসা সাহায্য** :—শিক্ষকদের অল্পবেতন হলেও তাঁরা যদি চিকিৎসার প্রতিশ্রুতি পান, তাহলে অনেক উদ্বেগ থেকে তাঁরা মুক্ত হতে পারেন। সরকারী কর্ম্মচারীরা এধরণের সুযোগ পেয়ে থাকেন এবং শিক্ষকরাও সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত থেকে সেই সুযোগ সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত কারণেই চাইতে পারেন। হাসপাতালে বিনাব্যয়ে শিক্ষকদের চিকিৎসার আয়োজন থাকা দরকার।

(৬) **ছুটির স্নুযোগ** :—স্কুলে কমপক্ষে বছরে ২০০ দিন কাজ হওয়ার কথা। এর মধ্যে শিক্ষকরা অনেক ছুটি পেয়ে থাকেন। তবে এছাড়াও অসুস্থতার জন্যে যাতে অতিরিক্ত ছুটি পেতে তাঁরা কোন অসুবিধা বোধ না করেন, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। মহিলা শিক্ষিকাদের জন্য মাতৃত্বকালীন বিশেষ ছুটিও দিতে হবে। উচ্চতর অধ্যয়নে ইচ্ছুক শিক্ষককে বিনা আপত্তিতে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ দিতে হবে এবং বেতনসহ ছুটি মঞ্জুর করা উচিত। তবে এক বছরের বেশি অধ্যয়ন-অবকাশ দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে।

Q. 7. Discuss the problems of private tuitions as additional employment for teachers and suggest remedies.

Ans. শিক্ষকদের বেতন অত্যন্ত অল্প বলে তারা স্কুলের অধ্যাপনার বাইরে গৃহশিক্ষকতা করে তাঁদের আয় বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে থাকেন।

এই প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষাজগতে এক নূতন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে আমাদের দেশে। শিক্ষকগণ গৃহশিক্ষকতা করার ফলে শিক্ষার্থীদের স্কুল অধ্যাপনার দিকে যেন মনোযোগ হ্রাস পাচ্ছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের গৃহ-শিক্ষকতার আশ্রয় গ্রহণের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়ে থাকেন। ফলে শিক্ষার্থীরা স্কুলে অধ্যয়নের গুরুত্ব সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করে এবং শিক্ষকগণও অনুরূপ-ভাবে স্কুলের কাজে অনেকেই অবহেলা করেন। গৃহশিক্ষকতার আর একটি কুফল হলো এই যে, শিক্ষার্থীরা আপন উদ্যমে পাঠপ্রস্তুতির কোনও রকম স্পৃহা বোধ করে না, সর্ব্ববিষয়েই গৃহশিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে আত্মনির্ভরশীলতা হারায়। গৃহশিক্ষকতা ব্যবস্থার ব্যাপকতার ফলে অভিভাবকদেরও ব্যয়বৃদ্ধি হয়েছে এবং বহুক্ষেত্রে গৃহশিক্ষককে বিশেষভাবে সন্তুষ্ট করতে না পারলে স্কুলের পরীক্ষায় শিক্ষকের কৃপার ওপর নির্ভর করতে হয়। যে অভিভাবকের আর্থিক সামর্থ্য আছে, তাঁর সন্তান কোন চেষ্টা না করেই বার্ষিক পরীক্ষায় ভাল ফল দেখায়। দরিদ্র ঘরের সন্তানরা নির্ম্মমভাবে অবহেলিত হয়ে থাকে।

অবশ্য যে সব শিক্ষার্থী পড়াশুনায় অনগ্রসর, তাদের বিশেষ অধ্যাপনার প্রয়োজন আছে। তবে সেই প্রয়োজনমতো বিশেষ অধ্যাপনার আয়োজন করা উচিত স্কুল কর্ত্তৃপক্ষেরই। এর জন্য স্কুলভবনে অন্য সময়ে বিশেষ কোচিং ক্লাশ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনই বাঞ্ছনীয়। এর জন্য স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ যৎসামান্য অতিরিক্ত বেতন ধার্য্য করতে পারেন এবং তাই থেকেই শিক্ষকদের আয়বৃদ্ধি যুক্তি-সঙ্গত।

গ্রামাঞ্চলে শিক্ষকদের অবসর সময়ে আয়বৃদ্ধির অনুকূলে গ্রাম উন্নয়নের পরিকল্পনাগুলিতে নিযুক্ত করা খুব ভাল। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিত ব্যক্তিরা এইভাবে উন্নয়নমূলক কাজে উদ্যোগী হলে গ্রামবাসীদের মনে উদ্দীপনার সঞ্চার হবে, শিক্ষকরাও আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে বিশেষ সামাজিক মর্য্যাদা লাভ করবেন। বর্ত্তমানে গৃহশিক্ষকতার ফলে শিক্ষকগণ 'ব্যবসায়ী, নির্ম্মম, অসৎ ষড়যন্ত্রকারী'-রূপে যে অপবাদে কলঙ্কিত হয়েছেন, তা থেকে মুক্ত হবেন। শহরাঞ্চলেও এই ধরনের কল্যাণমূলক কাজে শিক্ষকদের আয়বৃদ্ধির উৎসাহ দেওয়া উচিত।

Q. 8. Discuss the problems relating to teachers' training in India.

Ans. শিক্ষার মূল কর্ম্মী শিক্ষকদের কাজের উন্নতির জন্য তাঁদের উপযুক্ত ট্রেনিং বা শিক্ষণ ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। বর্ত্তমানে প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষকদের জন্য এবং মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান অনেক হয়েছে, একথা ঠিক কিন্তু শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রী বা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত শিক্ষকরা যাতে প্রকৃত শিক্ষাতত্ত্বের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে পারেন,

সেদিকে আরও মনোযোগ দেওয়া উচিত। বিশেষতঃ প্রাথমিক পর্য্যায়ের শিক্ষকদের শিক্ষণ সম্পর্কে অধিকতর সুবন্দোবস্ত করা উচিত, কারণ অল্পবয়স্ক শিশুদের শিক্ষার ভার যাঁদের উপর, তাঁদের শিক্ষণদানই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যাঁরা স্কুলফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করনে, তাঁদের জন্য সাধারণ-ভাবে শিক্ষণ ব্যবস্থা থাকা উচিত এবং এই শিক্ষণ অন্ততঃ দুবছরের হওয়া উচিত। স্নাতক ডিগ্রীধারী শিক্ষকগণ এক বছরের শিক্ষণ গ্রহণ করলেই যথেষ্ট। অবশ্য স্নাতক শিক্ষকগণও দুবছরের শিক্ষণ গ্রহণ করলেই ভাল, কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষকের অভাব ও দীর্ঘকালীন শিক্ষণ গ্রহণের অর্থব্যয় সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনা করলে স্বল্পকালীন শিক্ষণ ব্যবস্থ‍াই সময়োপযোগী।

শিক্ষক শিক্ষণ সম্পর্কে একটি সমস্যা প্রথমেই আলোচনা করা যাক। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কোন কোন রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ত্তাধীনে, কোন রাজ্যে রাজ্য সরকারই এবিষয়ে তত্ত্বাবধান করে থাকেন; ফলে সমগ্র দেশে একই ধরনের শিক্ষণ পরিচালনা নেই। অনেক ক্ষেত্রে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ থেকে শিক্ষণ ডিগ্রী দেওয়া হয়, আর রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর থেকে শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে, এমনকি পৃথক শিক্ষণ প্রাতিষ্ঠানও পরিচালিত হয়। এই ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় নয়, এতে অহেতুক শ্রম ও অর্থব্যয় হয় এবং শিক্ষণ মানের পার্থক্য ঘটে। মুদালিয়র কমিশন এবিষয়ে সুপারিশ করেন যে, শিক্ষণ ব্যবস্থার সংহতি সাধনের জন্য একটি পৃথক বোর্ড থাকা দরকার।

শিক্ষণরত শিক্ষকরা শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে নীতিগত জ্ঞান অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে যাতে প্রকৃত ক্লাশ পরিচালনা ও অধ্যাপনা বিষয়ে সমস্যাগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন, সেজন্য ভাল আদর্শ স্কুল থাকা দরকার এবং সেখানে শিক্ষকদের প্র্যাকটিস্ অধ্যাপনার ব্যবস্থা থাকা উচিত। অবশ্য বহু শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানেই মডেল স্কুল না থাকায় প্র্যাকটিস্ অধ্যাপনা আশানুরূপ হয় না অথচ শিক্ষণ পাঠক্রমে এই বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। বাস্তবক্ষেত্রের সমস্যাগুলির সঙ্গে শিক্ষণরত শিক্ষককে পরিচিত করানোর উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র প্র্যাকটিস্ অধ্যাপনা ছাড়াও শিক্ষার্থী পর্য্যবেক্ষণ পদ্ধতি, পাঠ-বিশ্লেষণ ও পর্য্যালোচনা, শিক্ষা-অভীক্ষা প্রস্তুত ও ব্যবহার, শিক্ষার্থীদের সমবেত অধ্যয়ন ও কর্ম্মসংগঠন, গ্রন্থাগার কর্ম্মধারা পরিচালন এবং কিউমুলেটিভ রেকর্ড কার্ড সংরক্ষণ বিষয়েও শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের যথার্থ জ্ঞান অর্জ্জনের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কেও প্রত্যেক শিক্ষককে কিছু কিছু জ্ঞান অর্জ্জন করা উচিত, যাতে শিক্ষার্থীর আচরণ জটিলতা সম্পর্কে সম্যক্ সহানুভূতিসম্পন্ন মনোভাব সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। সহপাঠ্য বিষয়গুলি যেমন—গ্রন্থাগার পরিচালনা, ক্রীড়া অনুষ্ঠান পরিচালনা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, শিক্ষামূলক বেতার

অনুষ্ঠান, অডিও-ভিজুয়াল শিক্ষা, স্কাউট, রেডক্রশ, প্রভৃতি সম্পর্কেও প্রত্যেক শিক্ষকের প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকলে স্কুলের প্রতিটি কাজে তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারেন।

শিক্ষকগণ যাতে স্কুলে কর্ম্মরত থাকার সময়েও মাঝে মাঝে শিক্ষণ ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন, তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। রিফ্রেসার কোর্স, বিশেষ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কোর্স, শিক্ষণ কর্ম্মশালায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, আলোচনা চক্র, সম্মেলন প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষকগণ নিজেদের বৃত্তি সম্পর্কে অধিকতর ওয়াকিবহাল হতে না পারলে কেবলমাত্র এককালীন শিক্ষণ দ্বারা শিক্ষকদের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা চলে না। বর্ত্তমানে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থায় এই ধরণের কর্ম্মসূচীর যথেষ্ট অভাব আছে।

শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে যে সকল শিক্ষক শিক্ষণ গ্রহণ করবেন, তাঁদের পূর্ণ তালিকা যথাযথ রক্ষা করে তাঁদের কর্ম্মধারার সঙ্গে নিয়ত সংযোগ রাখতে পারলে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষের উভয়েরই উপকার হয়। দুঃখের বিষয়, এ ধরনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা আমাদের দেশে এখনও সর্ব্বত্র হয়নি। সরকারী শিক্ষা দপ্তর, শিক্ষক সমিতি, প্রভৃতি সংস্থাগুলি শিক্ষণপ্রাপ্ত সকল শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারলে দেশের শিক্ষক-সমস্যার পথে অনেক সহায়তা হতে পারে। যেমন, বহু শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষকতা ত্যাগ করে অন্য বৃত্তি গ্রহণ করেছেন—সেক্ষেত্রে তাঁদের শিক্ষণ গ্রহণ শিক্ষাক্ষেত্রে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারলে শিক্ষকতা ছাড়াও শিক্ষাসংক্রান্ত আরও বহু উন্নয়নমূলক কাজে তাঁদের সানন্দ সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব হতে পারে।

শিক্ষক শিক্ষণ কলেজগুলি কেবলমাত্র শিক্ষকদের শিক্ষাদান কার্য্যেই রত থাকবে, এমন কথা নয়। শিক্ষাতত্ত্ব বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা কার্য্যেও শিক্ষণ সংস্থাগুলির যথেষ্ট করণীয় আছে। শিক্ষণ কলেজের প্রতিটি অধ্যাপকের এমন যোগ্যতা থাকা দরকার যাতে তাঁরা বছরের নির্দ্দিষ্ট সময় কিছু না কিছু গবেষণামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে তার ফলাফল দাখিল করবেন। এর ফলে শিক্ষাতত্ত্ব বিষয়ে সতত জ্ঞানের প্রসার ঘটবে এবং শিক্ষণরত শিক্ষকরাও তার সুফল পাবেন।

শিক্ষক শিক্ষণ কলেজে শিক্ষণ গ্রহণেচ্ছু শিক্ষকদের ভর্ত্তি করার পূর্ব্বে তাঁদের যোগ্যতা ও আগ্রহ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া উচিত। শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক যদি শিক্ষকতার কাজে না লাগেন, তবে শিক্ষণদানের সকল পরিশ্রম ও অর্থব্যয় ব্যর্থ হবে। অবশ্য যোগ্যতম শিক্ষকদের শিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহী করতে হলে উত্তম বেতন ও সুখসুবিধার আয়োজন অবশ্যই করতে হবে। তাছাড়া, শিক্ষণ কলেজে শিক্ষণ গ্রহণের জন্য কোন জায়গায় বেতন গ্রহণ, আবার

কোনও জায়গায় বৃত্তিপ্রদানের ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে, সকল কলেজেই বিনা বেতনে পূর্ণ ব্যয়ে যোগ্যতম শিক্ষকদের শিক্ষণদানের ব্যবস্থা করা উচিত। শিক্ষণ গ্রহণকালে প্রত্যেক শিক্ষককে তাঁর স্কুলের পূর্ণ বেতন নিয়মিত দেওয়া দরকার। শিক্ষণপ্রাপ্ত প্রত্যেক শিক্ষককে অন্ততঃ পাঁচ বছরের জন্য শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ থাকতে হবে।

শিক্ষক শিক্ষণ কলেজগুলি আবাসিক প্রতিষ্ঠান হওয়াই ভাল। শিক্ষকগণ সম্মিলিত ভাবে আত্মনির্ভরশীলতা, সহযোগিতা ও শ্রম মর্য্যাদা সম্পর্কে যাতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষাতত্ত্বের মূলসূত্রগুলি উপলব্ধি করতে পারেন, এজন্য আবাসিক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানই একমাত্র উপযুক্ত কেন্দ্র।

স্নাতক ডিগ্রীধারী শিক্ষকদের শিক্ষণদান ছাড়াও স্নাতকোত্তর (এম. এ.) পর্য্যায়ে যাতে উচ্চতর শিক্ষাতত্ত্ব বিষয়ে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও গবেষণার ব্যবস্থা থাকে, সেবিষয়েও সচেষ্ট হওয়া দরকার। স্নাতকোত্তর শিক্ষাতত্ত্ব সংক্রান্ত কলেজে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক তুলনামূলক চর্চ্চা, শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে নিয়ত গবেষণা প্রভৃতি বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হবে এবং যেসব শিক্ষক উচ্চতর পর্য্যায়ে শিক্ষণ গ্রহণ করে বিশেষ অভিজ্ঞ ও যোগ্যতাসম্পন্ন হতে চান, তাঁদের পক্ষে এ ধরনের কলেজ অত্যাবশ্যক।

শিক্ষক শিক্ষণ কলেজগুলিতে অধ্যাপনার জন্য উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক সংগ্রহ করাও এক সমস্যা। শিক্ষক শিক্ষণ অধ্যাপকদের শিক্ষণ ডিগ্রী ছাড়াও অন্ততঃ পাঁচ বছরের শিক্ষকতা বা পরিদর্শকের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে বিনিময় ব্যবস্থা থাকা খুব বাঞ্ছনীয়। নূতন অধ্যাপকরা যাতে মাঝে মাঝে প্রধান শিক্ষক বা পরিদর্শকের কাজ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেন, সে সুযোগ দেওয়া উচিত।

VIII

PROBLEMS OF TESTS AND EXAMINATIONS

[Internal and external examinations—limitations of the present system—School records—evaluation and marking—Assessment for the Public examination.]

Q. 1. What are the limitations of the present system of examinations in India ?

Ans. শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার্থীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাগ্রহণ বিষয়ে কতোখানি অগ্রসর হচ্ছে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করার জন্য শিক্ষাবিদ্ ও অভিভাবকগণ সকলেই আগ্রহশীল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলিও অধ্যাপনা বিষয়ে কতখানি সার্থক হচ্ছে, সে সম্পর্কে মূল্যায়নের জন্যও পরীক্ষার প্রয়োজন আছে।

বর্ত্তমানে পরীক্ষা ব্যবস্থা দুরকমের : আন্তর (internal) এবং বাহিরিক (external)। আন্তর পরীক্ষাগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব তত্বাবধানে হয়ে থাকে বছরে অন্ততঃ একবার। এই পরীক্ষা শিক্ষার্থীর প্রগতি পরিমাপ করতে চেষ্টা করে এবং তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগে সহায়তা করে। এই আন্তর পরীক্ষা গ্রহণের নীতি ও ব্যবস্থার ওপরে শিক্ষাদান পদ্ধতিও অনেকাংশে নির্ভরশীল হয়। আধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক শেষ পরীক্ষা ছাড়াও মাঝে সাময়িক পরীক্ষা সাপ্তাহিক বা ত্রৈমাসিক পর্য্যায়ে হয়ে থাকে। কিছু কিছু স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রভাব হ্রাস করার জন্য সারা বৎসরের সাময়িক পরীক্ষাগুলির ধারাবাহিক (cumulative) মূল্যায়নের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। বাহিরিক পরীক্ষা সাধারণতঃ একটি শিক্ষান্তর সম্পূর্ণ হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য যোগ্য শিক্ষার্থীকে নির্ব্বাচিত করে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের অনুমতি ও অধিকার দান। সাধারণতঃ প্রাথমিক স্তর, নিম্ন মাধ্যমিক (মিড্‌ল স্কুল) স্তর, মাধ্যমিক স্তর, উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর প্রভৃতির শেষেই সরকারী বা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্বাবধানে আঞ্চলিক ভিত্তিতে এই বাহিরিক পরীক্ষাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। মোটামুটিভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভেতরে ও বাইরে যথেষ্ট পরিমাণে পরীক্ষার আয়োজন আমাদের দেশে আছে।

তবে এই পরীক্ষাগুলি শিক্ষার্থীর পুঁথিগত শিক্ষার পরিমাপে উপযোগী হলেও ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্যান্য বিষয়গুলির মূল্যায়ন সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে যথেষ্ট কার্যকরী নয়। বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার ব্যাপক মর্য্যাদা স্বীকৃত হয়েছে এবং শিক্ষার্থীর দেহ, মন ও সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির ক্ষেত্রে শিক্ষার

গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব উপলব্ধি করার ফলে বর্ত্তমান যুগে এমন পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়েছে, যা শিক্ষার্থীর সমগ্র ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিমাপ করতে সক্ষম হবে।

এমন কি পুঁথিগত বিদ্যার যথাযথ পরিমাপে বর্ত্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থা কতখানি সক্ষমতা দাবী করতে পারে, সে বিষয়েও ইদানীং প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্নের উত্তরে প্রবন্ধ রচনা করতে বলে শিক্ষার্থীর জ্ঞান পরীক্ষা অনেকাংশেই পরীক্ষকের মনোভঙ্গীর ওপর নির্ভর করে বলে সকল ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলাফল সমান সুবিচার করতে পারে না। তাছাড়া বর্ত্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মনে এক অবাঞ্ছিত বিদ্বেষময় প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সহযোগিতার মূল্যবান নীতিকে বিসর্জ্জন দিতে হচ্ছে। সম্ভবতঃ বর্ত্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অশান্তির এ আর এক কারণ। বর্ত্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার আর একটি ত্রুটি হলো এই যে, রচনাধর্ম্মী প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জ্ঞান পরীক্ষা করা হয় বলে পরীক্ষার যাথার্থ্য (validity) সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়। হাতের লেখা, ভাষাজ্ঞান, রচনাক্ষমতা প্রভৃতির যোগ্যতা না থাকলে অনেক সময়ে ভাল শিক্ষার্থীও সার্থক উত্তর লিখতে পারে না।

বাহিরিক পরীক্ষা তরুণ শিক্ষার্থীদের মনে যে বিপুল আতঙ্কের সৃষ্টি করে থাকে, সে কথাও এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য। শিক্ষার্থী নতুন এক পরিবেশে গিয়ে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় বলে তার অর্জ্জিত জ্ঞান প্রকাশে বিস্তর বাধার সৃষ্টি হয়। অপরিচিত পরীক্ষকদের ওপর স্বাভাবিক অবিশ্বাস জন্মায়; এতে শিক্ষার্থীর মানসিক সাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

Q. 2. Suggest some measures to overcome the problems relating to evaluation and marking of students' progress in educational institutions.

Ans : আমাদের দেশে পরীক্ষা ও শিক্ষার্থীর প্রগতি পরিমাপ ব্যবস্থার ত্রুটি আছে, একথা অনস্বীকার্য্য। তবে প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থাকে একেবারে লুপ্ত করাও যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে বাহিরিক পরীক্ষার প্রভাব হ্রাস করে এর কুফল দূর করার চেষ্টা করা উচিত। তাছাড়া আধুনিক বিষয়াত্মক (objective) অভীক্ষার প্রবর্ত্তন করে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত মনোভঙ্গীর প্রভাবও হ্রাস করা চলে। পরীক্ষাব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে শিক্ষার্থী অর্থহীনভাবে মুখস্থ বিদ্যায় উৎসাহ না পায় এবং প্রতিটি শিক্ষণীয় বিষয় যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করার প্রেরণা পায়। শিক্ষার্থীর শিক্ষাপ্রগতির যথাযথ পরিমাপ করতে কেবল বাহিরিক পরীক্ষার ওপর নির্ভর না করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত সাময়িক পরীক্ষাগুলির ধারাবাহিক পরিমাপকেও মর্য্যাদা দিতে হবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পরীক্ষার ওপর শিক্ষার্থীরা যে বিপুল গুরুত্ব আরোপ করে থাকে এবং অন্যান্য সাময়িক পরীক্ষাগুলি অবহেলা করে। তার কারণ বার্ষিক পরীক্ষায় ফলাফলের ভিত্তিতেই উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের এইজন্যই পরিষ্কারভাবে বোঝানো উচিত যে, তাদের সারা বছরের শিক্ষাগ্রহণ প্রচেষ্টার যে ধারাবাহিক পরিমাপ করা হয়েছে তার ওপরেই উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার অধিকার নির্ভর করবে। এই ব্যবস্থার ফলে শিক্ষার্থীরা বছরের সকল সময় উদ্যোগী থাকতে চেষ্টা করবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধারাবাহিক প্রগতি পরিমাপের নিয়মিত হিসাব (Cumulative Record) রাখার একটি নতুন পদ্ধতি ইদানীং প্রচলিত হচ্ছে। শিক্ষকগণ প্রতিটি শিক্ষার্থীদের সমগ্র বিকাশের তথ্যগুলি নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখেন এবং বৎসরান্তে সেই হিসাব মতই শিক্ষার্থীর সামগ্রিক প্রগতির পরিমাপ অল্প আয়াসে যথার্থভাবে করা সম্ভব হয়। অবশ্য নিয়মিতভাবে এই হিসাব রক্ষা করা শ্রমসাধ্য ও ব্যয়বহুল, কিন্তু তা প্রগতি পরিমাপের জটিল সমস্যার সুরাহা করতে পারে। শিক্ষার্থীর প্রগতির সার্থক মূল্যায়নের এর চেয়ে ভাল উপায় আর হতে পারে না।

তবে এ ব্যবস্থা ছাড়াও পরীক্ষা ব্যবস্থা থাকবে এবং সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান পরীক্ষার উপযুক্ত মূল্যায়ন সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। প্রথমতঃ, শিক্ষার্থীর উত্তরের জন্য কিছু সংখ্যামান ধার্য্য করার রীতিটি পরিবর্ত্তন করতে হবে। হার্টগ কমিটির রিপোর্টে এই রীতির দোষগুলি বর্ণিত হয়েছে। এর পরিবর্ত্তে শিক্ষার্থীর উত্তরকে 'খুব ভাল', 'ভাল', 'মাঝারী', 'মন্দ', 'খুব মন্দ', এই পাঁচটি স্তরে চিহ্নিত করা যেতে পারে। অনেকে এই পাঁচটি স্তরের জন্য ক, খ, গ, ঘ, চ প্রভৃতি অক্ষরমান প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী। এই নতুন মান নির্দ্ধারণের ফলে সামান্য দু-এক নম্বরের পার্থক্যের জন্য অস্বাস্থ্যকর বিদ্বেষের সৃষ্টি হওয়া কমবে। শিক্ষার্থীরা কয়েকটি মোটামুটি যোগ্যতা স্তরে বিভক্ত হবে এবং সমষ্টিগত স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা শিখবে। এই অক্ষরমান ব্যবস্থায় সর্ব্বশেষ স্তর 'চ' এবং এই স্তরের শিক্ষার্থীদের 'বিফল' বলে ঘোষণা করা যেতে পারে। কিছু পরিসংখ্যান নীতি প্রয়োগ করলে যে কোন সংখ্যামানকে অক্ষরমানে রূপান্তরিত করাও চলবে।

পরীক্ষা ও প্রগতি-মান নির্ণয়ের ত্রুটিগুলি দূর করতে হলে আরও কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান পরীক্ষা করার সময় তাদের সামর্থ্য উপলব্ধি করে সহৃদয় শিক্ষককেই পরীক্ষাগ্রহণের দায়িত্ব দিতে হবে। এজন্য শিক্ষক ছাড়া অন্য কেহ পরীক্ষক না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্ত্তমান যুগের শিক্ষাতত্ত্বে ধারাবাহিক প্রগতি পরিমাপের গুরুত্বই অধিকতর মর্য্যাদা পেয়েছে। একারণে সাময়িক পরীক্ষাগুলি যত কম সংখ্যায় এবং যত ঘরোয়া পরিবেশে অনুষ্ঠিত করা যায়; ততই মঙ্গল। এতে নিয়মিত পাঠপ্রস্তুতির জন্য বেশি সময় পাওয়া যেমন সম্ভব হবে তেমনি শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রীতিকর সৌহার্দ্য সৃষ্টি হওয়া সহজ হবে।

IX

Problems Relating to Primary Education

[Aims, methods, contents of nursery and infant education—Necessity of infant education—importance of the early years—Problems of nursery and infant education—Properly trained teachers—Social consciousness, attitude of parents etc—Special problems of big cities, industrial areas, etc—Maladjustment and guidance—Historical development in our country and comparison with other countries—Present day position—Future plans.]

Q. 1. Write an essay on aims, methods and contents of nursery and infant education.

Ans : দার্শনিক কমেনিয়াস আধুনিক কিণ্ডারগার্টেন ও নার্সারী শিক্ষাব্যবস্থার ভাবধারা প্রথম জাগিয়ে তোলেন। ১৭শ শতাব্দীতে এই ধর্ম্মযাজক দার্শনিক শিশুর স্বচ্ছন্দ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সমাজকে স্মরণ করিয়ে দেন। আধুনিক ধরণের নার্সারী স্কুল সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় প্রবর্ত্তিত হয়। কয়েক বছর পরে আমেরিকাতেও নার্সারী স্কুলশিক্ষার প্রচলন হয়। কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষার প্রাথমিক পর্য্যায়রূপেই নার্সারী শিক্ষার স্থান এবং যেক্ষেত্রে কিণ্ডারগার্টেন পাঁচ বছর বয়সে শিশুকে ভর্ত্তি করা হয়, সেক্ষেত্রে নার্সারীতে অন্ততঃ এক বছর কম বয়সে নেওয়া হয়ে থাকে। অনেক নার্সারী স্কুলে এক বছর বয়সের শিশুকেও ভর্ত্তি করা হয়। নার্সারী শিক্ষাব্যবস্থাকে এজন্য প্রাক্-প্রাথমিক বা প্রাক্-স্কুল শিক্ষাও বলা হয়ে থাকে।

নার্সারী স্কুলের উদ্দেশ্য গৃহ ও অভিভাবকদের সঙ্গে শিশুপালনে সহযোগিতা করা। কোন শিশুই কেবলমাত্র নার্সারীতে প্রতিপালিত হতে পারে না, তবে অভিভাবক যে সময়ে শিশুর প্রতি একেবারেই মনোযোগ দিতে পারেন না, দিবাভাগের সেই সময়টুকু নার্সারী স্কুলে শিশুরা নিরাপদে থাকে। অনেক মনে করেন আধুনিক নার্সারী স্কুলগুলি শিশু প্রতিপালনে মায়ের সকল দায়িত্ব পালন করতে পারে, এ ধারণা অভ্রান্ত নয়।

সম্পূর্ণ রুটিনমত নিয়মমাফিক শিক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে এবং স্কুলের শিক্ষাদান রীতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রারম্ভে শিশুর জীবনের বিভিন্ন শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক চাহিদাগুলি যথাসম্ভব পূরণের মাধ্যমে তার ভবিষ্যৎ জীবনকে সফল করার উদ্দেশ্যে আজ নার্সারী স্কুলের মর্য্যাদা ব্যাপকভাবেই স্বীকৃত হয়েছে। আজ একথা সর্ব্বজনবিদিত যে, শিশুর প্রথম পাঁচবছরের শিক্ষা ও আচরণই তার জীবনের বনিয়াদ এবং এই বনিয়াদ সুদৃঢ় না হলে

শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন গঠন সমস্যাসঙ্কুল হয়ে পড়ে। এই কারণে নার্সারী শিক্ষা বর্ত্তমান শিক্ষাজগতে সমগ্র মানবসভ্যতার ভিত্তিস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। দরিদ্র, মধ্য মধ্যবিত্ত ও ধনী সকল স্তরের পরিবারের শিশুর জন্যই এই নার্সারী শিক্ষার প্রয়োজন আজ উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

নার্সারী স্কুলে শিক্ষার জন্য বই পড়ার ব্যবস্থা থাকে না। মামুলী পড়া বা ট্রেনিংএর কোন আয়োজন নার্সারী স্কুলে সাধারণতঃ থাকে না। এই জাতীয় স্কুলে শিশুর পরিবেশ এমনভাবে রচিত হয়, যাতে শিশু তার ক্রমবর্দ্ধমান অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি বিকাশের মাধ্যমে আপন প্রকৃতিগত সহজাত নীতি অনুসারে আপন ব্যক্তিত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশে সমর্থ হয়। নার্সারী স্কুলের মূল উদ্দেশ্য শিশুকে বিভিন্ন সদভ্যাসের সঙ্গে পরিচিত করা এবং স্বাস্থ্য ও জীবন সম্পর্কে সহজ অনুপচারিক (informal) ট্রেনিং দেওয়া।

প্রখ্যাত শিশুশিক্ষাবিদ্ ফ্রয়বেলের বিশ্বাস, শিশুর সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের পথে তাকে পরিচালিত করার পূর্ব্বে তার প্রকৃতিকে ভালভাবে জানতে হবে। তাঁর শিক্ষাব্যবস্থাকে এই জন্য তিনি কিণ্ডারগার্টেন (Kindergarten) অর্থাৎ 'শিশু উদ্যান' নামে অভিহিত করেছিলেন। উদ্যানে ফুল যেমন আপন প্রাকৃতিক নিয়মে প্রস্ফুটিত হয়, মানব শিশুর বিকাশও তেমনি প্রাকৃতিক নিয়মে হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাদাম মন্তেসরীও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে শিশুদের উপযোগী এমন পরিবেশ তাঁর শিশু-স্কুলে প্রবর্ত্তিত করেছিলেন, যাতে শিশুর দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজনগুলি স্বাভাবিকভাবেই পূরণ হওয়ার সুযোগ পায়। মন্তেসরী শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমোন্নতির ফলে আজ নার্সারী শিক্ষা আধুনিক সভ্যতার অপরিহার্য্য অঙ্গ হয়ে পড়েছে।

সুস্থ শিশুরা স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে সুরু করে। পরিবেশ যদি অস্বাস্থ্যকর হয়, তখন শিশুর অভিজ্ঞতা সম্পদও অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ে। নার্সারী স্কুলের স্বাস্থ্যকর সামাজিক পরিবেশে প্রতিটি শিশু মুক্ত স্বচ্ছন্দভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ভাষাশিক্ষা, আচরণ শিক্ষা প্রকৃতি বিষয়ে সুসমঞ্জস জ্ঞান অর্জ্জন করার সুযোগলাভ করে।

শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির পক্ষে আর একটি বিশেষ সহায়ক হলো খেলাধুলা। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের প্রেরণা খেলার মধ্যেই পরিস্ফুট হয়। অতি অল্প বয়স থেকে এই খেলার মাধ্যমে শিশুর পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা, মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি, বিচারবুদ্ধি, কল্পনা ও সৃজনীশক্তি জাগরিত হওয়ার সুন্দর সুযোগ পায়। তবে খেলা যদি উপযুক্ত পরিবেশে না হয়, তবে অনেক ক্ষেত্রেই এর সমস্ত শক্তি উদ্দেশ্যবিহীন কার্য্যে অপচয় হয়। সুতরাং শিশুর খেলার জন্য নার্সারী স্কুলের পরিবেশে এমন সব খেলনা ও ক্রীড়া-উপকরণ রাখা হয়, যা

শিশুর বুদ্ধি, বিচার কল্পনা ও সৃজনী শক্তির বিকাশে সহায়তা করতে পারে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় একথা জানা গেছে যে, শিশুর গৃহপরিবেশ শান্তিহীন হলেও নার্সারী স্কুলের খেলা ও খেলনার পরিবেশে শান্ত ও প্রফুল্ল হয়ে সদভ্যাসগুলি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

শিশুর মনোবিকাশের ধারা নিরবচ্ছিন্ন হলেও এর কতকগুলি স্তর আছে। এক একসময়ে শিশুর এক একটি শক্তির উন্মেষ ঘটতে থাকে এবং সেই সময়ে কোন অন্তরায় ঘটলে শক্তিটি কোনদিনই সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ লাভ করতে পারে না। শিশুর দুবছর আড়াই বছর বয়সে অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণতা আসে এবং কল্পনার পরিশীলনের মধ্যেই তার বিকাশ ঘটতে থাকে। উপযুক্ত খেলনা ও গল্পের সাহায্যে যদি তার কল্পনাশক্তিকে জাগ্রত ও পুষ্ট না করা হয়, তবে তার সমস্ত কল্পনাশক্তি ব্যর্থ হবে এবং সঙ্গীত, সাহিত্য, চারুকলা, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান প্রভৃতি সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ উপভোগে বঞ্চিত হবে।

নার্সারী শিক্ষা দু-বছর থেকে পাঁচ বছর এবং এখন অনেকের মতে সাত বছর পর্য্যন্ত হওয়া উচিত। ইংলণ্ডের নার্সারী স্কুল এসোসিয়েশন এই অভিমত পোষণ করেন। কারণ তাঁদের মতে পাঁচ বছর বয়সে শিশুর যে মনোবিকাশের ছন্দ পরিলক্ষিত হয়, তার সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি ঘটে সাত বছরে। এই কারণে পাঁচ বছর পর্য্যন্ত নার্সারী স্কুলে শিক্ষা গ্রহণের পর সাধারণ প্রাইমারী স্কুলে শিশুর শিক্ষাধারা নতুনভাবে সুরু করার চেয়ে সাত বছর পর্য্যন্ত নার্সারী পদ্ধতিতে শিক্ষাদান যুক্তিযুক্ত।

শিশু যখন হাঁটতে ও কথা বলতে শেখে, তখন নবলব্ধ শক্তি দ্বারা পারিপার্শ্বিক জগতকে পরখ করে দেখতে চায় এবং এ থেকেই তার মধ্যে নানা বিষয়ে অদম্য কৌতুহল স্বাভাবিকভাবেই জেগে ওঠে। এই কৌতুহল যথাযথভাবে নিবৃত্ত করতে পারলে শিশুর স্বাভাবিক বহুমুখী বিকাশ সহজ হয়ে ওঠে। সুস্থ শিশুর আর একটি লক্ষণ হলো স্বাধীনতার আকাজ্ক্ষা। দেহ ও মনের বিকাশলাভের সাথে সাথে শিশু সকল অধীনতা মোচন করে মুক্ত হতে চায়; কিন্তু সমাজের যাদের উপর তাকে নির্ভর করতেই হয়, তাদের প্রতি আকর্ষণও সে অবহেলা করতে পারে না। স্বাধীনতাবোধ ও অনিবার্য্য নির্ভরশীলতার এই অন্তর্দ্বন্দ্বে শিশু নিজেকে সঙ্কটাপন্ন বোধ করে। এই সময়ে নার্সারী স্কুলের স্বাধীন সহযোগিতামূলক পরিবেশে শিক্ষক বা শিক্ষিকার সস্নেহ ব্যবহারে শিশু এই অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে পারে।

শিশুরা পরস্পরের কাছ থেকে খুব তাড়াতাড়ি শেখে, এজন্য নার্সারী স্কুলে শিক্ষক বা শিক্ষিকার নেপথ্য তত্ত্বাবধানের ফলে কর্তৃত্ব করা, সুনিয়মী কাজ করা, নৃত্যগীত করে আনন্দলাভ করা, নানা পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করা সবই দ্রুত অগ্রসর হতে পারে। শিশু প্রকৃতির স্বাভাবিক উত্তেজনা ও অসংযত

উদ্দাম শক্তি কল্যাণপথে পরিচালিত করার পক্ষে একারণেই নার্সারী স্কুলের উপযোগিতা খুব বেশি।

নার্সারী স্কুলের শিক্ষা কোন নির্দ্দিষ্ট সময় বা স্কুলগৃহের কোন নির্দ্দিষ্ট অংশবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকে না। বিশ্রামের সময় বাদে বাকী সমস্ত সময় শিশু ঘরে বা বাইরে কোন না কোন কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখার সুযোগ পায় এবং স্বাধীনভাবে সব কাজ করেও সকলের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে শেখে। একটি সামাজিক পরিবেশে বাস করার প্রথম সূত্রগুলি শিশু নার্সারী স্কুলে সহজভাবেই শেখে।

নার্সারী স্কুলে খেলার মধ্য দিয়েই শিশুর বুদ্ধি, বিবেচনাশক্তি, কর্ম্মকুশলতা, সমাজচেতনা ও বিবেক উন্মেষিত হয় বলে স্কুলের সমগ্র পরিবেশেই তার জন্য খেলার মাধ্যমে কাজের আয়োজন রাখা হয়। ছোট ছোট চাকাওয়ালা গাড়ীতে ছেলেমেয়েরা জিনিসপত্র নিয়ে প্রয়োজনমত চালিয়ে বেড়ায়। তারপর ধাপে ধাপে উঠে (ছোটদের জন্য অল্প ধাপ, চারবছরের পর কিছু বেশি ধাপ) শ্যুট (chute) থেকে স্বচ্ছন্দভাবে নীচে গড়িয়ে নামা, ছোট ছোট 'গেট' বা ধাপে ওঠা, দড়ির মই বাওয়া, দড়ির ওপরে হাঁটা, লম্বা কাঠের দুদিকে উঠে সমতা (ব্যালান্স) রক্ষা করা, রিং থেকে ঝোলা, দোল দেওয়া, দোল খাওয়া, বালির গর্ত্ত করা, জল বালি দিয়ে খাবার তৈরী করা, শিশুর জন্য বিশেষভাবে নির্ম্মিত ছোট্ট জলাশয়ে জলক্রীড়া, ছোট ছোট গাছের পিছনে লুকোনো প্রভৃতির মাধ্যমে শিশুর সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, স্নায়ু ও সচেতনতা সুস্থভাবে বিকশিত হয়ে থাকে নার্সারী স্কুলে। স্কুলের বাগানে পোষা জীবজানোয়ারের খাওয়াদাওয়া দেখা থেকে অপরের যত্ন করা বা সমবেদনা প্রকাশ করার শক্তি, আর প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে দিয়ে শিশু মনে ভগবৎ ভক্তির সূচনা করাও নার্সারী স্কুলের কাজ।

শিশুর কাছে নার্সারী স্কুল এক বিরাট পরীক্ষাগার। তার সজাগ ইন্দ্রিয়গ্রামের সাহায্যে সকল অভিজ্ঞতার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করে চলে। এইজন্য নার্সারী স্কুলের খেলাঘরগুলোও সেইভাবে সজ্জিত থাকে। কয়েকটি নীচু লম্বা সুদৃশ্য শেল্‌ফ্‌ বা আলমারীতে নানারকমের সুন্দর সুন্দর পুতুল, খেলনা, ইন্দ্রিয়গ্রাম পরিপুষ্ট করবার ক্রীড়া সরঞ্জাম (মন্তেসরী উপকরণ), মেকানো, বিভিন্ন অংশ খুলে জোড়া দেওয়া যায় এমন খেলনা, ছোট চা-সেট্, শয্যাদ্রব্যাদি, ঘরবাড়ী তৈরীর জন্য ছোট ছোট কাঠের ইট, ছবির বই, ছবিশুদ্ধ কাঠের ব্লক, রং তুলি ইত্যাদি আঁকার সরঞ্জাম, নরম মাটি, ময়দা, বালি প্লাষ্টিসিন ইত্যাদি নমনীয় জিনিস, নানারকমের পাত্র ইত্যাদি সুন্দরভাবে সাজানো থাকে। শিশুরা নিজেরাই এগুলি বা'র করে, ব্যবহার করে, আবার গুছিয়ে রাখে।

নার্সারী স্কুলে শিশুর খেলাকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা চলে :—

(১) সক্রিয় অঙ্গ সঞ্চালন—যেমন, হাঁটাচলা, দৌড়ঝাঁপ, বলখেলা, জলে খেলা, দোল খাওয়া ইত্যাদি যাতে মাংসপেশী ও স্নায়ুগুলি সংহত হয় এবং শিশু ক্রমে নিজের দেহকে সম্পূর্ণ স্বনিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

(২) সন্ধানী বা পরীক্ষামূলক খেলা—বিভিন্ন জিনিস নাড়াচাড়া করার তাগিদে শিশু নানাভাবে সৃজনীশক্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়,—যেমন, কাঠের ইট বা টুকরো দিয়ে ঘরবাড়ী, পুল ইত্যাদি তৈরী করা।

(৩) কল্পলোকের খেলা—বয়স্ক বাস্তবজীবনের বহু পরিস্থিতিকে শিশু আপন পরিস্থিতিরূপে বিশ্বাস করে নিয়ে (make-believe) কল্পলোকের খেলায় রত হয় এবং গাড়ীর ড্রাইভার, ডাক্তার প্রভৃতির কর্ম্মধারা খেলায় রূপান্তরিত করে ভবিষ্যতের প্রস্তুতি করে।

ভাল নার্সারীস্কুলে মোটামুটি যে ধরনের সময় তালিকা অনুসরণ করা হয়, তা এই রকম :—

বেলা ৯-১১.৩০—	স্কুলের পোষাকে স্কুলে উপস্থিত হওয়া; প্রীতি সম্ভাষণ; শিক্ষক বা শিক্ষিকার পরিদর্শন; নোংরা থাকলে পরিচ্ছন্ন হওয়া; ইচ্ছামত কিছু খেলা; ফলের রস, দুধ বা ঠাণ্ডা জল খাওয়া।
১১.৩০-১২টা—	পুতুল, খেলা যথাস্থানে সাজিয়ে রাখা এবং মধ্যাহ্ন আহারের জন্য তৈরী হওয়া। যারা আহারের বন্দোবস্তে সহযোগিতা করবে, তারা খেলা ছেড়ে আগে যাবে।
১২টা-১২.৪৫—	মধ্যাহ্নভোজন
১টা-২.৩০—	বিশ্রাম ও নিদ্রা
২.৩০-৩.১৫—	বিছানা গুছিয়ে রাখা, জল খাওয়া, খেলা
৩.১৫—	দুধ খাওয়া, বাড়ী যাবার জন্য তৈরী হওয়া

এই তালিকায় খেলার সময় মোট তিন ঘণ্টা, খাওয়াদাওয়া দেড় ঘণ্টা, বিশ্রাম দেড় ঘণ্টা অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি সময় দেওয়া হয়ে থাকে খেলাধূলার জন্য। কারণ খেলা থেকেই শিশুর সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাভাবিক বিকাশ সহজ হয়।

নার্সারী স্কুলে অন্ততঃ দুটি বড় খেলাঘরের ব্যবস্থা থাকা চাই এবং সকলের সমবেত হওয়ার জন্য একটি হলও থাকা দরকার। ঐ হলে প্রার্থনা বা অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি করা হয়। তাছাড়া, স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ডাক্তারের ঘর, শয়নকক্ষ, খেলনা রাখার কক্ষ, অন্ততঃ চারটি স্নানাগার, দুতিনটি ভাঁড়ার, বসবার ঘর ইত্যাদি থাকা চাই।

Q. 2. Discuss the necessity of infant education and the importance of the early years of a child.

Ans : পূর্ব্বে শিশুর জীবনের প্রথম কয়েকটি বৎসরকে শিক্ষার পরিধির মধ্যে গণ্য করা হতো না। মনে করা হতো, ঐ সময়ে শিশুর মঙ্গলের সকল কিছু ব্যবস্থা জননীই জানেন। শিক্ষাবিজ্ঞান শিশুপালন সম্পর্কে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেছে, বহু জননী সেগুলি একেবারেই গ্রাহ্য করতেন না। বর্ত্তমানে এই মনোভাব বহুলাংশে পরিবর্ত্তিত হয়েছে এবং অশিক্ষিত পিতামাতাও আজকাল শিশু-মঙ্গল কেন্দ্রগুলি থেকে শিশুপালন ও শিক্ষার মূল তত্ত্বগুলি জেনে নিয়ে আসার আগ্রহবোধ করছেন।

শিশুশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সমাজ ও জাতির প্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ মূল্যবান বলে আজ সর্ব্বজনস্বীকৃত হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থা যতই উচ্চস্তরের হোক, যদি শিশুর প্রথম বয়সের শিক্ষাদীক্ষা অবহেলিত হয়, তাহলে কোনমতেই সফল হতে পারে না। কারণ শিশুর মন ও দেহের গঠন শৈশবে যেভাবে হবে, পরবর্ত্তী স্তরের শিক্ষাধারার প্রভাব সেই পরিমাণেই কার্যকরী হবে। সেজন্য শিশুশিক্ষার গোড়ায় শিশুর দৈহিক সুষ্ঠু বিকাশের দিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

অতিরিক্ত যত্ন বা আদরের ফলে শিশুর আচরণ ও স্বাস্থ্য অনেক সময় বিকৃত হয়ে পড়ে। শিশুর কান্না শোনা মাত্রই তাকে যখন-তখন খাওয়ানোর ফলে হজমের গোলমাল হয় এবং বহুবিধ জটিল ব্যাধির সৃষ্টি হয়। ক্রমে শিশুর স্বাস্থ্য ও মানসিক প্রশান্তি নষ্ট হয়। প্রকৃত শিশু শিক্ষার বিষয়ে যত্নবান কোন ব্যক্তি এ সকল বিষয়ে অবহেলা করেন না।

শিশুকে শিক্ষা দেবার সময় পিতামাতার পক্ষে সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো আদর ও অনাদরের মধ্যে সূক্ষ্ম সমতা রক্ষা করে আচরণ করা। শিশুর যাতে কোনরকম স্বাস্থ্যহানি না ঘটে, সেজন্য সদাজাগ্রত সতর্কতা এবং যত্ন দরকার। পিতামাতা শিশুকে মহাসামগ্রী জ্ঞান করে কখনো অতিরিক্ত যত্ন করেন, যে পরিমাণ যত্ন তাঁরা পরে নানা সামাজিক কারণে করতে পারবেন না। আবার শিশুকে আদর্শ নিখুঁতভাবে গড়ে তোলার জন্য অতিরিক্ত শাসন করেন, যে শাসন শিশুকে সমগ্র জগতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। বহু অভিভাবকের এই জাতীয় সামঞ্জস্যহীন আচরণের ফলে বহু শিশুর মনে গভীর বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং পরবর্ত্তী নিয়মমাফিক স্কুল শিক্ষা গ্রহণের সময় বিপুল সমস্যার সম্মুখীন হয়। কারণ তখন অতিরিক্ত যত্ন পাওয়া সম্ভব হয় না, শাসনকেও আর ভাল লাগে না। এইজন্য শিশুর প্রাক্-স্কুল শিক্ষা বা গৃহশিক্ষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কাজেই পিতামাতার কর্ত্তব্য, শিশুর প্রথম বয়সে কোনও অসুখ হলে

উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করে স্বাভাবিকভাবে প্রফুল্লতার সঙ্গেই তা গ্রহণ করা উচিত যাতে শিশুর মনে সাহস জাগে। শিশুর স্বাভাবিক কাজকর্ম্মে স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রচেষ্টায় উৎসাহ দেওয়া দরকার। সে যাতে আপন উদ্যোগে বিভিন্ন কাজে সাফল্য লাভ করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা ভাল। বাইরের বিধি নিষেধ দ্বারা শিশুর সুনিয়মবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা না করে তার স্বাভাবিক আন্তর-সুনিয়মবোধ জাগানো প্রয়োজন।

সদ্যঃপ্রসূত শিশুর কোন অভ্যাস থাকে না, কতকগুলি প্রতিবর্ত্তী (reflex) ও প্রবৃত্তি (instinct) দ্বারা তার সকল আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ক্রমে স্পর্শ, ঘ্রাণ, দৃষ্টি প্রভৃতি সংবেদন (sense) মাধ্যমে শিশু নানা বস্তু ও বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে থাকে। এই সময়ে কেবল নিছক দৈহিক উপায়েই শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে এবং প্রতিটি সংবেদনশীলতা ধীরে ধীরে প্রখর করে তোলার জন্য উপযুক্ত পরিশীলনে সহায়তা করতে হবে।

শৈশবের বিকাশ যাতে স্বাভাবিক হয়, সেজন্য বয়স্কদের দেখা উচিত শিশুকে আনন্দ দেওয়ার প্রচেষ্টায় যেন আধিক্য না থাকে। শিশু যাতে নিজের প্রচেষ্টায় আনন্দলাভ করতে পারে, যাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুশিমত সঞ্চালন করে আনন্দ পায়, সে ব্যবস্থা রাখাই বাঞ্ছনীয়।

শিশুর মনে মানুষ ও জড় পদার্থের পার্থক্যবোধ জন্মে, তখন পরিবেশের মানুষের কাছে প্রশংসা ও অনুমোদন লাভের ইচ্ছা প্রবল হয়। এই সময়ে বয়স্কদের পক্ষে প্রশংসা বা নিন্দার সাহায্যে শিশুকে বিভিন্ন পথে চালিত করা সহজ হয়। প্রথম বয়সে অবশ্য নিন্দার প্রয়োগ খুবই কম করা উচিত এবং প্রশংসার ব্যবহারও খুব বিবেচনার সঙ্গে করা দরকার। নচেৎ কোনও ফললাভ হয় না।

শিশুর শেখবার বাসনা এত প্রবল যে, পিতামাতা কেবল এর সুযোগ দিলেই যথেষ্ট। শিশুকে আত্মবিকাশের সুযোগ দিলে সে আপন চেষ্টাতেই উপযুক্ত পথে অগ্রসর হবে। কথা বলে শেখানোর জন্য বয়স্ক ব্যক্তিরা যে সকল কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে থাকেন। তা শিশুর স্বাভাবিক ভাষা-বিকাশকে ব্যাহত করে বলেই বিশ্বাস হয়। শিশুরা নিজেদের বুদ্ধির সঙ্গে সমতা রেখে শিখতে থাকে, জোর করে কোন কিছু শেখানোর চেষ্টা করা ভুল। আপন চেষ্টায় প্রাথমিক অসুবিধাগুলি জয় করে কৃতকার্য হওয়ার যে অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাই সারাজীবন শিশুকে চেষ্টার প্রেরণা দেয়। এই অসুবিধাগুলি যেন এমন না হয় যাতে শিশু জয় করতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়ে অথবা এমন সহজও হওয়া উচিত নয়, যাতে কোন চেষ্টা না করেই করা যায়।

নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং রুটিনমত কাজ করা শিশুর জীবনে বিশেষ করে

প্রথম বছরে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রথম থেকে আহার, নিদ্রা এবং মলমূত্র ত্যাগ নির্দ্দিষ্ট অভ্যাস গঠন করাতে হবে। এছাড়া পরিবেশের সঙ্গে পরিচিতি লাভও শিশুমনের স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। এজন্য শিশুকে পরিবেশের সঙ্গে যথাসম্ভব পরিচিত করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব অভিভাবকদেরই।

শিশুর মধ্যেই বয়স্ক ব্যক্তির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিহিত থাকে, এজন্য শিশুর প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত আচরণ করাই বাঞ্ছনীয়। তবে অতিরিক্ত আদরও অপকারী, সেকথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ফ্রয়েড, গুডএনাফ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীর মতে তিন থেকে ছয় বছর বয়সের মধ্যেই শিশুর মনে যে প্রভাব স্থান পায়, তা ভবিষ্যৎ জীবনের সর্ব্বাংশেই ক্রিয়াশীল থাকে। এই শৈশবে যে সকল অভ্যাস গড়ে ওঠে, তা পরিবর্ত্তন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যে শিশু সামাজিক সহনশীলতা বা আত্মনির্ভরশীলতা শেখেনি, বয়স্ক জীবনে তার জীবনধারা স্বভাবতই কঠোর হয়ে পড়বে এবং তরুণ বয়সেই নানা বিভ্রান্তিতে কষ্ট পাবে। তেমনি শৈশবে যথাযথভাবে লেখা ও পড়ার অভ্যাস না হলে পরবর্ত্তী স্তরে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্য্যায়ে শিশু নানা বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

এই সকল কারণে অল্পবয়স্ক শিশুদের শিক্ষার কাজে নিযুক্ত শিক্ষক বা অভিভাবদের দায়িত্ব যত বেশি, তত বেশি দায়িত্ব সম্ভবতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আর কোন ব্যক্তির থাকে না। শিশুশিক্ষায় ব্রতী সকলকেই এজন্য শিশুর আচরণ ও বিকাশ সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে এবং বিশেষ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে॥

Q. 3. Enumerate the problems of nursery and infant education in India.

Ans. জগতের অন্যান্য সকল প্রগতিশীল দেশে নার্সারী ও শিশু শিক্ষা বিষয়ে যে পরিমাণ উন্নতি হয়েছে, ভারতে এখনও তা হয়নি কারণ কতকগুলি সমস্যা আজও দূর করা সম্ভব হয়নি। প্রকৃতপক্ষে অতি অল্পবয়স্ক শিশুর শিক্ষার জন্য যে পৃথক স্কুল ব্যবস্থা প্রয়োজন, একথা এদেশের অভিভাবকদের অনেকেই সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। শিশু পিতামাতার কাছে থেকে অনুপচারিক (informal) শিক্ষা গ্রহণ করে বিকাশলাভ করবে স্বাভাবিকভাবে, এই ধারণাই এদেশের অধিকাংশ অভিভাবকের মনে বদ্ধমূল। মাতাপিতার সান্নিধ্যে যে শিক্ষা হয়, তা স্কুলে হতে পারে না বলেই সকলের ধারণা এবং তা আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত। ফলে যে সকল গৃহে পিতা বা মাতা অল্পশিক্ষিত বা শিশুমন সম্পর্কে সম্যক্‌ভাবে অবহিত নন, সেক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে শিশুর প্রথম বয়সের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা অবহেলিত এবং বহুক্ষেত্রে বিকৃত হতে বাধ্য হচ্ছে।

অবশ্য অর্থনৈতিক কারণে যখন পিতা ও মাতা উভয়েই উপার্জ্জনের

উদ্দেশ্যে অন্যত্র ব্যস্ত থাকতে বাধ্য হন, তখন শিশুকে দিনমানে কোনও প্রতিষ্ঠানে গচ্ছিত রেখে যাওয়ার কথা ইদানীং অনেকটা বাধ্য হয়েই ভাবতে হচ্ছে অনেককে। এই ধরণের অভিভাবকরা নার্সারী বা শিশুদের বিশেষ স্কুলে আপন সন্তানদের ভর্ত্তি করেন উন্নত ধরণের শিক্ষার জন্য নয়, মূলতঃ নিজেদের অনুপস্থিতিতে শিশুকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অন্যের ওপর দেওয়ার তাগিদেই তা করে থাকেন। দাম্পত্য জীবনে শিশু পরিচর্য্যা ও শিক্ষার গুরুদায়িত্ব যে দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করে থাকে, তা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যই বহু অভিভাবক নার্সারী স্কুলের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। বলা বাহুল্য, এধরণের মনোভাবের ফলে নার্সারী ও শিশুদের বিশেষ স্কুলগুলিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে থাকলেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, শিশু এতে উপকৃত হচ্ছে না। কারণ নার্সারী স্কুল গৃহশিক্ষার পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণভাবে স্থান গ্রহণ করতে পারে না। পিতামাতার স্নেহ এবং আত্মিক সম্পর্ক যেখানে স্বল্প, সেখানে নার্সারী স্কুল শিশুর বিশেষ উপকার করতে পারে না। শিশুকে বাঞ্ছিত রত্নরূপে সকল প্রকার স্নেহ ও সহানুভূতি দিতে হবে প্রত্যেক অভিভাবককে এবং কেবল নার্সারী স্কুলের শিক্ষাধারার উপর পরিপূর্ণ নির্ভর না করে সামঞ্জস্যপূর্ণ গৃহশিক্ষাও অক্ষুন্ন রাখতে হবে।

বহু অভিভাবক নার্সারী শিক্ষার উপযোগিতা স্বীকার করলেও সম্পূর্ণভাবে এর তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতে পারেন না বলে অনেক ক্ষেত্রে নার্সারী-স্কুল পরিচালকদের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। খেলার আনন্দে শিশু সব কিছু শিক্ষালাভ করতে পারে, এ ধারণা অনেক অভিভাবক স্বীকার করতে চান না। পুঁথি ছাড়া অক্ষর জ্ঞান বা সংখ্যাজ্ঞান হতে পারে, ধারাপাত না পড়েই শিশু অঙ্ক শিখতে পারে, প্রাচীনপন্থী বহু অভিভাবক একথা কিছুতেই সমর্থন করতে পারেন না। এজন্য অভিভাবকদের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে বহু নার্সারী-স্কুলে কিছু কিছু বই পড়ার ব্যবস্থা অনিচ্ছাসত্বেও রাখতে হয় এদেশে। সুতরাং প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত ক্রীড়াভিত্তিক শিশুশিক্ষা এদেশের অধিকাংশ নার্সারী-স্কুলেই সম্ভব হয় না।

মূলতঃ শহরাঞ্চলে অবস্থাপন্ন মহলেই নার্সারী-স্কুল ও শিশুদের বিশেষ ধরণের স্কুলের চাহিদা দেখা যায়। এই শ্রেণীর অভিভাবকদের অনেকেই আধুনিক আদবকায়দার বশবর্ত্তী হয়ে নার্সারী-স্কুলে আপন সন্তানদের পাঠিয়ে থাকেন এবং এই ধরণের পিতামাতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য সুসজ্জিত মনোহারী স্কুল কক্ষ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শিক্ষাব্যয় বৃদ্ধি পায়, যা এদেশের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত অভিভাবকের পক্ষেই বহন করা দুঃসাধ্য। ফলে, নার্সারী-স্কুল শিক্ষা ইদানীং যেন বহুলাংশেই ব্যয়বহুল আদবকায়দায় পর্য্যবসিত হয়েছে এবং দেশের অগণিত শিশু এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে না।

সত্যসত্যই, বিদেশী মতবাদের উপর গঠিত এই নার্সারী স্কুলগুলি বিদেশী ধরণে সংগঠিত হয় বলে আসবাবপত্র, ছবি নক্সা, ক্রীড়াঙ্গন, উপকরণাদির আয়োজন বহু অর্থব্যয় করতে হয়, যা সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত মহলে বহন করা সম্ভব নয়। এজন্য সরকারী সাহায্য প্রয়োজন বলে মনে হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে এদেশের সরকারী শিক্ষাদপ্তর প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্ব্বজনীন ও আবশ্যিক করার ব্যাপারে যেভাবে ব্যতিব্যস্ত রয়েছেন, সেক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক নার্সারী-স্কুলের জন্য অর্থ সাহায্যের কথা তাঁদের পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব হচ্ছে না। আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন, সেটাই যখন সংগ্রহ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, তখন প্রাক্-প্রাথমিক নার্সারী-স্কুল ব্যবস্থাকে জনসাধারণের সাহায্যের উপরই নির্ভর করে থাকা ছাড়া বর্ত্তমানে আর কোন উপায় নেই। ফলে, নার্সারী-স্কুল ব্যবস্থা অদূর ভবিষ্যতে ব্যাপকভাবে সকল শ্রেণীর অভিভাবকদের উপকারে আসতে পারবে বলে মনে হয় না।

বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় বর্ত্তমানে নার্সারী-স্কুল ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত হওয়ার একটি কুফল হচ্ছে এই যে, স্কুলগুলির উৎকর্ষমান সম্পর্কে কোন নির্দ্দিষ্ট ধারণা করা সম্ভব হচ্ছে না। অভিভাবকরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল নন এবং তাঁরা শুধু এইটুকুই বিশ্বাস করেন যে, আধুনিক শিশু শিক্ষাব্যবস্থা নার্সারী-স্কুলে অপেক্ষাকৃত ভাল। এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে তাঁরা নার্সারী-স্কুলে শিশুকে পাঠিয়ে থাকেন। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই অভিভাবকদের এই অজ্ঞতা এবং নার্সারী-স্কুলের প্রতি সদ্যজাগ্রত মোহের সুযোগে অনেক অনভিজ্ঞ ব্যক্তি নার্সারী-স্কুল প্রতিষ্ঠা করে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উচ্চ বেতনহারে অভিভাবকদের আকৃষ্ট করছেন। এই সকল অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রকৃতপক্ষে কিছু খেলা, সঙ্গীত নৃত্য, শিল্পকাজ, ভ্রমণ প্রভৃতি প্রমোদনমূলক কর্ম্মসূচীর মাধ্যমে শিশুকে নিযুক্ত রাখেন কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত নার্সারী বা শিশুশিক্ষাকে কার্য্যকরী করতে পারেন না। ফলে, কয়েক বৎসর পরে দেখা যায়, শিশু কতকগুলি আদবকায়দা শিখেছে, অনেকগুলি বহির্পাঠ্য বিষয় আয়ত্ত করে প্রশংসা অর্জ্জন করছে, কিন্তু প্রকৃত আচরণ, সহযোগিতাবোধ, সুনিয়মবোধ, শ্রদ্ধাবোধ—কিছুই ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারেনি, এমনকি বহু ক্ষেত্রে প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞান, সংখ্যাজ্ঞানও আয়ত্ত করতে পারেনি। এই ধরণের ব্যবসায়িক নার্সারীস্কুলের সংখ্যা এদেশে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেখানে শিশু প্রকৃত শিক্ষাগ্রহণের পরিবর্ত্তে আয়াসপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং ভবিষ্যতে উচ্চতর শিক্ষাস্তরে পরিশ্রমসাধ্য চিন্তনভিত্তিক শিক্ষাকে ঘৃণা করতে শিখছে। নার্সারীস্কুলে প্রদর্শনমূলক অনুষ্ঠানের আধিক্যের জন্যও শিশুকে প্রশংসাপ্রিয় হতে দেখা যাচ্ছে।

এই সকল কারণেই নার্সারী স্কুলের মাধ্যমে শিশু সমাজের মানসিক ও চারিত্রিক অবনতি যাতে না ঘটে, ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অভিভাবকদের শোষণ করা না হয়, সেজন্য নার্সারী স্কুলগুলিকে সংহত ও কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন। প্রতিটি স্কুলে কি ধরণের শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকবেন, তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া দরকার। সরকারী শিক্ষা দপ্তর এদিকে আকৃষ্ট না হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অভিভাবকগণ সম্মিলিত হয়ে এবিষয়ে কতকগুলি নীতি ও উৎকর্ষমান নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। সরকারী উদ্যোগে আইন প্রণয়নের জন্যও দাবী জানানো উচিত, যাতে নার্সারী স্কুলের মতো গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবসায়িক স্বার্থপরতা বৃদ্ধি না পায়।

অবশ্য নার্সারী শিক্ষার জন্য উপযুক্ত দক্ষ শিক্ষক সংগ্রহ করাও সহজ নয়। এ বিষয়ে ভাল ট্রেনিংএর আয়োজনও এদেশে ব্যাপক নয়। বুনিয়াদী শিক্ষণ বা বি. টি. ট্রেনিংএর জন্য সরকারী শিক্ষাদপ্তর যে পরিমাণে উদ্যোগী, নার্সারী শিক্ষণ সম্পর্কে সে পরিমাণে উদ্যোগী নন। তার কারণ, সরকারী মহল এখন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিকল্পেই সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করেছেন। যতদিন না বিশেষ ধরণের শিশুশিক্ষার উপযুক্ত ট্রেনিংএর আয়োজন করা যাচ্ছে, ততদিন এদেশের নার্সারী স্কুলগুলি শিশুর উপকারের চেয়ে অপকারই করবে বেশি।

এই প্রসঙ্গে শহরাঞ্চলে স্থানাভাবের কথাও উল্লেখযোগ্য। নার্সারী-স্কুলের উদ্যান, ক্রীড়াকক্ষ, সমাবেশ কক্ষ, গ্রন্থাগার, পাঠকক্ষ, সংগ্রহশালা প্রভৃতি নানাপ্রকার আয়োজন রাখার জন্য যে পরিমাণ স্থান সঙ্কুলান প্রয়োজন, শহরে তা দুষ্প্রাপ্য। এ কারণে অধিকাংশ নার্সারী-স্কুলে অতি অল্প জায়গায় কাজকর্ম্ম হয় এবং শিশুর বিকাশের উপযোগী উন্মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে না।

নীতিগতভাবে নার্সারী ও শিশুর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশঃ মর্য্যাদালাভ করতে থাকলেও উপরিউক্ত সমস্যাগুলির জন্য প্রকৃতপক্ষে উপযুক্ত পরিমাণে সমাজের ব্যাপক উপকার সাধন করতে পারছে না।

Q. 4. Discuss the special problems of primary and infant education in big cities and industrial areas in India.

Ans. বর্ত্তমান শহর সভ্যতার যুগে প্রাথমিক ও শিশু শিক্ষাক্ষেত্রে শহরাঞ্চলে কতকগুলি বিশেষ ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। প্রধানতঃ জনসংখ্যা বেশি বলে শহরে শিশুশিক্ষার চাহিদা বেশি, কিন্তু স্কুলগুলিতে স্থানাভাব সর্ব্বজনবিদিত। এই জন্য প্রত্যেক প্রাথমিক স্কুলেই অগণিত শিক্ষার্থী সংখ্যা অপরিহার্য্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং কোন ক্ষেত্রেই শিশুর ব্যক্তিগত বৈষম্যের উপযুক্ত মর্য্যাদা দেওয়া সম্ভব হয় না। অত্যধিক শিক্ষার্থী সংখ্যার দরুণ

প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিশুরা উন্মুক্ত পরিবেশের সুযোগ তো পায় না, বরং অপরিসর শ্রেণীকক্ষে বহুক্ষণ একই কাজে আবদ্ধ থাকার জন্য তাদের মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যেরও ক্রমাবনতি ঘটে। শহরে বাসস্থানের অভাব এতই প্রকট যে, স্কুলের জন্য উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা করার কথা চিন্তা করাই যায় না।

অবশ্য কোন কোন প্রগতিশীল মহলে উন্মুক্ত পরিবেশে বিস্তীর্ণ স্কুলভবনে প্রাথমিক শিশুশিক্ষার আয়োজন করা হয়ে থাকে, কিন্তু শহরে বাড়ী ও জমির মূল্য এত অধিক যে, সে ধরণের আদর্শ স্কুলের ব্যয়ের পরিমাণ স্বভাবতই বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষার্থীদের বেতনও যথেষ্ট উচ্চহারে নির্দ্ধারণ করতে হয়। ফলে শহরাঞ্চলে আদর্শ স্কুলের উপযুক্ত ভবনের ব্যবস্থা করা গেলেও ব্যয়াধিক্যের জন্য সেই ধরণের স্কুলের সুযোগ মধ্যবিত্ত গৃহের শিশুদের ভাগ্যে সহজলভ্য হয় না।

কেবল স্কুলভবনের সমস্যা ছাড়াও আছে অন্যান্য শিক্ষা-উপকরণের সমস্যা। শহরের প্রতিটি জিনিষ চাহিদার তুলনায় ইদানীং এত অল্প উৎপাদন হয় যে, দ্রব্যমূল্য সর্ব্বদাই ক্রমবর্দ্ধমান। একারণে শিশুশিক্ষার উপকরণাদি, আসবাবপত্র এবং পাঠ্যপুস্তকাদির মূল্য খুবই বেশি এবং শহরের আদবকায়দা রক্ষার জন্য স্কুল কর্ত্তৃপক্ষকেও কতকগুলি অতিরিক্ত ব্যয় বাধ্য হয়েই করতে হয়, যা গ্রামাঞ্চলে না হলে কোন লোকই মনঃক্ষুণ্ণ হয় না।

শহরাঞ্চলে বিবিধ প্রকার উচ্চবেতনের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহ করাও দুরূহ ব্যাপার। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন হার এত অল্প যে, কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি এই বৃত্তিতে আগ্রহবোধ করেন না। যাঁরা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন, তাঁরা অন্যত্র অপেক্ষাকৃত অধিক বেতনের কর্ম্মসংস্থান পেলেই শিক্ষকতা ত্যাগ করেন। ফলে, শিশু-শিক্ষার্থীদেরই ক্ষতি হয়।

শিশুর উপযুক্ত শিক্ষার জন্য অভিভাবক ও পিতামাতার সযত্ন দৃষ্টি ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। শহরবাসী অভিভাবকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থ উপার্জ্জন, সমাজকল্যাণ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে, সন্তানের শিক্ষার দাবী তাঁদের কাছে মূল্যবান হলেও অধিক সময় বা চিন্তা দিতে পারেন না। ইদানীং জননীরাও সমাজকল্যাণ ও অর্থ উপার্জ্জন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার দরুণ বহু পরিবারের শিশু সন্তানগণ অবহেলিত পরিবেশে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সে সব কারণে শহরাঞ্চলে শিশুশিক্ষার উন্নততর ব্যবস্থা থাকলেও অভিভাবকদের স্নেহ-সান্নিধ্যের অভাবে অনেকাংশেই শিশুর ব্যক্তিত্ব যথাযথভাবে বিকশিত হতে পারে না।

শিল্পাঞ্চলের যে সকল পিতামাতা কলকারখানায় কঠোর পরিশ্রম করেন, তাঁদের মানসিক স্থৈর্য্য নষ্ট হয় এবং তাঁরা গৃহের শান্তিময় পরিবেশ রক্ষা করতে

অনেক সময়েই পারেন না। শিশুর দাবী পূরণে তাঁরা মানসিক ও অর্থনৈতিক কারণে প্রায়ই ব্যর্থ হন, ফলে শিশুর স্বাভাবিক শিক্ষা ও বিকাশ অত্যন্ত ব্যাহত হয়। শিল্পাঞ্চলের কোলাহলময় পরিবেশ, অপরিচ্ছন্ন পারিপার্শ্বিক ও তীব্র অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা শিশুর অভিভাবককে যেমন উদ্বিগ্ন ও অশান্ত করে রাখে, তেমনি ঐ ধরণের সামাজিক পরিবেশে শিশুও অস্থির অনিয়মী বিদ্বেষপরায়ণ এবং অতৃপ্ত ব্যক্তিত্ব নিয়ে বড় হতে থাকে। সমাজের পক্ষে এই পরিবেশ কতখানি বিপজ্জনক তা সহজেই অনুমেয়।

শহর পরিবেশের কোলাহল শিশু শিক্ষার পক্ষে সত্যসত্যই খুবই ক্ষতিকর। শিশুর মনোযোগ বিধৃত করে রাখার জন্য যে প্রশান্ত পরিবেশ প্রয়োজন। শহরে সে পরিবেশ দুর্লভ বলা চলে। কোলাহল ছাড়াও শহরের নিত্যনূতন আকর্ষণ ও বৈচিত্র্য শিশুমন কেন বয়স্কমনকেও বিক্ষিপ্ত করে রাখে। জ্ঞানার্জ্জনের জন্য বা অভিজ্ঞতা উপলব্ধির জন্য যে ন্যূনতম সাধনার মনোবৃত্তি প্রয়োজন, একাগ্রতা প্রয়োজন, শহরের ব্যস্ত জীবনধারা তার পরিপন্থী। শহরের সুখাবহ পরিবেশগুলি শিশুকে এমন প্রলুব্ধ করে যে, তার অপরিণত মনোযোগ সহজেই বি ক্ষপ্ত হয়ে পড়ে। এই কারণে শহরের মধ্যে শিশু শিক্ষার যত প্রকার আধুনিক ব্যবস্থাই থাকুক না কেন, উপযুক্ত পরিবেশের অভাব দূর করা সহজসাধ্য নয়।

যদিও শহরের মধ্যে স্কুলের সংখ্যা অগণিত, তবুও একটি বিষয়ে শিশু অসুবিধা ভোগ করে, তা হলো নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা। শহরের বেগবান যানবাহনের বিপদ এত বেশি যে, শিশুকে নিরাপদে নিকটতম স্কুলে পাঠানোও চিন্তার ব্যাপার। এজন্য বহু প্রগতিশীল শিশু স্কুলে নিজস্ব যানবাহনের আয়োজন থাকে, এবং তার জন্য অভিভাবকদের অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করতে হয়। অবশ্য এই সুবিধা অনেক মধ্যবিত্ত অভিভাবক গ্রহণ করতে পারেন না, ফলে শিশুদের বিপজ্জনক যানবাহনসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে স্কুলে যেতে হয়।

শহরাঞ্চলে শিশুদের শিক্ষার চাহিদা খুব বেশি অথচ স্কুলের অভাব প্রকট; এই কারণে কোন কোন ব্যবসায় মনোবৃত্তির ব্যক্তি শিশুদের প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করে থাকেন। সাম্প্রতিক কালে এই ধরণের প্রাথমিক ও শিশু স্কুল দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে শিশুরা কোন না কোন স্কুলে পাঠগ্রহণের আপাত সুযোগ লাভ করলেও তাদের প্রকৃত শিক্ষা অনেকাংশেই হচ্ছে না, কারণ ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির শিক্ষকের কাছ থেকে শিশুর প্রকৃত উন্নতি আশা করা যায় না।

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে শহরে পৌরসভা (মিউনিসিপ্যালিটি) এবং সরকারী শিক্ষা দপ্তর একই সাথে ক্ষমতা প্রয়োগ

করে থাকেন বলে বহু ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। সরকারী উদ্যোগে অবৈতনিক আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার নীতি কার্য্যকরী করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু পৌরসভার হাতে অধিকতর ক্ষমতা ন্যস্ত করার বিষয়ে সরকারী পক্ষ ইচ্ছুক নন। এ ছাড়া পৌরসভার অর্থসংস্থান অল্প হওয়ার দরুণ বাধ্য হয়ে সরকারী দপ্তরের শরণাপন্ন হতে হয় এবং প্রশাসনিক টানাপোড়েনের মধ্যে বহু অর্থ ও শ্রম অপচিত হয়। শিশু শিক্ষার প্রগতি যথাসম্ভব দ্রুত হয় না।

শহর ও শিল্পাঞ্চলের এসকল সমস্যা সত্ত্বেও অধিকাংশ অভিভাবক শহরের শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নততর বলে ধারণা করে থাকেন, তার কারণ শহরের স্কুলগুলির মনোরম বহিরাবরণ, আদবকায়দা, স্কুল ইউনিফর্ম, সিনেমা থিয়েটারের মাধ্যমে শিক্ষা, স্কুল বাস প্রভৃতির প্রতি কিছু মোহ প্রকৃত সমস্যাকে চক্ষুর অন্তরালে রাখতে পেরেছে। অভিভাবকগণ যদি শহর শিক্ষার বহিরাবরণের প্রতি প্রলুব্ধ না হয়ে অল্পব্যয়ে প্রকৃত আচরণ শিক্ষার দাবী জানান, তাহলে শিক্ষাজগতে এক নতুন সচেতনতা আসতে পারে বলে মনে হয়। নতুবা অগণিত আধুনিক বিদেশী শিক্ষাধারার সংমিশ্রণে বর্তমানযুগের শহর-শিক্ষা ভারতের মত দরিদ্র দেশে উপকারের চেয়ে অপকারই করছে বেশি।

Q. 5. Discuss the problems of maladjustment and guidance of children in relation to primary education.

Ans. অল্পবয়স্ক শিশুর শিক্ষাগ্রহণের পথে একটি প্রধান প্রতিবন্ধক হলো সামাজিক ও মানসিক সমন্বয় সাধনের অভাব ও বিকৃতি। যেমন, বহু শিশু ভালভাবে বই পড়তে পারে না এবং বইয়ের বিষয়বস্তু সহজে গ্রহণ করতে পারে না ; সে সব ক্ষেত্রে শিশুর প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক সমন্বয়ের বিকৃতি অনেকাংশেই ব্যাঘাত সৃষ্টি করে থাকে। এসব কারণে ইদানীং প্রাথমিক স্কুলের শিশু-শিক্ষার্থীদের মধ্যেও বিবিধ আচরণ সমস্যা দেখা দিচ্ছে এবং পড়াশুনার প্রতি তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করা যাচ্ছে না। আচরণের বিকৃতি সম্পর্কে অবহিত না হলে অপরিণত শিশুমনের উপযুক্ত শিক্ষাবিধান একরকম অসম্ভব। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় ৩০% শিশুর আচরণ-বিকৃতি দেখা যায়। তবে সাধারণতঃ ৫% থেকে ১০% শিশুর কোন না কোন আচরণ-বিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান সমাজের ক্রমবর্দ্ধমান জটিলতা, অর্থনৈতিক চাপ, পারিবারিক অশান্তি প্রভৃতি কারণে শিশু-শিক্ষার্থী অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে অক্ষম হচ্ছে, ফলে তার আচরণ ক্রমে অবাঞ্ছিত হয়ে পড়ছে। বালকদের মধ্যে অবাঞ্ছিত আচরণ প্রায় ৮৫% ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং এই আচরণ-বিকৃতি প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অবহেলিত হয় বলেই মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিরক্তিকর সমস্যামূলক অবোধ্য আচরণ দেখা দেয়।

আচরণ বিকৃতি নানাবিধ। এর মধ্যে লাজুকভাব, সন্দিগ্ধভাব, মিথ্যাবলা, বাচালতা, নিষ্ঠুরতা, প্রতারণা করা, অত্যাচার করা, স্কুল পালানো, অবাধ্যতা, আলস্য, চুরি করা, অশ্রদ্ধা, অশ্লীলতা, কোলাহলপ্রিয়তা, আত্মপ্রচার, অস্বাস্থ্যকর যৌনাভ্যাস প্রভৃতি প্রধান। এই সকল বিকৃত আচরণের মূল উদ্ভব এবং প্রতিকারের কার্য্যকরী নীতি সম্পর্কে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকগণ সম্যকভাবে অবহিত না হলে শ্রেণী-সুনিয়ম রক্ষা করা যায় না। শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণের প্রথমদিকে শিক্ষকগণ যে সকল অসুবিধার উল্লেখ করে থাকেন, সেগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধা শ্রেণী-সুনিয়ম সমস্যা। আচরণ বিকৃতি রোধ করা গেলে এই সমস্যা দূর করা যায়। কিন্তু যেখানে আচরণ-বিকৃতির মূল নিহিত থাকে বংশগতির মধ্যে। সেখানে সমস্যা খুবই জটিল হয়ে পড়ে। তবে স্কুল ও সামাজিক পরিবেশকে সুকৌশলে নিয়ন্ত্রিত করা গেলে বংশগতিজনিত আচরণ-সমস্যাগুলিও অনেকাংশে প্রশমিত করা সম্ভব হয়। এদেশে বর্ত্তমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এমনই গতানুগতিক যে, স্কুলের পরিবেশকে পুনর্গঠন করা বা গৃহ পরিবেশকে পুনর্গঠিত করার ব্যাপারে অভিভাবকদের সঙ্গে সহযোগিতা করার যথাযথ অবকাশ নেই। শিক্ষকগণ সহানুভূতিসম্পন্ন হলে আচরণ-সমস্যা অনেক কমে, কিন্তু যে ধরণের অর্থ নৈতিক নিষ্পেষণে শিক্ষকসমাজ বর্ত্তমানে জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন, তার ফলে শিশুর আচরণ-সমস্যার প্রতি আশানুরূপ সহানুভূতিসম্পন্ন মনোযোগ দেওয়া তাঁদের মত অল্প বেতনের শিক্ষকদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এই কারণে, বহু ক্ষেত্রেই আচরণ সমস্যাক্লিষ্ট শিশুরা শিক্ষকের কাছে রূঢ় আচরণ পেয়ে ক্রমাবনতির পথে নেমে যাচ্ছে। সুতরাং, শিক্ষাক্ষেত্রে সুনিয়ম রক্ষা করাটাই প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবশ্য এমন অনেক আচরণ সমস্যা আছে, যা স্কুলের সুনিয়ম রক্ষায় বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করে না, কিন্তু শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ও শিক্ষা গ্রহণের অন্তরায় হয়ে থাকে। এ সকল আচরণ-বিকৃতির স্বরূপ ও মাত্রা নির্ণয় করার জন্য নানাবিধ মানসিক অভীক্ষা (টেষ্ট) বিদেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে সে ধরণের বিজ্ঞানসম্মত প্রচেষ্টা বিরল বললেই চলে। শিশুর ব্যক্তিত্ব, আগ্রহ, মানসিক দ্বন্দ্ব প্রভৃতির সঠিক ধারণা করার জন্য এ ধরণের অভীক্ষা আমাদের দেশে কিছু কিছু প্রণয়ন ও প্রচলন করার চেষ্টা হলেও এখনো শিক্ষক ও অভিভাবক মহলে এ ধরণের প্রচেষ্টার গুরুত্ব উপলব্ধি হতে দেখা যায় নি। ফলে, ব্যক্তিগত ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে শিশুর আচরণ সমস্যাকে বিচার করা হয় এবং বহু ক্ষেত্রেই শিশুর প্রতি অবিচার করা হয়ে থাকে।

প্রত্যেক শিশুর স্বাভাবিক ও সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য কতকগুলি তৃপ্তি

লাভ করতে চায়। দৈহিক, সামাজিক ও মানসিক তৃপ্তিগুলি শিশু অহরহ বঞ্চিত হলে আচরণ সমস্যা জাগে। শিশুর ব্যক্তিগত চাহিদা অপূর্ণ থাকলে যে ব্যর্থতার মনোভাব জাগে, তা থেকে অসন্তোষ ও আচরণ-বিকৃতির উদ্ভব হয়। সাধারণতঃ, দারিদ্র্য, সদ্ভাবহীন গৃহ পরিবেশ, ব্যক্তিগত অসামর্থ্য, অভিভাবকের অবহেলা বা অতি-যত্ন এবং নানাবিধ অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিক অভ্যাসের ফলেই শিশুর আচরণ-বিকৃতি ঘটে।

সমাজবিজ্ঞানের সমীক্ষায় দেখা গেছে দারিদ্র্য শিশুর আচরণ-বিকৃতির অন্যতম প্রধান কারণ। এজন্য সমাজের নিম্ন-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শোচনীয় দারিদ্র্য দূর করার বিষয়ে সযত্ন না হতে পারলে আচরণ সমস্যা দূর করা প্রায় অসম্ভব। সমস্যাটি এখানে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক।

সম্ভবতঃ এই শোচনীয় দারিদ্র্যের সংগ্রামে জর্জ্জরিত হয়ে বহু পরিবারে স্বাস্থ্যকর সদ্ভাব ও প্রীতির সম্পর্ক ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। সদ্ভাবহীন পারিবারিক পরিবেশে শিশু অত্যন্ত বিভ্রান্তবোধ করে এবং নিরাপত্তাবোধ হারায়। প্রাথমিক স্কুলের শিশু-শিক্ষার্থীরা অনেকক্ষেত্রেই এজন্য স্কুলের পরিবেশে নিজেকে নিরাপদ বোধ করে না এবং পাঠে অমনোযোগী হয়ে পড়ে। এজন্য প্রাথমিক শিক্ষকদের উচিত মাঝে মাঝে শিশুর বাড়ীতে গিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং যথাসম্ভব সুস্থ সদ্ভাবপূর্ণ গৃহ পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করা। অবশ্য শিক্ষকের এই সমাজকল্যাণমূলক কাজ আদর্শ বলে মনে হলেও কার্য্যক্ষেত্রে অল্প বেতনের শিক্ষকদের পক্ষে তা করা বর্ত্তমানে সম্ভব হয় না।

শিশু যখন কোনও দৈহিক বা মানসিক অপরিপূর্ণতার জন্য নিজেকে বিশেষ বিশেষ কাজে অসমর্থ বলে জানতে পারে। তখন তার মনে এক হীনমন্যতার সৃষ্টি হয় এবং এই হীনমন্যতার ফলে হতাশ জাগে বা কোন কোন ক্ষেত্রে হীনমন্যতা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টায় উগ্রতার সৃষ্টি হয়। অনেকে মনে করেন, অসমর্থ শিশুদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে দিলে তাদের হীনমন্যতা দূর হয়। এ ধারণা সত্য নয়, কারণ বিভক্ত করে দেওয়ার নীতিটাই হীনমন্যতার জন্ম দেয়। তাছাড়া, বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এদেশে পৃথক পৃথক শ্রেণী ও পৃথক শিক্ষকের ব্যবস্থা করাও সম্ভব নয়। এই সমস্যার সমাধান করতে হলে শিক্ষককে সহানুভূতিসম্পন্ন হতে হবে এবং শিশুর কাছে নানাবিধ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে বোঝাতে চেষ্টা করতে হবে যে, এক বিষয়ে অসমর্থ বহু ব্যক্তি জগতে অন্য বিষয়ে বিপুল সার্থকতা অর্জ্জন করতে পেরেছেন। এইভাবে অসমর্থ শিশুদের মনে গভীর আশার সঞ্চার করতে পারলে তাদের মনে কোনও রকম আচরণ সমস্যা জাগতে পারে না।

অনেক শিশু আছে, যারা বাড়ীতে কোনও রকম স্নেহ বা মর্য্যাদা পায় না। এ ধরণের শিশুর স্নেহ ও নিরাপত্তার দাবী অবহেলিত হওয়ার দরুণ অসহায়ভাব জাগে এবং সেই অসহায়ভাব দূর করার জন্য প্রবল উগ্রভাব সৃষ্টি হয়, যা সকল মানসিক শান্তি বিনষ্ট করে। যদিও এসব ক্ষেত্রে শিশুর সঙ্গে অভিভাবকের সম্পর্ক উন্নত করার ব্যাপারে শিক্ষকের বিশেষ কিছু করার থাকে না। তবুও শিক্ষক স্কুল পরিবেশের মধ্যে এই ধরণের অবহেলিত শিশুর প্রতি সামঞ্জস্যপূর্ণ স্নেহ ও মর্য্যাদা দেখাতে পারেন। যাতে শিশু অন্ততঃ কিছু পরিমাণে আপন চাহিদাগুলি মিটিয়ে নেওয়ার আনন্দ ও তৃপ্তি পেয়ে স্বাভাবিক হতে পারে।

অবহেলিত শিশুর আচরণ-বিকৃতি যেমন সমস্যার সৃষ্টি করে, তেমনি অতি-যত্নে প্রতিপালিত শিশুও শিক্ষাক্ষেত্রে নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। যে সব পিতামাতা স্বয়ং উদ্বেগজনিত অস্থিরতায় ভোগেন এবং নিরাপত্তাবোধ হারিয়েছেন, সাধারণতঃ তাঁরাই সন্তানকে অতিরিক্ত যত্নের মধ্যে পালন করতে চান। এ ধরণের শিশু স্বার্থপর, উগ্র, দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং বড় হয়েও ছেলেমানুষ থেকে যায়। সুতরাং এই সব শিশুকে স্কুলের পরিবেশে সমাজান্বিত করা বিশেষ কঠিন কাজ। এরা অপরের অভিমত সহ্য করতে পারে না এবং সহজেই ব্যর্থতার হতাশায় ভেঙে পড়ে। স্কুল পরিবেশের কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেলে এবং সকলের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেলে এইসব শিশু ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে এবং পড়াশুনায় সকলের সাথে এগুতে পারে।

প্রাথমিক স্কুলের কোন কোন পরিবেশ ও শিশুর আচরণ-বিকৃতির কারণ হয়ে থাকে। অনভিজ্ঞ শিক্ষণহীন (আনট্রেণ্ড) শিক্ষক অনেক সময় শিশুকে নানাপ্রকার ভীতি প্রদর্শন করেন, পরীক্ষার আতঙ্কে উদ্বিগ্ন করে রাখেন। ফলে শিশু কোন কোন ক্ষেত্রে পড়াশুনা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চায়। আবার কখনো বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে অবাধ্য হয়ে ওঠে। ক্লাশে সুনিয়ম রক্ষার তাগিদে অনেক সহানুভূতিহীন শিক্ষক এক অনাবশ্যক কঠোরতা ও কর্ত্তৃত্ব আরোপ করেন যে, তার ফলে শিশুর স্বাভাবিক উদ্যম ও সজীবতা নষ্ট হয়ে যায় এবং সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ ছাড়া আপন উদ্যোগে কোন কাজ করার সকল আগ্রহ হারায়। শিশুকে অহরহ নিন্দা, বিদ্রূপ এবং কঠোরতার সম্মুখীন হতে হয় বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্কুল থেকেই তারা আচরণ বিকৃতি নিয়ে আসে, একথা আজ অভিজ্ঞ মহলে স্বীকৃত হয়েছে। সহানুভূতিশীল সুশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকগণ প্রাথমিক শিক্ষা পর্য্যায়ের শিশুদের শিক্ষা ও পথনির্দ্দেশের ভার নিলে এই সকল সমস্যার প্রতিকার হতে পারে।

শিশুর আচরণ-বিকৃতি নিবারণ ও প্রতিকারের জন্য প্রত্যেকটি শিশুকে

নিয়মিত পর্য্যবেক্ষণ করে তার প্রগতির আনুপূর্ব্বিক ইতিবৃত্ত রক্ষা করা দরকার, যাতে শিশুকে যথাযথভাবে পথনির্দ্দেশ দেওয়া সহজ হতে পারে। মাঝে মাঝে শিক্ষকগণ এবিষয়ে আলোচনা ও পন্থা নির্দ্ধারণের জন্য সম্মেলনে মিলিত হবেন।

আমেরিকার ডেলাওয়ার রাজ্যে Bullis নামে এক শিক্ষাবিদ Delaware Human Relations class নামে এক ধরণের পদ্ধতি প্রচলন করেছেন, যার মাধ্যমে বিকৃত আচরণের শিশুদের ক্ষতিকর প্রক্ষোভগুলি উপশমিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে। একটি ক্লাসে শিক্ষক এমন একটি উদ্দীপক গল্প শোনাবেন যার মধ্যে বিভিন্ন প্রাক্ষোভিক (ইমোশ্যনাল) সমস্যার দৃষ্টান্ত পরিস্ফুট থাকবে। গল্প শোনানোর পর শিশুরা ঐ সকল প্রাক্ষোভিক সমস্যা সম্পর্কে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করবে এবং সেইভাবে আপন প্রাক্ষোভিক সমস্যাগুলি সম্পর্কেও যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টি লাভের সুযোগ পেয়ে স্বাভাবিক আচরণ করতে শিখবে। উৎসাহী শিক্ষকের হাতে আমাদের দেশের প্রাথমিক স্কুলগুলিতেও ডেলাওয়ার পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে শিশুর আচরণ-সমস্যায় পথনির্দ্দেশ দেওয়া সম্ভব হতে পারে।

আচরণ সমস্যায় পথনির্দ্দেশের জন্য প্রত্যেক প্রাথমিক স্কুলে শিশু মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন শিক্ষক থাকা একান্ত প্রয়োজন। তিনি বিভিন্ন মানসিক অভীক্ষা ব্যবহারের প্রক্রিয়াগুলি অবশ্যই জানবেন এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শিশুকে স্থানীয় শিশু পথনির্দ্দেশ ক্লিনিকে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। অবশ্য শহরাঞ্চলের প্রাথমিক স্কুল ব্যবস্থায় এ ধরণের আয়োজন কিছু কিছু সম্ভব হলেও গ্রামাঞ্চলের শিশুরা এ সকল সুযোগ আমাদের দেশে এখন কোনক্রমেই পেতে পারে না বলে মনে হয়।

Q. 6. Narrate the historical development of primary education in India.

Ans. ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আয়ত্তে আসে। এই কোম্পানী এদেশে বাণিজ্য বিস্তার এবং রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারেই বিশেষ উৎসাহী ছিল। দেশে শিক্ষাপ্রসারের দিকে কোম্পানীর বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না। ১৮১৩ সালের ইষ্ট ইণ্ডিয়া আইন প্রণীত হয় এবং সেই অনুসারে শিক্ষাখাতে সর্ব্বপ্রথম ব্যয়বরাদ্দ হয়। এই বরাদ্দের পরিমাণ ছিল বাৎসরিক ১ লক্ষ টাকা এবং গভর্নর জেনারেল এই মঞ্জুরীকৃত অর্থ সদ্ব্যবহারের দায়িত্ব পান। কিন্তু ঐ অর্থ উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যয় হতে থাকে। কারণ সেই সময়ে নিম্নমুখী পরিস্রুতি মতবাদ (Downward filtration theory) অনুসারে কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস ছিল যে, দেশের কতকগুলি লোককে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত

করে তুলতে পারলে তাদের মাধ্যমেই দেশের অন্য সকলের মধ্যে ধীরে ধীরে শিক্ষার প্রসার ঘটবে।

সরকার শিক্ষা প্রসারের জন্য বিশেষ কিছু না করলেও খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ এবিষয়ে বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। ১৮১৪ সালে মে সাহেব চুঁচুড়ার কাছে ১৬টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলগুলি অল্পসময়ের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিশুরা এই স্কুলগুলিতে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। সরকার থেকে ঐ স্কুলগুলিকে মাসিক ৬০০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করা হত। ক্রমে স্কুলগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬টি হয় এবং সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হয় মাসিক ১৮০০ টাকা।

১৮১৯ সালে গভর্ণর জেনারেলের উদ্যোগে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থাটি কলকাতায় কতকগুলি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩২ সালে সরকারী মহল এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যধারায় সন্তুষ্ট হয়ে মাসিক ৫০০ টাকা সাহায্য বরাদ্দ করেন। শিক্ষকদের ট্রেনিং দেওয়ার কিছু কিছু আয়োজন ও এই সংস্থাটির প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছিল।

১৮৩৫ সালে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার তথ্যসংগ্রহ ও পর্য্যালোচনার উদ্দেশ্যে এডাম (Adam) নামে এক ধর্ম্মযাজককে কমিশনার নিযুক্ত করেন। এডামের বিখ্যাত রিপোর্টে জানা যায় যে, সেই সময়ে বাংলা ও বিহারে জনসাধারণের শিক্ষার জন্য প্রায় ১,০০,০০০ শিক্ষালয় ছিল। তাঁর তিনটি রিপোর্টকে ভারতবর্ষের লিখন-পঠনক্ষম জনসংখ্যার "সর্ব্বপ্রথম সুশৃঙ্খল আদমসুমারী" বলা চলে। এতে তিনি বলেছিলেন যে, প্রতি ৪০০ জনের জন্য অথবা প্রতি ৬৩ জন স্কুল-যোগদানোপযোগী শিশুর জন্য একটি করে শিক্ষালয় ছিল। অনেকে বলেছেন, ১,০০,০০০ স্কুলের অস্তিত্বের কথাটা নিতান্তই কাল্পনিক। কিন্তু এডামের রিপোর্টে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন করা হয়নি, কারণ তিনি 'স্কুল' কথাটির দ্বারা আধুনিক ধরনের স্কুল বোঝান নি; সমষ্টিগত বা ব্যক্তিগতভাবে বাড়ীতে ও বাড়ীর বাইরে অনুষ্ঠিত সবরকম শিক্ষাচর্চ্চার দেশীয় ব্যবস্থাকেই তিনি 'স্কুল' নামে অভিহিত করেছিলেন। প্রতি গ্রামের জন্য একটি করে স্কুলের আয়োজন ছিল, একথাও উল্লেখ করেছিলেন এডাম। তাঁর মতে বাংলা দেশের উন্নত জেলাগুলিতে স্কুল গমনোপযোগী শিশুদের শতকরা ১৬ জন কোন-না-কোন রকম শিক্ষালয়ে পাঠগ্রহণ করত এবং অনুন্নত জেলাগুলিতে শতকরা ২'৫ জন শিশুর শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। সমগ্র বাংলাদেশে স্কুলে গমনোপযোগী শিশুদের শতকরা ৭ জন শিক্ষালয়ে যেত। অর্থাৎ ১৮৩৫ সালে সমগ্র বাংলাদেশে শতকরা ৯৩ জন শিশুর কোন রকম শিক্ষার আয়োজন ছিল না।

এডাম সাহেব যে সব সুপারিশ করেছিলেন, সেগুলির প্রধান কয়েকটি এইরকম :—

১। দেশীয় শিক্ষালয়গুলির উন্নতি সাধন করতে হলে শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শক নিযুক্ত করতে হবে।

২। পরিদর্শকগণ শিশুদের শিক্ষাপ্রগতির পরীক্ষা গ্রহণ করবেন এবং পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে শিক্ষকদের পারিশ্রমিক নির্দ্ধারিত হবে।

৩। শিক্ষকদের শিক্ষণদানের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক জেলায় একটি করে নর্ম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪। শিক্ষক ও ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য স্থানীয় ভাষায় প্রণীত কিছু কিছু পাঠ্যপুস্তকের প্রবর্ত্তন করতে হবে।

৫। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য প্রতি জেলায় একজন করে চীফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার নিয়োগ করতে হবে। এঁর কর্ত্তব্য হবে নিজ অঞ্চলের তথ্য সংগ্রহ করা, শিক্ষকদের সঙ্গে সংযোগসাধন করা, পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করা, পরীক্ষা পরিচালনা করা, পুরস্কার দেওয়া এবং শিক্ষা উন্নয়ন ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করা।

৬। যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের সাহায্যের জন্য প্রত্যেক স্কুলের সঙ্গে কিছু জায়গীর থাকবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, উপরোক্ত সুপারিশগুলি কার্য্যকরী করা হয়নি; বড়লাটের কার্য্যনির্ব্বাহ পরিষদের আইন সদস্য লর্ড মেকলে ইউরোপীয় শিক্ষা-সম্পদের আত্মম্ভরিতা ও ভারতীয় শিক্ষাসংস্কৃতির স্বল্পতম জ্ঞান নিয়ে এডামের পরিকল্পনাকে সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন এবং বলেছিলেন, এধরনের পরিকল্পনা সার্থকতা লাভের সময় এখনো আসেনি। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ডও এবিষয়ে উৎসাহ দেননি।

১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন গভর্নর জেনারেল হন, তখন স্থির হয় যে, বাংলার কয়েকটি জেলায় প্রাথমিক স্কুল মঞ্জুর করা হবে। ১০০টি প্রাথমিক স্কুলের ব্যয়ভার সরকার সম্পূর্ণভাবে বহন করবেন এবং এখানে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। এই স্কুলগুলিতে মাসিক এক আনা করে বেতন আদায় করা হতো; কিন্তু বেসরকারী স্কুলগুলি প্রায় অবৈতনিক ছিল বলে হার্ডিঞ্জের পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়।

১৮৫৪ সালের শিক্ষাসংক্রান্ত নির্দ্দেশনামাতে (উডের ডিসপ্যাচে) বলা হয় যে, সরকার অন্যান্য পর্য্যায়ে শিক্ষার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের দিকে লক্ষ্য রাখবেন। উডের গুরুত্বপূর্ণ এই ডিসপ্যাচে প্রথমেই স্বীকার করা হয়েছে যে, ভারতে শিক্ষাবিস্তার করা ইংলণ্ডের পবিত্রতম কর্ত্তব্য এবং তার শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হল যাতে ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমে ভারতবাসীরা কার্য্যকরী শিক্ষার অতুল পার্থিব ও নৈতিক আশীর্ব্বাদ লাভ করতে পারে। ডিসপ্যাচে

নিম্নমুখী পরিস্রুতি মতবাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে, ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে সকল স্তরের ছেলেমেয়েরা যাতে উপকৃত হয়, সেধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে মনোযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সিপাহী বিদ্রোহের পর দেশে সুশাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম সেক্রেটারী অব ষ্টেট উর্ড ষ্টানলী ১৮৫৯ সালে আর একটি শিক্ষাসংক্রান্ত ডিস্‌প্যাচ প্রণয়ন করেন। ষ্টানলীর ডিসপ্যাচে একথা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ১৮৫৪ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছুই করা হয়নি এবং শিক্ষক শিক্ষণের জন্য আরও বেশিসংখ্যক স্কুল স্থাপন করতেই হবে। এই নতুন ডিস্‌প্যাচে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষাকর ধার্য্যের সুপারিশ করা হয় এবং সরকারী প্রচেষ্টায় আরও প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেওয়া হয়।

কিন্তু বাংলা দেশে মন্বন্তর হওয়ায় Famine Commission-এর নির্দ্দেশ অনুসারে শিক্ষকের ধার্য্যের প্রস্তাব বাতিল হয়, এবং ব্যাপক শিশু ও গণশিক্ষা প্রবর্ত্তনের পরিকল্পনাও বাতিল হয়। ঐ সময়ে বাংলার কয়েকটি জেলায় সার্ক্‌ল্‌ স্কুল স্থাপনের নীতি গৃহীত হয়। ঐ নীতি অনুসারে একজন প্রবীণ গুরু নিয়োগ করা হতো এবং তিনি নিকটবর্ত্তী স্কুলগুলি পরিদর্শন করে শিক্ষকদের পরামর্শ ও উপদেশ দিতেন।

১৮৫৪ সালের নির্দ্দেশনামায় দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য (১) প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ এবং (২) সাহায্য দান প্রথা প্রবর্ত্তন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের কাজ বিশেষ অগ্রসর হয়নি।

লর্ড রিপন ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসার পর ১৮২২ সালে হাণ্টার সাহেবের নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন। ভারতের তদানীন্তন শিক্ষাব্যবস্থার পর্য্যালোচনা করে শিক্ষাপ্রসারের পন্থা নির্দ্ধারণ করাই হাণ্টার কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল। দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা সরকারেরই কর্ত্তব্য বলে এই কমিশন অভিমত প্রকাশ করেন এবং নিম্নরূপ সুপারিশ করেন:—

১। শিক্ষার্থীরা জীবনের কর্ত্তব্য-সাধন করবার জন্য যাতে উপযুক্ত হতে পারে, মাতৃভাষার মাধ্যমে সেই ধরনের শিক্ষাদান করাই প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। প্রাথমিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার নিম্নতম স্তর রূপে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত নয়।

২। উচ্চ প্রাথমিক বা নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা আবশ্যিক করার প্রয়োজন নেই।

৩। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রয়োজনমত আইন বিধিবদ্ধ করতে হবে।

৪। যদি কোনস্থানে গ্রাম্য স্কুল থাকে, তাহলে তার উন্নতি বিধানের জন্য সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করা উচিত।

৫। যে সকল বিদ্যালয় সরকারী সাহায্য গ্রহণ করবে, সেগুলিতে পরিদর্শকগণ অবশ্যই যাবেন এবং পরীক্ষা করবেন।

৬। পরীক্ষার ফলাফলের ওপর প্রাথমিক স্কুলের সাহায্যের পরিমাণ নির্ভর করবে। অনগ্রসর অঞ্চলের বিদ্যালয় সম্পর্কে বা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই নীতির ব্যতিক্রম হতে পারে।

৭। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ ও আসবাবপত্র খুবই সাধারণ হবে।

৮। প্রাথমিক পরীক্ষার মান উন্নয়ন করতে হবে এবং গণিত, হিসাব, প্রকৃতি বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় পাঠ্যব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিল্প সম্পর্কে অর্জ্জিত জ্ঞান যাতে শিশুরা কার্য্যক্ষেত্রে নিয়োগ করতে পারে, সেদিকে যত্ন নিতে হবে।

৯। শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য স্কুলে দেশীয় খেলাধুলার ও ব্যায়ামের আয়োজন করতে হবে।

১০। শিক্ষকদের শিক্ষণলাভের সুবিধার জন্য উপযুক্তভাবে নর্ম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১১। মিউনিসিপ্যাল ও লোক্যাল বোর্ড পরিচালিত প্রাথমিক স্কুলের সকল শিক্ষার্থীর বেতন রেহাই দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কতকগুলি ছাত্রের বিনাবেতনে পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

১২। কৃষিপ্রধান ও অনগ্রসর গ্রামে বিদ্যালয়ের সময়সূচীর কঠোরতা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই।

১৩। সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে সকল জাতির শিশু পাঠগ্রহণ করতে পারবে।

১৪। আঞ্চলিক সংস্থার তহবিল ও স্থানীয় সরকারের শিক্ষাতহবিলে প্রাথমিক শিক্ষার দাবী অগ্রগণ্য বিবেচিত হবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, হাণ্টার কমিশন প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও আবশ্যিক করবার সুপারিশ করেননি। লর্ড রিপনের আমলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলির উপর ন্যস্ত হলো। কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষ মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার প্রতি অধিকতর মনোযোগী থাকায় দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা আগের মতোই অবহেলিত রয়ে গেল।

১৮৮৬ সালের মধ্যে সাহায্যদান নীতি (গ্রান্ট-ইন-এড) পরিবর্তন হয়। ছাপানো পাঠ্যপুস্তক আবশ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য সমস্ত প্রাথমিক স্কুলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেক স্কুল কর্তৃপক্ষকে শিক্ষার্থীদের হাজিরা হিসাব ও পরিদর্শকের মন্তব্য সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৮৯৯ সালে লর্ড কার্জন ভারতের গভর্ণর জেনারেল হন। তাঁর সভাপতিত্বে

১৯১০ সালে সিমলাতে শিক্ষাবিভাগীয় উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের একটি সম্মেলনে শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত ১৫০টি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং পরবর্ত্তীকালে লর্ড কার্জন এই সমস্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতেই ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারে উদ্যোগী হন। তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে যে নীতি গ্রহণ করেন, তার মধ্যে যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এবিষয়ে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন (qualitative improvement) ও সংখ্যাগত সম্প্রসারণ (quantitative expansion)-উভয়দিকেই একই সঙ্গে সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করলেন। এই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য তিনি প্রচুর অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করলেন। সুতরাং প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেল এবং অল্পসময়ের মধ্যে এক লক্ষেরও বেশি প্রাথমিক স্কুল দেশের শিশুদের শিক্ষায় রত হল। এছাড়া লর্ড কার্জনের উদ্যোগে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার ব্যাপক প্রবর্ত্তন সম্ভব হলো এবং পরীক্ষার ফলের উপর সাহায্যদানের নীতি (payment-by-results) বাতিল করে দিলেন। কারণ ঐ নীতির দ্বারা শিক্ষক সমাজে দুর্নীতির প্রসার ঘটছিল।

কার্জন নীতির ফলে প্রাথমিক শিক্ষার যথেষ্ট প্রগতি সম্ভব হয়েছিল, একথা সত্য কিন্তু তাকে আশানুরূপ বলা চলে না। ইতিমধ্যে বরোদা রাজ্যে ১৯০৭ সালে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হলো। সেই সঙ্গে সমগ্র দেশে এক নতুন রাজনৈতিক চেতনা দেখা দিল এবং শিক্ষাপ্রসারের প্রতি সরকারী অবহেলার বিরুদ্ধে ভারতীয় নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলের নেতৃত্বে তীব্র আন্দোলন সুরু হয়। সর্ব্বজনীন আবশ্যিক অবৈতনিক গণশিক্ষা প্রবর্ত্তনের দাবী নিয়ে গোখলে ১৯১০ সালে আইন সভায় এক প্রস্তাব দাখিল করেন। সেই প্রস্তাবটিকে বিলের আকারে ১৯১১ সালে তিনি আবার উত্থাপন করেন এবং বলেন, দেড়শত বৎসরে বৃটিশ শাসনের পরেও ভারতে শিক্ষিত জনসংখ্যার হার মাত্র শতকরা ছয়জন। সরকারের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, উপযুক্ত সময়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করার বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা করা হবে কারণ গণশিক্ষা প্রবর্ত্তনের উপযুক্ত সময় এখনো আসেনি। এই কারণে বিলটি প্রত্যাখ্যাত হয়।

যদিও বিলটি প্রত্যাখ্যাত হয়, তবুও গোখলের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়নি এবং কার্য্যতঃ প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের দিকে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বের চেয়ে অধিক মনোযোগী হতে বাধ্য হলেন। ১৯১২ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারত পরিদর্শনে এসে ভারতের নরনারীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন এবং তাঁর অভিষেকের সময় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দ হলো।

১৯১১ সালে বিঠলভাই প্যাটেল গোখলের অসম্পূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করেন

এবং তাঁর উদ্যোগে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ করতে বাধ্য হন। ১৯১৭ সালে বৃটিশ পার্লামেণ্ট ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত শাসনের কিছুটা সুযোগ দেন। প্রত্যেক প্রদেশে তখন থেকে শিক্ষা বিস্তারের দিকে আগ্রহ দেখা দেয়। ১৯১৯ সালে বাংলা দেশে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হলো, এর প্রধান ধারাগুলি এইরকম :—

১। সকল মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে প্রথমতঃ এই আইন প্রযোজ্য হবে। তারপর বাংলা সরকার ক্রমশঃ ইউনিয়ন বোর্ড অঞ্চলে এই আইন প্রয়োগ করতে পারেন।

২। এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার এক বছরের মধ্যে প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটি নিজ নিজ এলাকায় শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ করে শিক্ষার্থী সংখ্যা, শিক্ষকের প্রয়োজন, ব্যয়ের পরিমাণ, সম্ভাব্য শিক্ষাকরের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে বিবরণী দাখিল করবেন।

১৯১৯ সালের বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইনে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়নি। তবে প্রয়োজনমত দুঃস্থ পরিবারের শিশুকে বিনাবেতনে শিক্ষাদানের নির্দ্দেশ ছিল। এই আইনে বলা হয় যে, আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য যদি মিউনিসিপ্যালিটির অর্থ সঙ্কুলান না হয়, তবে সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে মিউনিসিপ্যালিটি শিক্ষাকর ধার্য্য করতে পারে।

১৯১৯ সালে ভারত সরকার আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা অনুসারে শিক্ষাবিষয়ক দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর ন্যস্ত হয় এবং এর ফলে প্রাদেশিক শিক্ষা আইনগুলি বিধিবদ্ধ হওয়ার সুবিধা হয়।

সমগ্র দেশে এক অভূতপূর্ব্ব রাজনৈতিক ও সামাজিক গণজাগরণের ফলস্বরূপ ভারতবর্ষে ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক অথচ বিক্ষিপ্ত বিস্তার দ্রুততা লাভ করে। এই সময়ে এদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ১.৫ লক্ষ থেকে ১.৮ লক্ষ হয়। কিন্তু ১৯২৭ সালের পর থেকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার দরুণ এই অগ্রগতি মন্থর হয়ে আসে। ১৯২৯ সালে হার্টগ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে বলেন, দারিদ্র্য, কুসংস্কার, অভিভাবকদের নিরক্ষরতা জাতিভেদপ্রথা, ভাষা ও ধর্ম্মের বৈষম্য প্রভৃতি কারণে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি ব্যহত হচ্ছে। সুতরাং প্রাথমিক অগ্রগতির দিকে যত্নবান না হয়ে এবং আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনে ব্যস্ত না হয়ে আপাততঃ এর গুণগত মানোন্নয়নের দিকে সকল কর্ম্মশক্তি নিয়োজিত করার সুপারিশ করেন এই কমিটি। কমিটির পরামর্শ মত ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত কাজ চলে এবং এই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার সংখ্যাগত সম্প্রসারণ আর বিশেষ হয়নি।

১৯৩৫ সালে যে নতুন ভারত সরকার আইন প্রবর্ত্তিত হয়, তার ফলে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা

১৯৩৭ সাল থেকে এদেশে বলবৎ হয়। এই সময়ে জাতীয় নেতারা হার্টগ কমিটির শিক্ষা সম্প্রসারণ বিরোধী নীতি বর্জ্জন করে। কংগ্রেসী সরকারের মাধ্যমে নানাবিধ শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার প্রয়াসী হলেন। পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল 'বিদ্যামন্দির' পরিকল্পনা করলেন; বোম্বাইতে 'ভলান্টারী স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হল এবং গান্ধিজী অভিনব 'বুনিয়াদী' শিক্ষা পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন। কংগ্রেস সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করলেন। যে সব গ্রামে স্কুল ছিল না, সেখানে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলো। অনেক বালিকা-স্কুল স্থাপিত হলো এবং স্কুলগুলিতে শিক্ষকসংখ্যা বৃদ্ধি করা হলো। কিন্তু অবৈতনিক আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের কাজ খুবই মন্থরগতিতে চলতে থাকে। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হওয়ায় সেই ধীর অগ্রগতিও বন্ধ হয়ে গেল।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর প্রাথমিক শিক্ষা পর্য্যায়ে নীতিগতভাবে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং বিভিন্ন রাজ্যে এই শিক্ষাব্যবস্থা প্রাথমিক স্কুলগুলিতে প্রবর্ত্তনের ব্যাপক প্রচেষ্টা সুরু হয়। উদ্বাস্তু সমস্যার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাসমস্যা এক নতুন জটিলতার সম্মুখীন হলো। এ সত্ত্বেও প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ১৯৫৩ সালে ৩৭০০০ প্রাথমিক স্কুল ও ৪৬ লক্ষ প্রাথমিক শিক্ষার্থী বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৪৮ সালে ভারতের ২২৪টি শহর এবং ১০ ১০টি গ্রামে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হতে পেরেছিল এবং ১৯৫৩ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর দেখা যায়, ৫৯৮টি শহরে এবং ২১,২৬০টি গ্রামে এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হতে পেরেছে। ১৯৪১ সালে এদেশে লিখনপঠনক্ষম জনসংখ্যার হার ছিল ১৪·৬% মাত্র; ১৯৫১ সালে সেটি হয় ১৮·৩% এবং ১৯৫৩ সালে প্রায় ২০% দাঁড়ায়। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর আসাম (১৯৪৭), বোম্বাই (১৯৪৭), মধ্যভারত (১৯৪৯), বিন্ধ্যপ্রদেশ (১৯৫২) প্রভৃতি রাজ্য নবোদ্যমে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ করে। কারণ ১৯৫০ সালে গৃহীত ভারতীয় সংবিধানের ৪৫ ধারায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, ১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত ভারতের সকল ছেলেমেয়ের অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থা রাষ্ট্রের উদ্যোগেই প্রবর্ত্তন করতে হবে।

Q. 7. Describe the present position and future plans of primary education in India.

Ans. [এই গ্রন্থের পৃঃ ১৪—২২ দ্রষ্টব্য]

Q. 8. Compare the development of primary education in India with other countries of the world.

Ans: [ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার বিবর্তন ও প্রগতি সম্পর্কে এই অধ্যায়ের Q. 6-এর উত্তর দ্রষ্টব্য]

পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিতে, বিশেষতঃ ইউরোপীয় দেশগুলিতে, উনবিংশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লব যে নবজাগরণের সূচনা করে, তার ফলে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীর প্রয়োজন ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্মীদের এবং তাদের সন্তানদের ন্যূনতম শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার দাবীতে যে শিক্ষাব্যবস্থা সে সময়ে সুরু হয়, তারই ক্রমবিবর্তনের ফলে সর্ব্বজনীন আবশ্যিক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা জন্ম নেয়। ১৯১৪ সালের মধ্যে বেলজিয়ামে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সকল বালকবালিকাকে স্কুলে শিক্ষাগ্রহণে নিযুক্ত করা হয়। ১৯১৮ সালে ইংলণ্ডে, ১৯৩৬ সালে ফ্রান্সেও এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়ে যায়। ইতালীতে এ পর্য্যন্ত ১১ বছর বয়স অবধি সকল শিশুর আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা সম্ভব হয়েছে। সমগ্র জগতে আমেরিকাই এখন আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে অগ্রণী হয়ে আছে এবং শীঘ্রই সেদেশে ১৮ বছর বয়স পর্য্যন্ত সকল বালক-বালিকার আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা চলছে।

বর্ত্তমানে **আমেরিকার** শিশুসংখ্যার প্রায় ৯০% প্রাথমিক স্কুলগুলিতে অধ্যয়ন করছে। সাধারণতঃ ঐদেশে ৬ বছর বয়সে শিশুকে স্কুলে যেতে হয়, তবে প্রাথমিক শিক্ষার কাল কোন রাজ্যে আট বৎসর, কোন রাজ্যে ছ বৎসর। আমেরিকার প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিশুকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, সদভ্যাস, চিন্তাক্ষমতা প্রভৃতি অর্জ্জনে সহায়তা করা হয় এবং এক্ষেত্রে জন ডিউইর শিক্ষা-নীতি বিশেষভাবে কার্য্যকরী করার চেষ্টা করা হয়েছে। ঐদেশে প্রয়োগবাদের ভিত্তিতে শিক্ষাকে সকল পর্য্যায়ে পরীক্ষানিরীক্ষার সাপেক্ষ করা হয়েছে বলে অবশ্য অনেকে সমালোচনা করেন যে, মানবজাতির সনাতন ঐতিহ্যগুলি আমেরিকার প্রাথমিক শিক্ষায় অবহেলিত হচ্ছে। তবে ডিউই নীতি শিশুর শিক্ষাকে অনাবশ্যক কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতার হাত থেকে মুক্ত করে ব্যষ্টিকেন্দ্রিক (Community-centred) করার চেষ্টা করেছে। শিশু যাতে সামাজিক পরিবেশকে উপলব্ধি করতে পারে, সামাজিক ও নাগরিক দায়িত্বজ্ঞান অর্জ্জন করতে পারে, সে বিষয়ে যত্নশীল হওয়াই বর্ত্তমানে আমেরিকার প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য।

আমেরিকার রাষ্ট্র পরিচালিত প্রাথমিক স্কুলগুলিতে কোন ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়ার বিধি নেই। তবে নীতিগত জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলার মাধ্যমে সুরুচি জাগ্রত করার প্রচেষ্টা হয়। সাহিত্যের মধ্যে উপকথা, বাইবেলের গল্প প্রভৃতি পড়তে দেওয়া হয় এবং কিভাবে জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে হয় তা শেখানো হয়। ইতিহাস পাঠের মধ্যে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্রকথা ও মূল্যবান কাহিনীগুলি পড়ানো হয়। স্বাস্থ্যকর অবসর যাপনের জন্য সঙ্গীত ও শিল্পকলার শিক্ষা ওদেশে একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। দৈহিক স্বাস্থ্য অটুট রাখার জন্য নানাবিধ খেলাধুলার আয়োজন আমেরিকার প্রাথমিক শিক্ষায় অপরিহার্য্য।

আমেরিকার প্রাথমিক শিক্ষায় পরীক্ষাব্যবস্থারও আমূল সংস্কার করা হয়েছে। বর্ত্তমানে অর্জিত বিদ্যার অভীক্ষা (achievement test) প্রচলন হওয়ার ফলে অতি অল্পসময়ে শিশুর অর্জিত বিদ্যার পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয়েছে। তবে শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থাকে এইভাবে সহজ করার বিরুদ্ধে অনেকে সমালোচনা করে বলেন যে, শিশুর মধ্যে কঠিনতর কাজ করার প্রেরণা এতে হ্রাস পাচ্ছে। অবশ্য একথা সত্য যে, প্রাথমিক শিক্ষাস্তর থেকে উচ্চতর স্তরে সহজ পরীক্ষা মাধ্যমে উন্নীত হওয়ার ব্যবস্থা থাকায় শিশু ও অভিভাবকগণ অনেক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়েছেন।

নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন প্রভৃতি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতেও শিশুসংখ্যার ৯০%-এর বেশি স্কুলে পড়ে, তবে প্রাথমিক স্কুলে শিশু কয় বৎসর অধ্যয়ন করবে, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। **নরওয়ের** গণবিদ্যালয় (people's school)-গুলি ৭ থেকে ১৪ বছর বয়সের শিশুদের আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের দায়িত্ব নিয়ে থাকে। উল্লেখযোগ্য এই যে, নরওয়েতে নার্শারী স্কুল ও কিণ্ডারগার্টেনের ব্যাপক প্রচলন সম্ভব হয়নি, যেমন হয়েছে আমেরিকায়। রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক পরিচালিত হয় নরওয়ের গণবিদ্যাগুলি। শিশুদের এই বিদ্যালয়ে না পাঠালে অভিভাবককে শাস্তি পেতে হয়। বেসরকারী স্কুল খুব অল্প, এবং লোকে সেগুলিকে ঘৃণার চোখে দেখে। কারণ জনসাধারণ চায় এমন স্কুল যেখানে সমাজের সকল পর্য্যায়ের শিশু সমান সুযোগ ও মর্য্যাদা পাবে। গণবিদ্যালয়গুলি অবৈতনিক, এমনকি পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাসরঞ্জামগুলিও বিনামূল্যে রাষ্ট্র থেকে দেওয়া হয়। অধিকাংশ স্কুলেই বিনামূল্যে শিশুদের প্রাতরাশ দেওয়া হয়। পাঠ্যপুস্তকগুলি শিক্ষামন্ত্রী দপ্তরের অনুমোদিত হতে হয়।

নরওয়ের প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্যবিষয়ের তালিকা দেখলে মনে হবে অত্যধিক গুরুভার। কিন্তু ঐদেশের শিক্ষাবিদ্‌গণ মনে করেন, ১৪ বছর পর্য্যন্ত আবশ্যিক শিক্ষা গ্রহণের পর যাদের আর কোন শিক্ষাগ্রহণ সম্ভব হবে না, তারা যেন জীবনসংগ্রামে ব্যর্থ না হয়—এমন শিক্ষাব্যবস্থাই প্রয়োজন। পাঠ্যবিষয়সূচীর মধ্যে আছে ভাস্কর্য্য, নরওয়ের ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, প্রাকৃতিক ইতিহাস, শারীরশিক্ষা, চিত্রাঙ্কণ, সঙ্গীত, শিল্পকাজ (বালকদের), সূচীশিল্প (বালিকাদের)। শহরের স্কুলগুলিতে বালকদের জন্য বাগান করা এবং বালিকাদের জন্য গৃহবিজ্ঞান শিক্ষা সাধারণতঃ আবশ্যিক। সম্প্রতি কয়েক বছর যাবৎ সপ্তাহে পাঁচ পিরিয়ড ইংরেজীভাষাও বাধ্যতামূলকভাবে শেখানো হচ্ছে গণবিদ্যালয়গুলিতে। কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতিই নরওয়ের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যপকভাবে প্রচলিত।

ডেনমার্কে গৃহশিক্ষার ঐতিহ্য এত সুগভীর যে, অভিভাবকগণ শিশুকে

স্কুলে পাঠানোর কোন প্রয়োজনই বোধ করেন না। অবশ্য ডেনমার্কের ষষ্ঠ ফ্রেডেরিক ১৮১৪ সালে ৭ থেকে ১৪ বছর বয়সের সকল বালকবালিকাকে সপ্তাহে তিন দিন আবশ্যিকভাবে স্কুলে যোগদানের নির্দেশ জারী করেন এবং প্রত্যেক শহরে অন্তত একটি করে প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠার আদেশ দেন। ১৮৪৯ সালে বাধ্যতামূলক স্কুল-অধ্যয়ন ব্যবস্থায় সপ্তাহে ছয় দিনই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ডেনমার্কে আবশ্যিক শিক্ষা এখনো ৭ থেকে ১৪ বছর বয়সের বালকবালিকাদের দেওয়া হয়। ৭ বছরের নিম্নবয়স্ক শিশুদের জন্য বেসরকারী নার্সারী স্কুল আছে, সেগুলি অবৈতনিক নয়। রাষ্ট্র পরিচালিত অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলে শিশুরা ৬ বছর বয়সে ভর্তি হতে পারে, তবে ভর্তির সময় কোনক্রমেই ৮ বছরের বেশি হবে না। এই প্রাথমিক শিক্ষা ১১ বছর বয়সে সমাপ্ত হয়। নরওয়ের মতই ডেনমার্কের পাঠক্রম, তবে ইংরেজী এই পর্যায়ে শেখানো হয় না। সহযোগিতা, দায়িত্বজ্ঞান, চিন্তাক্ষমতা প্রভৃতির অনুশীলনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সুইডেনে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই এবং এখন ৭ থেকে ১৪ বছর বয়সের সকল বালকবালিকার জন্য এই সুযোগ দানের প্রস্তাব বিবেচনা করা হচ্ছে। ১৯২১ সালে এদেশে কমপ্রিহেন্‌সিভ (Comprehensive) স্কুল ব্যবস্থা প্রচলনের প্রস্তাব হয়, এবং ১৯৪০ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে আলোচনার পর একটি স্কুল আইনও বিধিবদ্ধ হয়। ঐ আইনের বলে ইউনিটারী (unitary) স্কুল নামে আর এক ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গঠনের চেষ্টা হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, ৭ বছর বয়সে শিশু ইউনিটারী স্কুলে প্রবেশ করবে এবং প্রথম তিন বছর সুশিক্ষণপ্রাপ্ত কোনও মহিলা শিক্ষক শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। পরবর্তী তিন বছর প্রকৃত প্রাথমিক (elementary) শিক্ষা চলবে এবং এই পর্যায়ে কোনও মহিলা বা পুরুষ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিশুর শিক্ষা চলবে। এই ছ'বছরে শিশুর যাবতীয় পাঠ্যবিষয় একজন শিক্ষকই শিক্ষা দেবেন। ৭ম ও ৮ম বছরে কতকগুলি মূল পাঠ্যবিষয় (core subjects) সকল শিশুকে শিখতে হবে, তবে যাদের সামর্থ্য আছে, তারা, ইংরেজী বা জার্মান ভাষা এই দুবছরে শিখতে পারে। অন্য শিশুরা সুইডিশ ভাষা শিখতে পারে, অনেকে বৃত্তিমূলক শিক্ষাগ্রহণেও রত হতে পারে। ৯ম বছরে শিশুর শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রবাহনীতি (streaming) প্রবর্তন করা হবে। চার বছরের অধ্যয়নমূলক জিমন্যাসিয়াম কোর্স, এক বছরের আধুনিক বিদ্যা কোর্স, অথবা বৃত্তিমূলক কোর্স—প্রধানতঃ এই কয়টি প্রবাহে শিশুরা শিক্ষাগ্রহণ সুরু করতে পারবে। এই ব্যবস্থায় শিশুকে ৯ বছর যাবৎ একাদিক্রমে স্কুল শিক্ষা গ্রহণ করে ১৬ বছর বয়সে শিক্ষা সমাপ্ত করতে হবে।

সুইডেনের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতি অনেকাংশে নরওয়ে এবং ডেনমার্কের মত। তবে আমেরিকার গণতান্ত্রিক সাধারণ স্কুলের সহজ শিক্ষার সঙ্গে এই দেশগুলির শিক্ষাব্যবস্থার মূল পার্থক্য এই যে, এখানে শিশুকে প্রাথমিক স্তরেই যত বেশি সম্ভব অধ্যয়নমূলক শিক্ষাগ্রহণে নিযুক্ত করা হয়। আমেরিকার মত এ দেশগুলিতেও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি আছে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়নে শিশুকে অব্যাহতি দেওয়ার কোন ইচ্ছা এদেশের শিক্ষাবিদ্‌দের নেই।

রাশিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ইউনিটারী স্কুল ব্যবস্থা বিশেষ সামাজিক মর্য্যাদা লাভ করেছে। সকল শিশুকে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সাত বছর যাবৎ প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। ক্রুশ্চভের স্কুলসংস্কার নীতি অনুসারে আবশ্যিক শিক্ষাগ্রহণের কাল দশ বছর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করার চেষ্টা চলেছে। এখন আবশ্যিক শিক্ষা ৭ বছর বয়সে সুরু হয় এবং ১৪ অথবা ১৭ বছর বয়স পর্য্যন্ত চলে। অবশ্য রাশিয়ায় শিশুর প্রাক্-স্কুল শিক্ষা ও পরিচর্য্যার প্রতি অন্যান্য দেশের চেয়ে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এক বছর বয়স থেকেই শিশুকে রাষ্ট্র পরিচালিত শিশু-ক্রীস (creche) বা পালনাগারে রাখা চলে। এরপর তিন থেকে সাত বছর অবধি কিণ্ডারগার্টেনে শিশুর স্বাস্থ্যকর প্রতিপালনের আয়োজন রয়েছে। ক্রীস্‌গুলি রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তর তত্ত্বাবধান করেন এবং কিণ্ডারগার্টেনগুলি রাষ্ট্রীয় শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়। বছরের সর্ব্বসময় এই ক্রীস ও কিণ্ডারগার্টেনগুলি খোলা থাকে এবং শিশুরা প্রতিদিন ৯ ঘণ্টা থেকে ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সেখানে থাকতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে সকল মহিলা কর্ম্মীরা থাকেন তাঁদের অন্ততঃ দশ বছরের স্কুল শিক্ষা গ্রহণের পর আরও চার বছর ব্যাপক ট্রেনিং গ্রহণ করতে হয়। এই সকল প্রাক্-স্কুল প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক ক্ষেত্রেই অভিভাবকের সামর্থ্য অনুসারে কিছু কিছু মূল্য আদায় করে এবং এ ধরণের কতকগুলি প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় সংস্থা বা কল কারখানার কর্ত্তৃপক্ষদের দ্বারাও পরিচালিত হয়ে থাকে তাদের কর্ম্মীদের জন্য।

রাশিয়ার অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর স্কুলশিক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা এবং শিক্ষার প্রতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টির জন্য শিক্ষককে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। সকল শিশুর প্রতি শিক্ষাদানের যত্ন নেওয়া হয় এবং অনগ্রসর হীনবুদ্ধি শিশুদের জন্য পৃথক স্কুলও আছে। চার বছর স্কুলশিক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে কোনও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা নেই। পাঠক্রমে আছে রুশভাষা, ভূগোল, রুশ ইতিহাস, গণিত, প্রকৃতি বিজ্ঞান, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কণ ও শারীরশিক্ষা। শিক্ষার ৫ম বৎসরে প্রবেশের পূর্ব্বে শিশুকে অবশ্যই লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং স্থানীয় ভাষা ও গণিতে কিছু পারদর্শিতা

অর্জন করতে হবে। সাত বছরের কোর্সের শেষ তিন বছরে শিশুকে উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাচীন ইতিহাস এবং একটি বিদেশী ভাষাও শিখতে হয় অন্যান্য পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে (৫ম শ্রেণীতে); তারপর ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীতে বীজগণিত, জ্যামিতি, প্রাণিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, এবং রুশ রাষ্ট্র সংবিধান অধ্যয়ন করতে হয়।

সপ্তাহে ছয়দিন কেবলমাত্র সকালে স্কুল বসে এবং বিকালে শিক্ষার্থীরা পায়োনীয়ার ভবন, ক্লাব বা সমিতিতে সুপরিকল্পিত ও সুনিয়মী ব্যবস্থায় অবসর যাপন করে। অবসর সময়ের এই গুরুত্বের উদ্দেশ্য, শিশুকে দেহ ও মনে রাষ্ট্রের উপযোগী করে গড়ে তোলা।

জার্মান ফেডেরাল রিপাবলিকে সাধারণ প্রাথমিক স্কুলকে Grundschule বলে এবং প্রত্যেকটি স্থানীয় অঞ্চল (Land) প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজন ও পরিচালনার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী থাকে। রাষ্ট্র পরিচালিত প্রত্যেক স্কুলের পাঠক্রমে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তবে অভিভাবকরা ইচ্ছা করলে সন্তানদের সেই ধর্ম্মশিক্ষা না গ্রহণের নির্দ্দেশ দিতে পারেন। বেসরকারী স্কুলগুলিকে রাষ্ট্র থেকে লাইসেন্স নিতে হলে রাষ্ট্রের নির্দ্ধারিত পাঠক্রম অনুসরণ করতে হয়, রাষ্ট্র নির্দ্ধারিত যোগ্যতা অনুসারে শিক্ষক নিয়োগ করতে হয় এবং অভিভাবকের আর্থিক মর্য্যাদার ভিত্তিতে শিশুকে স্কুলে গ্রহণ করা হয় না, এমন প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। ৬ থেকে ১৮ বছরের সকল বালকবালিকার আবশ্যিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পরিকল্পনার সহায়করূপে এই লাইসেন্স প্রথার প্রচলন করা হয়েছে। জার্মানীতে Grundschule স্কুল ব্যবস্থার ধারণা সূচিত হয় ১৯০২ সালে এবং Einheitsschule বা কমপ্রিহেনসিভ স্কুলের প্রাথমিক পর্য্যায়ে চার বছরের প্রাথমিক সাধারণ শিক্ষার আয়োজন রাখার নীতি উত্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল মাধ্যমিক শিক্ষা পর্য্যায়ে উপনীত হওয়ার পূর্ব্বে শিশুকে উচ্চতর শিক্ষার বনিয়াদ গঠনে সহায়তা করা। বর্ত্তমানে ঐ দেশে অনেকে মনে করেন, চার বছরের প্রাথমিক শিক্ষা নিতান্তই অল্প, ছয় বছরের হওয়া উচিত। অপরপক্ষ বলেন, ছয় বছরের প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হলে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার হ্রাস করতে হয়, এবং সেটি হবে বিপজ্জনক।

মূলতঃ জার্মানীর Grundschule-তে শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে তার প্রকৃতিদত্ত বৈশিষ্ট্যগুলি সৎপথে বিকশিত করার চেষ্টা করা হয় এবং উপযুক্ত সাধারণ শিক্ষাদানের প্রাথমিক ভিত্তিস্থাপনের প্রয়াস থাকে। মাতৃভাষাকে লিখিত ও মৌখিকভাবে স্বচ্ছন্দে ব্যবহারের দক্ষতা অর্জ্জন, সংখ্যা-গণিত বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন, প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়া, কাব্য ও শিল্পকলা উপলব্ধি, সুষ্ঠু ধর্ম্মবোধ সৃষ্টি এবং গণতান্ত্রিক সমাজের কার্য্য

পদ্ধতি উপলব্ধির উদ্দেশ্যে ইতিহাস অধ্যয়ন প্রভৃতি বিষয়ে Grundschule-তে বিশেষ আয়োজন থাকে।

সুইজারল্যাণ্ডেও মাধ্যমিক শিক্ষার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে Grundschule বলা হয় এবং শিক্ষার বনিয়াদ গঠনে এই প্রাথমিক শিক্ষা পর্য্যায়ের যথেষ্ট গুরুত্ব স্বীকৃত হয়ে থাকে। তবে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষাকাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। কোন অঞ্চলে ছয় বছরের Grundschule ব্যবস্থা প্রচলিত, আবার কোথাও ৪ বা ৫ বছরের প্রাথমিক শিক্ষাকেই যথেষ্ট বলে মনে করা হয়। সর্ব্বত্রই স্কুলে অবৈতনিক শিক্ষা দান করা হয় এবং বেসরকারী স্কুলের অস্তিত্ব প্রায় বিরল। আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থা ৬ বা ৭ বছরে সুরু হয় এবং ৮ বা ৯ বছর যাবৎ চলে। এ ছাড়া কিণ্ডারগার্টেন আছে, সেখানে ২ বছর বয়সের শিশুকেও ভর্ত্তি করা হয়। অবশ্য কিণ্ডারগার্টেনে যোগদান আবশ্যিক নয় এবং শিল্পাঞ্চলের কর্ম্মীদের সন্তানরা প্রায়ই বিনামূল্যে এই ধরণের স্কুলে যোগদানের সুযোগ পেয়ে থাকে। সুইজারল্যাণ্ডের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে যে ধরণের পাঠক্রম অনুসরণ করা হয়, তা অনেকাংশে জর্মানী বা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলির মত এবং অত্যাবশ্যকীয় পাঠ্যবিষয়গুলি অধ্যয়নের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়।

ফ্রান্সে আবশ্যিক শিক্ষা সুরু হয় ৬ বছর বয়সে এবং ১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত চলে। শিক্ষাশেষে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষা সমাপনের সার্টিফিকেট লাভের জন্য একটি পরীক্ষা দিতে হয়। ঐদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বলতে নার্সারী ও শিশুদের বিশেষ স্কুলগুলিও অন্তর্ভুক্ত হয়। বেসরকারী স্কুল কিছু কিছু আছে, তবে সেগুলিকে রাষ্ট্র নির্দ্ধারিত উৎকর্ষমান অনুসরণ করে চলতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালিত স্কুলগুলিতে কোন ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয় না। প্রতি বৃহস্পতিবার স্কুল বন্ধ থাকে, যাতে অভিভাবকগণ নিজ সন্তানদের অভিরুচিমত ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে পারেন। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রভাব দেশের সর্ব্বত্র—যেখানেই জনসংখ্যা ৫০০ জনের বেশি, সেখানে ৬ বছর বয়স থেকেই বালক ও বালিকাকে পৃথকভাবে শিক্ষা দিতে হয়। সহশিক্ষা পদ্ধতিতে কোনও প্রাথমিক স্কুল চালাতে গেলেই শিক্ষা দপ্তরের অনুমতি প্রয়োজন হয়।

২ থেকে ৬ বছরের শিশুর নার্সারী স্কুল (e'coles maternelles) ফ্রান্সের এক ঐতিহ্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা। ১৮৩৭ সালে এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় কর্ম্মরত পিতামাতার সহায়তার জন্য এবং বর্ত্তমানে এটি এক বিপুল সামাজিক শক্তি অর্জ্জন করেছে। রাষ্ট্র থেকে এই নার্সারী স্কুলগুলিকে বিশেষ যত্ন করা হয় এবং এর জন্য পৃথক পরিদর্শক দপ্তর আছে। সমগ্র ফ্রান্সে শিক্ষাবিষয়ে যত পরীক্ষানিরীক্ষা ও গবেষণার সুযোগ দেওয়া হয়, তার অধিকাংশই নার্সারী শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়ে থাকে। ডেক্রলী (Decroly), পিয়াজে

(Piaget), ক্লাপারিদ (Clapare'de) এবং ফেরিইর (Ferriere) প্রমুখ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌দের নীতিগুলি অবলম্বনে ফ্রান্সে অবিরত শিশু শিক্ষা সম্পর্কে গবেষণা চলেছে। লিখন, পঠন ও গণিত শিক্ষার জন্য ফ্রান্সের নার্সারী স্কুলগুলি সকালে তিন ঘণ্টা ও বিকালে তিন ঘণ্টা খোলা থাকে। কোন কোন নার্সারীতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত শিশুদের রাখার ব্যবস্থা ক্রমশই প্রবর্ত্তিত হচ্ছে, যে সব মায়েরা কাজে যান, তাঁদের সুবিধার জন্য। ফ্রান্সের প্রায় ৬০% শিশু এখন ২ থেকে ৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নার্সারীতে প্রতিপালিত হচ্ছে এবং শিক্ষা দপ্তর থেকে নার্সারী স্কুলের উন্নতির জন্য আরও ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা করছেন।

নার্সারী শিক্ষার পর প্রাথমিক শিক্ষার পর্য্যায়টিকে পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে : ৬-৭ বছর বয়সে preparatory section ; ৭-৯ বছর বয়সে elementary section ; ৯-১১ বছর বয়সে middle section ; ১১-১২ বছর বয়সে upper section ; এবং ১২-১৪ বছর বয়সে final section। বৃহস্পতিবার ও রবিবার ছুটির দিন বাদে শিক্ষার্থীদের সপ্তাহে পাঁচদিন দৈনিক ৬ ঘণ্টা স্কুলে থাকতে হয়। তবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুলের সময়ের পরেও বিশেষ অধ্যাপনার ব্যবস্থা আছে। পাঠক্রমে আছে লিখন, পঠন, গণিত, ফ্রান্সের ইতিহাস ও ভূগোল, নীতি ও নাগরিক জ্ঞান, বিজ্ঞানের মূল তথ্য, চিত্রাঙ্কণ, সঙ্গীত, হস্তশিল্প, দৈহিক শ্রম, শারীর শিক্ষা, পরিকল্পিত কর্ম্মসূচী এবং অবসরযাপন।

১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী সময়ে ফ্রান্সের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমকে অনাবশ্যক পুঁথিকেন্দ্রিক, অবাস্তব এবং অতিরিক্ত অধ্যয়নমূলক বলে সমালোচনা করা হয়েছিল। এইজন্য ১৯৪৫ সালে সরকারী নির্দ্দেশ জারী হয় স্কুলগুলিকে বাস্তবমুখী ("bath of realism") করাতে হবে। নার্সারী স্কুল থেকেই এই সংস্কার সুরু হয় এবং Decroly-র global method নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষানিরীক্ষা সুরু হয়। তবে শিক্ষার যে অংশে গুরুত্বপূর্ণ কর্ম্ম-প্রচেষ্টা প্রয়োজন, সেখানে শিশুকে খেলার আনন্দদান ও অধ্যয়ন সহজ করার উৎসাহ দেওয়া হয়নি। যে সব শিশু ১১ বছর বয়সে মাধ্যমিক শিক্ষা আরম্ভ করতে চায়, তাদের একটি পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। যারা মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ১১-১২ বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করতে চায় না, তারা ১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের সার্টিফিকেটের জন্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারে। পরীক্ষার দুটি ভাগ আছে : প্রথমে, কয়েকটি প্রশ্ন সমেত একটি শ্রুতিলিখন দেওয়া হয়, এবং পরীক্ষা করা হয় শিশুর ফরাসী ভাষা ও গণিতের জ্ঞান ; এর পর, মৌখিক পরীক্ষায় উচ্চৈস্বরে পাঠ, আবৃত্তি, ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞানের প্রশ্নোত্তর

এবং সম্ভব হলে গান ও চিত্রাঙ্কণের পরীক্ষাও হয়। কেবলমাত্র উপযুক্ত শিক্ষার্থীদেরই পরীক্ষাগ্রহণের অনুমিত দেওয়া হয়, এবং প্রায় ৮০% সফল হয়।

বেলজিয়ামের শিক্ষাব্যবস্থায় অস্পষ্ট আদর্শবাদের কোন স্থান নেই। নানা সামাজিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এই ক্ষুদ্র দেশটি বাস্তবসম্মত গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে ১৮৩০ সাল থেকে। ১৮৩০ সালে বেলজিয়ামের স্বাধীনতা সনদে শিক্ষাকে অবৈতনিক ঘোষণা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, নিজ সন্তানকে নিজ অভিরুচিমত শিক্ষাদানের কোন বাধা অভিভাবককে দেওয়া হবে না। এইজন্য অধুনা বেলজিয়ামের স্কুলশিক্ষা ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য, সংহতি ও সরলতা অক্ষুণ্ণ রাখার আন্তরিক প্রচেষ্টা চলছে। এক ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সহজে অন্য ব্যবস্থায় শিশুর সামর্থ্য অনুসারে পরিবর্ত্তন করার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে, শিশুর আচরণ ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মসংস্থান সম্পর্কে পথনির্দ্দেশের ব্যবস্থা হচ্ছে, সাংস্কৃতিক প্রগতি অক্ষুণ্ণ রেখে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে ব্যাপক করা হচ্ছে।

১৯৩৬ সালে শিক্ষামন্ত্রী বোভিসি (Bovesse) শিক্ষার আমূল সংস্কারের এক পরিকল্পনা প্রণয়ণ করেন। তবে ঘটনাচক্রে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা স্থগিত ছিল। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য এইরকম: শিশুর মনকে সমাজ জীবনযাপনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা; সকল শিশুকে জীবনধারণের মূল কৌশল ও তথ্যগুলি আহরণে সহায়তা করা; এবং শিশুর সামর্থ্য, আগ্রহ ও মূল্যবোধ অনুসারে চরিত্রগঠনে সহায়তা করা। এই ধরণের শিক্ষার জন্য শিশুদের স্কুলজীবন সুরু হয় ৩ বছর বয়সে এবং ৬ বছর বয়স পর্য্যন্ত চলে। এই বয়সে স্কুলে যোগদান অবশ্য বাধ্যতামূলক নয়। কোন অঞ্চলে ৩০ জনের কম শিশু থাকলে স্কুল খোলা হয় না। বেলজিয়ামের শিশুদের এই স্কুলগুলিতে ফ্রয়েবেল ও ডেক্রলির শিক্ষানীতি অনুসৃত হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ শিশুদের স্কুলগুলিই রাষ্ট্রপরিচালিত এবং অবৈতনিক। পরবর্ত্তী পর্য্যায়ের প্রাথমিক স্কুলগুলি কম্যুন (commune), প্রদেশ (province), রাষ্ট্র, বেসরকারী ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় পরিচালিত হয়। এই ধরণের স্কুলগুলি রাষ্ট্র অনুমোদিত ও অর্থসাহায্য পুষ্ট। কোন অঞ্চলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষও স্কুলগুলি তত্ত্বাবধান করেন। প্রাথমিক স্কুলগুলিও অবৈতনিক।

৬ থেকে ১২ বছর বয়সের শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা এদেশে আবশ্যিক। এর পর অন্ততঃ ২ বছর (১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত) প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কোন ধরণের মাধ্যমিক বা কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করতেই হয়। গ্রামাঞ্চলে সহশিক্ষা

প্রচলিত ; শহরাঞ্চলে নয়। প্রাথমিক শিক্ষাকালকে দু'বছর করে চারটি চক্রে (cycle) বিভক্ত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যয়ন চক্রটির পরে শিক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষা সাধারণতঃ সমাপ্ত হয়। ১৯১৪ সালে স্কুল পরিত্যাগের বয়স নির্দ্ধারিত হয় ১৪ বছর এবং সেজন্য চতুর্থ অধ্যয়ন চক্রটিও সংযোজিত হয়। বর্ত্তমানে মাধ্যমিক ও কারিগরী শিক্ষার ব্যাপক সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই চতুর্থ চক্রটির প্রয়োজন হ্রাস পেয়েছে এবং এটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

বেলজিয়ামের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমে আছে ধর্ম্ম বা নীতিশিক্ষা, মাতৃভাষা, সাধারণ গণিত, ডাচ বা ফরাসী. ভাষায় সাধারণ জ্ঞান, ভূগোল, প্রাকৃতিক ইতিহাস, চিত্রাঙ্কণ, স্বাস্থ্য, সঙ্গীত, শারীরশিক্ষা, প্রকৃতি বিজ্ঞানের সরল জ্ঞান। বালিকাদের জন্য সূচীশিল্প ও গ্রামাঞ্চলের বালকদের জন্য বাগান পরিচর্য্যা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

হল্যাণ্ডের স্কুলগুলি প্রকৃতই জনগণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৯৪৬ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হল্যাণ্ডের শিক্ষামন্ত্রী এক আবেদনে বলেন, জাতিগঠনের পরিকল্পনা জনগণের নতুন চিন্তাধারা থেকেই সৃষ্টি হতে হবে। একশত বছরেরও কম সময়ে এই দেশের জনসংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ; এই দেশকে অবিলম্বে ব্যাপকভাবে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করার প্রয়োজন হয়েছে ; এবং সুদক্ষ কর্ম্মী সৃষ্টির জন্য, হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির রক্ষার জন্য স্কুলগুলিতে বিশেষ ধরণের শিক্ষাদানের আরও আয়োজন করতে হবে।

হল্যাণ্ডে আবশ্যিক শিক্ষা সুরু হয় শিশুর ৬-৭ বছর বয়সে এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনশীলতার জন্য এই আবশ্যিক শিক্ষা পূর্ণ ৮ বছর যাবৎ চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সালে একটি আইনও প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ছাড়া শিশুর ৩-৬ বছরের বয়সে শিক্ষার জন্য যে সকল নার্সারী ও শিশু-স্কুল আছে, সেগুলিতে যোগদান আবশ্যিক না হলেও সেগুলির সদ্ব্যবহার করার জন্য অভিভাবকদের উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। ঐ বয়সের শিশুসংখ্যার প্রায় ⅔ এখন ঐ সকল স্কুলে অধ্যয়ন করছে। শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কেবলমাত্র পরিদর্শনের মাধ্যমেই হয় এবং বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রাথমিক স্কুলগুলি পরিচালিত হয় বলে উৎকর্ষমান বিভিন্ন। তবে পৃথিবীর অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাব এদেশের স্কুলগুলিতে সুস্পষ্ট। এদেশেও ডেক্রলি ও মন্তেসরী শিক্ষাপদ্ধতি অনুসৃত হয়।

প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষাকাল ৬ বছর ; কখনও ৭ বছর। রোম্যান ক্যাথলিক স্কুলগুলি ছাড়া আর সবই সহশিক্ষা ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়। শিক্ষার্থীদের লিখন, পঠন ও গণিত শেখানো হয় ; ডাচ ভাষা, ডাচ ইতিহাস, ভূগোল, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ইতিবৃত্ত, প্রাকৃতিক ইতিহাস ও স্বাস্থ্য,

সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কণ, সন্তরণ ও জিমন্যাষ্টিক এবং বালিকাদের সূচীশিল্প শেখানো হয়। ধর্ম্মশিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয়। প্রায় ৭% প্রাথমিক শিক্ষার্থী পরবর্ত্তী স্তরে মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণ করতে চায়; তাদের জন্য স্কুলের সময়ের পরে সাধারণতঃ ফরাসী ভাষা শেখানো হয়।

১৯৩০ সালে হল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষ, ১৯৫৪ সালে ১ কোটি ২½ লক্ষ। ফলে, ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার অনুপাতে কর্ম্মসংস্থান করা হয়নি। সুতরাং, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকে যথাসম্ভব ব্যাপক ও পরিপূর্ণ করার চেষ্টা চলেছে। যেসব শিশু আর্থিক কারণে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্য্যায়ে প্রবেশ করতে পারছে না, বিশেষ করে তাদের জন্যই প্রাথমিক শিক্ষাকে পরিপূর্ণ করার প্রয়োজন। এইজন্যই প্রাথমিক স্কুলের পরে দু বছরের continued elementary স্কুল কোর্স প্রচলিত হচ্ছে, যেখানে বাস্তবসম্মত সহজ সামাজিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এখানে কারিগরী শিক্ষাদানের কোন চেষ্টা করা হয় না, এটি উল্লেখযোগ্য। শিশু যাতে বয়স্ক জীবনে উপনীত হওয়ার পূর্ব্বেই আপনার কর্ম্মসংস্থান সম্পর্কে আপন সামর্থ্য উপলব্ধি করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই এই দুবছর তাকে সমাজ ও ব্যক্তিত্ব পরিচিতিতে সহায়তা করা হয়। এই ধরণের continued elementary স্কুলে বালকদের জন্য কাঠের কাজ, বালিকাদের জন্য গৃহবিজ্ঞান, কিছু ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাথমিক শ্রেণীগুলির পাঠ্যবিষয়গুলির পরবর্ত্তী পাঠগুলিও শেখানো হয়। আশা করা হয় যে, শিশুরা এই ধরণের শিক্ষা পেলে অন্তত সপ্তাহে ৮ ঘণ্টা অধ্যয়ন করে ১৮ বছর বয়স পর্য্যন্ত তাদের অভিরুচিমত অতিরিক্ত অর্থকরী শিক্ষাগ্রহণের প্রেরণা পাবে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিক্ষার্থীরা এইভাবেই উচ্চতর কারিগরী শিক্ষাগ্রহণও করতে পারবে।

প্রাথমিক স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ শেষ করে শিশুরা advanced elementary স্কুলে চার বছরের জন্য অধ্যয়নরত হতে পারে। প্রাথমিক স্কুলের প্রায় ⅙ অংশ শিক্ষার্থী এই advanced স্কুলে যোগ দেয়। এই স্কুলের পাঠক্রমে প্রাথমিক স্কুলের বিষয়গুলি ছাড়াও থাকে: ফরাসী, ইংরেজী ও জার্মান ভাষা, অঙ্ক, ব্যবসায়িক শিক্ষা। এই স্কুলের শেষ বর্ষে অঙ্ক ও পদার্থ-বিজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জনের সুযোগ দেওয়া হয়, যাতে শিক্ষার্থী কোনও মাধ্যমিক কারিগরী স্কুলে শিক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত হতে পারে। অবশ্য অধিকাংশ শিক্ষার্থী এডভান্স স্কুল অধ্যয়ন শেষ করে কোন কাজকর্ম্মে নিযুক্ত হয়ে পড়ে। কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী শিক্ষক শিক্ষণ কলেজে যোগ দেয়।

ইটালী দেশের দারিদ্র্যের জন্যই ১৮৫৯ সালের কাসাটি (Casati) আইন বা ১৮৭৭ সালের কোপ্পিনো (Coppino) আইনের পর থেকে গত প্রায় এক শতাব্দী যাবৎ শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন ঘটেনি। এখনো

বিশেষ করে দক্ষিণ ইটালীতে ব্যাপক নিরক্ষরতা বিদ্যমান এবং এই শতাব্দীর সুরু থেকে রাষ্ট্র চেষ্টা করছে অন্ততঃ পাঁচ বছরের অবৈতনিক স্কুল ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করতে—কিন্তু আজও ঐ দেশের সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলিতেও তিন বছরের বেশি অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হয়নি। ধর্ম্ম (চার্চ) এবং রাষ্ট্রের মধ্যে শিক্ষানিয়ন্ত্রণের দাবী নিয়ে প্রতিযোগিতা চলার ফলেও শিক্ষা প্রগতি ব্যাহত হয়েছে। মুসোলিনীর আমলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরোধিতা ব্যাপক হওয়ার দরুণ শিক্ষা প্রগতি মোটেই সম্ভব হয়নি। ১৯৩৯ সালে পুনরায় জাতীয় সংস্কারের নামে ফ্যাসিষ্ট নীতি ব্যাপকতা লাভ করায় জনগণের কল্যাণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রসার অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এইজন্য যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের প্রথম কর্ত্তব্য হল ইটালীর জনগণকে জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করা; এবং দ্বিতীয় কর্ত্তব্য, যেটি গুরুত্বপূর্ণ, ইটালীর অধিবাসীকেই ইটালীর স্কুলগুলি পরিচালনার ভার নিতে উদ্বুদ্ধ করা। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালে শিক্ষামন্ত্রী এক পরিকল্পনা রচনা করে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিমত আহ্বান করেন। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল নিরক্ষরতা দূর করা, স্কুলভবন ও শিক্ষা সরঞ্জামের অভাব দূর করা, শিক্ষাগ্রহণের সমান সুযোগ দান করা, সকল স্তরে কারিগরী শিক্ষার দাবী পূরণ করা এবং শিক্ষক ও জনগণকে উপযুক্তভাবে শিক্ষার নীতিগুলি সম্পর্কে ট্রেনিং দেওয়া।

নীতিগতভাবে বর্ত্তমানে ইটালীতে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের বালক-বালিকার শিক্ষাগ্রহণ আবশ্যিক। তবে বাস্তবক্ষেত্রে, বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে, প্রায়ই শিশুরা ১১ বছর বয়সেই পড়াশুনা বন্ধ করে। ৩-৬ বছরের শিশুদের জন্য সমৃদ্ধ শহর ও কম্যুনে যথেষ্ট সংখ্যক নার্সারী আছে। এইসব স্কুলের শিক্ষাপদ্ধতি ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের মতই উন্নত ধরণের এবং প্রায় ১০ লক্ষ শিশু এসব স্কুলে অধ্যয়নরত। শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গে এ ধরণের যে অল্প কয়েকটি নার্সারী স্কুল সংযুক্ত আছে, সেগুলি রাষ্ট্র পরিচালিত। অন্যগুলি বেসরকারী পরিচালনায় চলে। নার্সারীতে বিনামূল্যে মধ্যাহ্নভোজন ও চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং এই ব্যবস্থা রাষ্ট্রের উদ্যোগে দরিদ্র অঞ্চলগুলিতেও প্রসারিত করার চেষ্টা চলেছে। প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রীয় অর্থসাহায্যও দেওয়া হচ্ছে।

স্বাভাবিক কারণেই বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি সকলেরই যত্ন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা সাধারণতঃ ১১ বছর পর্য্যন্ত চলে এবং ধর্ম্ম, সমাজ ও নীতি শিক্ষার সঙ্গে কয়েকটি প্রয়োজনীয় পাঠ্য বিষয় শেখানো হয়। গ্রামাঞ্চলের অবহেলিত শিশুদের জন্য আরও বিশেষভাবে চিন্তা করা হচ্ছে। পরীক্ষামূলকভাবে ফ্লোরেন্সে পেস্তালোৎসী সিটি স্কুল স্থাপিত হয়েছে।

উপসংহারে উল্লেখযোগ্য এই যে, বর্ত্তমানে প্রায় সব দেশেই প্রাক্-স্কুল

শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। আমেরিকায় অবশ্য বেশি নার্সারী স্কুল নেই। তবে যেখানে আছে সেখানে কর্ম্মরত জননীদের সহায়তার জন্যই প্রবর্ত্তিত হয়েছে। অথবা গৃহপরিবেশ অনুকূল না হলে শিশুকে নার্সারীতে রাখা হয়। অবশ্য, ইদানীং উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে, শিশুর শারীরিক, সামাজিক ও শিক্ষা বিকাশের ক্ষেত্রে নার্সারী স্কুলের অবদান অল্প নয়। বর্ত্তমানে আমেরিকার নার্সারী স্কুলগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা কেন্দ্ররূপে পরিচালিত হয়ে থাকে। রাশিয়ায় নার্সারী স্কুলের মাধ্যমেই শৈশব থেকেই শিশুর মন ও দেহ রাশিয়ার বিশেষ ধরণের রাষ্ট্রজীবনের উপযোগী করে নেওয়ার চেষ্টা হয় এবং জননীদের নির্দ্দেশ দেওয়া হয় শিশুপালন সম্পর্কে। ফ্রান্সে নার্সারী স্কুলের উদ্দেশ্য কর্ম্মজীবী সম্প্রদায়ের সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমকে শিশুর কাছে সহজবোধগম্য করে তোলা। বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডে নার্সারী স্কুলে শিশুদের ব্যক্তিতা ও ব্যক্তিগত সামর্থ্য অনুশীলনের প্রেরণা দেওয়া হয়। ইটালীতে নার্সারী স্কুলগুলি শিক্ষা পুনর্গঠনের এক অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কেবলমাত্র স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে নার্সারী স্কুলের প্রয়োজনবোধ খুব অল্প।

প্রাথমিক স্কুলের গুরুত্বও অধুনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে তবে এইসব স্তরে শিশু শিক্ষার্থীকে কতখানি স্বাধীনতা দেওয়া উচিত, সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। অনেকে মনে করেন, অতিরিক্ত স্বাধীনতা শিশুকে অনিয়মী করে তুলতে পারে। এ ছাড়া, শিশুর কোন্ বয়সে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করা উচিত, সে বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। অধিকাংশ দেশেই ১২ বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হয়, যদিও ১৫ বছর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করার চেষ্টা হচ্ছে।

X

Problems Relating to Secondary Education

[Aims of Secondary Education—its nature, methods—contents—Needs of the adolescent—individual differences—requirements of the country—employment opportunities—Guidance in the secondary school—Plan of secondary education. Secondary and Primary education—secondary and vocational education—secondary and higher education—upgrading and diversification of higher secondary education—history—background needs—comparison with other countries—Present-day position—special difficulties and problems— Five-year plans, future plan.]

Q. 1. What are the aims of Secondary Education ?

Ans. শিক্ষার উদ্দেশ্য দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল—সমাজের প্রয়োজন ও ব্যষ্টির প্রয়োজন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটে শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণে। এইজন্যই শিক্ষার উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তনশীল—যদিও সেই পরিবর্ত্তন মূল নীতিগুলিকে অব্যাহত রাখে। তবে শিক্ষার বিভিন্ন দিক জীবনধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যরক্ষার জন্য অধিকতর গুরুত্ব ও ভিন্ন তাৎপর্য্য লাভ করে থাকে।

শিক্ষাতত্ত্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নানাবিধ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। কোন কোন শিক্ষাবিদ মাধ্যমিক শিক্ষাকে সাধারণভাবে জীবন গঠনের গুরুত্ব দান করেছেন, কোন কোন গ্রন্থে গভীর পুঁথিগত জ্ঞানার্জ্জনের পক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষাকালকে অপরিহার্য্য গণ্য করা হয়েছে। কেহ মনে করেন, মাধ্যমিক শিক্ষা তরুণ শিক্ষার্থীর সকল প্রকার চাহিদার সুষ্ঠুরূপ দিতে চেষ্টা করবে; আবার কোন কোন শিক্ষাবিদের মতে তরুণদের সমাজায়িত করে তুলে সমাজের প্রয়োজনে নিযুক্ত করাই মাধ্যমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। তরুণ মনের বিকাশ মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য একথা যেমন বলা হয়, তেমনি কেহ কেহ বলেন, জাতীয় ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করাই মাধ্যমিক পর্য্যায়ের তরুণ শিক্ষার্থীদের কর্ত্তব্য হওয়া উচিত।

ইউরোপের লাটিন গ্রামার স্কুলে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীকে কলেজে শিক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। সে সময়ে শিক্ষার্থীর মানসিক নিয়মানুবর্ত্তিতা ও নীতিজ্ঞান শিক্ষার প্রতিই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হতো। কিন্তু বহু শিক্ষার্থী গ্রামার স্কুলে অধ্যয়নের পর কলেজে যোগ দিত না। এই কারণে গ্রামার স্কুলের গুরুভার অধ্যয়ন মোটেই জনপ্রিয় হয়নি। 'একাডেমী' শিক্ষা আন্দোলনে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য কিছুটা উদার রূপ ধারণ করে। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের মতে উৎকৃষ্ট মাধ্যমিক শিক্ষা তরুণ সম্প্রদায়কে সুখী জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে।

ফ্রান্সে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সংস্কৃতির প্রসার ও সংরক্ষণ। তরুণ সম্প্রদায়ের চিন্তাক্ষমতা ও যুক্তিবোধ জাগ্রত করে জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবান করে তোলাই ফরাসী মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষার সংখ্যাগত সম্প্রসারণের চেয়ে গুণগত উৎকর্ষই ঐ দেশের লক্ষ্য। কোনও একটি বিশেষ বৃত্তি সম্পর্কে তরুণদের সুশিক্ষিত না করে যে কোনও পরিবেশের সম্মুখীন হওয়ার শিক্ষা দেওয়াই ফ্রান্সের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার মূলনীতি।

জার্মানীতে মাধ্যমিক শিক্ষার স্কুলগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত এবং রাষ্ট্রপিতাদের বিশ্বাস রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয় জীবনকে সুসংগঠিত করার জন্য তরুণ সম্প্রদায়েকে দেহে ও মনে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলাই মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। যুদ্ধের সময়ে জার্মানীর মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে তরুণদের জাতীয় শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে নাৎসী নীতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হতো। শহরের প্রত্যেকটি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের এক বছর কৃষিক্ষেত্রে শ্রমদান করতে হতো। রাষ্ট্রের নেতা সৃষ্টির জন্য প্রচার প্রতিষ্ঠানরূপে মাধ্যমিক স্কুলগুলিকে ব্যবহার করা হতো। এই ধরণের জার্মান মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার মূলনীতি ছিল এই যে, নাগরিকের বহু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে কিন্তু কোন অধিকার নেই। জার্মান মাধ্যমিক স্কুলে জ্ঞানসম্পদ আহরণের চেয়ে কাজ ও চরিত্রগঠনের প্রতিই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীর মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও গণতান্ত্রিক করার চেষ্টা চলছে।

ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হলো চরিত্রগঠন। আচার আচরণ ও নীতিবোধ সম্পর্কে বিশেষভাবে শিক্ষাদান করা এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিতা বিকাশের প্রয়াস বৃটিশ মাধ্যমিক শিক্ষার মূলনীতি। খেলাধূলা, পড়াশুনা, সামাজিক কাজকর্ম্মে সর্ব্বত্র যথাসম্ভব যথার্থ আচরণ করতে শেখানোই মাধ্যমিক স্কুলগুলির কাজ বলে মনে করা হয়। শিক্ষার্থীকে অতিরিক্ত স্বাধীনতা দেওয়া বা অতিরিক্ত শাসন করা—কোনটাই ইংলণ্ডের মাধ্যমিক স্কুলে চলে না। উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে আদর্শ নাগরিকরূপে চরিত্রগঠন করাই মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য।

রাশিয়ার মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় জার আমলে যে স্বেচ্ছাচারিতা, নিরক্ষরতা ও রক্ষণশীলতা ছিল, গণতান্ত্রিক রাশিয়ায় তার উচ্ছেদ করে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের নতুন উন্নততর সমাজ ব্যবস্থার উপযোগী কর্ম্মঠ ও দায়িত্বশীল নাগরিকরূপে গড়ে তোলার কাজ চলেছে। সামর্থ্য এবং পরিবেশের প্রয়োজনমত প্রতিটি তরুণ যাতে উপযুক্তভাবে সঙ্ঘবদ্ধ উপায়ে সংগঠনী কাজের মাধ্যমে নতুন জগত গড়ে তুলবার প্রেরণা পায়, মাধ্যমিক স্কুলের সেইরূপ লক্ষ্য নির্দ্ধারিত হয়েছে। বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিদের যথাশীঘ্র সম্ভব সাক্ষর ও

বুদ্ধিমান নাগরিক শ্রেণীভুক্ত করাও রাশিয়ার মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। আর একটি উদ্দেশ্য, জাতীয় সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখার শিক্ষালাভ করা।

ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের পর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে পুনর্গঠিত হচ্ছে এবং সেই উদ্দেশ্যে ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ত্তমানে এই যে প্রতিটি তরুণকে সৎ আচরণ, স্বভাব ও চরিত্র গঠনে সহায়তা করা। গণতান্ত্রিক দেশের প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব অনেক, সেই অনুযায়ী দায়িত্বসম্পন্ন নাগরিক গঠন করাও ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য। ভারতের মত দরিদ্র দেশে তরুণ সম্প্রদায় যাতে উৎপাদনমূলক শিল্পক্ষেত্রে দক্ষত: অর্জ্জন করে দেশের বিভিন্ন অভাব দূরীকরণে আত্মনিয়োগ করতে পারে, সে বিষয়েও মাধ্যমিক স্কুলগুলি তরুণ শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে চায়। দারিদ্র্যের মধ্যেও যাতে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে দেশের ও জাতির ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখার প্রেরণা লাভ করে শিক্ষার্থীরা, মাধ্যমিক শিক্ষার সেটিও একটি উদ্দেশ্য।

মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায়, তরুণমনের বিকাশের দিকে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করলে অবাস্তব চিন্তামূলক শিক্ষাগ্রহণে বহু সময় ও উদ্যোগ অপচয় হয়; আবার তরুণ সম্প্রদায়ের শরীর গঠনকে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্য্যায়ের লক্ষ্য বলে স্বীকার করলে অনাবশ্যক শারীরচর্চ্চায় তরুণ জীবনের ব্যক্তিত্ব বিকাশ ব্যাহত হয়। গ্রীক শিক্ষাবিদ সক্রেটিসের মতে নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করাই তরুণ শিক্ষার্থীর কর্ত্তব্য। প্লেটো বলেন, ব্যায়ামের দ্বারা জ্ঞান ও নীতিবোধ জাগে না, তিনি অঙ্ক, সঙ্গীত, তর্কবিদ্যা প্রভৃতি তরুণ জীবনের শিক্ষার উপাদান বলে মনে করতেন। এরিষ্টটলের কাছে তরুণদের শিক্ষার উদ্দেশ্য সর্ব্বাঙ্গীণ জীবন যাপনের শিক্ষা গ্রহণ করা। সুরুচি, আত্মসংযম, বিনয়, সহযোগিতা এবং সদ্‌বিষয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি করাই তরুণদের শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। কাণ্ডেলের মতে, এরিষ্টটলের এই নীতিই আজ দু হাজার বছর পরেও আধুনিক মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে পুনঃপ্রবর্তিত হতে চলেছে।

রোম্যানরা গ্রীকদের চেয়ে আরও বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন. এই রোম্যান আমলে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য অনেক বাস্তবসম্মত হয়েছিল এবং সুস্পষ্টভাবে নির্দ্ধারিত হয়েছিল। এই সময়ে শারীর শিক্ষা দেওয়া হত কেবল শরীর গঠনের জন্যই নয়—সামরিক জাতিগঠনের উদ্দেশ্যে। সুকুমার শিল্প অবহেলিত হতো। Cicero বলেছিলেন, বাগ্মিতার দ্বারাই মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পারে এবং সেজন্য উদারভাবে সকল শাস্ত্র যথাসম্ভব অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।

মধ্যযুগে ইউরোপের স্কুলগুলিতে রোম্যান ও গ্রীক প্রভাব যেমন ছিল তেমনি খৃষ্টান প্রভাবও বৃদ্ধি পেতে থাকে। খৃষ্টান শিক্ষানীতি অনুসারে

মাধ্যমিক স্কুলগুলির উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত হয় এই যে, নীতিজ্ঞান, ধর্ম্মজ্ঞান, পবিত্র গ্রন্থাদির জ্ঞান এবং ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিশেষ তথ্যাদি সম্পর্কে তরুণ সম্প্রদায়কে আলোকপ্রাপ্ত করতে হবে। ধর্ম্মযাজকের বৃত্তিই ছিল সমাজের সবচেয়ে মর্য্যাদাসম্পন্ন বৃত্তি এবং ধর্মপ্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক পরিচালিত মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে ধর্ম্মযাজকের আদর্শকেই একমাত্র শিক্ষনীয় বিষয় বলে বিশ্বাস করা হতো। পাঠক্রমের মধ্যে কোনও প্রবণতা ছিল না, জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলির সম্মুখীন হওয়ার শিক্ষা লাভের উপায় ছিল না।

নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের যুগে পুঁথিগত শিক্ষার প্রসারলাভ ঘটে এবং মাধ্যমিক স্কুলগুলির লক্ষ্য হয় কিভাবে তরুণ শিক্ষার্থীদের মূল্যবান পুঁথির জ্ঞান আহরণে সহায়তা করা যায়। এজন্য ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে—গ্রীক ভাষা শিক্ষারও প্রসার ঘটে। প্রাচীন গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করাই মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়ে পড়ে।

কমেনিয়াসের মতে বিজ্ঞান, নীতিজ্ঞান, দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি শিক্ষার মাধ্যমে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতিলাভ করাই তরুণ সম্প্রদায়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য। ফ্রান্সিস বেকনের মতে জীবন ধারণের উৎকর্ষবৃদ্ধিই তরুণদের শিক্ষা-গ্রহণের উদ্দেশ্য। জন লক্ বিশ্বাস করতেন, নীতিশিক্ষা, কঠোর পরিশ্রম প্রভৃতির মাধ্যমে তরুণ দেহ ও মনকে সুগঠিত করতে হবে। রুশো তাঁর শিক্ষাদর্শনে বলেছেন, তরুণ শিক্ষার্থীকে প্রকৃতির দিকে আকৃষ্ট করে স্বাধীনভাবে ব্যক্তিতা বিকাশে উদ্বুদ্ধ করা উচিত এবং কোনও বিশেষ বৃত্তির জন্য তরুণদের শিক্ষিত করে তোলার বিরোধিতা করেছেন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ইংরেজী ভাষা শিক্ষা, বৃত্তিশিক্ষা ও স্বাস্থ্যচর্চ্চাকে তরুণ বয়সের শিক্ষার লক্ষ্য বলে গণ্য করতেন। হার্বার্ট বলেন, নীতিশিক্ষা, চরিত্রগঠন ও সামাজিক সামঞ্জস্য বিধান শিক্ষাই তরুণদের শিক্ষাগ্রহণের লক্ষ্য হওয়া উচিত। স্পেন্সারের মতে আত্ম-সংরক্ষণ, বৃত্তিশিক্ষা, সন্তানপালন, সামাজিক সম্পর্করক্ষা, ও অবসর যাপনের শিক্ষাই তরুণদের শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া দরকার। ইংলিশ (Inglis) মাধ্যমিক শিক্ষার তিনটি লক্ষ্য নির্দ্ধারণ করেন—(১) প্রত্যেককে সম্ভাবনাময় নাগরিক ও সমাজের সহযোগী সদস্যরূপে গড়ে তোলা ; (২) সম্ভাবনাময় কর্ম্মী ও উৎপাদনক্ষম ব্যক্তিরূপে প্রত্যেককে গড়ে তোলা ; এবং (৩) প্রত্যেকের অবসর যাপন ও ব্যক্তিত্বগঠনের মাধ্যমে সমাজের প্রয়োজন সিদ্ধিকার্য্যে শিক্ষিত করা। এই লক্ষ্য মূলতঃ সমাজতান্ত্রিক। ফ্রাঙ্কলিন ববিট (Bobbitt) মনে করতেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য বয়স্কজীবন যাপনের উপযোগী করে তোলা এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল প্রকার কর্ম্মের মধ্য দিয়ে মানবজীবনের সামগ্রিক সার্থকতা আনয়ন করা। কুস (Koos) মাধ্যমিক শিক্ষার চারটি উদ্দেশ্য তালিকাবদ্ধ করেছেন : (১) নাগরিক-সামাজিক-নৈতিক দায়িত্ব শিক্ষা, (২) শারীরিক দক্ষতা অর্জন,

(৩) অবসর যাপন, সুকুমার শিল্প চর্চ্চা ও উপলব্ধি, এবং (৪) বৃত্তিমূলক দক্ষতা অর্জ্জন। টৌটন (Touton) মাধ্যমিক শিক্ষার ৮টি উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ করেছেন: (১) শারীরিক কুশলতা বৃদ্ধি, (২) বিজ্ঞান ও সমাজ জীবনের মূল নীতিগুলি প্রয়োগ শিক্ষা, (৩) আগ্রহ ও অনুরাগের আবিষ্কার; (৪) নিহিত সামর্থ্যের সর্ব্বপ্রকার সদ্ব্যবহার; (৫) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও শিক্ষালাভ; (৬) অবসর যাপন ও সুকুমার শিল্পচর্চ্চায় অংশগ্রহণ; (৭) ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে উচ্চতম মানের আচরণ এবং (৮) সুষ্ঠু গার্হস্থ্য জীবন যাপন।

এই সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্দ্ধারণের মধ্যে অনেকাংশেই সাদৃশ্য আছে। তবে কোনটিই সর্ব্বাঙ্গীণ নয়। এজন্য ১৯১৮ সালে আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য যে বিশেষ কমিশন নিয়োজিত হয়, সেই কমিশন যে উদ্দেশ্যতালিকা প্রণয়ন করেন, তা আজ সারা জগতে মর্য্যাদা লাভ করেছে। এই কমিশন স্পেন্সার, ববিট ও ইংলিশের পদ্ধতি অনুসারে মানুষের বিভিন্ন কার্য্যবিধির বিশ্লেষণ করে মাধ্যমিক শিক্ষার যে সাতটি মূলনীতি (Cardinal principles) নির্দ্ধারণ করেছেন, সেগুলি :—

(১) স্বাস্থ্য : সামাজিক বা ব্যক্তিগত দক্ষতা নির্ভর করে স্বাস্থ্যের অক্ষুণ্ণতার উপর। এজন্য মাধ্যমিক স্কুলে স্বাস্থ্য চর্চ্চায় প্রতি বিন্দুমাত্র অবহেলা করা উচিত হবে না। সমগ্র মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে স্বাস্থ্যচর্চ্চার নীতিগুলি ব্যাপকভাবে সন্নিবিষ্ট থাকবে এবং একটি পৃথক বিচ্ছিন্ন পাঠ্যবিষয়রূপে স্বাস্থ্য শিক্ষা দেওয়া সঙ্গত হবে না।

(২) শিক্ষার মূল প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান : শিক্ষার মূল প্রক্রিয়া বলতে লিখন, পঠন ও গণিত শিক্ষাই বোঝায়। এই বিষয়গুলি যদিও প্রাথমিক স্তরে শিক্ষালাভ হয়েছে, তবুও মাধ্যমিক স্তরে এইগুলির যথাযথ অনুশীলন ও জ্ঞান বৃদ্ধি না হলে উচ্চতর ও জটিলতর জ্ঞানানুশীলনে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

(৩) গৃহজীবনে সার্থক অংশগ্রহণ : সামাজিক সংস্থারূপে গৃহের মর্য্যাদা উপলব্ধি, গৃহের কর্ত্তব্য পালন প্রভৃতির মাধ্যমে তরুণ শিক্ষার্থীকে গৃহজীবনেও সার্থকভাবে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই শিক্ষা ঘটনাক্রমে সুযোগমত দিতে হবে, তবে এর উপকারিতা সুদূরপ্রসারী।

(৪) বৃত্তিমূলক দক্ষতা : জীবনের এক সময় সকলকেই নিজের এবং অপরের কল্যাণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। এজন্য প্রত্যেককেই সমাজে বাস করবার উদ্দেশ্যে কিছু বৃত্তিমূলক দক্ষতা অর্জ্জন করতে হয়। অসংখ্য বৃত্তি, বৃত্তিশিক্ষার সময় এবং পরিবর্ত্তনশীল সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বৃত্তিসমূহের উপযোগিতা—এ সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীকে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরেই যথাযথ পথনির্দ্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

(৫) নাগরিকতা : আপন পল্লী, শহর, রাষ্ট্র ও জাতির অন্যান্য অধিবাসীর

সঙ্গে পারস্পরিক চিন্তা বিনিময়ের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের শিক্ষা দেওয়াও স্কুলের মাধ্যমিক উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এইভাবে তরুণ শিক্ষার্থীর মনে আন্তর্জ্জাতিক সমস্যাগুলি সম্পর্কেও চেতনা জাগ্রত করা যাবে।

(৬) সার্থক অবসর যাপন: যন্ত্রযুগের কল্যাণে মানুষ বর্ত্তমানে অনেক অবসর পাচ্ছে, কিন্তু সেই অবসর স্বাস্থ্যকর কার্য্যে ব্যয়িত না হলে দেহ ও মনের জড়ত্ব আসতে পারে। এই কারণে তরুণ শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের অবসর সময়গুলি সংগঠন ও বিনোদনমূলক সার্থক কাজে লাগাতে পারে সেবিষয়ে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরেই তাদের পথনির্দ্দেশ দেওয়া প্রয়োজন।

(৭) নৈতিক চরিত্র: অবসর সময় বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যই পূর্ব্বের চেয়ে নৈতিক চরিত্র গঠনের দিকে অধিকতর মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। সমাজে তরুণ সম্প্রদায়ের অপরাধ প্রবণতা পর্য্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, তারা অবসর সৎকার্য্যে ব্যয় করার কৌশল আয়ত্ত করতে পারে না। ফলে অনেক সময় অসৎ পথে ভ্রমবশতঃ অবসর যাপন করে সমাজের সর্ব্বনাশ করে।

এই সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পর্য্যালোচনার পর মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত নীতিগুলি লিপিবদ্ধ করা যায়:—

(১) মাধ্যমিক শিক্ষার সকল উদ্দেশ্য প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্ত্তী স্তরের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করার অনুকূল হওয়া দরকার। প্রাথমিক স্কুলের সকল পাঠ্যবিষয়ই অধীত হবে, তবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীর বয়স ও আগ্রহ অনুসারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে এবং পাঠ্যবিষয় আয়ত্ত করার উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে।

(২) মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পরিবর্তনের যথেষ্ট স্বাধীনতা রাখতে হবে, যাতে স্থানীয় স্কুলের প্রয়োজনমত পাঠ্যবিষয়গুলি শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করা যায়।

(৩) মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য সমাজগঠনেরই লক্ষ্য, অতএব সেই লক্ষ্য স্কুলের অনুমোদিত হওয়া দরকার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্য্যসূচীর অনুকূল হওয়া উচিত।

(৪) মাধ্যমিক শিক্ষার প্রাচীন ভ্রান্ত লক্ষ্যগুলিকে আধুনিক সর্ব্বজন স্বীকৃত লক্ষ্য থেকে পৃথক করতে হবে।

(৫) মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশিত হওয়া দরকার, অস্পষ্ট দার্শনিক নীতি ব্যাখ্যা দ্বারা মাধ্যমিক স্কুলের কাজ জটিল করা চলবে না।

(৬) সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও পরিবর্ত্তন করতে হবে।

(৭) মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য *নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে শিক্ষাদর্শন* সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিরুচি নির্দ্ধারণ করতে হবে।

(৮) সমাজ ও ব্যক্তি উভয়ের কল্যাণার্থেই মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্দ্ধারিত হবে।

(৯) মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এমনভাবে ঘোষিত হবে, যা সাধারণ লোকেও হৃদয়ঙ্গম করে তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে।

Q. 2. Describe fully the nature and methods of secondary school and the services performed by it.

Ans. প্রতিটি স্কুলের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভের প্রয়োজন মিটানো এবং সমাজের কল্যাণে প্রতিটি নাগরিকের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশে সহায়তা করা। মাধ্যমিক স্কুলের কর্ম্মপ্রকৃতি সম্পর্কে ইংলিশ (Inglis) যে তালিকা রচনা করেছেন, তা এইরকম :

সমন্বয়ন (Adjustive or adaptive): মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষার্থীকে বৃহত্তর পরিবেশের সঙ্গে দ্রুত ও সার্থক সমন্বয়ন ও সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করে।

সংহতি (Integrating): মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষার্থীদের মধ্যে একাত্মতা, চিন্তার ঐক্য, গণতন্ত্র ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টির সহায়তা করে থাকে।

পার্থক্য (Differentiating): মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তি বৈষম্যের মর্য্যাদা দান করে এবং তার ফলে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের পার্থক্য অক্ষুণ্ণ রেখে বহুমুখী বিকাশ সম্ভব করে।

প্রস্তুতি (Propaedeutic): উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণেচ্ছু শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির কাজে মাধ্যমিক স্কুল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে।

পথনির্দ্দেশ (Guidance and exploration): শিক্ষার্থীর বহুমুখী প্রতিভা ও সম্ভাবনার আবিষ্কার করে উপযুক্ত পথনির্দ্দেশের আয়োজন করে মাধ্যমিক স্কুলগুলি।

মাধ্যমিক স্কুলের কর্ম্মপ্রকৃতি সম্পর্কে ব্রিগ্‌স্ (Briggs)-এর অভিমত আরও ব্যাপক ও সুস্পষ্ট। তাঁর মতে মাধ্যমিক স্কুলের কর্ম্মপ্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত সংহতি; শিক্ষার্থীর প্রয়োজন পূরণ; জাতীয় ঐতিহ্য উপলব্ধি; শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও সামর্থ্যের আবিষ্কার; পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞানসম্পদের সুবিন্যাস; যথাযোগ্য ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অনুরাগ ও আগ্রহের প্রয়োগ; পথনির্দ্দেশ; ব্যক্তিত্বের পার্থক্য নিরূপণ ও যথাযোগ্য মর্য্যাদা দান; শিক্ষাদান ও শিক্ষা-গ্রহণের পদ্ধতির উন্নয়ন।

তরুণ শিক্ষার্থীকে গণতন্ত্রের উপযোগী করে গড়ে তোলা মাধ্যমিক স্কুলের এক অবশ্য কর্ত্তব্য বলে অধুনা স্বীকৃত হয়েছে। শ্রেণী বিভেদবোধ ত্যাগ করে

সকলকে একই সংস্কৃতিভাবাপন্ন হতে শেখাতে পারে মাধ্যমিক স্কুলগুলি। স্কুলের গণতান্ত্রিক সমাজ পরিবেশ তরুণ শিক্ষার্থীকে বয়স্ক জীবনের গণতান্ত্রিক জীবন যাপনের প্রেরণা দিতে পারে।

প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদান ছাড়াও মাধ্যমিক স্কুলগুলি শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে আরও নানাবিধ কর্ম্মসূচী গ্রহণ করে থাকে এবং সেগুলি পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীর সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশে সহায়তা করে। এই পরোক্ষ কর্ম্মসূচীর অন্তর্গত করা যায় এইগুলি :

১। স্কুল গ্রন্থাগার : পাঠ্যপুস্তকের বাইরে চিত্তাকর্ষক নানাবিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জনের আগ্রহকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রত্যেক মাধ্যমিক স্কুলেই অবসর বিনোদনের উপযোগী গ্রন্থাগার সংরক্ষিত হয়।

২। মধ্যাহ্ন ভোজন : উন্নততর দেশগুলিতে মাধ্যমিক স্কুলে মধ্যাহ্ন ভোজনের কর্ম্মসূচী প্রবর্ত্তিত হচ্ছে, কারণ এর ফলে শিক্ষার্থীর সাধারণ স্বাস্থ্য বিকাশ সমন্বিত হয় এবং সঙ্ঘভোজের মাধ্যমে শিক্ষামূলক আচরণ সৃষ্টির সহায়তা করা যায়।

৩। পরিবহন : স্কুলে যোগদানের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ দূরাঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীদের স্কুলে আসা-যাওয়া সম্ভব করতে হলে উপযুক্ত যানবাহন ও পরিবহনের ব্যবস্থা করা দরকার এবং এই ব্যবস্থা স্কুলেরই নিজস্ব তত্ত্বাবধানে হলে ভাল হয়।

৪। স্বাস্থ্য পরীক্ষা : তরুণ শিক্ষার্থীর দ্রুত বিকাশ যাতে অব্যাহত থাকে, সেজন্য মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে নিজস্ব চিকিৎসকের দ্বারা শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসা পরামর্শের প্রয়োজন রাখতে হয়।

৫। পাঠ্যপুস্তক : মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণ অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে বহু উন্নততর দেশে শিক্ষার্থীদের স্কুল থেকে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা হচ্ছে। এই পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের ব্যয় শিক্ষার্থীরা পরোক্ষভাবে বহন করে থাকে।

৬। তত্ত্বাবধান : শিক্ষার্থীর পাঠ্যবহির্ভূত বহু কাজকর্ম্ম মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানের অন্তর্গত হয়েছে। খেলাধুলা, ছবি, নৃত্য-গীতাভিনয় প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পিকনিক, প্রভৃতি বিষয় স্কুল অথবা কিশোর সংগঠনগুলির উদ্যোগে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্য্যায়ের অন্তর্গত হওয়ার ফলে এগুলিও মাধ্যমিক স্কুলের কর্ম্মসূচী বলে গৃহীত হচ্ছে।

এই সকল কর্ম্মসূচী শিক্ষণীয় বিষয়গুলির সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট যে, এগুলিকে পৃথক করা সহজ নয়। এইজন্যই আধুনিক মাধ্যমিক স্কুলের কর্ম্মপ্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এগুলি। মাধ্যমিক শিক্ষার কর্ম্মপ্রকৃতির ক্রম-বর্দ্ধমান ব্যাপকতার এটি একটি লক্ষণ। সমাজের বৃদ্ধি ও সভ্যতার জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক স্কুলগুলির কর্ম্মপ্রকৃতির অবিরাম পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন

করে সমাজের প্রয়োজন মিটাতে হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত কর্ম্মসূচীর কতকগুলি যে স্কুলের তত্ত্বাবধান ছাড়া করা যায় না এমন নয়, তবে স্কুলের সুনিয়মী পরিবেশে সেগুলির যে কল্যাণকর সুফল পাওয়া যায়, সেটি শিক্ষাবিদদের একান্ত কাম্য।

মাধ্যমিক স্কুলব্যবস্থা না থাকলেও সমাজ ও সভ্যতার অস্তিত্ব থাকতে পারতো। কিন্তু সে অস্তিত্বের রূপ হতো অন্যরকম। বর্ত্তমান যুগে আধুনিক যন্ত্র ও সামাজিক সংগঠনের পরিবেশে যে ধরণের সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা প্রয়োজন, যে সংযম, বিশেষ প্রস্তুতি ও জ্ঞান অত্যাবশ্যক, তা মাধ্যমিক স্কুলের মতো সুসংবদ্ধ প্রতিষ্টানই তরুণ সম্প্রদায়ের হাতে তুলে দিতে পারে। বর্ত্তমান যুগের রাষ্ট্রব্যবস্থার কার্য্যকলাপ এবং রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের মূল তথ্য উপলব্ধি করা বিভিন্ন যন্ত্রের কার্য্যকলাপ ও ব্যবহারবিধি শিক্ষা, কৃষি ও উৎপাদন ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানপ্রদত্ত তথ্যের প্রয়োগ শিক্ষা, জটিল সভ্যতার উপযোগী সামাজিক ও ব্যবসায়িক কাজকর্ম্মের বিবরণী সংরক্ষণ শিক্ষা, উৎপাদনমূলক শিল্পকার্য্যে শ্রমনিয়োগ শিক্ষা, যুদ্ধকালীন সামরিক শিক্ষা ও শান্তিকালীন কল্যাণব্রত শিক্ষা, প্রভৃতি বিষয়ে মাধ্যমিক স্কুলগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করছে ইদানীং।

শিক্ষার্থীর শিক্ষা ব্যতীত বৃহত্তর সমাজের কল্যাণেও আধুনিক মাধ্যমিক স্কুলগুলির প্রভাব নিয়োজিত হচ্ছে। সমাজের যে সকল সমস্যা সমাধানে মাধ্যমিক স্কুলের কর্ম্মপ্রকৃতি নির্দ্দেশিত হচ্ছে, সেগুলি নীচে আলোচিত হল :—

সমাজের স্বাস্থ্য ও শুচিতা : জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়ন বর্ত্তমান যুগের জনবহুল সমাজ ব্যবস্থার এক প্রধান সমস্যা। রাষ্ট্রের উদ্যোগে ডাক্তার, নার্স, হাসপাতাল, দুগ্ধ সরবরাহ প্রভৃতি কর্ম্মসূচীর মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের আয়োজন থাকলেও প্রতিটি তরুণ নাগরিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ব্যক্তিগত বিধিগুলি না জানলে চলে না। মাধ্যমিক স্কুলগুলি তরুণ শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধিগুলি শিক্ষা দেয় এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রচেষ্টায় জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ উদ্যোগ সমূহের সাথে সহযোগিতা করতে শেখায়। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীকে মাধ্যমিক স্কুলে বিজ্ঞান ও শারীরচর্চ্চার পাঠগ্রহণ করতে হয় এবং এই উপায়ে রোগ সংক্রমণ ও শরীর সংরক্ষণের মূল তথ্যগুলি অবগত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। সামাজিক শিক্ষার পাঠগ্রহণের মাধ্যমে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীরা জানতে পারে জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে নাগরিক দায়িত্বের মূলনীতিগুলি, রোগসংক্রমণের সময়ে টীকা গ্রহণের গুরুত্ব ও দায়িত্ব, দূষিত কুখাদ্য বিক্রয় রোধ করার পন্থা, পানীয় জল দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা দূর করার উপায় এবং জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ সম্পর্কে অজ্ঞ জনসাধারণকে সচেতন করার দায়িত্ব। অনেক ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের সঙ্ঘবদ্ধ করে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে পল্লী

পরিচ্ছন্ন অভিযান সংগঠন করা হয় এবং এর ফলে শিক্ষার্থীরা যেমন পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রচনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে। তেমনি তাদের আদর্শ অভিযান বহু বয়স্ক অথচ স্বাস্থ্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ও উদাস ব্যক্তিকে অনুপ্রেরিত করে সমাজশুচিতার উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

গৃহজীবনের মান উন্নয়ন: মাধ্যমিক স্কুলকে গৃহজীবনধারার পরিপূরক রূপেই বর্ত্তমান যুগে গণ্য করা হয়। গৃহের শিক্ষা মাধ্যমিক স্কুলের কাজে এবং মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষা গৃহের কাজে সহায়তা করে। প্রকৃতপক্ষে গৃহকর্ম্মের বহু বিষয় আজ স্কুল কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গৃহের পরিধি স্কুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, কারণ গৃহে যে সকল বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করা হতো, ইদানীং তার অনেকগুলিই স্কুলে সম্পন্ন হচ্ছে। শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ প্রস্তুতিস্বরূপ মাধ্যমিক স্কুলের পাঠক্রম রচিত হলেও শিক্ষার্থীর বর্ত্তমান পরিবেশের প্রয়োজন সম্পর্কেও শিক্ষাদান অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে। গৃহ ও বৃহত্তর সমাজের প্রতিফলন স্কুলের কার্য্যসূচীর মধ্যে পরিস্ফুট হয়। স্কুলের অধীত বিষয়ের উপযুক্ত কার্য্যকারিতা শিক্ষার্থী গৃহের পরিবেশেই যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে। যে সকল কার্য্যসূচী গৃহের পরিবেশকে সুরুচিপূর্ণ ও স্বাস্থ্যকর করে সেগুলি স্কুলে শিক্ষা-দানের প্রয়োজন এজন্যই বিশেষভাবে অনুভূত হয়। গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে শিক্ষার ব্যাপ্তি ও জনসঞ্চার হওয়ার ফলে তরুণ শিক্ষার্থীদের অবসর যাপনের সুশিক্ষা দেওয়া এক সমস্যা হয়েছে। মাধ্যমিক স্কুলে এই বিষয়ে সুশিক্ষা না দেওয়া হলে চঞ্চল তরুণ মন গৃহপরিবেশকে বৈচিত্র্যহীন মনে করে শহরের ব্যবসায়িক প্রমোদন কেন্দ্র, গল্পগুজব কেন্দ্র প্রভৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং গৃহের শান্তি ও সংহতি ক্ষুণ্ণ করে। এজন্য গৃহপরিবেশের মধ্যে স্বাস্থ্যকর সৃজনমূলক অবসর যাপনের শিক্ষাদানের দায়িত্ব মাধ্যমিক স্কুলগুলিকেই গ্রহণ করতে হয়েছে। শিল্পকাজ, রন্ধনবিদ্যা, সঙ্গীত, সূচীশিল্প, গৃহসজ্জা, আসবাব নির্ব্বাচন ও সংরক্ষণ, বর্ণচিত্রণ, বৈদ্যুতিক মেরামতী প্রভৃতি বহু কাজ আজকাল স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এই উদ্দেশ্যেই।

নিরাপত্তা শিক্ষার উন্নয়ন: শহর সভ্যতার বিস্তারলাভের সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তা শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। অভিভাবক সমিতি, স্থানীয় পুলিশ-বাহিনী, যানবাহন সংস্থা প্রভৃতির সহায়তায় ইদানীং স্কুলগুলির মাধ্যমেই নিরাপত্তা শিক্ষাদানের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। পথেঘাটে ট্রেন, ট্রাম বাসে চলাচলের প্রাথমিক নিয়মকানুনগুলি আলোচনা, খেলাধুলা, ভ্রমণ, চলচ্চিত্র প্রভৃতির মাধ্যমে তরুণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব মাধ্যমিক স্কুলের উপরই স্থাপিত হয়েছে।

বৃত্তিমূলক দক্ষতার বিকাশ: যদিও মাধ্যমিক স্কুলেই বৈজ্ঞানিক, শিল্পী এবং সুদক্ষ কারিগরের ট্রেনিং সম্পন্ন হয় না, তবুও মাধ্যমিক স্কুলেই তরুণ

শিক্ষার্থীর বৃত্তিমূলক দক্ষতার প্রাথমিক আবিষ্কার ও বিকাশের পথনির্দ্দেশ সূচিত হয়, একথা অনস্বীকার্য্য।

সুষ্ঠু রাষ্ট্রব্যবস্থা সৃষ্টি ও সংরক্ষণ: দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সরকার গঠনে উপযুক্ত সচেতন নাগরিকমণ্ডলীর প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজনেই মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নাগরিকজ্ঞান শিক্ষাদানের আয়োজন হচ্ছে। তরুণ বয়সে এই সকল জ্ঞানের প্রাথমিক পরিচয় হয়ে বয়স্ক জীবনে সুষ্ঠু সরকার গঠনে ও সংরক্ষণে জনগণ যথাকর্ত্তব্য উপলব্ধি করতে পারে।

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ: দেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে ব্যক্তিগত স্বার্থে অপচয় না করে সমাজের কল্যাণে সংরক্ষিত ও সদ্ব্যবহৃত করার চেতনা জাগাতে পারে মাধ্যমিক স্কুলগুলি, কারণ মাধ্যমিক স্কুলের পাঠক্রমে সমাজ কল্যাণকর চিন্তা সৃষ্টির আয়োজন থাকে।

জাতীয় প্রতিরক্ষা: যুদ্ধকালীন প্রতিরক্ষায় তরুণ সমাজকে প্রস্তুতিদানের দায়িত্বও আজকাল মাধ্যমিক স্কুলগুলির ওপর অনেকখানি এসেছে। যদিও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে সমর শিক্ষাদানের বিরোধিতা অনেকে করেন, কিন্তু সুনিয়ম, কঠোর শ্রম, পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা, সঙ্ঘবদ্ধতা প্রভৃতি গুণগুলি মাধ্যমিক স্কুলে অনুশীলিত হয় বলে প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত শিক্ষাগ্রহণে পরবর্ত্তীকালে সুবিধা হয়।

অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন: বর্ত্তমান যুগে শিক্ষাকে মূলধন বিনিয়োগের মতই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। উপযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষা তরুণ সমাজের মধ্যে কর্ম্মক্ষমতা ও অর্থনৈতিক দক্ষতা আনে এবং তার ফলে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে তাদের সার্থক অংশগ্রহণ সম্ভব হয় বলে শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যয়বরাদ্দকে ফলপ্রসূ অর্থ বিনিয়োগ বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে এইজন্যই আজকাল বাণিজ্যশিক্ষা, কারিগরীশিক্ষা প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বয়স্ক জীবনের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের ব্যবস্থা থাকে।

আধুনিক মাধ্যমিক স্কুলগুলি তরুণ সমাজকে এই সকল বিষয়ে সহায়তা করার জন্য সমাজের অন্তর্গত একটি প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য হয়েছে—সমাজের বিভিন্ন কাজকর্ম্মের সঙ্গে মাধ্যমিক স্কুলের সংযোগ ও সামঞ্জস্য রক্ষা এইজন্যই অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক মাধ্যমিক স্কুল শুধু শিক্ষার্থীদের পুঁথিগত শিক্ষাদানের ভারপ্রাপ্ত, একথা ভুল; স্কুল কর্ত্তৃপক্ষকে সমাজের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করতে হয়, স্কুলের পরিধির বাইরেও শিক্ষার ক্ষেত্র বিস্তৃত করতে হয়, বয়স্ক শিক্ষার আয়োজন করতে হয় এবং তরুণ মনে সমাজ সচেতনতা জাগ্রত করতে হয়।

Q. 3. What are the characteristic problems of contents and curriculum of secondary school ?

Ans. শিক্ষার ইতিহাসের প্রথম যুগে মাধ্যমিক স্কুলের পাঠক্রম সম্পর্কে অনেকের ধারণা ছিল, তরুণ শিক্ষার্থীদের মানসিক শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করার জন্য অঙ্ক, বিদেশী ভাষা, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ের বিরক্তিকর অংশগুলি শিখতে বাধ্য করা দরকার। তখনকার দিনে মাধ্যমিক স্কুলের পাঠক্রমে নীতিজ্ঞান শিক্ষার যে সকল ব্যবস্থা ছিল, তাতে সমাজের পুরোহিত, ধর্ম্মযাজক প্রভৃতি শ্রেণীর ব্যক্তিগণের আধিপত্য বিস্তারের প্রচ্ছন্ন প্রয়াস ছিল। তাছাড়া, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ শিক্ষা সীমাবদ্ধ রেখে শ্রেণীভেদ বৃদ্ধির সহায়তা করা হতো। কেবলমাত্র ঐতিহ্যের মর্য্যাদায় এমন সব বিষয় মাধ্যমিক পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ছিল, যার কোন উপযোগিতা বর্ত্তমান সমাজে নেই। কলেজে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়, এই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক পাঠক্রম প্রণয়ন করা হতো—শিক্ষার্থীর বর্ত্তমান জীবনের প্রয়োজনের কোন মর্য্যাদা রক্ষাকরা হতো না। বয়স্ক ব্যক্তিরা যা পছন্দ করতেন, ভাল মনে করতেন, তরুণ শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, আগ্রহ বিবেচনা না করেই তা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতেন। মনে করা হতো, তরুণ মাত্রেই অন্যায়প্রিয়, অবাধ্য এবং শিক্ষাবিমুখ। শিক্ষাদানের মনস্তাত্ত্বিক সত্যগুলি না জানার দরুণ কতকগুলি স্থূল যুক্তির ভিত্তিতে পাঠক্রম রচনা ও শিক্ষাদান সম্পন্ন হতো।

বর্ত্তমান যুগে শিক্ষাবিজ্ঞানের বিপুল উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক স্কুলের পাঠক্রম রচনার এই মনোভাব পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। পাঠক্রম রচনার পূর্ব্বেই ইদানীং শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য, আদর্শ এবং দর্শন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। এখন বোঝা গেছে যে, শিক্ষার্থীর সামাজিক দক্ষতা ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনে সহায়তা করাই মাধ্যমিক স্কুলের পাঠক্রমের লক্ষ্য। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তরুণ শিক্ষার্থীর মনে সহজভাবে সঞ্চারিত করার সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলিকেও মেটাতে হবে। পাঠক্রম এমন হওয়া উচিত যাতে সত্যসত্যই বর্ত্তমান জীবনধারণের উপযোগী জ্ঞান ও তথ্য আহরণে তরুণ শিক্ষার্থী সমর্থ ও উৎসাহী হয়। তার ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কর্ত্তব্য পালনের দক্ষতাও যাতে বৃদ্ধি পায়, পাঠক্রমে সেই ধরণের আয়োজন অবশ্যই থাকা দরকার। শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও আগ্রহের যথাযথ পরিমাপ করে তার আসন্ন বয়স্ক জীবনের বৃত্তি নির্ব্বাচনের দক্ষতা অর্জ্জনেও যেন পাঠক্রম সহায়তা করতে পারে। জীবনের সকল প্রধান কাজকর্ম্মের পরিচয়লাভের সুযোগও থাকবে মাধ্যমিক স্কুলের পাঠক্রমে।

আগের দিনের মত এখন আর রাষ্ট্রনায়কদের ইচ্ছামত পাঠক্রম প্রণয়ন হয় না। তবে শিক্ষাক্ষেত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অভিমতের চাপে এমন পাঠক্রম

রচিত হয়ে থাকে, যা শিক্ষার্থীদের উপযোগী নয়। এই কারণে শিক্ষা পরিচালনার সকল পর্য্যায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সম্মিলিত পরামর্শে পাঠক্রমের মূল কাঠামো নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। পাঠক্রম প্রণয়ন সম্পর্কে কোনও অনমনীয় সংস্কারবোধ থাকা চলে না এবং প্রয়োজন হলেই সমাজের আবশ্যক মত পাঠক্রম পরিবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। সুতরাং বর্ত্তমান যুগে মাধ্যমিক স্কুলের পাঠক্রম প্রণয়নের জন্য কতকগুলি নীতি অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন হয়েছে। প্রথমে অভিভাবক ও শিক্ষকদের অভিমত অনুসারে স্কুল শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের উপযোগিতা নির্দ্ধারণ করে স্কুলের নীতিদর্শন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করতে হবে। এরপর স্থানীয় স্কুলের বিশেষ প্রয়োজনগুলি অনুধাবন করতে হবে এবং পাঠক্রম রচনায় সেই প্রয়োজনগুলি মিটানোর চেষ্টা করতে হবে। এছাড়া তরুণ শিক্ষার্থীদের আগ্রহ-অনুরাগ ও বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কেও পাঠক্রম রচয়িতার ব্যাপক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আবার স্থানীয় পরিবেশে সেই অঞ্চলের তরুণদের প্রয়োজন সম্পর্কেও তথ্যানুসন্ধান করে পাঠক্রমে স্থানীয় প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। পাঠক্রম কার্য্যকরী করার পরে কি ধরণের ফলাফল আশা করা হবে, তারও একটি ধারণা গঠন করা প্রয়োজন। অর্থাৎ উদাহরণ স্বরূপ, স্বাস্থ্যচর্চ্চা শিক্ষার ফলে তরুণ শিক্ষার্থীর কি কি আচরণ সংগঠিত ও পুনর্গঠিত করতে হবে এবং তার জন্য অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহযোগী ব্যবস্থার আয়োজন রাখতে হবে। এই সকল উপচারিক (formal) শিক্ষাব্যবস্থার সহযোগীরূপে সমাজ পরিবেশে যে সকল অনুপচারিক (informal) শিক্ষার মাধ্যমে তরুণ মনের বিকাশ ঘটে থাকে, সেগুলির তথ্যানুসন্ধান করে পাঠক্রমের মাধ্যমে তার পুষ্টিসাধনের আয়োজন করতে হবে।

তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক স্কুলের পাঠক্রম রচনার পূর্ব্বে তার সকল প্রকার কার্য্যবিধির পরিচয় লাভ করে উপরিউক্ত নীতি অনুসরণ করে সকল শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে যথাযথভাবে সুবিন্যস্ত করতে হয়। সাধারণতঃ শিক্ষণীয় সকল তথ্যকে কতকগুলি পাঠ্য বিষয়ে বিভক্ত করা হয় যুক্তিসম্মতভাবে, কিন্তু এর ফলে তরুণ মনে জ্ঞানের অখণ্ডতা উপলব্ধি করার অসুবিধা হয়। এইজন্য পাঠক্রমকে মনোবিজ্ঞানের সূত্র অনুসারে পরিবেশনের প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থীর আশু প্রয়োজনের ভিত্তিতে সমগ্র পাঠক্রমকে প্রথমে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে অথচ সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপিত করতে হবে এবং তারপর 'ইউনিট' ভিত্তিতে বিভিন্ন অংশ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে। পাঠক্রম রচনার সময়ে এই অখণ্ডতা রক্ষার বিষয়টি স্মরণ রাখতে হয়। পাঠক্রম যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়; পরবর্ত্তী স্তরে সম্পূর্ণ করবার ইচ্ছায় কোন স্তরে অসম্পূর্ণ পাঠক্রম প্রবর্ত্তন করা অনুচিত। এই সঙ্গে বিবেচনা করতে

হবে কোন্ পাঠ্যবিষয়ের কোন্ অংশটি মাধ্যমিক শিক্ষার কোন্ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দ্ধারিত হবে। এই বিবেচনা নির্ভর করে শিক্ষার্থীর বিকাশ, বিষয়বস্তুর ক্রমান্বয়ী উপযোগিতা প্রভৃতির উপর। যে বয়সে যে ধরণের পাঠ্যবিষয় চিত্তাকর্ষক এবং উপযোগী বলে স্বীকৃত হবে, সেই বয়সে পাঠক্রমের সেই অংশটুকু অধ্যয়নের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এছাড়া শিক্ষার্থীর সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষ আগ্রহ-মুখী শিক্ষারও যাতে পরিপোষণ হয়, পাঠক্রমে তার আয়োজন থাকা উচিত।

পাঠক্রমে স্কুলের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীর সকল অভিজ্ঞতাই সুষ্ঠুভাবে সন্নিবেশিত হবে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রমকে পরিপুষ্ট করার জন্য আরও বিভিন্ন সহায়ক বিষয়ের প্রয়োজন হয়। অভিজ্ঞতাকে সজীব ও চিত্তাকর্ষক করার জন্য স্কুলের পরিধির মধ্যে বিভিন্ন ধরণের কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত নতুবা কেবল পুঁথির নির্দ্দেশে শিক্ষার্থীর মনে অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আগ্রহ সঞ্চার করা যায় না। এছাড়া প্রয়োজন স্কুলের গ্রন্থাগার। বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা, প্রভৃতি সুদক্ষ গ্রন্থাগারিকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হলে পাঠক্রমের বহু বিষয়ের প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি ও পরিপোষণ করা সহজ হয়। পাঠক্রমের সুষ্ঠু পরিবেশনের একটি অপরিহার্য্য বিষয় হলো পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠক্রমের সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের সারমর্ম্ম পাঠ্যপুস্তকে এমনভাবে থাকা উচিত যাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে বিষয়বস্তুর সম্যক জ্ঞান লাভ সহজ হয়। একই বিষয় প্রাথমিক স্কুলে অধ্যয়ন করা হয়ে থাকলে সেটির পরবর্ত্তী স্তরের আলোচনাই মাধ্যমিক স্কুলে হওয়া বাঞ্ছনীয়; পাঠক্রম রচনায় এই সামঞ্জস্য না থাকলে শিক্ষার্থীর কাছে পাঠ্যবিষয়ের আকর্ষণ নষ্ট হয়।

পরিশেষে উল্লেখ করা দরকার যে, মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যে সকলবিষয় শিক্ষার আবশ্যক, তার স্থান থাকা দরকার। রাষ্ট্রের নীতি সম্পর্কে পাঠক্রম প্রণেতার দ্বিমত থাকলেও এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। পাঠক্রমের আর একটি লক্ষ্য হওয়া উচিত, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ এবং এর জন্য শিক্ষাবিদ্দের সর্ব্বদাই সমাজের প্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে পাঠক্রম পরিবর্ত্তন করে চলতে হয়। উচ্চতর শিক্ষা, বৃত্তিমূলক দক্ষতা এবং বয়স্ক জীবনের সার্থক সমন্বয়নে তরুণ শিক্ষার্থী যাতে কোনরকম অসুবিধা বোধ না করে, মাধ্যমিক স্কুলের পাঠক্রমের সেই লক্ষ্যই হওয়া উচিত।

Q. 4. What are the problems in designing a curriculum based on the needs of adolescents ?

Ans. তরুণ শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের বিকাশ ও বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্যগুলি

এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সেগুলির যথাযথ মর্য্যাদা না দিয়ে পাঠক্রম রচনা বা যে কোন কল্যাণকর কর্ম্মসূচীর পরিকল্পনা করা অবাস্তব বলে গণ্য হতে পারে। পরিণত বয়সের প্রারম্ভ সূচিত হয় তরুণ বয়সে, এইজন্যই তার চাহিদা ও বৈশিষ্ট্যগুলি এত যত্নসহকারে অনুধাবনের প্রয়োজন হয়। তরুণ বয়সে জীবনের নতুন পর্য্যায় সুরু হয়, নানা অভিজ্ঞতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি তরুণ-তরুণী অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তাদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র ক্রমশই বিশেষ রূপ ও বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে থাকে। এই বয়সে শিক্ষার্থীর দৈহিক বৃদ্ধির পরিমাণ ও গতি বিশেষ লক্ষ্যণীয়। তার পেশীগত শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ চঞ্চল কাজকর্ম্মে বিশেষ উৎসাহ পায়। আবার দৈহিক বৃদ্ধির লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্যগুলির আকস্মিকতায় অনেক তরুণ লজ্জাবোধ করে এবং এমন এমন কাজকর্ম চায়, যাতে তার মন দেহ থেকে অন্যদিকে আকৃষ্ট হতে পারে। তরুণ বয়সে বালক ও বালিকার বৃদ্ধি সমান হয় না। প্রথম দিকে বালকদের বৃদ্ধি বেশি হয়, কিন্তু পরে বালিকাদের বৃদ্ধি দ্রুততা লাভ করে। অনেকে বিশ্বাস করেন, তরুণ বয়সে রক্তচাপও বৃদ্ধি পায়। পরিপাকযন্ত্রের ক্রিয়া পরিবর্ত্তন হওয়ার দরুণ ক্ষুধার তারতম্য ঘটে। গ্রন্থি পরিণতির জন্য বালকদের কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তন হয়, বালিকাদের দৈহিক আকৃতির পরিবর্ত্তনের সাথে নানাবিধ অস্বস্তির সৃষ্টি হয়।

এই সকল পরিবর্ত্তন তরুণদের বিভিন্ন বয়সে দেখা দেয় এবং এবিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ধার্য্য করা যায় না। এই অনিশ্চিত তারুণ্যের জন্য আবহাওয়া, জাতিগত বৈশিষ্ট্য, স্থানীয় প্রভাব, বুদ্ধি এবং অন্যান্য একাধিক প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রভাব ক্রিয়াশীল থাকে। তবে এই অনিশ্চিত বৈষম্যের জন্যই তরুণ শিক্ষার্থীর পাঠক্রম প্রণয়ন কালে তরুণদের বিভিন্ন বিচিত্র আগ্রহ-অনুরাগ, প্রস্তুতি, প্রাক্ষোভিক পরিণতি, নিজের প্রতি ও অপরের প্রতি মনোভাব এবং সামাজিক চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে সকল বিষয় চিন্তা করতে হয়।

তরুণ শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ পরিমাপের দুটি পন্থা আছে: মানসিক বয়স (mental age বা M. A.) নির্দ্ধারণ এবং বুদ্ধ্যঙ্ক (intelligence quotient বা I. Q.) নির্দ্ধারণ। বিভিন্ন বয়সের তরুণদের গড়পড়তা মানসিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে মানসিক বয়স নিরূপিত হয়। দেখা গেছে, তরুণ বয়সে, ১৪ থেকে ১৬ বছর বয়সে মানসিক বয়স বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়। এই কারণেই অল্প বয়সে যে দ্রুত গতিতে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে, এই বয়সে তার অগ্রগতি কিছুটা হ্রাস পায় এবং সেই মত পাঠক্রমের সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়। শিক্ষার্থীর জন্মবয়সকে মানসিক বয়স দ্বারা বিভাজন করলে বুদ্ধ্যঙ্ক পাওয়া যায়। এই বুদ্ধ্যঙ্কের দ্বারা শিক্ষার্থীর প্রতিভা উপলব্ধি করা যায়

বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। সুতরাং বুদ্ধ্যাঙ্কের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তরুণ শিক্ষার্থীর পাঠগ্রহণের সামর্থ্যও বিবেচনা করার প্রয়োজন হয়।

মাধ্যমিক স্কুলের তরুণদের আচরণের তীব্রতা, আকস্মিক পরিবর্তনশীলতা, প্রক্ষোভের বৈচিত্র্য, সাময়িক বিদ্রোহ, নানারূপ অসামঞ্জস্য, প্রভৃতির প্রতি শিক্ষাবিদদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তরুণদের মধ্যে যে প্রক্ষোভগুলি বিশেষ প্রবল হতে দেখা গেছে, সেগুলি হলো ভালোবাসা, ভয় এবং ক্রোধ। কোনও তরুণ এই প্রক্ষোভের যে কোন একটিতে পরিণতি লাভ করে অন্যটিতে অপরিণত থাকতে পারে। অকারণ ভয়, ক্রোধ দমনে অসামর্থ্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি তরুণ জীবনের এই অসম্পূর্ণ পরিণতির লক্ষণ। অতি অল্প তরুণের পক্ষেই সকল প্রক্ষোভের পরিণতি লাভ করা সম্ভব হয়।

এই সকল প্রাক্ষোভিক দ্বন্দ্বের কারণ অনেক বয়স্ক ব্যক্তি উপলব্ধি না করে তরুণদের প্রতি রুষ্ট হন, ফলে তরুণরা প্রাক্ষোভিক দ্বন্দ্বের সাথে অতিরিক্ত সামাজিক পীড়নেও কষ্ট পায়। প্রাক্ষোভিক দ্বন্দ্বগুলি সহানুভূতিসহকারে বিবেচিত না হলে তরুণদের পক্ষে নীতিজ্ঞান বিকাশও সম্ভব হয় না। প্রক্ষোভগুলি যথাযথভাবে বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে প্রশমিত হলে এবং সামর্থ্যের উপযুক্ত চিত্তাকর্ষক পাঠক্রম থাকলে তরুণ মনের বহু কল্যাণকর বিকাশ সম্ভব হয়। তরুণ শিক্ষার্থীর অপরিণত বুদ্ধির প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়ে অত্যধিক পীড়ন করলে তার মধ্যে অসৎ পন্থা অবলম্বনের প্রবৃত্তি জাগে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। তরুণমনের আর একটি বৈশিষ্ট্য দিবাস্বপ্ন ; কল্পনাশক্তির প্রসার লাভের জন্যই তরুণরা দিবাস্বপ্নের মাধ্যমে বহু অপূরণীয় ইচ্ছার পূরণ করার চেষ্টা করে। এই দিবাস্বপ্ন অল্প ভাল, কিন্তু যাতে অত্যধিক ও অবাস্তব না হয়, সেজন্য তরুণ শিক্ষার্থীকে যথাসম্ভব চিত্তাকর্ষক কাজে নিযুক্ত রাখা দরকার। সৎ সাহিত্য পাঠে উৎসাহিত করতে পারলেও অত্যধিক দিবাস্বপ্নের কুফল হ্রাস পায়।

তরুণ বয়সে নানা প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ে আত্মসম্মান ও আত্মপ্রতিষ্ঠার মনোভাবটি বেশ প্রবল হয়ে ওঠে। জিনিষপত্র, বন্ধুবান্ধব ও পরিবেশের উপর তরুণ শিক্ষার্থী তার আপন প্রভাব ও কর্তৃত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হয়। তার সদ্যজাগ্রত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে এইভাবে সে পরীক্ষা করে দেখতে চায়। দলবদ্ধ হয়ে কাজ করা তরুণ বয়সের আর একটি বৈশিষ্ট্য। সঙ্কেতবাক্য, গোপনীয়তা রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে এই সময় বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। এই দলবদ্ধ ভাব ও নেতৃত্বের অঙ্কুরিত মনোভাবকে স্কুল পাঠক্রমের মাধ্যমে যথেষ্ট উপকারে নিয়োজিত করা যায়। সমবয়সীদের চিন্তাধারা ও দলীয় সংস্কৃতির প্রভাব তাদের উপর এই সময় এত প্রবল হয় যে, শিক্ষক ও পিতামাতার মন্তব্যের চেয়েও বন্ধুদের মন্তব্যকে বেশি মূল্যবান মনে করে। এই দলীয়

সংস্কৃতিকে (peer culture) একেবারে উপেক্ষা না করে স্কুল পাঠক্রমের মাধ্যমে তার সুষ্ঠু রূপায়ণ করার চেষ্টা করা দরকার। অনুকরণ প্রবৃত্তিও তরুণ বয়সের একটি বৈশিষ্ট্য ; উপযুক্ত আদর্শ উপস্থাপন করতে পারলে এই প্রবৃত্তির ফলে তরুণ মন আদর্শরূপে গড়ে উঠতে পারে। বালক ও বালিকার প্রতি পারস্পরিক প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক আকর্ষণও তরুণ বয়সে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে ; এইজন্যই তরুণরা তরুণীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আপন কৃতিত্ব অতিরিক্তভাবে প্রদর্শন করতে চায়, তরুণীরাও তরুণদের কাজকর্ম্মের প্রশংসা করে, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। এই আচরণ অনেক সময়ে বয়স্ক ব্যক্তিরা অনুমোদন করতে পারেন না এবং তাঁরা যে সব বিধিনিষেধ আরোপ করেন, তার ফলে তাঁরা তরুণতরুণীদের আস্থা হারিয়ে ফেলেন।

এই সকল কারণে তরুণ শিক্ষার্থীদের নানাপ্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তাদের আগ্রহ-অনুরাগের পরিধিও এই সময় প্রসারলাভ করতে থাকে। ফলে অনেক সময় পাঠ্য বিষয় চর্চ্চার কাজে যথাযথ মনোনিবেশ করতে সক্ষম হয় না। তরুণমনের সমস্যা ও তার আগ্রহ-অনুরাগের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে। এই জন্য তরুণদের আগ্রহ-অনুরাগমত পাঠক্রম সমন্বিত করতে পারলে তাদের অনেক সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে ওঠে। তরুণদের আগ্রহ-অনুরাগ সাধারণভাবে এক ধরণের নয়, সেইজন্যই তরুণদের একই আগ্রহ আছে মনে করে সকলের জন্যে সমান পাঠক্রম নির্দ্ধারণ করা চলে না। বয়স্ক ব্যক্তিদের আগ্রহ-অনুরাগের ধারণায় তরুণদের আগ্রহকে বিশেষ পথাভিমুখী করার জন্য পাঠক্রমকে কাজে লাগাতে গেলে তরুণমনের স্বাভাবিক বিকাশ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তরুণ শিক্ষার্থীর এই সমস্যাগুলি পর্য্যালোচনার সঙ্গে তার প্রয়োজনগুলি সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যেতে পারে, কারণ গণতান্ত্রিক সমাজে সকলের প্রয়োজনানুসারেই সমাজের কার্য্যবিধি নির্দ্ধারিত হওয়ার কথা এবং শিক্ষার্থীর পাঠক্রমের মধ্যেও সেই সকল প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তরুণ শিক্ষার্থীর প্রয়োজনগুলি এইভাবে তালিকাবদ্ধ করা যায় :—

১। তরুণ বয়সের শিক্ষার পর যে বৃত্তি গ্রহণের প্রয়োজন হবে, সে বিষয়ে যথাযথ অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের প্রয়োজনে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে কাজের সুযোগ ;

২। প্রত্যেক তরুণ শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য সংরক্ষণ প্রয়োজন ;

৩। প্রত্যেক তরুণ শিক্ষার্থীর প্রয়োজন সমাজের প্রতি তার কর্ত্তব্য ও দায়িত্বগুলি অবহিত হওয়া ;

৪। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রয়োজন আপন পরিবারবর্গের মর্য্যাদা সম্পর্কে যথাযথ ধারণা সৃষ্টি ও সার্থক গৃহজীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়া ;

৫। প্রত্যেক তরুণ শিক্ষার্থীর পণ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয়ের বিধিগুলি জানা প্রয়োজন ;

৬। প্রত্যেক তরুণ শিক্ষার্থীর একান্ত প্রয়োজন বিজ্ঞানের অবদান সম্পর্কে মোটামুটিভাবে অবহিত হওয়া ;

৭। সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত ও প্রকৃতির সৌন্দর্য উপলব্ধি ও উপভোগের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ তরুণ শিক্ষার্থীদের দেওয়া প্রয়োজন ;

৮। অবসর সময় যথাযথভাবে কাজে লাগানোর ক্ষমতা অর্জ্জন প্রয়োজন ;

৯। প্রত্যেক তরুণ শিক্ষার্থীর বয়স্ক ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা করার আচরণ শিক্ষা প্রয়োজন এবং অপর সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করে বাস করতে অভ্যস্ত হওয়া প্রয়োজন ;

১০। প্রত্যেক তরুণ শিক্ষার্থীর যুক্তিসঙ্গত চিন্তা, সুস্পষ্ট ভাবপ্রকাশ ও উপলব্ধি সহকারে পঠন ও শ্রবণ অভ্যাস প্রয়োজন।

তরুণদের এই সকল প্রয়োজন পূর্ণ না হলে তাদের মনে হতাশার সৃষ্টি হয় এবং নানাপ্রকার আচরণ বিকৃতি দেখা দেয়। এই আচরণ বিকৃতি রোধ করার জন্য তরুণমনের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজন এবং সেই মত পাঠক্রম পরিকল্পনা আবশ্যক।

তরুণরা বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষুদ্র সংস্করণ নয়। প্রত্যেকটি তরুণ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে হবে এবং বয়স্ক প্রভাবের বাইরে তার স্বাভাবিক বিকাশের উপযোগী নমনীয় পাঠক্রম প্রণয়ন করতে হবে।

পাঠক্রমের অন্তর্গত প্রত্যেকটি কর্ম্মসূচী তরুণ দেহ ও মনের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের উপযোগী হওয়া উচিত। তরুণ দেহ ও মন যে গতিতে পরিণতি লাভ করে, পাঠক্রম বিন্যাস সেই অনুপাতে সম্পন্ন হলে শিক্ষার্থী পাঠাভ্যাসে আগ্রহলাভ করে।

তরুণ মনের ব্যাপকতা স্বীকার করে তার নিত্যনূতন আগ্রহ ও সামর্থ্যের অনুপাতে পাঠক্রমকেও ব্যাপক ও পরিবর্ত্তনশীল করতে হবে। আগ্রহ পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে পাঠক্রম পরিবর্ত্তনের স্বাধীনতা রাখতে হবে।

সহপাঠক্রমিক কার্য্যক্রমের যথেষ্ট আয়োজন রাখতে হবে, যার ফলে তরুণ শিক্ষার্থী তার অবসর সময় সম্পূর্ণভাবে সৎ কাজে নিয়োগ করতে পারে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের সম্যক্ পরিমাপ করতে হবে এবং পাঠক্রমে সেই উপযোগী কর্ম্মসূচীর আয়োজন রেখে শিক্ষার্থীকে নিয়োগ করতে হবে।

তরুণ বয়সে যে শিক্ষাটি সর্ব্বাপেক্ষা অবহেলিত হয় তা হলো যৌনশিক্ষা

যৌন সম্পর্কিত চেতনা জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তরুণতরুণীরা নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয় কিন্তু এ বিষয়ে কোনও জ্ঞান অর্জ্জনের সুযোগ না থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই ভুল ধারণা ও অন্যায় কাজে শরীর নষ্ট করে। পাঠক্রমে এইজন্যই যৌনশিক্ষার দাবী উত্থাপিত হয়েছে।

যে সকল বিষয় ধর্ম্ম ও নীতি সম্পর্কিত বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে, অপরিণত তরুণ মনের স্বাভাবিক বিকাশের সহায়তায় সে সকল বিষয় পাঠক্রম থেকে বর্জ্জন করাই যুক্তিসঙ্গত।

তরুণদের উপযুক্ত পথে পরিচালিত করার জন্য উপযুক্ত পথনির্দ্দেশের ব্যবস্থাও পাঠক্রমের মধ্যে থাকা দরকার। কি ধরণের আগ্রহ ও সামর্থ্য কি ধরণের কাজের উপযোগী সে বিষয়ে তরুণ শিক্ষার্থীর সাধারণ ধারণা সৃষ্টিতে পাঠক্রমের সহায়তা প্রয়োজন।

পাঠক্রমকে চিত্তাকর্ষক করার জন্য অহেতুক প্রতিযোগিতার পরিমাণ হ্রাস করে সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

সংক্ষেপে বলা যায়, তরুণ শিক্ষার্থীর প্রয়োজনের উপযোগী পাঠক্রম রচনার জন্য দরকার সহানুভূতিশীল শিক্ষক ও পাঠক্রমপ্রণেতা। যে পাঠক্রম শিক্ষার্থীর প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে, সেই পাঠক্রম তরুণ সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠা সম্ভব করতে পারে।

Q. 5. What are the major causes of individual differences and the principles for providing for such differences in secondary education ?

Ans. মাধ্যমিক শিক্ষা পর্য্যায়ে তরুণ শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাদের বিচিত্র ব্যক্তি বৈষম্য। প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষাক্ষেত্রে এই ব্যক্তি বৈষম্য নানা সমস্যার সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তি বৈষম্যের কারণ ও এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে আধুনিক যুগের সমষ্টিগত গণশিক্ষাকে সার্থক করা সহজ নয়।

ব্যক্তি বৈষম্যের বিভিন্ন কারণগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে:

(১) বংশধারা বা প্রকৃতি
(২) পরিবেশ বা প্রতিপালন
(৩) সম্প্রদায় ও জাতি বৈশিষ্ট্য
(৪) নারীপুরুষ ভেদ
(৫) বয়স ও পরিণতি
(৬) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহ

বংশধারা ও পরিবেশজনিত প্রভাবে ব্যক্তি বৈষম্য সম্পর্কে মতভেদ

আছে। অনেকের মতে বংশধারাজনিত ব্যক্তি বৈষম্যই গুরুত্বপূর্ণ; আবার অনেকে মনে করেন, পরিবেশের প্রভাবে যে ব্যক্তি বৈষম্য ঘটে তারই গুরুত্ব অধিক। আধুনিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, ব্যক্তি বৈষম্য সৃষ্টিতে উভয়েরই প্রভাব আছে। বংশধারার প্রভাবে কোনও একটি বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির মধ্যে উদ্ভূত হয়, এবং পরিবেশের প্রভাবে সেই বৈশিষ্ট্যটি বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। শিক্ষাক্ষেত্রে বুদ্ধি, জন্মগত সামর্থ্য, আগ্রহ, নীতিবোধ, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাব আলোচনার প্রয়োজন হয়।

বুদ্ধিবৃত্তির উপর বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে নিউম্যান, ফ্রীম্যান এবং হোলজিংগারের গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে জানা যায়, বুদ্ধির ২৫% থেকে ৩০% পর্য্যন্ত পরিবেশের প্রভাবে রূপান্তরিত করা যেতে পারে এবং বাকীটুকু বংশধারা প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত থেকে যায়। শারীরিক বৈশিষ্ট্যের উপর পরিবেশের প্রভাব অতি অল্প, বুদ্ধিবৃত্তির উপর এর প্রভাব কিছুটা, শিক্ষালাভের বিষয়ে এই প্রভাব অনেকখানি এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও প্রকৃতিগঠনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী। বুদ্ধির তারতম্যে ব্যক্তিবৈষম্য ঘটে থাকে, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন।

জাতি ও সম্প্রদায়গত ব্যক্তিবৈষম্যের কারণ বংশধারার কিংবা পরিবেশের মধ্যে নিহিত থাকে কিনা, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে 'বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কিত যে ব্যক্তিবৈষম্য দেখা যায়, তা বুদ্ধি বা সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে না বলেই মনে হয় এবং উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যে সকলের বুদ্ধি বিকাশের আয়োজন করা যায়।

কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে বালিকাদের মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের অধিকার দেওয়া হতো না। বালকদের চেয়ে বালিকাদের হীনবুদ্ধি বলে মনে করা হতো। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে জানা যায় যে, সাধারণভাবে বালক ও বালিকার মধ্যে বুদ্ধির বিশেষ পার্থক্য থাকে না। আগ্রহ, অনুরাগ, ব্যক্তিত্ব ও মেজাজ সম্পর্কে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়, সেগুলি দেহের কয়েকটি অন্তঃক্ষরা বিশেষ বিশেষ গ্রন্থির জন্যই হয়ে থাকে। ভাষা বিষয়ে নারীর সামর্থ্য পুরুষদের চেয়ে অধিকতর বলে অবশ্য প্রতিপন্ন হয়েছে। বালকরা সংখ্যাবিষয়ক পরীক্ষায় অধিকতর যোগ্যতা দেখায়। বালিকারা স্মৃতিশক্তিবিষয়ক কাজে দক্ষতা দেখায়। কারিগরী দক্ষতায় বালকদের শ্রেষ্ঠতাও সর্ব্বজনবিদিত, তবে মনে হয় পারিবেশিক প্রভাব এর জন্য অনেকাংশে প্রভাবশালী।

মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি বয়স ও পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন গতিতে বিকাশলাভ করতে থাকে। তরুণ বয়সেই অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যের প্রায় সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে, অথবা তার পরে বিকাশলাভের গতি এত স্বল্প হয় যে, পরিমাপ

করা যায় না। কোন্ বয়সে কোন্ মানসিক বৈশিষ্ট্যের শিক্ষা আগে দেওয়া উচিত, সে বিষয়ে কোনও নির্দ্দিষ্ট নীতি নির্দ্ধারণ করা যায়নি।

ব্যক্তি বৈষম্যের মর্য্যাদায় তরুণ শিক্ষার্থীদের যথোপযুক্ত শিক্ষা পরিবেশনের ব্যবস্থা করা যায় দুটি উপায়ে: ক্লাশঘরের মধ্যে শিক্ষকের প্রচেষ্টায় এবং সমগ্র স্কুল পরিবেশে সর্ব্বাঙ্গীন পরিচালন প্রচেষ্টায়।

ক্লাশঘরের মধ্যে শিক্ষকের প্রচেষ্টায় সঙ্ঘবদ্ধ শিক্ষাদানের সময়ে ব্যক্তি বৈষম্যের যথাযথ মর্য্যাদা দেওয়া খুব সহজ নয়। শিখনের যে সকল মূলসূত্র সঙ্ঘবদ্ধ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেগুলি ক্লাশের বিভিন্ন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অচল হতে পারে। সঙ্ঘবদ্ধ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পাঠ অনুশীলনের সময়ে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রয়োজনানুসারে পাঠ নির্দ্দেশ দিতে হবে। পাঠ অনুশীলনের সময় যথেষ্ট দীর্ঘ হবে, প্রয়োজনমত শিক্ষার্থীর আগ্রহ অনুসারে নতুন পাঠ্য সংযোজিত হবে, তবেই ব্যক্তি বৈষম্যের মর্য্যাদা রক্ষা সম্ভব হতে পারে।

ল্যাবরেটরী পরিকল্পনায় শিক্ষাদানের আয়োজন করলে সম্ভবতঃ ব্যক্তি-বৈষম্যের অধিকতর মর্য্যাদা দান করা সহজ হয়। শিক্ষক পথনির্দ্দেশ ও সহায়তা করবেন এবং শিক্ষার্থী আপন উদ্যোগে বিভিন্ন পাঠ অনুশীলনে রত থাকবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও সামর্থ্যমত অনুশীলনী নির্ব্বাচনের যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হবে এবং এই সময়ে বিভিন্ন শিক্ষার্থী বিভিন্ন পাঠ্যাংশ নিয়ে অধ্যয়নরত থাকতে পারবে। এই ব্যবস্থায় কোনও শিক্ষার্থীর উন্নততর মেধার জন্য অন্য অল্পধী শিক্ষার্থীকে সহজে পরাজিত করার অবকাশ থাকবে না; উন্নততর মেধার জন্য অল্প সময়ে একটি অনুশীলন আয়ত্ত হলেই পরবর্ত্তী অনুশীলন গ্রহণ করতে হবে। অল্পধী শিক্ষার্থীরাও হীনমন্যতা ও মর্য্যাদাহানির আশঙ্কা থেকে রক্ষা পাবে। এইভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পাঠগ্রহণ বিভিন্ন ভাবে সমাপ্ত হলে সামগ্রিক বিবরণী সংগ্রহ করে সকলের কাজের তুলনামূলক পর্য্যালোচনা ও পরীক্ষা করা হবে এবং সকলকে একটি বিশেষ উৎকর্ষমানে উপনীত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উৎসাহ দিতে হবে।

সমগ্র স্কুল পরিবেশে সর্ব্বাঙ্গীন পরিচালন প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থীদের ব্যক্তি-বৈষম্যের যথাযোগ্য মর্য্যাদা দেওয়ার জন্য নানাভাবে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শ্রেণীবিভক্ত করা হয়। সামর্থ্য, বালকবালিকা, বয়স, বয়ঃসন্ধি, ব্যর্থতা, বিকলাঙ্গতা, মানসিক বিকলতা এবং পাঠক্রম—সাধারণতঃ এইগুলির ভিত্তিতেই শ্রেণীবিভাগ হয়ে থাকে।

সামর্থ্য অনুসারে শ্রেণীবিভাগের নাম সমসত্ত্ব (homogeneous) শ্রেণী বিভাগ। বুদ্ধ্যঙ্ক, পরীক্ষার ফল এবং শিক্ষকের বিচারের ভিত্তিতে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়। সাধারণতঃ সামর্থ্যের দুইটি চরম পর্য্যায় (খুব ভাল ও

খুব মন্দ) এবং মাঝামাঝি—এই তিনটি শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের বিভক্ত করা হয় দুটি শ্রেণীবিভাগ হলে প্রত্যেক শ্রেণীতে মাঝামাঝি সামর্থ্যের কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থীও থাকবে। তবে সামর্থ্য অনুসারে এই শ্রেণীবিভাগ প্রত্যেক পাঠ্য-বিষয়ের জন্য পৃথকভাবে করতে হবে, কারণ বিভিন্ন বিষয়ের সামর্থ্য একরকম হয় না। শিক্ষার্থীদের এই শ্রেণীবিভাগ না জানানোই উচিত কারণ তার ফলে নিম্ন সামর্থ্য ও উচ্চ সামর্থ্য-বিশিষ্ট শিক্ষার্থীদের হীনমন্যতা ও উচ্চমন্যতা সৃষ্টি হতে পারে।

বালক-বালিকাদের মধ্যে একমাত্র আগ্রহ-অনুরাগ এবং দৈহিক আকৃতির পার্থক্য ছাড়া আর কোন ভেদ নেই। ঐচ্ছিক পাঠ্য বিষয়ের ব্যবস্থা থাকলে আগ্রহ-অনুরাগের ভিত্তিতেবালক-বালিকাদের মধ্যে পৃথক শ্রেণীবিভাগ প্রয়োজন হয় না। তবে অনেকে বলেন জীববিদ্যা শিক্ষার সময়, বিশেষ করে প্রজনন তত্ত্ব আলোচনাকালে, বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে শ্রেণীবিভক্ত করাই উচিত। শারীরচর্চ্চাকালেও বালক-বালিকাদের পৃথক রাখা বাঞ্ছনীয়। আবার অনেকে বলেন, নারী-পুরুষকে একসাথে জীবনযাপন করতে হবে এবং সেইজন্যই এক সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ শিক্ষার সুযোগ বালকবালিকাদের সহশিক্ষার মধ্যেই দেওয়া কর্ত্তব্য। স্কুল জীবনের প্রভাব সুদূরপ্রসারী এবং এই পরিবেশে বালক ও বালিকার পৃথক জীবনযাত্রার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করলে নারীপুরুষ সম্পর্কিত বহু অকারণ গোপনীয়তা, কুসংস্কার ও বিধিনিষেধ সৃষ্টি হয়ে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যহীন করে তুলতে পারে।

বয়স অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করার সার্থকতা অল্প, কারণ সপ্তম শ্রেণীর পর থেকে বিভিন্ন বয়সের বালকবালিকা এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে, দেখা যায়। বংশগত ও পরিবেশের প্রভাবে বিভিন্ন বালকবালিকা বিভিন্ন বয়সে এক এক-রকম সামর্থ্য অর্জ্জন করে বলে বয়সের মানদণ্ডে শিক্ষার শ্রেণীবিভাগ করা অবাস্তব হয়ে পড়ে।

তরুণ শিক্ষার্থীর বয়ঃসন্ধিকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্ভাবনাময়। অনেকে বলেন, বয়ঃসন্ধিকাল (puberty), তার আগে (pre-puberty) এবং বয়ঃসন্ধির পরে (post-puberty)—এই তিনটি শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের বিভক্ত করলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যেতে পারে। কারণ এই তিনটি স্তরে সকল বয়সের সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীর মধ্যে সমসত্ত্বভাব জাগ্রত থাকে, যদিও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বালিকাদের বয়ঃসন্ধিকাল কিছু আগেই দেখা দেয়। তবে বয়ঃ-সন্ধি অনুসারে শিক্ষার্থীদের শ্রেণীবিভাগ করা খুব সহজ নয়, কারণ বয়ঃসন্ধির আগমন এত ধীরে হয় যে, শিক্ষকের পক্ষে তা যথাযথভাবে অনুধাবন করা কঠিন হয়। এইজন্য অনেক শিক্ষাবিদ্ বলেন, শিক্ষার্থীরা যে সকল ঐচ্ছিক

পাঠ্যবিষয় নির্ব্বাচন করে, সেইগুলির ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করলেই সেটি অনেক স্বাভাবিক হয়।

বিকলাঙ্গ শিক্ষার্থীদের পৃথক শ্রেণীভুক্ত করা সম্পর্কে প্রবল মতানৈক্য আছে। অনেকে বলেন, সাধারণ শ্রেণীতে বিকলাঙ্গ শিক্ষার্থী থাকলে অন্যান্য স্বাভাবিক শিক্ষার্থীদের মনে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয়। কিন্তু আর একদল শিক্ষাবিদ্ বলেন, সকল শিক্ষার্থীকে সমাজ জীবনের সবকিছুর সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে চলার শিক্ষা দেওয়াই উচিত। অতএব সেই অনুসারে সহযোগিতা ও সহানুভূতির পরিবেশে বিকলাঙ্গ ও স্বাভাবিক শিক্ষার্থীদের একসঙ্গে শিক্ষাদানই বাঞ্ছনীয়। তবে যে সকল শিক্ষার্থীর শ্রবণ, দৃষ্টি বা বাক্‌যন্ত্রের বিশেষ ত্রুটি আছে, তাদের জন্য পৃথক শ্রেণী, এমন কি পৃথক স্কুল রাখা একান্ত দরকার। বিকৃতমনা শিক্ষার্থীদেরও পৃথক ব্যবস্থা থাকা উচিত।

মাধ্যমিক পর্য্যায়ের শিক্ষার্থীদের বিচিত্র আগ্রহ-অনুরাগের মর্য্যাদা রক্ষা করে তাদের উপযুক্ত শিক্ষা সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঐচ্ছিক বা নির্ব্বাচনমূলক পাঠ্য বিষয়ে আয়োজন করা হচ্ছে। বিভিন্ন পাঠ্য-বিষয়ের মধ্যে থেকে শিক্ষার্থী আপন আগ্রহ-অনুরাগ অনুসারে পাঠ্যবিষয় (electives) নির্ব্বাচন করে নিতে পারে। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য এই যে, মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক ক্ষেত্র বিস্তৃত করা, ব্যক্তিবৈষম্যের মর্য্যাদা দেওয়া, কর্ম্মজীবনের প্রস্তুতিতে সহায়তা করা এবং বিশেষ ধরণের শিক্ষাগ্রহণে স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ জাগানো। সাধারণতঃ ৯ম বা ১০ম শ্রেণীর পূর্ব্বে পাঠ্যবিষয় নির্ব্বাচনের অধিকার শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয় না এবং নির্ব্বাচিত পাঠ্য বিষয়গুলি সাধারণ আবশ্যিক পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখার দিকে যত্ন নিতে হয়।

উপসংহারে মাধ্যমিক শিক্ষায় ব্যক্তি বৈষম্যের মর্য্যাদা দানের মূলসূত্রগুলিকে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা যায় :—

১। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামর্থ্য, প্রয়োজন ও আগ্রহের পার্থক্য থাকে ; অতএব, মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা উচিত যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, প্রয়োজন ও আগ্রহ অনুসারে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করে আপন প্রতিভার যথাযথ উন্মোচন ঘটাতে পারে।

২। সাধারণ আবশ্যিক পাঠক্রমের বিস্তার স্বরূপ প্রত্যেকটি বিশেষ আগ্রহ সংক্রান্ত পাঠ্যবিষয়ের সমন্বয় সাধন করতে হবে।

৩। প্রত্যেক স্কুলে যথেষ্ট সংখ্যক ঐচ্ছিক পাঠ্যবিষয়ের ব্যবস্থা থাকবে।

৪। নির্ব্বাচিত পাঠ্যবিষয়গুলি (electives) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাধ্যমিক স্কুলের উচ্চশ্রেণীগুলিতে থাকবে।

৫। প্রত্যেকটি নির্ব্বাচিত পাঠ্যবিষয় স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে অধীত হবে।

৬। প্রত্যেক পাঠ্যবিষয় অধ্যয়নের সময়ে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিতার মর্য্যাদা স্মরণ রাখতে হবে।

৭। স্কুল পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ, সহপাঠ্য পাঠক্রম প্রভৃতির আয়োজন করে ব্যক্তি বৈষম্যের যত্ন নিতে হবে।

৮। পাঠক্রমের বিষয়বস্তু ও শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। শিক্ষাদান পদ্ধতি উপযুক্ত হলে ব্যক্তিবৈষম্য হ্রাস পেতে পারে।

Q. 6. Discuss the present requirements of our country in respect of secondary education.

Ans. ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার সাম্প্রতিক ব্যাপক পরিবর্ত্তনের ফলে যে সকল নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বর্ত্তমান প্রয়োজন অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উপযোগিতা সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করা আবশ্যক হয়েছে। কেবলমাত্র বর্ত্তমান যুগের উপযোগী মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা ছাড়াও ভবিষ্যৎ ভারতের সম্ভাব্য প্রগতি ও রূপ সম্পর্কে যথাসম্ভব সঠিক পরিকল্পনার জন্যও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন তা পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য।

রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারত ধর্ম্মনিরপেক্ষ এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে জগতে আপন পরিচিতি ঘোষণা করেছে। অতএব, ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে, যাতে নাগরিকগণ গণতন্ত্রের পরিপোষক আচরণ, মনোবৃত্তি ও চরিত্রগঠনে সক্ষম হয় এবং রাষ্ট্রের উদার জাতীয় ধর্ম্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর পক্ষে ক্ষতিকর সকল মনোভাবের বিরোধিতা করতে শেখে। তাছাড়া, যদিও ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ বিপুল, তবুও বর্ত্তমানে ভারত এক দরিদ্র রাষ্ট্র। জনগণের বিপুলাংশ এখনো শোচনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে কালযাপন করে থাকে। এইজন্য ভারতের আশু সমস্যাগুলির অন্যতম হলো দেশবাসীর উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি করা, জাতীয় সম্পদ সমৃদ্ধ করা এবং এইভাবে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। এই দারিদ্র্যের জন্যই দেশবাসী এতই বিব্রত যে, কোনও উপায়ে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করার পর সাংস্কৃতিক কর্ম্মোদ্যোগে একেবারেই উৎসাহ পায় না। এইজন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে, যাতে দেশের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন সম্ভব হতে পারে।

উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত সমস্যা বিশ্লেষণ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষাসংগঠনের বর্ত্তমান প্রয়োজনগুলি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব হবে। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাহায্যে তরুণ

নাগরিকদের চরিত্র গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে ; তারা যাতে দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সার্থক অংশ গ্রহণ করতে পারে, এজন্য তাদের বৃত্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে ; এবং তাদের সাহিত্য, শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক আগ্রহ-অনুরাগের পরিপোষণ করে জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনকল্পে তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করতে হবে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব খুব দায়িত্বপূর্ণ এবং এর জন্য প্রত্যেক নাগরিককে খুব যত্নের সঙ্গে সুশিক্ষিত করে তুলতে হয়। এর জন্য বিভিন্ন বুদ্ধিগত, সামাজিক ও নৈতিক বৈশিষ্ট্যের অনুশীলন করতে হয় এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলি তরুণরা আপন চেষ্টায় আয়ত্ত করতে পারে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিককে বহু জটিল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে চিন্তা করতে হয় এবং স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হয়। অধিকাংশ নাগরিকের শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্য্যায়তেই ; এবং এইজন্যই ভবিষ্যৎ নাগরিককে এই সকল গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ও শিক্ষিত করার কর্ত্তব্য মাধ্যমিক স্কুলগুলিরই থাকবে। প্রথমেই মাধ্যমিক স্কুলগুলির শিক্ষাব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে তরুণ শিক্ষার্থীরা সুস্পষ্ট চিন্তা করা এবং নতুন চিন্তাধারা উপলব্ধি ও গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্জ্জন করতে পারে। শিক্ষিত মনের এই একান্ত উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যটুকু মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমেই বর্ত্তমান যুগের তরুণ ভারতীয়দের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে। যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনগণ অস্পষ্ট চিন্তা করে, তারা প্রগতির অন্তরায় এবং আপন অস্তিত্বের পক্ষেও বিপজ্জনক, কারণ বর্ত্তমান যুগের চতুর প্রচারকুশল কূটনৈতিকদের ব্যাপক প্রচার ঝঞ্ঝায় তাদের বিপথগামী ও সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্থক গণতান্ত্রিক নাগরিক হতে হলে সংহত বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে মিথ্যা থেকে সত্যকে, প্রচার থেকে তথ্যকে আহরণ করার এবং কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষমতা অর্জ্জন করতে হবে। বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গীর সাহায্যে সকল বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিক চিন্তা ও বিচার করে সুপরীক্ষিত তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যাস করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এই সকল বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন, কারণ তাঁদের শিক্ষাদান পদ্ধতির উপরেই এই সকল বিষয়ের সার্থকতা নির্ভর করছে।

চিন্তার স্বচ্ছতা অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট ভাব প্রকাশ, কথায় এবং লেখায়, শিখতে হবে। যে সমাজে বলপ্রয়োগে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় না, মুক্ত চিন্তা, ভাবের আদানপ্রদান যেখানে সমাজ ব্যবস্থার অঙ্গীভূত, সেখানে স্পষ্ট ভাবপ্রকাশের অনুশীলন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় এইজন্য স্পষ্ট ভাবপ্রকাশের অনুশীলনের যথাযথ আয়োজন থাকা দরকার।

তরুণ নাগরিকের মধ্যে এই সকল বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত করতে হলে শিক্ষার্থীদের মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক এবং বাস্তব সমস্যামূলক সকল বিষয়ের প্রতি শিক্ষাব্যবস্থার যত্ন প্রসারিত হওয়া দরকার। সঙ্কীর্ণ পুঁথিগত ও অধীত বিদ্যাকেন্দ্রিক শিক্ষাচিন্তাকে প্রসারিত করে জীবনধারণের শিক্ষা প্রবর্ত্তন করতে হবে। কোনও নাগরিক একাকী জীবনধারণ করতে পারে না। প্রত্যেক নাগরিকের আপন সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি এবং সমাজের কল্যাণে অপরাপর নাগরিকের সঙ্গে মিলিতভাবেই জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে হয়। অপরের অভিজ্ঞতার অংশগ্রহণ সহযোগিতা, ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শ প্রভৃতির মাধ্যমে সুসমঞ্জসভাবে দক্ষতার সঙ্গে জীবনযাত্রা পরিচালনা করতে হয়। এই উদ্দেশ্যে সুনিয়ম, সহযোগিতা, সমাজসচেতনতা এবং সহনশীলতা এই কয়টি গুণ প্রত্যেক নাগরিককে আয়ত্ত করতে হয়। সমাজবদ্ধ কার্য্যাবলীর জন্য সুনিয়ম (ডিসিপ্লিন) একান্ত অপরিহার্য্য। অনিয়মী ব্যক্তি কখনই আপন ব্যক্তিত্বকে সুদৃঢ় করতে পারে না এবং সমাজের কল্যাণেও সত্যকার অবদান রাখতে পারে না। সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে প্রত্যেক গণতান্ত্রিক নাগরিককে সমাজের অন্যান্য সকলের কল্যাণে প্রস্তুত থাকার শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে এবং অন্যান্য সকলের ভাব, ভাষা, রুচি, আগ্রহ, বিশ্বাস প্রভৃতির প্রতি গভীর সহনশীলতার মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। বিশেষতঃ ভারতের মত বহু ভাষা বহু মত বহু ধর্ম্মের দেশে এই সহনশীলতার শিক্ষা একান্ত আবশ্যক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা পর্য্যায়ের শিক্ষার্থীদেরই সেই শিক্ষায় প্রথম উদ্বুদ্ধ করা দরকার। এর জন্য সমাজবিদ্যা, মানববিদ্যা প্রভৃতি পাঠ্যবিষয়ের যথাযথ অনুশীলন অপরিহার্য্য।

মাধ্যমিক স্কুলের আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় লক্ষ্য হওয়া উচিত তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা। অবশ্য এই জাতীয়তাবোধের মধ্যে তীব্র জাতীয় সঙ্কীর্ণতাবোধ যেন না থাকে। প্রকৃত জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার জন্য আন্তরিকভাবে দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কীর্ত্তিগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা দরকার, দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির দুর্বলতা সম্পর্কেও তাদের সম্পূর্ণ সচেতন করা দরকার এবং সেই সঙ্গে দুর্ব্বলতাগুলি দূর করার জন্য তরুণ শিক্ষার্থীকে আত্মনিয়োগের প্রেরণা দেওয়াও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বর্ত্তমানে জগতের সভ্যতার পরিপোষক আন্তর্জ্জাতিক মনোভাব সৃষ্টির জন্যও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার পাঠক্রম পুনর্গঠন করা প্রয়োজন।

মাধ্যমিক শিক্ষার উপযোগিতা আর একটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, সেটি হলো তরুণ শিক্ষার্থীদের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করে উৎপাদনমূলক বা কারিগরী বৃত্তি সম্পর্কিত দক্ষতা অর্জ্জনে সক্ষম করে

তোলা। সকল শিক্ষার্থী যাতে সকল প্রকার কায়িক পরিশ্রমে দ্বিধাবোধ না করে, প্রতিটি উৎপাদনমূলক কাজ যথাসাধ্য সুচারুভাবে সুসম্পন্ন করে, সুদক্ষ সহানুভূতিশীল শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সেই শিক্ষা দিতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার পরে তরুণ শিক্ষার্থীরা যাতে কোন কারিগরী, কৃষি, বাণিজ্য বা' অনুরূপ বৃত্তিমূলক ক্ষেত্রে সার্থকভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারে, তার প্রস্তুতিদানের দায়িত্ব মাধ্যমিক স্কুলকেই গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান প্রয়োজনে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার আর একটি কর্ত্তব্য হলো মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমে দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে নেতৃত্ববোধ জাগ্রত করা। আদর্শ সুনিয়ম ও কর্ত্তব্যবোধের সঙ্গে নেতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ যথেষ্ট সংখ্যক তরুণ নাগরিক না থাকলে কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে না। সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, শিল্পসম্পর্কিত, এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বগ্রহণের উপযোগী ব্যক্তিত্ব গঠনের সূচনা মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরেই হওয়া উচিত।

Q. 7. Discuss the scope of educational and vocational guidance in secondary schools.

Ans. শিক্ষার্থীর আগ্রহ-অনুরাগ, সামর্থ্য এবং শিক্ষা ও বৃত্তিগত প্রয়োজনের যথাযথ গতিপ্রকৃতি নিরূপণ করা মাধ্যমিক স্কুলের অতি প্রয়োজনীয় কার্য্যাবলীর অন্যতম। এছাড়া মাধ্যমিক স্কুলের কর্ত্তব্য শিক্ষার্থীর আগ্রহ-অনুরাগ, সামর্থ্য ও প্রয়োজনানুসারে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা। শিক্ষার্থীদের এমনভাবে শিক্ষিত করতে হবে যাতে তারা স্পষ্ট চিন্তার সাহায্যে নিজেদেরই যথাসম্ভব ঠিকপথে পরিচালিত করতে পারে। এযাবৎ এই কাজটি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদেরই করণীয় ছিল, কিন্তু ইদানীং শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক পথনির্দ্দেশের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য উন্নততর মাধ্যমিক স্কুল ব্যবস্থায় এ সম্পর্কে সমগ্র স্কুল পরিচালনার সহায়তা প্রসারিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন শিক্ষকের পথনির্দ্দেশ প্রচেষ্টাকে সম্মিলিত ও সংহত করে বিশেষজ্ঞ পরিচালিত এক নতুন কার্য্যক্রম প্রবর্ত্তিত হচ্ছে।

মাধ্যমিক শিক্ষাপর্য্যায়ে পথনির্দ্দেশের উদ্দেশ্য প্রথম ছিল তরুণ শিক্ষার্থীর শিক্ষা সমাপনের পর তার বৃত্তি নির্ব্বাচন সম্পর্কে পরামর্শদান করা। সাম্প্রতিককালে এই ধারণা পরিবর্ত্তিত হয়েছে। কোন শিক্ষার্থী একটিমাত্র বিশেষ বৃত্তির উপযোগী বলে বর্ত্তমানে আর বিশ্বাস করা হয় না। এবিষয়ে শিক্ষা ও বৃত্তি পথনির্দ্দেশের দুটি সংজ্ঞা স্মরণ করা যেতে পারে :

'বর্ত্তমান পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান এবং আপন আগ্রহ-অনুরাগ, সামর্থ্য ও সামাজিক প্রয়োজনানুসারে ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করাই মাধ্যমিক স্কুলের পথনির্দ্দেশ কর্ম্মসূচীর লক্ষ্য।'

'প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আপন সামর্থ্য ও আগ্রহ-অনুরাগ উপলব্ধিতে সহায়তা করা, সেগুলির যথাসম্ভব বিকাশে এবং জীবনের লক্ষ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট করে সমাজের সার্থক সদস্যরূপে পরিণত আত্মপরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করাই মাধ্যমিক স্কুলের পথনির্দ্দেশের লক্ষ্য।'

ব্যাপকভাবে বিচার করলে স্কুলের প্রতিটি কর্ম্মসূচীর মধ্যেই পথনির্দ্দেশ নিহিত থাকে এবং শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক পথনির্দ্দেশের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্যগত, ব্যক্তিগত এবং প্রাক্ষোভিক পথনির্দ্দেশও থাকে। তবে স্কুলের পথনির্দ্দেশ কর্ম্মসূচী বলতে বৃত্তিমূলক এবং তৎসংক্রান্ত শিক্ষামূলক পথনির্দ্দেশ কর্ম্মসূচীকেই বোঝায়।

স্কুলের পথনির্দ্দেশ কর্ম্মসূচীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলি এইভাবে উল্লেখ করা যায় :—

১। শিক্ষার্থীকে পথনির্দ্দেশের জন্য প্রত্যেক শিক্ষকের কি কর্ত্তব্য সে বিষয়ে সহযোগিতাপূর্ণ প্রচেষ্টা সম্ভব করা।

২। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পর্য্যবেক্ষণ করে তাদের ধারাবাহিক প্রগতির হিসাব রক্ষা করা।

৩। শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও আগ্রহ পরিমাপের উদ্দেশ্যে নিয়মিতভাবে সাফল্যজ্ঞাপক অভীক্ষা এবং অধীত বিদ্যাসমূহের পরীক্ষা গ্রহণ করা।

৪। প্রত্যেক শিক্ষক যাতে শিক্ষার্থীর যথাযথ পর্য্যবেক্ষণ, প্রগতি পরিমাপ, অভীক্ষা ব্যবহার এবং ব্যক্তিত্ব পুনর্গঠনে সক্ষম হন, সেজন্য শিক্ষক শিক্ষণের নিয়মিত আয়োজন করা।

৫। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রয়োজন এবং পাঠক্রমের প্রয়োজনের সমন্বয় সাধনের জন্য পাঠক্রমের সঙ্গতিবিধান করা।

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে পথনির্দ্দেশ কর্ম্মসূচীর মধ্যে শিক্ষার্থীর বৃত্তিমূলক (vocational) পথনির্দ্দেশও অন্তর্ভুক্ত। এই বিশেষ ধরণের পথনির্দ্দেশের জন্য নিম্নরূপ প্রস্তুতি প্রয়োজন :

১। বিভিন্ন বৃত্তি ও কর্ম্মসংস্থান সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ এবং শিক্ষার্থীদের তা জানানো।

২। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পর্য্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন বৃত্তির উপযোগী তাদের বিশেষ সামর্থ্য ও সম্ভাবনাগুলি অবগত হওয়া।

৩। শিক্ষার্থীর বিভিন্ন সামর্থ্য ও আগ্রহ সম্পর্কে তাদের সঙ্গে আলোচনা করা এবং বিভিন্ন বৃত্তি ক্ষেত্রে প্রায়োজনীয় সামর্থ্য ও আগ্রহ সম্পর্কে তাদের সচেতন করা।

৪। সাধারণভাবে কোনও বৃত্তিক্ষেত্র নির্ব্বাচনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা।

৫। কোনও বৃত্তির জন্য বিশেষ প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে বিশেষ পাঠক্রম ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্ব্বাচনে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা।

৬। বৃত্তিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ এবং সাফল্য নিরূপণে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা।

মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম যুগে পাঠক্রমে ঐচ্ছিক বিষয়ের বিশেষ আয়োজন ছিল না। মাধ্যমিক স্কুলের ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তার জন্য পাঠক্রমের প্রসার ঘটতে থাকে এবং নানা ধরণের শিক্ষার্থীর প্রয়োজনমত নানা পঠ্যবিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মাধ্যমিক স্কুলে বিভিন্ন প্রতিভার শিক্ষার্থীদের ঠিকমত পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষিত করতে পারলে সমগ্র দেশের সকল প্রকার কর্ম্মসূচীর উপযোগী বিভিন্ন সামর্থ্যের সক্ষম কর্ম্মী লাভ করা সহজ হতে পারে। শিক্ষার্থী সংখ্যা এবং পাঠ্যবিষয় এই দুটি দিকে প্রসার হওয়ায় মাধ্যমিক স্কুলে পথনির্দ্দেশের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

বহুবিধ পাঠ্যবিষয়ের বিষয়বস্তু এবং পরিমাণ সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা না থাকায় অনেক শিক্ষার্থী কোনও পাঠ্যবিষয় গ্রহণ করে পরে অক্ষমতার দরুণ তা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। শিক্ষার্থীর বিফলতা কোনও শিক্ষাবিদেরই কাম্য নয়; এই বিফলতা হ্রাস করার জন্য শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের উপযোগী পাঠক্রম গ্রহণে পথনির্দ্দেশ দেওয়া বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়। সামর্থ্যের বাইরে যে পাঠক্রম, তা আয়ত্ত করার প্রেরণা দানের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীকে কৃত্রিম উপহার, পুরস্কার ইত্যাদি দেওয়া বন্ধ করে তার আগ্রহ ও অনুরাগের অনুকূল পাঠক্রম নির্দ্ধারণ করলে শিক্ষার্থী স্বাভাবিক অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং স্বচ্ছন্দভাবে পাঠপ্রগতি দেখাতে পারে।

মাধ্যমিক শিক্ষার পক্ষে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণেচ্ছু শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যথাযথ তথ্য না জানালে তারা বিভ্রান্ত হয় এবং নতুন বৃহত্তর পরিবেশে নিজেকে সমন্বিত করতে অসুবিধা বোধ করে। কলেজে শিক্ষাগ্রহণ সম্পূর্ণ করার পূর্ব্বেই বহু শিক্ষার্থী পড়াশুনা বন্ধ করে, তার কারণ মাধ্যমিক স্কুলে কলেজ-শিক্ষা সম্পর্কে তার যথাযথ পথনির্দ্দেশ পায়নি। উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যথাযথ ধারণা শিক্ষার্থী যদি পূর্ব্বাহ্ণেই গ্রহণের সুযোগ পায়, তবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার অপচয় হ্রাস পায়।

পথনির্দ্দেশের অভাবে বহু তরুণতরুণী বিভিন্ন অনুপযুক্ত বৃত্তিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে আগ্রহ-অনুরাগের অভাবে, দুর্ব্বল শরীরের জন্য এবং নানা সামাজিক কারণে বিশেষ অস্বস্তি ও বিফলতা বোধ করে। বর্ত্তমান জগতে নানাপ্রকার বৃত্তিক্ষেত্রে কি ধরণের সামর্থ্য প্রয়োজন, কি ধরণের কাজের দক্ষতা প্রয়োজন, সে বিষয়ে তরুণ তরুণীদের সম্যক্ ধারণা না থাকায় উপযুক্ত কর্ম্মী নির্ব্বাচনও দুরূহ হয়ে পড়েছে।

এই সকল কারণে মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক পথনির্দ্দেশের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে।

Q. 8. Describe the methods and problems of acquiring information about pupils in a school guidance programme.

Ans. শিক্ষার্থীকে পথনির্দ্দেশ বা পরামর্শ দেওয়ার পূর্ব্বে শিক্ষককে অবশ্যই শিক্ষার্থীর সম্পর্কে সর্ব্বপ্রকার সম্ভব তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হয়। এই সকল তথ্যের সাহায্যে শিক্ষার্থীর অনুরাগ-আগ্রহ, সামর্থ্য, প্রবণতা প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক্ অবহিত হওয়া যায়। শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে কি করবে তা নির্দ্ধারণ করতে হলে অবশ্যই তার বর্ত্তমান ও অতীত কর্ম্মধারার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করা দরকার হয়।

সাধারণতঃ দুটি উপায়ে এইসকল তথ্য সংগ্রহ করা যায়: উপচারিক (formal) উপায়ে অভীক্ষা, প্রশ্নোত্তরিকা ব্যবহারের সাহায্যে, এবং অনুপচারিক (informal) উপায়ে পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে। উপচারিক পদ্ধতিতে বহুসংখ্যক শিক্ষার্থীর অল্পসময়ে তথ্যসংগ্রহ করা যায় এবং শিক্ষকের পক্ষে বহু শিক্ষার্থীর সঙ্গে পৃথকভাবে যোগাযোগ করার অসুবিধা দূর হয়। তাছাড়া অভীক্ষা, প্রশ্নোত্তরিকা প্রভৃতির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করলে সিদ্ধান্ত বিচার ও সংশোধনের সম্ভাবনা থাকে। সাধারণতঃ উপচারিক তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতিতে যে সকল অভীক্ষা ও প্রশ্নোত্তরিকা ব্যবহৃত হয়, সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য: ভাষানির্ভর (verbal) ও ভাষামুক্ত (non-verbal) বুদ্ধি অভীক্ষা; অধীত বিদ্যা (academic achievement) অভীক্ষা; ব্যক্তিত্বনিরূপক প্রশ্নোত্তরিকা; বৃত্তিগত আগ্রহ নিরূপক প্রশ্নোত্তরিকা; (interest inventory); কারিগরী কর্ম্মপ্রবণতা অভীক্ষা; বৈজ্ঞানিক কর্ম্মপ্রবণতা অভীক্ষা; শিল্পকলা সম্পর্কিত কর্ম্মপ্রবণতা অভীক্ষা ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে বুদ্ধিঅভীক্ষা এবং অধীতবিদ্যা অভীক্ষা সকল শিক্ষার্থীকেই দেওয়া হয়। অন্যান্যগুলি বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে প্রযোজ্য।

অনুপচারিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা হয়:

১। শিক্ষার্থীর যে সকল কাজের মধ্যে বিশেষ প্রবণতার আভাস পাওয়া যাবে, শিক্ষক সেইগুলি লিপিবদ্ধ করে সংশ্লিষ্ট পথনির্দ্দেশক শিক্ষকের কাছে জমা দেবেন।

২। পথনির্দ্দেশক শিক্ষক (guidance officer) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পৃথক সাক্ষাৎকারের সাহায্যে তাদের আগ্রহ-অনুরাগ, সমস্যা,

বিরক্তি, পারিবারিক পরিস্থিতি, বৃত্তিমূলক অভিজ্ঞতা প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন। এরকম একাধিক সাক্ষাৎকার প্রয়োজন হতে পারে।

৩। শিক্ষার্থীর পড়াশুনার আচরণ, সামাজিক সংযোগ, বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ ও সাধারণ আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করে তার বিশেষ প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

৪। শিক্ষার্থীর গৃহের সংস্কৃতি তার ভবিষ্যত গঠনে অনেকাংশে ক্রিয়াশীল হয়। পিতার শিক্ষা ও কর্ম্মজীবন, পরিবারের অন্যান্য সকলের শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলি তরুণ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত কর্ম্মধারা সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারে। গৃহপরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয়ে শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের সঙ্গে পরামর্শ করে শিক্ষার্থীর আগ্রহ-অনুরাগ ও বিশেষ সামর্থ্য সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যেতে পারে। গৃহপরিবেশ পর্য্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, শিক্ষার্থী স্কুল যোগদানে কিরূপ ইচ্ছুক, অথবা আর্থিক অবস্থার অনুপাতে কতদূর শিক্ষাগ্রহণরত থাকতে পারবে কিংবা অল্পবয়সে বৃত্তিগ্রহণে বাধ্য হবে কিনা।

৫। অনেক শিক্ষার্থী স্কুলের ছুটিতে বিভিন্ন বৃত্তি সম্পর্কে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পায়। পথনির্দ্দেশক এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর সঙ্গে আলোচনা করলে শিক্ষার্থীর মনোভাব জানতে পারেন এবং সেই তথ্য অনুসারে পথনির্দ্দেশের আয়োজন করতে পারেন।

৬। স্কুলের বিভিন্ন কার্য্যসূচীতে শিক্ষার্থীর যোগদান যদি বাধ্যতামূলক না হয় এবং একাধিক ঐচ্ছিক পাঠ্যবিষয় অধ্যয়নের আয়োজন থাকে, তাহলে শিক্ষার্থীর প্রকৃত প্রবণতা জানা সহজ হয়।

৭। স্কুলের বিভিন্ন কাজে এবং ভবিষ্যতের কর্ম্মজীবনে সফলতার অনেকখানি শিক্ষার্থীদের দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের জন্য ব্যাহত হতে পারে। এজন্য শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার নিয়মিত বিবরণীও পথনির্দ্দেশ কর্ম্মসূচীর পক্ষে বিশেষ সহায়ক। দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের জন্য অনেকের প্রকৃত আগ্রহ প্রকাশিত হয় না, এবং বৃত্তিক্ষেত্রেও দুর্ব্বল শরীরের জন্য আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সফল হতে পারে না।

৮। স্কুলের অধীত বিদ্যার ফলাফলগুলিও অবশ্যই মাধ্যমিক শিক্ষার পথনির্দ্দেশ কর্ম্মসূচীতে সহায়তা করতে পারে। কোন কোন বিষয় বিশেষ বিশেষ উচ্চতর শিক্ষা বা বৃত্তিক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় এবং শিক্ষার্থী যদি সেই সকল বিষয়ে ভাল ফল দেখাতে পারে, তাহলে স্বভাবতঃই সংশ্লিষ্ট উচ্চতর শিক্ষা বা বৃত্তিক্ষেত্রে সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই কারণে স্কুলের মার্ক্‌স্‌-ও পথনির্দ্দেশক শিক্ষক বিশ্লেষণ করে থাকেন।

এই সকল তথ্যগুলি সুনির্দ্দিষ্ট ধারাবাহিক বিবরণী ফর্ম্মে নিয়মিত লিপিবদ্ধ

করে রাখতে হয় এবং প্রয়োজনমত বিশ্লেষণ ও পর্য্যালোচনা করে পথনির্দ্দেশ দিতে হয়।

Q. 9. Discuss the problems relating to interpretation of school guidance data and counselling in secondary education.

Ans. মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের পথনির্দ্দেশের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহ করা, বিভিন্ন অভীক্ষা প্রয়োগ করা খুব দুঃসাধ্য নয়, কিন্তু ঐ সকল উপায়ে সংগৃহীত তথ্যগুলিতে সঙ্কলিত, বিশ্লেষিত ও ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। পথনির্দ্দেশ সংক্রান্ত তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, ও বিচারবোধ থাকা দরকার। যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে এই সকল তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা না করলে তরুণ শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবন বিপর্য্যস্ত হতে পারে।

সামর্থ্য, আগ্রহ প্রভৃতি নিরূপণের জন্য যে সকল অভীক্ষা ও প্রশ্নোত্তরিকা ব্যবহৃত হয়, সেগুলির ফলাফল বিচার করার পূর্ব্বে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে ঐ অভীক্ষা ও প্রশ্নোত্তরিকার স্বরূপ ও ব্যবহারবিধি সঠিকভাবে জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। যে বিষয়ে অভীক্ষা গৃহীত হয়েছে বা হবে, সেই বিষয়টি সম্পর্কে কিছু জ্ঞান আহরণ করা তাঁর দরকার। এই সকল প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকার জন্য বহু শিক্ষক অভীক্ষার ফলাফলের ভুল ব্যাখ্যা করেন এবং তার ফলে বহু অভিভাবক বৈজ্ঞানিক অভীক্ষা ব্যবহার রীতির উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন।

শিক্ষার্থীর প্রবণতা ও শিক্ষাগ্রহণ ক্ষমতা (aptitude) নিরূপণের জন্য যে অভীক্ষা প্রয়োগ করা হয়, সেগুলি যথার্থ (valid) হলে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ প্রচেষ্টার সার্থকতা সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, মাধ্যমিক স্কুলের তরুণ শিক্ষার্থীদের সকল সামর্থ্য ও ক্ষমতাই পরিপূর্ণতা লাভ করেনি, বরং সদাই পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। অতএব প্রবণতা অভীক্ষার নির্দ্দেশ মত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু অনুমান করা গেলেও সেই প্রবণতা আরও পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। কারণ শিক্ষার্থীর অতীত ও বর্ত্তমানের ধারাবাহিক সমষ্টিতেই তার প্রতিটি ক্ষমতা ও সামর্থ্য বিকাশ লাভ করতে থাকে। তবে প্রবণতার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সাধারণভাবে এর কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে না এবং কোনও ব্যক্তির বিশেষ তীব্র প্রবণতা সচরাচর অকস্মাৎ লুপ্ত হয়ে যায় না। তাছাড়া, একটি বিশেষ প্রবণতা নিয়ে কোনও মানুষ জন্মগ্রহণ করে না ; নানাবিধ প্রবণতার মধ্যে যেটি প্রকাশ ও তৃপ্তি লাভে সমর্থ হয়, মানুষ সেই ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠালাভ করে। অতএব পথনির্দ্দেশকের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, শিক্ষার্থীর কোনও একটি বিশেষ

প্রবণতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। তীব্র প্রবণতা সত্ত্বেও পরিবারের প্রভাবে অনেক সময় বিশেষ মনোমত ক্ষেত্রেও অনেকে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। এই কারণে শিক্ষার্থীর একাধিক প্রবণতার পরিপোষণ বাঞ্ছনীয়। একই শিক্ষার্থীর মধ্যে আবার বিভিন্ন প্রবণতার তারতম্য থাকে এবং অপর পক্ষে একই প্রবণতা সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সমানভাবে থাকতে পারে। এই জন্যই পথনির্দ্দেশের সময় প্রবণতা অভীক্ষার ফলাফলের সাধারণ পর্য্যালোচনা করা দরকার যাতে শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীর বিভিন্ন প্রবণতার বিশিষ্টতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রবণতা অভীক্ষা প্রয়োগের পূর্ব্বে ঐ অভীক্ষার যাথার্থ্য (validity) সম্পর্কেও নিঃসন্দিহান হওয়া দরকার। ঐ অভীক্ষা সত্যই শিক্ষার্থীর প্রবণতা ছাড়া অন্য কিছু পরিমাপ করছে না, এবিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া একই প্রবণতা অভীক্ষা সকল সময়ে একই ফল নির্দ্দেশ করবে, সেই নির্ভরযোগ্যতা (reliability)-ও থাকা আবশ্যক। আরও দেখতে হবে, অভীক্ষাটি প্রয়োগের অসুবিধা যতদূর সম্ভব অল্প হতে হবে ; জটিল অভীক্ষা হলে তা প্রয়োগের জন্য বিশেষ পরিবেশ ও বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন হতে পারে। অভীক্ষার সংখ্যামান (norm), বিশ্লেষণ ও ফলাফল নির্ণয়ের সরলতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, এবং স্বল্পমূল্য ও বিবেচনা করতে হবে।

বুদ্ধি অভীক্ষার ফলাফল থেকে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ বৃত্তিক্ষেত্র নির্দ্দেশ করা যায় না। এই অভীক্ষার ফলাফল থেকে শিক্ষার্থীর মানসিক সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু কোন্ বৃত্তিক্ষেত্রে বা শিক্ষাক্ষেত্রে কি ধরনের মানসিক ক্ষমতা ও সামর্থ্য প্রয়োজন, তা নির্দ্ধারণ করার জন্য পথনির্দ্দেশক শিক্ষকের বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। বুদ্ধি অভীক্ষা শিক্ষার্থীর সাধারণ সামর্থ্য সম্পর্কে আলোকপাত করে এবং বিশেষ বিশেষ সামর্থ্যগুলি সম্পর্কে কোন নির্দ্দেশ দিতে পারে না। উচ্চ বুদ্ধি সকল ক্ষেত্রেই সফলতা আনতে পারবে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না ; কারণ যে কাজে নির্দ্দিষ্ট রুটিন মত একই কাজ একইভাবে ক্রমাগত করতে হয়, সেখানে উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি তৃপ্তিলাভ করতে পারে না এবং বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

বুদ্ধি অভীক্ষার ফলাফল থেকে শিক্ষার্থীর অধীত বিদ্যার সাফল্য সম্পর্কে যথেষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়, তবে এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বুদ্ধি এবং অধীত বিদ্যার সাফল্যের সহপরিবর্ত্তনের মান (Coefficient of correlation) কমপক্ষে ·৮০ হওয়া উচিত কিন্তু দলগত ক্ষেত্রে এই মান মাত্র ·৪০ হলেই চলে।

প্রবণতা এবং বুদ্ধি থাকলেও কোনও বিষয়ে দক্ষতা অর্জ্জনের আগ্রহ অনেকের থাকে না। এই জন্য প্রবণতার সঙ্গে আগ্রহ অনুরাগের বিশ্লেষণও

প্রয়োজন এবং এই বিষয়টিকে প্রবণতারই একটি পর্য্যায়রূপে গণ্য করা দরকার। আগ্রহ-অনুরাগের অভাব থাকলে সচরাচর কোন বিষয়ে সাফল্য লাভে বিঘ্ন ঘটে, তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, আগ্রহ-অনুরাগের সঙ্গে সামর্থ্যের সম্পর্ক অল্পই। আগ্রহ-অনুরাগ থাকলে সামর্থ্যের পরিপোষক হতে পারে কিন্তু আগ্রহ থাকলে সামর্থ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করে না।

তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার পর পথনির্দ্দেশক শিক্ষার্থীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তার ভবিষ্যৎ কর্ম্মধারা নির্দ্ধারণে সহায়তা করেন। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যেমন তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তেমনি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর শিক্ষা ও বৃত্তিক্ষেত্রের পথনির্দ্দেশ দেওয়া হয়। এই ধরণের সাক্ষাৎকার যথাসম্ভব সহজ স্বচ্ছন্দ ও অনুপচারিক হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং শিক্ষার্থীকে মুক্তমনে সকল মনোভাব ব্যক্ত করার সুযোগ দেওয়া দরকার। এই সাক্ষাৎকারের সময় দক্ষ পথনির্দ্দেশক বিশেষ কোন পরামর্শ দেন না, কারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে কোন্ পরামর্শটি 'সম্পূর্ণ' প্রযোজ্য, তা কেহ বলতে পারেন না। কোনও শিক্ষা বা বৃত্তিক্ষেত্রে শিক্ষার্থী সফল হবে বা ব্যর্থ হবে, এমন ভবিষ্যদ্বাণী করা কখনও উচিত নয়। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত অধিকার শিক্ষার্থীর উপরই ন্যস্ত করা বিধেয়। যদি দেখা যায়, শিক্ষার্থীর সিদ্ধান্ত অনুকূল হয়নি, তখন পুনরায় তথ্যসংগ্রহ, অভিজ্ঞতা সংগ্রহ প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আপন সামর্থ্য ও যোগ্যতা উপলব্ধিতে সহায়তা করতে হবে।

পথনির্দ্দেশ বিষয়ে যথেষ্ট সাধারণ বিচারবোধ প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, কারণ অভীক্ষালব্ধ ফলাফল সর্ব্বদা নির্ভরযোগ্য হয় না। ভুলক্রমে অনেক সময়ে শিক্ষার্থীকে ভুল শ্রেণীবিভক্ত করা হয়; ফলাফল লিপিবদ্ধ করার ত্রুটিতে, অভীক্ষা প্রণয়নের ত্রুটিতে অথবা শিক্ষার্থীর ইচ্ছাকৃত ত্রুটিতে বহুক্ষেত্রে অভীক্ষালব্ধ ফলাফল সঠিক স্বরূপ উদ্ঘাটনে বিভ্রান্তি এনে দেয়। এরজন্যই স্মরণ রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য যে, অভীক্ষা, প্রশ্নোত্তরিকা, সাক্ষাৎকার প্রভৃতি মাধ্যমে সংগৃহীত সকল তথ্যের ভিত্তিতে কোনও অনড় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। এই তথ্যগুলিকে সিদ্ধান্তগ্রহণের সহায়করূপে বিবেচনা করাই ভাল।

Q. 10. Discuss the problems of articulation between secondary and primary education.

Ans. মাধ্যমিক শিক্ষার সার্থকতা ও সফলতা অনেকখানি নির্ভর করে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে এই পর্য্যায়টির যথাযথ সমন্বয় ও সন্ধিবন্ধনের উপর। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষাক্রমের মধ্যে এই অত্যাবশ্যক সন্ধিবন্ধন উপেক্ষিত হয়ে থাকে। শিক্ষকগণ মনে

করেন এই দুটি শিক্ষাপর্য্যায় সম্পূর্ণ পৃথক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। এক শ্রেণী বা পর্য্যায় থেকে শিক্ষার্থীকে উচ্চতর শ্রেণী বা পর্য্যায়ে উন্নীত করার সময়ে অধীত বিদ্যার পরীক্ষার উপরেই প্রচুর গুরুত্ব আরোপ করা হয় কিন্তু শিক্ষকের স্বাধীন বিবেচনা ও সহৃদয় সহানুভূতির কোন মর্য্যাদাই দেওয়া হয় না। পরীক্ষায় শিক্ষার্থী সফল হলেই তার উচ্চ উৎকর্ষমান স্বীকৃত হয়ে যায়। যে সকল শিক্ষার্থী গুরুভার পাঠ্যবিষয়ের প্রতি অল্প বয়সে আগ্রহ দেখাতে পারে না, তাদের উচ্চতর শিক্ষার অনুপযুক্ত বলে নিরুৎসাহিত করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্য্যায়ে শিক্ষার্থী যখন প্রবেশ করে, তখন পাঠক্রমের আকস্মিক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন ঘটানো হয়, যার ফলে শিক্ষার্থী বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। স্কুলের শিক্ষাদান পদ্ধতিও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্য্যায়ে বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত করা হয়, ফলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে যারা সবেমাত্র মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণ সুরু করেছে, তাদের পক্ষে পাঠ অনুধাবন করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এই সকল কারণেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে সুচিন্তিত সন্ধিবন্ধন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

ভারতে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে বুনিয়াদী শিক্ষানীতির প্রচলন হওয়ায় এই সন্ধিবন্ধন সমস্যার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্কুলে শিল্পচর্চ্চার মাধ্যমে শিক্ষাদানের আয়োজন করতে হয়। এই নীতি প্রাথমিক শিক্ষাপর্য্যায়ে যতই উপযুক্ত হোক, মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যায়ে এই নীতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে গিয়ে অধীত বিদ্যা ও ব্যবহারিক বিদ্যার মধ্যে অনুবন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এছাড়া, মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্য্যায়ের প্রারম্ভিক শ্রেণীগুলিতে যখন উচ্চতর পাঠ্যবিষয়ের বিভাজন ও প্রবাহ-রীতি প্রবর্ত্তন করা হয়, তখনও বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার কিছু অংশ মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রাবরণ ও অধিক্রমণ (overlap) করে থাকে। এজন্য বুনিয়াদী শিক্ষানীতির উদার সংশোধন প্রয়োজন যাতে মাধ্যমিক শিক্ষার আধুনিক প্রবাহরীতির সঙ্গে সংঘর্ষ দূর করা যায়। বুনিয়াদী শিক্ষার মূলসূত্র জীবন-ধারণের শিক্ষা। অতএব মাধ্যমিক শিক্ষার যে সকল পাঠ্যবিষয় বর্ত্তমান জীবনযাত্রাকে সহায়তা করে, প্রাথমিক স্তর থেকে বুনিয়াদী শিক্ষানীতিতে সেইগুলির মর্য্যাদা দেওয়া কর্ত্তব্য।

অনেকে মনে করেন, বালকবালিকাদের শিক্ষার প্রথম আট বছর বুনিয়াদী শিক্ষানীতি অনুসরণ করে পরবর্ত্তী ৩।৪ বছর মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা উচিত। আবার অনেকে বলেন, কেবলমাত্র প্রথম পাঁচ বছর একই ধরণের শিক্ষা দিয়ে তারপর শিক্ষার্থীদের মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা উচিত। যে সকল শিক্ষার্থী উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হতে ইচ্ছুক, তারা তিন বছর জুনিয়র মাধ্যমিক স্কুলে অধ্যয়ন করতে পারে। যারা প্রাথমিক

পর্য্যায়েই শিক্ষাগ্রহণ সমাপ্ত করবে, তারা তিন বছরের সিনিয়র বেসিক (উচ্চ-বুনিয়াদী) স্কুলে শিক্ষাগ্রহণ করতে থাকবে। অন্য একদল শিক্ষাবিদ্ মনে করেন, এছাড়াও শিক্ষার্থীদের আর একটি শ্রেণীবিভাগ করা দরকার ; এই শিক্ষার্থীরা ১৪ বছর বয়সে শিক্ষাগ্রহণ সমাপ্ত করে এবং উচ্চতর অধীত বিদ্যা ক্ষেত্রে আর অগ্রসর না হয়ে ২।৩ বছরের বৃত্তিমূলক শিক্ষাগ্রহণে আত্মনিয়োগ করবে।

এই সকল বিভিন্ন পাঠ্যব্যবস্থার মধ্যে কোনওরকম কঠোর সীমারেখা সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয় নয়। ১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থী একই রকম পাঠক্রম অনুসরণ করবে এমন নির্দেশ দেওয়া অনুচিত। অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বলেন, ১১ বছর বয়সেই শিক্ষার্থীর বিশেষ আগ্রহ ও প্রবণতা পরিস্ফুট হয় এবং সেই অনুযায়ী পাঠক্রমের বিভিন্ন প্রবাহনীতি ঐ বয়সেই প্রচলিত করা উচিত। প্রাথমিক শিক্ষার শেষ পর্য্যায়ের ঐ কয়টি বছরে শিক্ষার্থীকে অধীত বিদ্যা, কারিগরী বিদ্যা অথবা বৃত্তিমূলক বিদ্যার সঙ্গে আগ্রহ ও প্রবণতা অনুসারে বিশেষভাবে পরিচিত করিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য। অবশ্য ১১ বছর বয়সে শিক্ষার্থী যে পাঠপ্রবাহ গ্রহণ করবে, সেইটাই চূড়ান্ত নয় ; ১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত তার গতিষ্ণু প্রবণতা অনুসারে এক প্রবাহ থেকে অন্য প্রবাহ গ্রহণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। এমনকি, অনেকের মতে, ১৪ বছর বয়সের পরেও যদি কোন শিক্ষার্থীর নতুন কোন আগ্রহ বা প্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠে, তবে সেই অনুযায়ী তার বিশেষ শিক্ষা প্রবাহ গ্রহণের স্বাধীনতা দিতে হবে এবং এইভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে কৃত্রিম সীমারেখা লুপ্ত করে সহজ ফলপ্রসূ সন্ধিবন্ধন রক্ষা করতে হবে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সার্থক সন্ধিবন্ধন কেবলমাত্র প্রশাসনিক সংস্কার বা সাংগঠনিক পরিবর্ত্তনের দ্বারাই সম্ভব হতে পারে না। জুনিয়র হাই স্কুলগুলি এই সন্ধিবন্ধনে সহায়তা করে, একথা সত্য ; কিন্তু কেবলমাত্র জুনিয়র হাইস্কুলের এই বৈশিষ্ট্যের ফলেই সন্ধিবন্ধন সহজ হতে পারে না। স্কুলের পরিচালন ব্যবস্থাও এমনভাবে অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ বিকাশের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে, যাতে প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তরে যাওয়ার সময়ে শিক্ষার্থী কোনওরকম অসুবিধা বোধ না করে। জুনিয়র হাইস্কুল না থাকলেও এই সন্ধিবন্ধন সম্ভব হতে পারে উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা ও পরিচালনার গুণে। তবে জুনিয়র হাইস্কুলগুলি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে সংযোগরক্ষা করে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সহজ করতে পারে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সন্ধিবন্ধনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিও স্মরণ রাখা দরকার :—

১। প্রত্যেক শ্রেণীর পাঠ্যবিষয় ও শিক্ষাদানপদ্ধতির মধ্যে যথাসম্ভব সংযোগ রক্ষা করতে হবে।

২। একজন বা অল্পসংখ্যক শিক্ষকের শিক্ষাদান ব্যবস্থা থেকে বহু শিক্ষকের শিক্ষাদান ব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষার্থীকে ক্রমশঃ পরিচয় করাতে হবে।

৩। শিক্ষকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষাদান ব্যবস্থা থেকে ক্রমশঃ শিক্ষার্থীর আপন প্রচেষ্টায় শিক্ষাগ্রহণ ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত করাতে হবে।

৪। বীজগণিত প্রভৃতি নতুন পাঠ্যবিষয়গুলি ক্রমশঃ পরিচিত করাতে হবে।

৫। ঐচ্ছিক বিষয়গুলিও ক্রমশঃ শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপন করতে হবে।

৬। শিক্ষার্থীদের শ্রেণীভিত্তিক প্রোমোশন না দিয়ে বিষয়ভিত্তিক প্রোমোশনের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

৭। পরীক্ষা গ্রহণের বাইরে এমন কয়েকটি পাঠ্যবিষয় প্রবর্তিত করা উচিত যা শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবনের পথনির্দেশরূপে সহায়তা করবে।

৮। একটি শ্রেণী থেকে উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়া অযথা দুঃসাধ্য করা হবে না।

৯। স্কুলে শিক্ষার্থী যত বেশিদিন থাকতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য দিতে হবে।

১০। শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা ও প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষাদান প্রণালী নির্দ্ধারিত হবে।

Q. 11. Discuss the problems of articulation between Secondary and Higher education.

Ans. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্য, আদর্শ এবং প্রক্রিয়া মূলতঃ ভিন্ন নয়। প্রত্যেকটিরই একই সাধারণ আদর্শ কিন্তু পার্থক্য বিভিন্ন স্তরের গুরুত্বের মধ্যে। প্রাথমিক স্কুলের উদ্দেশ্য সকল বালকবালিকাকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করা এবং দেশের প্রত্যেক নাগরিককে সাক্ষরতা দান করা; এই শিক্ষা শিক্ষার্থীকে অধিকতর শিক্ষাগ্রহণের মূলনীতিগুলির সঙ্গে পরিচিত করায়। মাধ্যমিক স্কুল এই উদ্দেশ্যগুলিরই প্রসার লাভে সহায়তা করে এবং বৃত্তিগত শিক্ষার মূলসূত্রগুলি শিক্ষার্থীর আয়ত্তে এনে দিতে চায়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উচ্চতর শিক্ষার মাধ্যমে প্রশাসনিক দায়িত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের কর্ম্মী সৃষ্টির চেষ্টায় অধিকতর কারিগরী ও অধীতবিদ্যার আয়োজন করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য ও প্রক্রিয়াগুলি এইভাবে তালিকাবদ্ধ করা যেতে পারে :—

১। বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রসারতার উদ্দেশ্যে চর্চ্চা, গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান করা এবং শিক্ষালাভে স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা

২। ব্যক্তিগত সংস্কৃতির উন্নতি সাধন

৩। শিক্ষার্থীদের সুকুমারবৃত্তি, ব্যক্তিগত আদর্শ ও আচরণের উন্নতি সাধন

বয়স্ক জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার

নেতা সৃষ্টি ও তাদের শিক্ষা দান।

৬ সমাজ সচেতনতার শিক্ষা দান।

৭। ব্যক্তিগত সামর্থ্য অনুযায়ী উচ্চতর বৃত্তিগত শিক্ষাদান।

৮। গণতন্ত্রের উপযোগী মনোবৃত্তি গঠন।

৯। আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার উপযোগী সদ্ভাব সৃষ্টি।

উচ্চশিক্ষার এই সকল বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে শিক্ষাদানের আয়োজন করতে গিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে এর সামঞ্জস্য বিধান করা সমস্যা হয়েছে। এই কারণে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার সন্ধিবন্ধন সমস্যার মূলে আছে এই দুই শিক্ষাস্তরের পাঠক্রম।

মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন আগ্রহ ও প্রবণতার তরুণদের শিক্ষাদানের প্রয়োজন হয়েছে এবং ইদানীং কলেজ শিক্ষা গ্রহণের জন্যও অধিক সংখ্যক মাধ্যমিক উত্তীর্ণ তরুণ শিক্ষার্থীকে ইচ্ছুক দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কলেজ শিক্ষাক্ষেত্রে কেবলমাত্র বিশেষভাবে উপযুক্ত শিক্ষার্থীরাই প্রবেশাধিকার পায়, সেই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম এমনভাবে উচ্চতর শিক্ষার সঙ্গে সমন্বিত করা দরকার যাতে শিক্ষার্থীরা সামর্থ্য অনুযায়ী উচ্চতর শিক্ষাপ্রবাহ অনুসরণ করতে পারে।

যে সকল কারণে মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের মধ্যে সন্ধিবন্ধনের সমস্যা বৃদ্ধি পায়, সেগুলি এইভাবে তালিকাবদ্ধ করা যেতে পারে :—

কলেজ ও মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে সহযোগিতার অভাব।

কলেজে নতুন শিক্ষার্থী গ্রহণ সম্পর্কে সঙ্কীর্ণ মনোভাব।

৩ কলেজে যোগদানেচ্ছু শিক্ষার্থীদের পথনির্দ্দেশের অভাব।

কলেজ ও স্কুল পাঠক্রমের প্রাবরণ ও অধিক্রমণ (Overlapping)।

মাধ্যমিক স্কুল ব্যবস্থার মধ্যেই একাধিক কার্য্যমান।

কলেজশিক্ষা গ্রহণেচ্ছু শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক স্কুলে যোগদানের পূর্ব্বে উপযুক্ত স্কুল নির্ব্বাচনে সহায়তা পেলে ভাল হয়। শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও আগ্রহের বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত পাঠপ্রবাহ সম্বলিত মাধ্যমিক স্কুলে পাঠগ্রহণ সুরু করলে পরবর্ত্তী স্তরে কলেজ শিক্ষা গ্রহণকালে কোনও সমস্যার উদ্ভব হতে পারে না। মাধ্যমিক স্কুল থেকে কলেজে প্রবেশ করার পর দেখা যায় শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের মানসিক ক্ষমতার অভাব, উচ্চতর শিক্ষাচর্চ্চার কৌশলের সঙ্গে পরিচিতির অভাব, ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ, সহপাঠ্য কার্য্যক্রমের অভাব অথবা অত্যধিক সহপাঠ্য কার্য্যক্রমের

চাঞ্চল্য ইত্যাদি কারণে কলেজ শিক্ষার প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে, অথবা মাধ্যমিক শিক্ষার বিফলতা সম্পর্কে ভুল ধারণার উদ্ভব হচ্ছে। মূলতঃ মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের মধ্যে সার্থক সন্ধিবন্ধের অভাবেই এগুলি ঘটে।

Q. 12. Discuss the relation between secondary and vocational education.

Ans. ভারতের বর্ত্তমান জাতীয় পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তরুণ শিক্ষার্থীদের উৎপাদনশীল কারিগরী ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কেবলমাত্র শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বৃত্তির উপযোগী করে গড়ে তোলাই এই বিশেষ মনোযোগদানের উদ্দেশ্য নয়; দেশের তরুণ সম্প্রদায় যাতে শ্রমের মর্য্যাদা উপলব্ধি করতে শেখে সেই উদ্দেশ্যেও মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষার নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করা প্রয়োজন। যেহেতু তরুণ শিক্ষার্থীর মাধ্যমিক শিক্ষাকালীন বয়ঃসন্ধি সময়ে তার ভবিষ্যৎ বৃত্তিজীবনের বনিয়াদ রচিত হয়, সেইজন্য মাধ্যমিক স্কুলেই শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন শিল্প ও কারিগরী কাজ সুষ্ঠুভাবে সযত্নে সম্পন্ন করার প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার যথাযথ ব্যবস্থা করা দরকার।

শ্রমমূলক কার্য্যের প্রতি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের মর্য্যাদাবোধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে কারিগরী দক্ষতা ও সামর্থ্য জাগ্রত করার দিকেও মাধ্যমিক স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষকে মনোযোগ দিতে হবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার সময়ে মাধ্যমিক স্কুলের এই প্রস্তুতি সহায়ক হবে। দেশের সামগ্রিক শিল্পোন্নতি ও কর্ম্মসংস্থান সমস্যার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্কুল ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে এই সহযোগিতা বিশেষ মূল্যবান হিসাবে পরিগণিত হবে।

প্রকৃত প্রবাহভিত্তিক বৃত্তিশিক্ষা কৃষি, কারিগরী, বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যবহারিক বিদ্যার মাধ্যমে মাধ্যমিক স্কুলের পরেই সুরু হয়, একথা সত্য। কিন্তু সেইজন্যই একথা যুক্তিসঙ্গত নয় যে, মাধ্যমিক স্কুলের কার্য্যসূচীর মূল্যবান সময়ের কিছুটা বৃত্তিশিক্ষার বনিয়াদ গঠনে ব্যয় করা হবে না। মাধ্যমিক স্কুলে শিল্পশিক্ষা, বৃত্তিতথ্য সংক্রান্ত পথনির্দ্দেশ প্রভৃতির আয়োজন না থাকলে তরুণ শিক্ষার্থী দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৃত্তি চাহিদার কথা জানতে পারবে না, ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বয়স্ক অভিভাবকদের নির্দ্দেশমত নির্ব্বিচারে যে কোন বৃত্তি গ্রহণ করে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে।

তাছাড়া, দেশের বর্ত্তমান ব্যাপক দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক নিষ্পেষণের সময় বহু শিক্ষার্থীর পক্ষেই মাধ্যমিক স্কুলের পর আর শিক্ষাগ্রহণ সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে উপযুক্ত বৃত্তিশিক্ষা ছাড়াই বৃত্তিগ্রহণ করতে তারা বাধ্য হয়। সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ কয়েক বছরে প্রবাহরীতি অনুসারে শিক্ষার্থীদের

আগ্রহ ও সামর্থ্য অনুযায়ী প্রয়োজনমত বৃত্তিশিক্ষাদানের দায়িত্ব মাধ্যমিক স্কুলগুলিকেই গ্রহণ করতে হবে।

অবশ্য কোন কোন বৃত্তিমূলক স্কুল বা পলিটেকনিকে মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্য্যায়ের ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত বালকবালিকাদের বৃত্তিশিক্ষা দেওয়া হয়; কিন্তু শিক্ষাবিদ্ মহলের অনেকে বলেন, যে সকল স্কুলে কেবলমাত্র বৃত্তিশিক্ষা দেওয়া হয়, সেখানে সাধারণ অধীতবিদ্যার চর্চ্চা খুবই অবহেলিত হয়। মাধ্যমিক স্কুলের পরিধির মধ্যে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সুসমঞ্জসভাবে বৃত্তিশিক্ষার আয়োজন করলে তরুণ শিক্ষার্থীর সংহত ব্যক্তিত্ব বিকাশ সহজ হয়।

তবে এই বিষয়ে সমস্যা এই যে, বৃত্তিগত বিদ্যার শিক্ষকগণের প্রকৃতি সাধারণ অধীত বিদ্যার শিক্ষকদের প্রকৃতি থেকে বিশেষ পৃথক বলে অনেক ক্ষেত্রেই কার্য্যসূচীর সমন্বয় সাধনে শিক্ষকদের মধ্যেই সহযোগিতার অভাব দেখা যায়। বৃত্তিশিক্ষার স্কুলে যেমন অধীত বিদ্যার অবহেলা হয় বলে অভিযোগ করা হয়, তেমনি অধীত বিদ্যার সাধারণ স্কুলে বৃত্তি শিক্ষার আয়োজন সুষ্ঠু হয় না—এই অভিযোগ শোনা যায়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নোক্ত নীতি অনুসরণ বাঞ্ছনীয়:—

১। বৃত্তি বিদ্যার শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন হবেন।

২। অধীত বিদ্যার শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও গভীর জ্ঞানসম্পন্ন হবেন।

৩। উভয় ধরনের শিক্ষক পরস্পরের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে এবং ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবেন এবং পরস্পরের কর্ম্মধারার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করবেন।

৪। শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও সামর্থ্য নিরূপণের জন্য শক্তিশালী পথনির্দ্দেশ কার্য্যসূচীর আয়োজন রাখতে হবে।

৫। স্কুলের প্রধান এবং অন্যান্য কর্ম্মী ও প্রশাসকগণ কর্ম্মী ও শিক্ষকসুলভ সহযোগিতা এবং সম্মিলিত দায়িত্বের মনোভাব রক্ষা করবেন।

Q. 13. Relate the historical background of secondary education in India.

Ans. বর্ত্তমানে ভারতে যে ধরনের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রচলিত তার প্রথম সূচনা হয় বৃটিশ শাসনকালে। বৃটিশ শাসকগণ রাষ্ট্ররক্ষার উদ্দেশ্যে এবং খৃষ্টান মিশনারীগণ ধর্ম্মান্তরকরণের উদ্দেশ্যে এদেশে মাধ্যমিক স্কুলের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও এবিষয়ে সহযোগিতা করতেন। ১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসায় ও রাষ্ট্ররক্ষার স্বার্থে ধর্ম্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করার ফলে মিশনারীদের প্রচেষ্টা অনেকাংশে ব্যাহত হয়। পরে অবশ্য ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে গৃহীত বিশেষ শিক্ষা সনদে ১৮১৩ সালে মিশনারীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হয় এবং ভারতে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা

মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু ইংরেজ সরকার শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে কোন সঠিক নীতি নির্দ্ধারণ না করায় মঞ্জুরীকৃত ঐ অর্থ সদ্ব্যবহার করা হয়নি এবং প্রায় ১০ বছর নিশ্চেষ্টতার পর ১৮২৩ সালে জেনারেল কমিটি ফর্ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শ্যান্ গঠন করে এই অর্থ কাজে লাগানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু প্রাচ্যধরনের শিক্ষার সমর্থনকারী এবং পাশ্চাত্য ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার সমর্থনকারীদের মধ্যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়, ঐ অর্থ কি ধরনের শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হবে। এই বিতর্কের দ্বন্দ্বে কমিটি কোন নীতি গ্রহণ করতে পারেনি। ১৮৩৫ সালে লর্ড বেন্টিঙ্কের নির্দ্দেশে মেকলে এই বিতর্কের মীমাংসার জন্য একটি 'মিনিট' প্রকাশ করেন। মেকলের এই মিনিটটি ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ দলিলরূপে স্বীকৃত হয়েছে। এই মিনিটের পরামর্শ অনুসারেই মাধ্যমিক স্কুলে ইংরেজীভাষাকে সকল শিক্ষার মাধ্যমরূপে গণ্য করা হয়। এর ফলস্বরূপ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্য্যায়ে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার দ্রুততর হলো, সরকারী স্কুল স্থাপনা বৃদ্ধি পেল এবং ইংরেজী শিক্ষা জনপ্রিয় হলো। যারা ইংরেজী শিক্ষাগ্রহণ করত, তাদের পক্ষে সরকারী চাকুরী সংগ্রহ করা সহজ হলো। রামমোহন রায় প্রমুখ ভারতীয় নেতারাও এই নতুন আগ্রহের সমর্থন করতে থাকেন। সরকারীভাবে ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করেন যে, ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরাই সরকারী চাকুরীক্ষেত্রে অগ্রাধিকার লাভ করবেন। কিন্তু ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষারদিকে তখনও কোন যত্ন দেখা যায়নি।

১৮৫৪ সালে উডের ডিস্‌প্যাচ বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে, একথা বলা চলে; কারণ ঐ ডিসপ্যাচের নির্দ্দেশ অনুসারেই সুনির্দ্দিষ্ট শিক্ষানীতি অবলম্বনে নানারূপ শিক্ষাসংস্কার সুরু হয়। এই ডিস্‌প্যাচের পরামর্শ মত প্রাদেশিক শিক্ষা বোর্ড এবং কাউন্সিলগুলি লুপ্ত করে সেখানে জনশিক্ষা বিভাগ (ডিপার্টমেণ্ট অব পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশ্যন) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যেক প্রদেশে একজন ডি. পি. আই. (ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশ্যন) নিযুক্ত করা হয়। স্কুল পরিদর্শনের ব্যবস্থা, এবং গ্রাণ্ট-ইন্-এড্ ব্যবস্থার সুষ্ঠু আয়োজনও এই ডিসপ্যাচের নির্দ্দেশমত হয়েছিল। ফলে, মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার খুব সহজ হয়। ১৮৫৫ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় ইংরেজী স্কুলের সংখ্যা ছিল ৪৭; ১৮৭১ সালে হয় ১৩৩ এবং ১৮৮২ সালে হয় ২০৯টি। গ্রাণ্ট ব্যবস্থার ফলে বেসরকারী উদ্যোগে অনেক মাধ্যমিক স্কুল স্থাপিত হয়েছিল।

এই ডিস্‌প্যাচের পরামর্শমত ১৮৫৭ সালে যখন ভারতে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো, তখন মাধ্যমিক স্কুলগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ত্তাধীন হয়ে পড়ল এবং স্বাধীনভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার কার্য্যসূচী নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশলাভের প্রস্তুতির জন্যই মাধ্যমিক শিক্ষা প্রয়োজন, এমন ধারণায় সৃষ্টি হলো।

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকারী হস্তক্ষেপ বন্ধ করার জন্য উডের ডিস্‌প্যাচে যে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সেটি অবশ্য গ্রাহ্য করা হয়নি। মিশনারীদের প্রতি রাষ্ট্রের অসহযোগিতার মনোভাবটি অক্ষুণ্ন ছিল। এর ফলে ইংলণ্ডে অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এবং মিশনারীদের তীব্র আন্দোলনের ফলে এবিষয়ে তদন্তের জন্য ১৮৮২ সালে হাণ্টার কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশনও উডের ডিস্‌প্যাচের মত রাষ্ট্রীয় শিক্ষাপ্রচেষ্টা প্রত্যাহারের নীতি এবং গ্রাণ্টপ্রথার মাধ্যমে বেসরকারী প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়ার নীতি সমর্থন করেন। তবে মিশনারীদের হাতে শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ না করে কোনও যোগ্যতর বেসরকারী পরিচালন ব্যবস্থার উপর দায়িত্ব দেওয়ার পরামর্শ দেন। এছাড়া উচ্চতর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষালাভের যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য 'এ'-কোর্স ও কারিগরী ও বাণিজ্য বিদ্যা অর্জ্জনের জন্য 'বি'-কোর্স নামে দুধরনের পাঠ্যসূচী প্রবর্ত্তনের পরামর্শ দেন এই কমিশন। এইভাবে হাণ্টার কমিশনের সুপারিশ থেকেই এদেশে বহুমুখী মাধ্যমিক পাঠক্রম ব্যবস্থার চিন্তাধারা প্রবর্ত্তিত হয়। অবশ্য তখন ইংরেজী শিক্ষার জনপ্রিয়তা এত বেশি যে, হাণ্টার কমিশনের সুপারিশগুলি অনেকেই গ্রাহ্য করেনি, কারণ কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তখনও কেউ উপলব্ধি করতে পারেনি।

সরকারী অর্থসাহায্য (গ্রাণ্ট) ব্যবস্থায় বেসরকারী প্রচেষ্টার ফলে ১৮৮২ সালে ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার সম্ভব হয়। তবে এই শিক্ষা-প্রসার সুসংবদ্ধ হতে পারেনি। এই বিষয়ে ১৯০২ সালে শিক্ষাসংক্রান্ত এক প্রস্তাবে লর্ড কার্জ্জন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় নিকৃষ্ট মানের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি শিক্ষার সংখ্যাগত সম্প্রসারণের চেয়ে গুণগত মানোন্নয়নের উপর বেশি গুরুত্ব দেন এবং সেই কারণে সকল স্কুলকে সরকারী অনুমোদন অর্জ্জনের নির্দ্দেশ দিলেন। ১৯০২ সালের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশের ফলে মাধ্যমিক স্কুলগুলির উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পেল। ১৯০৪ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় প্রত্যেক স্কুলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতেও বাধ্য করা হল। এই নতুন ব্যবস্থার ফলে জনসাধারণ সন্তুষ্ট হল না এবং সাধারণের ধারণা হল, ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয় চেতনাকে বিনষ্ট করার জন্যই বৃটিশ সরকার এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, কার্জ্জনের এই নীতির ফলে বেসরকারী শিক্ষা উদ্যোগ হ্রাস পেয়েছে এবং মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধিও পূর্ব্বের মত হচ্ছে না। মাধ্যমিক শিক্ষার স্বাধীন কর্ম্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে কোন কোন প্রদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ সংগঠিত হয়। তবে একথা সত্য যে, লর্ড কার্জ্জনের শিক্ষানীতির ফলে স্কুলভবন নির্ম্মাণ, ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষার উপকরণ সংগ্রহের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল, পরিদর্শন ব্যবস্থার উন্নতি

হয়েছিল এবং মাধ্যমিক স্কুলে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে মর্য্যাদা দান করা হয়েছিল।

১৯১৭ সালে স্যাডলার কমিশন নিয়োগ ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রগতির আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। স্যাডলার কমিশন অভিমত প্রকাশ করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার উন্নতির জন্যই মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতি অধিকতর যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। কমিশন বলেন, (১) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও স্কুল শিক্ষার মধ্যবর্ত্তী পার্থক্য নির্ণয় করবে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা, ম্যাট্রিকুলেশন নয়; (২) এই উদ্দেশ্যে পৃথক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন, এবং (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা ও ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার সমন্বয় সাধনের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ সংগঠন করা দরকার। বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্ত্তন এবং ভারতীয় ভাষাগুলিকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশও এই কমিশন করেন। স্যাডলার কমিশনের সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটে, কিন্তু শিক্ষকদের ট্রেনিং, তাঁদের বেতন হার, কারিগরী শিক্ষা প্রভৃতি সমস্যার সমাধান কিছুই হয়নি।

১৯১৯ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর শিক্ষার দায়িত্বভার অর্পণ করেন। কিন্তু অর্থব্যবস্থার ত্রুটির জন্য এই নতুন আয়োজনের ফলেও কোন উন্নতি হয়নি। তবে বেসরকারী উদ্যোগে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং প্রায় সব স্কুলেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষা মর্য্যাদা লাভ করে।

১৯২৯ সালে হার্টগ কমিটি অভিমত প্রকাশ করেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা বিশেষভাবে প্রভাবিত করে রেখেছে এবং ক্লাশ প্রোমোশনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত উদারতা ও শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুসারে বৃত্তি শিক্ষার আয়োজন না থাকায় বহু শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হচ্ছে। এই জন্যই কমিটি বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্ত্তনের জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। শিক্ষকদের ট্রেনিং বিষয়েও হার্টগ কমিটি গুরুত্ব প্রকাশ করেন। তবে এই সময়ে মাধ্যমিক স্কুলের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার মান নিকৃষ্ট হতে থাকে এবং শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

১৯৩৪ সালে সাপ্রু কমিটি দেশব্যাপী বেকার সমস্যার কারণ নির্ণয়ের জন্য নিযুক্ত হয়। এই কমিটির মতে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির জন্যই বেকার সমস্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে এবং পরীক্ষাদান ও ডিগ্রীলাভের উদ্দেশ্যেই তরুণরা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করে। জীবনের উপযোগী সত্যিকারেব বৃত্তির জন্য কোনও প্রস্তুতিলাভের সুযোগ তাদের থাকে না। সুতরাং সাপ্রু কমিটি সুপারিশ করেন; (১) মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমুখী করতে হবে; (২) ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষা পর্য্যায়ের বিলোপসাধন করতে হবে; (৩) মাধ্যমিক

ও ডিগ্রী কোর্সের শিক্ষাকাল এক বছর করে বৃদ্ধি করতে হবে; এবং (৪) মাধ্যমিক শিক্ষাকাল মোট ছয় বছরের হবে। এই ছয় বছরকে ভাগ করে ৩ বছর মাধ্যমিক ও ৩ বছর উচ্চতর মাধ্যমিক (হায়ার সেকেণ্ডারী) শিক্ষাপর্য্যায় নির্দ্ধারিত হবে। প্রথম ৩ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের পর শিক্ষার্থীকে বৃত্তিশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

১৯৩৫ সালে ভারতে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় এবং স্বদেশী আন্দোলন সুরু হওয়ার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসার ব্যাহত হয়। ১৯৩৬-৩৭ সালে মাধ্যমিক শিক্ষায় বৃত্তিশিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার স্থান সম্পর্কে পরামর্শের জন্য "উড্-এবট্-বিবরণী" উপস্থাপিত হয়। এই বিবরণীতে উল্লেখ করা হয় যে, মাধ্যমিক স্কুলের সাধারণ পাঠক্রমের সঙ্গে বৃত্তি ও কারিগরী পাঠক্রমও প্রবর্ত্তন করা দরকার। এই পরামর্শের ফলে 'পলিটেকনিক' নামে এক ধরনের নতুন কারিগরী স্কুল এদেশে প্রচলিত হয়। সেই সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশে কারিগরী, বাণিজ্য ও কৃষি বিদ্যাশিক্ষার জন্য কিছু কিছু বিশেষ ধরনের স্কুলও প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

১৯৪৪ সালে যুদ্ধোত্তর শিক্ষার পুনর্গঠন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পর্ষৎ একটি বিবরণী প্রচার করেন। এই বিবরণীটি 'সার্জ্জেণ্ট রিপোর্ট' নামে প্রখ্যাত। সার্জ্জেণ্ট রিপোর্টে পরামর্শ দেওয়া হয়:—(১) ৬-১৪ বছর বয়সের সকল বালকবালিকার জন্য অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করতে হবে; (২) নিম্ন বুনিয়াদী ও উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষাধারার সঙ্গে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষাধারার সমন্বয় সাধন করতে হবে; (৩) শিক্ষার্থীর ১১ বছর বয়সে মাধ্যমিক শিক্ষা সুরু হবে এবং ৬ বছর যাবৎ এই শিক্ষাগ্রহণ চলবে এবং (৪) শিক্ষাপর্য্যায়ে অধীত বিদ্যা ও কারিগরী উভয় ধরনের পাঠক্রমই প্রবর্ত্তন করা দরকার।

১৯৪৮ সালে ভারত সরকার শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে পরামর্শ লাভের জন্য তারাচাঁদ কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির সুপারিশগুলি ১৯৪৯ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা পর্ষৎ বিবেচনা করেন এবং পরামর্শ দেন:—(১) পাঁচ বছরের নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা ও তারপর তিন বছরের উচ্চ বুনিয়াদী বা প্রাক্-মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর চার বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা পর্য্যায় সুরু হবে; (২) মাধ্যমিক স্কুলগুলি বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্ত্তন করবে; (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা পর্য্যায়ে রাষ্ট্রভাষা আবশ্যিক হবে; এবং (৪) শিক্ষকদের বেতনের হার ও চাকুরীর সর্ত্তাদি সংশোধন করতে হবে।

১৯৫২ সালে মুদালিয়র কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে নিম্নরূপ সুপারিশ করেন:—

১। স্কুলের শিক্ষাকাল হবে ১১ বছর। এর মধ্যে ৮ বছর বুনিয়াদী ব

প্রাথমিক শিক্ষা ও পরবর্তী তিন বছর মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের সময় রূপে নির্দ্ধারিত হবে।

২। ইণ্টারমিডিয়েট কোর্সের বিলোপসাধন করা হবে এবং ডিগ্রী কোর্সের শিক্ষাকাল তিনবছর করা হবে।

৩। স্কুল শিক্ষার শেষ তিন বছর অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্য্যায়ে বহুমুখী পাঠক্রমের আয়োজন থাকবে। এই বহুমুখী পাঠক্রম সাতটি প্রবাহে বিভক্ত হবে; ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করে শিক্ষার্থী নিজ সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুযায়ী যে কোন একটি প্রবাহে পাঠগ্রহণ সুরু করবে।

৪। পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনের জন্য শক্তিশালী কমিটি নিযুক্ত হবে।

৫। মাধ্যমিক স্কুলে তরুণ শিক্ষার্থীদের শারীর শিক্ষার ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার আয়োজন থাকা চাই।

৬। বছরের মধ্যে কমপক্ষে ২০০ দিন স্কুলের কাজ চলা দরকার এবং প্রতি সপ্তাহে ৪৫ মিনিটের অন্ততঃ ৩৫টি পিরিয়ডে অধ্যয়ন চলবে।

৭। স্কুলের শেষ পরীক্ষার ফলাফল বিচারের সময় শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক পাঠ-প্রগতির হিসাবও গণ্য করা হবে।

৮। উপযুক্ত পাঠক্রম নির্ব্বাচনের সময় শিক্ষার্থীকে যথাযথ পথনির্দ্দেশ দিতে হবে।

৯। শিক্ষকদের উপযুক্ত ট্রেনিং ও বেতন দিতে হবে।

১০। প্রত্যেক স্কুলের পরিচালন সংসদকে কোম্পানী আইন মত রেজেষ্ট্রিকৃত হতে হবে।

১১। উপযুক্ত খেলাধুলার প্রাঙ্গণের জন্য আইন বিধিবদ্ধ করা উচিত।

বর্ত্তমানে ভারত সরকার মোটামুটিভাবে মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ মত মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা করছেন।

Q. 14. Discuss the significance and characteristics of diversification of higher secondary education in India and its present problems.

Ans. তরুণ শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুসারে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক স্কুলের ৯ম শ্রেণী থেকে ৭টি নির্ব্বাচনীয় বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষাকাল বৃদ্ধি করে একাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়নের জন্য উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা (হায়ার সেকেণ্ডারী) প্রবর্ত্তিত হয়েছে এবং যে সকল উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে একাধিক নির্ব্বাচনীয় বিষয় অধ্যাপনার ব্যবস্থা হয়েছে, সেগুলিকে বহুসাধক (মাল্‌টি-পারপাস) স্কুল বলা হচ্ছে। এই সকল স্কুলে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত সকল শিক্ষার্থীরই পাঠক্রম অভিন্ন। তবে ৯ম শ্রেণী থেকে শিক্ষার্থীকে

নিজের আগ্রহ ও সামর্থ্য মত পাঠ্যবিষয় নির্ব্বাচন করতে হবে। তবে নির্ব্বাচনী বিষয়গুলি ছাড়া পাঠক্রমে কতকগুলি কেন্দ্র-বিষয় (Core subjects) প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই শিক্ষা করতে হবে। এগুলির মধ্যে ভাষা, সমাজবিদ্যা, শিল্প, সাধারণ বিজ্ঞান, অঙ্ক প্রভৃতি আছে। এই বহুসাধক স্কুলের অধ্যয়ন সমাপ্ত হলে শিক্ষার্থীরা সরাসরি তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সে যোগদান করতে পারবে।

বহুসাধক উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের পাঠক্রম এই ধরনের :—

'ক' বিভাগ—ভাষা :

(১) স্থানীয় ভাষা কিংবা মাতৃভাষা, স্থানীয় ভাষা ও মাতৃভাষা মিশ্রিত পাঠক্রম, বা স্থানীয় ভাষা ও কোন প্রাচীন ভাষা মিশ্রিত পাঠক্রম, বা মাতৃভাষা ও একটি প্রাচীন ভাষা মিশ্রিত পাঠক্রম।

(২) হিন্দী বা ইংরেজী।

(৩) একটি আধুনিক ভারতীয় বা ইউরোপীয় ভাষা।

বিকল্প পরিকল্পনা : (১) প্রথমটির অনুরূপ।
(২) ইংরেজী বা আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা।
(৩) হিন্দী বা যে কোন ভারতীয় ভাষা।

'খ' বিভাগ—সমাজবিদ্যা, সাধারণ বিজ্ঞান, অঙ্ক :

সমাজবিদ্যাকে একটি ব্যাপক বিষয়রূপে পরিগণিত করা হয়েছে এবং ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠ্যবিষয় এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে তরুণ শিক্ষার্থীকে সম্যক্‌রূপে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করাই এই বিষয়টির মূল উদ্দেশ্য। যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠক্রমে সেইগুলি অধ্যয়নের আয়োজন রাখা হয়েছে।

'গ' বিভাগ—শিল্প :

বয়ন শিল্প, ধাতু শিল্প, বাগান শিল্প, সীবনশিল্প প্রভৃতি শিল্পের মধ্যে যে কোন একটি শিখতে হবে।

'ঘ' বিভাগ—নির্ব্বাচনীয় বিষয়গুলি : এগুলিকে সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

১। মানববিদ্যা—প্রাচীনভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরবিদ্যা, মনোবিজ্ঞানের সূত্র, তর্কবিদ্যা, অঙ্ক, সঙ্গীত, গৃহবিজ্ঞান।

২। বিজ্ঞান—পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ভূগোল, অঙ্ক, শারীরবিজ্ঞান ও শারীর স্বাস্থ্য।

৩। কারিগরী—ফলিত অঙ্ক, জ্যামিতিক অঙ্কণ, ফলিত বিজ্ঞান,

যন্ত্রসম্পর্কিত ইনজিনীয়ারিং-এর মূলসূত্র, বিদ্যুৎ সম্পর্কিত ইনজিনীয়ারিং-এর মূলসূত্র।

৪। বাণিজ্য—বাণিজ্যবিষয়ক নীতিকৌশলাদি, বুক কিপিং, বাণিজ্যিক ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরবিদ্যা, শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং।

৫। কৃষি—সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান, পশু চিকিৎসা, বাগান করা কৃষিসম্পর্কিত রসায়নবিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিদ্যা।

৬। ললিত কলা (ফাইন আর্টস্)—শিল্পের ইতিহাস, অঙ্কণ ও নক্সা, পেণ্টিং, মডেলিং, সঙ্গীত, নৃত্য।

৭। গৃহবিজ্ঞান—গৃহ-অর্থনীতি, খাদ্যপুষ্টিবিদ্যা ও রন্ধনবিদ্যা, মাতৃবিদ্যা ও শিশুচর্য্যা, গৃহ ব্যবস্থাপনা, ও গৃহচিকিৎসা।

অবশ্য বিভিন্ন রাজ্য সরকারের শিক্ষাদপ্তর প্রয়োজনবোধে স্থানীয় শিক্ষার্থীদের উপযোগী পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত পাঠক্রম রচনা ও গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলি ইণ্টারমিডিয়েট পাঠক্রমের কিছু কিছু অংশ কিছু পরিবর্ত্তন করে উচ্চতর মাধ্যমিক পাঠক্রমে সংযোজিত করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করেননি। ফলে, নতুন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে নতুন উদ্দেশ্য, নতুন পাঠক্রম পরিবেশন বা নতুন শিক্ষাচিন্তা উপস্থাপিত করার সুযোগ গ্রহণ করা যায়নি। সুতরাং পূর্ব্বে যে অভিযোগ ছিল, মাধ্যমিক স্কুলের পাঠক্রমে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অত্যধিক প্রভাব রয়েছে, এখনও সেই অভিযোগ কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি। বিভিন্ন নির্ব্বাচনীয় বিষয়ের পাঠপ্রবাহ অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির পাঠ্যতালিকা প্রণয়নের ভার বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত কলেজ অধ্যাপকদের দেওয়া হয় এবং মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকদের এবিষয়ে কিছু বলার থাকে না। ফলে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা পূর্ব্বতন ত্রুটি-পূর্ণ কলেজ শিক্ষারই অনুরূপ হতে চলেছে।

উচ্চতর মাধ্যমিক পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত **মানববিদ্যা** পাঠ্যবিষয়টি শিক্ষার্থীকে মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা সম্পদের সঙ্গে পরিচিত হতে সহায়তা করে। মানুষের প্রকৃতির অধ্যয়ন করাই মানববিদ্যার উদ্দেশ্য। মানুষের প্রক্ষোভ, ক্ষুধা, প্রবৃত্তি, নীতিবোধ, বুদ্ধিবৃত্তি, আত্মিক বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব সংগঠন, শিল্পসৃষ্টির বাসনা, সাহিত্য উপভোগ, প্রভৃতির মূলসূত্রগুলি পর্য্যালোচনা করার জন্য মানববিদ্যার মধ্যে মানুষের ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতির স্থান রয়েছে। মানব ইতিহাসের সম্পদগুলি কেবল জানলেই হবে না, সেইগুলির তাৎপর্য্য নির্ণয় করে অধিকতর প্রগতির পথে আপন চরিত্রকে পুনর্গঠিত করার কাজেই প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে মানববিদ্যা বর্ত্তমানে যেভাবে অধীত হচ্ছে তাতে সেই উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে বলে মনে হয় না। বর্ত্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহজে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে

শিক্ষার্থীরা মানববিদ্যা গ্রহণ করে থাকে। মানববিদ্যা শিক্ষাদান পদ্ধতিও স্কুলগুলিতে খুবই বিরক্তিকর। তাছাড়া আর একটি বিপজ্জনক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে, অল্পধী ও সাধারণ মেধার শিক্ষার্থীদেরই স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকগণ মানববিদ্যা অধ্যয়নে বাধ্য করছেন। ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি শিক্ষকদের যত্নও হ্রাস পাচ্ছে। বর্ত্তমানে কর্ম্মসংস্থান ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার প্রভাব ও চাহিদা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, অভিভাবকগণ যে কোন উপায়ে শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যায় শিক্ষিত করে উচ্চ বেতন অর্জ্জনে সক্ষম করে তুলতে চাইছেন। এর ফলেও মানববিদ্যার প্রতি এক সার্বিক অবহেলা বিস্তারলাভ করছে। এই সমস্যা দূর করতে হলে মানববিদ্যার পাঠক্রম সংস্কার করতে হবে, উপযুক্ত উৎসাহী শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে চিত্তাকর্ষক শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করতে হবে এবং যথোপযুক্ত সহপাঠ্য কার্য্যসূচীর মাধ্যমে মানববিদ্যার মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের মনে সুস্পষ্ট করতে হবে।

বিজ্ঞানের পাঠক্রমে যথারীতি পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও অঙ্ক শেখানো হয়। ভূগোল পাঠ্যবিষয়টি অধুনা সংযোজিত হয়েছে। এই পাঠক্রম গ্রহণেচ্ছু শিক্ষার্থীরা অধিকাংশই মাধ্যমিক শিক্ষার পর ডাক্তারী অথবা ইনজিনীয়ারীং পাঠ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এবং সেই অনুযায়ী কেহ জীব বিজ্ঞান বা অঙ্ক অধ্যয়ন সুরু করে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বিজ্ঞান অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আরও পাঠ্যবিষয় আছে, সেগুলির কোনও প্রস্তুতির আয়োজন উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে করা হয়নি। কোন কোন মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ অবশ্য ঐচ্ছিক বিষয়রূপে যন্ত্রবিদ্যা, স্বাস্থ্য ও শারীরবিজ্ঞান অধ্যাপনার আয়োজন করেছেন; তবে বিদ্যুৎবিদ্যা, ভূমিবিদ্যা, আলোকচিত্র-বিদ্যা, বেতারবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ও মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান পাঠক্রমের অন্তর্গত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন নির্ব্বাচনীয় পাঠ্যবিষয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারলে শিক্ষার্থীদের বহুমুখী বিকাশ সহজ হতে পারে। নির্ব্বাচনীয় বিজ্ঞান পাঠ্যবিষয়গুলির মধ্যে পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের কাছে খুবই কঠিন, কিন্তু সামর্থ্য অনুযায়ী অন্য সহজ বিজ্ঞান পাঠ্যবিষয় অধ্যয়নের যথেষ্ট আয়োজন নেই। একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, অধিকাংশ ভারতীয় শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান চর্চ্চার ভূমিকা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। পাশ্চাত্য দেশের মত এদেশের ঘরে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় খুবই কম। ফলে, দৈনন্দিন জীবনে শহরের অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী ছাড়া অনেকেই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায় না। এজন্য বিজ্ঞান শিক্ষকদের বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে এবং সবাক-চলচ্চিত্র-প্রক্ষেপণ যন্ত্র, ক্যামেরা, এপিডায়াস্কোপ প্রভৃতির ব্যবহারবিধি স্কুলের পরিধির মধ্যে আনতে হবে। পদার্থবিজ্ঞান অধ্যাপনার সময়ে তাপ, আলোক, শব্দ, বিদ্যুৎ যন্ত্র প্রভৃতির তাৎপর্য উপলব্ধি করানোর

জন্য শিক্ষার্থীদের সম্মুখে টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতার, সবাকচিত্র, বাষ্পইঞ্জিন, রঞ্জনরশ্মি, মোটর-গাড়ী, বিমানপোত প্রভৃতির প্রত্যক্ষ কার্য্যপ্রক্রিয়া উপস্থিত করতে হবে। এইভাবে মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে বিজ্ঞানের চিত্তাকর্ষক অবদান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করতে হবে। জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি সম্পর্কেও কেবল ল্যাবরেটরী ও ক্লাশে গতানুগতিক শিক্ষা ছাড়াও পরিবেশের সঙ্গে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন করাতে হবে।

উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের **কারিগরী** পাঠক্রমে প্রধানতঃ যন্ত্রবিদ্যা সম্পর্কিত ইনজিনীয়ারীং এবং বিদ্যুৎ সম্পর্কিত ইনজিনীয়ারীং অধীত হয়। অবশ্য অনেকে প্রশ্ন করেন, উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের বিজ্ঞান পাঠক্রমে উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষার্থীরা যখন কলেজের ইনজিনীয়ারীং কোর্স-গ্রহণের অধিকার পাচ্ছে, তখন পৃথকভাবে কারিগরী পাঠক্রমের প্রয়োজন কি? যে সকল শিক্ষার্থী উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার পর কলেজ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না, তাদের পক্ষে মাধ্যমিক স্কুলের কারিগরী পাঠ খুব প্রয়োজন, কারণ তারা কলকারখানায় হাতেকলমে কাজ করে উপার্জ্জন করতে পারবে। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে মাধ্যমিক পর্য্যায়ে কারিগরী পাঠপ্রবাহের ব্যাপক আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে না বলে অনেকেই বিজ্ঞান পাঠক্রম গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে।

মালটিপারপাস স্কুলে **বাণিজ্য** পাঠক্রমের প্রবর্ত্তন করা হয় মূলতঃ বুককিপিং স্টেনোগ্রাফী প্রভৃতি করণিকের কাজ শেখানোর জন্য। পরে ব্যাঙ্কিং, হিসাব-রক্ষণ, হিসাবপরীক্ষা, তত্ত্বাবধান, বাজার পর্যবেক্ষণ এবং অর্থ নৈতিক ভূগোলও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে এই সকল বিষয় শিক্ষাদানের জন্য কেবল উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকদের দায়িত্ব দিলেই চলবে না, তাঁদের কোন ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট থাকা দরকার। শিক্ষার্থীদের কেবল পুঁথিগত বাণিজ্য নীতি শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও ব্যবসায়-বাণিজ্য কেন্দ্র পরিদর্শন এবং বাণিজ্য পরিচালনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা গ্রহণের সুযোগসুবিধা দিতে হবে। বাণিজ্য শিক্ষা এমন বাস্তবসম্মত হওয়া দরকার যাতে শিক্ষার্থী মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে কোন ব্যবসাবাণিজ্যে নিযুক্ত হতে ইচ্ছুক হলে যেন মূলসূত্রগুলি কাজে লাগাতে পারে।

দেশের বর্ত্তমান খাদ্য পরিস্থিতিতে উন্নততর কৃষিযন্ত্র ও সার ব্যবহার প্রভৃতির শিক্ষা দেওয়ার জন্য উৎসাহী শিক্ষার্থীদের **কৃষিবিদ্যা** শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাপর্য্যায়ে বিশেষ পাঠক্রমের আয়োজন যথেষ্ট প্রশংসনীয়। অনেকে মনে করেন, কৃষিবিদ্যা গ্রামের ছেলেদের জন্য এবং মানববিদ্যা প্রভৃতি শহরের মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য। প্রকৃতপক্ষে শহরের ছেলেরা, এমন কি গ্রামের মেয়েরাও, কৃষিবিদ্যার পাঠগ্রহণ করে দেশের কৃষি ও খাদ্য পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করতে পারে। অন্যান্য ব্যবহারিক বিদ্যার মত কৃষিবিদ্যা

চর্চার জন্যও শিক্ষার্থীদের কেবল পুঁথিগত জ্ঞান সরবরাহ না করে কৃষি সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংগ্রহের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষার্থী যে কৃষিবিদ্যা গ্রহণ করে কৃষিজীবী হবে, এমন কোন কথা নেই; কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী তরুণ শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে যে বৃত্তিই গ্রহণ করুক, দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের প্রতি তার আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ সার্থক নাগরিকরূপে সে কাজ করতে পারবে।

উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে তরুণ শিক্ষার্থীদের সুকুমার বৃত্তি জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে **ললিত কলাবিদ্যা** চর্চার আয়োজন হয়েছে। অবশ্য মাধ্যমিক শিক্ষা পর্য্যায়ে এই পাঠ্যবিষয়টি আজও যথেষ্ট অবহেলিত রয়েছে। এই পাঠ্যবিষয়ের প্রতি অনেকের অস্পষ্ট ধারণা আছে এবং তাঁরা মনে করেন, ললিতকলা একটি রহস্যময় জগতের বিষয় এবং বাস্তব জগতের ব্যবহারিক শিক্ষাক্ষেত্রে এর কোন স্থান নেই। কিন্তু প্রক্ষোভ ও প্রবৃত্তির সুন্দর বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে ললিতকলার উপযোগি আজ শিক্ষাবিজ্ঞান জগতে সুপ্রমাণিত হয়েছে। সৃষ্টির আনন্দ, তৃপ্তিদানের আনন্দ উপভোগের মাধ্যমে ললিতকলা তরুণ শিক্ষার্থীকে সংগঠনী ব্যক্তিত্ব গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করে। কিন্তু মাধ্যমিক স্কুলের ললিতকলা বিষয়ক শিক্ষকগণ তরুণ শিক্ষার্থীদের শিল্পবোধ উপলব্ধির সুযোগ দেবার পূর্ব্বেই সূক্ষ্ম শিল্পকলা নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করার দিকে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। ফলে, অপরিণত তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিফলতার হতাশা সৃষ্টি হয়। কিন্তু অন্যান্য ফলিতবিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের যেমন সুযোগ দেওয়া হয়, তেমনি এক্ষেত্রেও জীবনের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় শিল্পসৌন্দর্য্যের প্রতি তরুণ শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণের উৎসাহ দিলে ললিতকলা বিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। মাধ্যমিক পর্য্যায়ে ললিতকলা উপলব্ধির মনোভাবটুকু জাগরিত হলে পরিণত বয়সে শিক্ষার্থীরা প্রকৃত ললিতকলা চর্চ্চা ও আয়ত্তের সুযোগ পেয়ে সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হবে।

বালিকাদের **গৃহবিজ্ঞান** শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ পাঠক্রমের আয়োজনও বিশেষ সময়োপযোগী হয়েছে। খাদ্যপুষ্টি, মাতৃত্ববিদ্যা, চিকিৎসা, বাগান সংরক্ষণ, শিশুচর্য্যা, গৃহ-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে মাধ্যমিক স্কুলে বালিকারা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করলে সার্থক শান্তিপূর্ণ গার্হস্থ্য জীবন সম্ভব হবে। তবে এই পাঠ্যবিষয়টি শিক্ষাদানের জন্য ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের যথাসম্ভব আয়োজন রাখতে হবে, কেবল পুঁথিবিদ্যায় এই পাঠক্রমের সার্থকতা সম্ভব নয়।

Q. 15. Bring out a comparative study of secondary education in different countries of the world.

Ans. ইউরোপের দেশগুলিতে মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষার

ধারাবাহিক স্তররূপে পরিগণিত করা হয় এবং সকল বালক-বালিকার কাছে মাধ্যমিক শিক্ষা সহজলভ্য করার দাবী স্বীকৃত হয়েছে। আমেরিকার বিপুল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ফলে ঐদেশে মাধ্যমিক স্কুলের প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সকলের শিক্ষালাভের সমানাধিকার রক্ষার প্রচেষ্টা চলেছে।

আমেরিকার বালক-বালিকারা সাধারণতঃ ১৪ বছর বয়সে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে প্রবেশ করে এবং ৪ বছরের হাইস্কুল পাঠ গ্রহণ করে। অনেকে ১২ বছর বয়সেও মাধ্যমিক শিক্ষা সুরু করে, তারপর ৩ বছর জুনিয়র হাইস্কুলে অধ্যয়ন করে পরবর্ত্তী তিন বছর সিনিয়র হাইস্কুলে পড়ে। এই মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাটি আমেরিকায় ৬-৩-৩ প্ল্যান নামে পরিচিত এবং বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে, কারণ এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষাস্তর থেকে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে প্রবেশের সন্ধিস্থলে বালক-বালিকাদের আগ্রহ ও সামর্থ্য পর্য্যবেক্ষণ করে উপযুক্ত পথনির্দ্দেশের সুযোগ এতে যথেষ্ট রয়েছে। আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, ঐদেশে একই স্কুলে উচ্চমেধাবী, সাধারণ ও অল্পমেধাবী সকল শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করে এবং সকল হাইস্কুলের শিক্ষাই অবৈতনিক, এমনকি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে দেওয়া হয়। খেলাধুলা, ক্লাব প্রভৃতির জন্য পৃথক খরচ দিতে হয় এবং অভিভাবকগণ শিক্ষার্থীদের পোষাক, যাতায়াত প্রভৃতির ব্যয়ভার বহন করেন। এই সকল ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জনের সদভ্যাসও জাগ্রত হয়েছে। স্কুল পাঠক্রমে এইজন্য নানাপ্রকার বৃত্তিমূলক বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন করা হয়েছে যার ফলে শিক্ষার্থীরা অর্থ-উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে সফলতা অর্জ্জন করতে পারে। সামাজিক প্রয়োজনে যখনই নতুন বৃত্তিবিদ্যার প্রয়োজন হয়, তখনই সে বিষয়ে পাঠক্রম প্রবর্ত্তিত হয় এবং পুরাণো পাঠক্রম বর্জ্জন করা হয়। তবে কতকগুলি কেন্দ্র (core) পাঠ্যবিষয় জুনিয়র ও সিনিয়র হাইস্কুলে অধীত হয়; সেগুলি —ইংরেজী, ইতিহাস, অঙ্ক ও বিজ্ঞান।

এছাড়া নির্ব্বাচনীয় (elective) বিষয়গুলি শিক্ষক ও অভিভাবকদের পরামর্শমত শিক্ষার্থী পছন্দ করতে পারে। কোন শিক্ষার্থী একটি নির্ব্বাচিত পাঠ্যবিষয় কিছুদিন অধ্যয়ন করে সেটি বর্জ্জন করে আর একটি পাঠ্যবিষয় গ্রহণ করতে পারে। সিনিয়র হাইস্কুলে সাধারণতঃ এই সকল নির্ব্বাচনীয় পাঠ্যবিষয়গুলি থাকে—কলেজ প্রিপারেটরী; ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, গৃহবিজ্ঞান এবং সঙ্গীত প্রভৃতি বিশেষ বিষয়। প্রত্যেকটি নির্ব্বাচনীয় পাঠ্য-বিষয়ের মধ্যে আবার শ্রেণীবিভাগ থাকে; যেমন, কলেজ প্রস্তুতি সম্পর্কিত পাঠক্রমে সাধারণ কলাবিদ্যা বিষয়ক কলেজ, ইনজিনীয়ারিং কলেজ, চিকিৎসা-বিদ্যার কলেজ প্রভৃতির প্রস্তুতিবিদ্যার পৃথক আয়োজন থাকে। বাণিজ্যবিদ্যার পাঠ্যক্রমে সেলসম্যান, টাইপিষ্ট, ম্যানেজার প্রভৃতি বৃত্তির বিশেষ শিক্ষা; এবং

কৃষিবিদ্যা সংক্রান্ত পাঠক্রমের মধ্যে শস্য উৎপাদন, হাঁস-মুরগী পালন, ফলের চাষ, পশুপালন প্রভৃতি বিশেষ শিক্ষার আয়োজন থাকে। সিনিয়র স্কুলের পাঠ শেষ হলে শিক্ষার্থীরা জুনিয়র কলেজে আরও দুবছর অধ্যয়ন করতে পারে; বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতি দেয় এই জুনিয়র কলেজগুলি।

আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষায় সহপাঠ্য কার্য্যসূচীর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, কারণ ঐদেশের শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করেন ঐ সকল সহপাঠ্য কার্য্যসূচীর মাধ্যমে তরুণ শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ সহজ হয়। তবে আমেরিকার স্কুলব্যবস্থা জনপ্রিয় হওয়ার দরুণ বিপুল শিক্ষার্থী সংখ্যার মাঝে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক রক্ষা খুবই দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। আমেরিকার মাধ্যমিক স্কুলগুলিকে এজন্য অনেকে সমালোচনা করে বলেন, ব্যক্তিতাহীন যন্ত্রবিশেষ। স্কুলের সহপাঠ্য কার্য্যসূচী এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বগঠনে গৃহ-পরিবেশের প্রভাব একেবারেই নষ্ট হতে চলেছে। সকল শিক্ষার্থীকে সমান সুযোগ দেওয়ার নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা সকলকে সকল প্রকার সুযোগ দেওয়ার ভ্রান্তনীতি গ্রহণ করেছে বলে অনেক শিক্ষাবিদ্ আশঙ্কা করেন।

রাশিয়ায় ইউনিটারী স্কুল ব্যবস্থার মাধ্যমে মাধ্যমিক পর্য্যায়ে উপযুক্ত সামর্থ্যবিশিষ্ট শিক্ষার্থীদের সযত্নে পৃথক করে নিয়ে তাদের যতদূর সম্ভব শিক্ষা-গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। ঐদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতাপ্রদান বা নতুন শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হয় এবং প্রতিটি শিক্ষা পরিকল্পনা যথেষ্ট সুনিয়মে পরিচালিত হয়। বড় বড় শহরে সহশিক্ষা (কো-এডুকেশন) বন্ধ করা হয়েছে, কারণ সেখানে বালক ও বালিকাদের পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা করা অর্থ নৈতিক দিক থেকে বাস্তবসম্মত। তরুণ বয়সে বালক-বালিকাদের পৃথক মনোভাব ও সামর্থ্য-আগ্রহ প্রভৃতি বিবেচনা করেই রাশিয়ায় সহশিক্ষা বর্ত্তমানে বিশেষ পছন্দ করা হয় না। উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে এবং উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের জন্য শিক্ষার্থী-দের বেতন ধার্য্য করার সিদ্ধান্তও হয়েছে। চার বছর প্রাথমিক শিক্ষা পর্য্যায় শেষ করে শিশুরা একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং ৫ম শ্রেণীতে যোগদান করে মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণ সুরু করে। ৭ম শ্রেণীর শিক্ষাগ্রহণ করার পর শিক্ষার্থীকে আর একটি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয় এবং এই পরীক্ষায় আটটি বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া হয়: রুশ ভাষা ও সাহিত্য, বীজগণিত অথবা গণিত, জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিজ্ঞান ও রাশিয়ার রাষ্ট্র-সংবিধান। সাত বছরের স্কুল শিক্ষা সকলের জন্য আবশ্যিক করার প্রচেষ্টা চলেছে। অবশ্য সাত বছরের মাধ্যমিক শিক্ষাকে রাশিয়ায় 'অসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষা' বলা হয়।

'সম্পূর্ণ মাধ্যমিক স্কুল' বলতে রাশিয়ায় ১০-বছরের মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষাকেই বোঝানো হয় এবং এই ধরনের স্কুল সাধারণতঃ বড় বড় শহরাঞ্চলেই থাকে। গ্রামাঞ্চলের যে সব শিক্ষার্থী সাত বছরের 'অসম্পূর্ণ' মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করে, তারা ইচ্ছা করলে শহরে এসে 'সম্পূর্ণ' মাধ্যমিক স্কুলে আরও তিন বছর অধ্যয়ন করতে পারে। 'সম্পূর্ণ' মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষ উন্নত ধরনের এবং রসায়নবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি পাঠ্যবিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পূর্ব্বে বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হত; এখন বিদেশী সাহিত্যচর্চ্চার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। শেষ দু'বছরে দর্শনশাস্ত্রের পাঠ দেওয়া হয় (প্রথম বছরে মনোবিজ্ঞান ও দ্বিতীয় বছরে তর্কবিদ্যা)। কোন কোন ১০-বছরের স্কুলে লাটিন ভাষা শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়েছে।

১০ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের পর শিক্ষার্থী একটি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। সেখানে রুশ ভাষা ও সাহিত্য, অঙ্ক (ত্রিকোণমিতি ও জ্যামিতি) প্রভৃতি বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই বিষয়গুলিতে মৌখিক পরীক্ষাও নেওয়া হয়। পরীক্ষার বিষয়গুলির মধ্যে বীজগণিত, রসায়নবিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, ইতিহাস ও বিদেশী ভাষাও থাকে। যে সকল অঞ্চলে রুশভাষা প্রচলিত নাই, সেখানে স্থানীয় ভাষায় মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে। পরীক্ষার্থীকে সকল বিষয়ে 'চমৎকার' মন্তব্য লাভ করতে হয় এবং তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগদানের অধিকার লাভ করে।

নরওয়েতে সাত বছর প্রাথমিক শিক্ষার পরে ইউনিটারী স্কুল ব্যবস্থা অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষা সুরু হয়। এই দেশে বহুদিন পূর্ব্বেই ১১৫০ সালে মাধ্যমিক স্কুলের প্রচলন হয় এবং তখন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা প্রস্তুতির জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়া হত। ১৮৫০ সালে পাঠক্রম সংস্কার করে আধুনিক ভাষা ও বিজ্ঞান পাঠ্যবিষয়রূপে সংযোজিত হয় এবং ১৮৯৬ সালে আর একবার পাঠক্রম সংস্কার করে তিনটি সুস্পষ্ট পাঠপ্রবাহে শিক্ষাধারা পরিচালিত করা হয়; একটি লাটিন পাঠপ্রবাহ, একটি আধুনিক পাঠপ্রবাহ (ইংরেজী ও ইতিহাস সহ) এবং একটি অঙ্ক-পদার্থবিজ্ঞান প্রবাহ। ১৯৩৫ সালের শিক্ষা সংস্কারের ফলে দু'ধরনের মাধ্যমিক স্কুল প্রবর্ত্তিত হয়; গতানুগতিক গ্রামার স্কুল (জিমন্যাসিয়াম) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রস্তুতির জন্য এবং আধুনিক স্কুল (রিয়ালস্কোল, realskole) সাধারণভাবে প্রাথমিকোত্তর শিক্ষার জন্য। দু'ধরনের স্কুলেই সামান্য বেতন দিতে হয়, তবে দুঃস্থ শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে।

সাধারণ রিয়ালস্কোলে তিন বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে

শহরাঞ্চলে দু'বছরও হয় এবং গ্রামাঞ্চলে চার বছর পর্য্যন্তও চলে। জিমন্যাসিয়ামে পাঁচ বছর শিক্ষা দেওয়া হয়। দু'ধরনের স্কুলেই শেষ দু'বছরের পাঠক্রম এক রকমের থাকে, যাতে এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে পরিবর্ত্তন করা সহজ হতে পারে। এছাড়া, যে সব শিক্ষার্থী দু-এক বছর যুব স্কুল বা continuation স্কুলে অধ্যয়ন করেছে, তারা চার বছরের জিমন্যাসিয়াম বা দু'বছরের রিয়াল-স্কোলে অধ্যয়ন করতে পারে। এগুলি সাধারণতঃ রাষ্ট্র পরিচালিত আবাসিক স্কুল; মেধাবী শিক্ষার্থীরা যাতে কোন রকমে উপযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষালাভে বঞ্চিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখাই এই স্কুলগুলির কাজ।

জিমন্যাসিয়াম ও রিয়ালস্কোলের পাঠক্রমে ধর্ম্মশিক্ষা, ইংরেজী, জর্ম্মান ও ফরাসী ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, নাগরিকজ্ঞান, অঙ্ক, বিজ্ঞান, শিল্প, শারীর কৌশল, মেয়েদের সূচীশিল্প এবং ছেলেদের কাঠের কাজ শেখানো হয়। জিমন্যাসিয়ামে প্রথম দু'বছর শিক্ষাদানের পর বিশেষ পাঠপ্রবাহের ব্যবস্থা আছে। মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণের পর মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল পরিচালিত বার্ষিক পরীক্ষা দিতে হয়। জিমন্যাসিয়াম স্কুলের শেষে শিক্ষার্থীরা সাধারণতঃ ১৯ বছর বয়সে এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় এবং এই পরীক্ষার নাম examen artium। রিয়ালস্কোলের শেষে শিক্ষার্থীরা সাধারণতঃ ১৭ বছর বয়সে realskoleksamen নামক পরীক্ষায় বসে।

সুইডেনে ১৯৫২ সালে যে নতুন স্কুল আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে সেই অনুসারে ১৫ বছর বয়সে সকল বালক-বালিকাকে একই ধরনের মূল শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে এবং ১৫ বছর বয়সে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রবাহ নীতি অনুসরণ করা হয়। মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষার্থীদের কোন বেতন লাগে না। পাঠক্রম নরওয়ের স্কুলের মত।

ডেনমার্কে ১৯৩৭ সালের শিক্ষা আইন অনুসারে ১১ বছর বয়সে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রবাহ অনুসরণ করতে হয়। এরপর শিক্ষার্থীরা দু-ধরনের ইণ্টারমিডিয়েট স্কুল ব্যবস্থার একটিকে গ্রহণ করে। একটি ব্যবস্থায় শিক্ষা সমাপ্তে পরীক্ষা দিতে হয়; আর একটিতে শিক্ষাগ্রহণ কালেই শিক্ষার্থীর প্রগতি পরিমাপ করা হয়ে যায়, শিক্ষাসমাপ্তে কোন পরীক্ষা দিতে হয় না। দুটি ব্যবস্থাতেই চার বছর অধ্যয়ন করতে হয়। প্রায় ৪০% শিক্ষার্থী প্রথম ব্যবস্থাটি গ্রহণ করে। দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি (পরীক্ষাহীন) অনুসারে শিক্ষার্থী ১৫ বছর পর্য্যন্ত স্কুলে অধ্যয়ন করে বৃত্তিমূলক বা কারিগরী স্কুলে পড়তে পারে। সচরাচর এই সব শিক্ষার্থীরা দিবাভাগে অর্থউপার্জ্জনে নিযুক্ত হয়। প্রথম ব্যবস্থা (পরীক্ষাসাপেক্ষ) অনুসারে শিক্ষার্থীরা ১৫ বছর পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করে আরও এক বছর রিয়ালস্কোলে অথবা আরও তিন বছর জিমন্যাসিয়ামে উচ্চতর পাঠ গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুতি লাভ করতে পারে। জিমন্যাসিয়ামে

তিনটি পাঠপ্রবাহ আছে : প্রাচীন ভাষা, আধুনিক ভাষা এবং অঙ্ক ও বিজ্ঞান। শিক্ষা সর্ব্বত্র অবৈতনিক, তবে বিত্তবান অভিভাবকদের আয়ক্ষমতা অনুপাতে কিছু কিছু বেতন আদায় করা হয়। অর্থনৈতিক কারণে প্রাথমিক স্কুল, দুটি পর্য্যায়ের মিড্‌ল স্কুল এবং realeksamen পরীক্ষার শেষ বছরটির অধ্যয়নের জন্য এক ধরনের সম্মিলিত বহুসাধক (multilateral) স্কুল প্রবর্ত্তিত হয়েছে। ডেনমার্কের গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারের দিকে যথাসাধ্য মনোযোগ দেওয়া হয়। গ্রামের স্কুলগুলির কোন কোনটিতে ৭-১৪ বছরের আবশ্যিক শিক্ষার পূর্ণ আয়োজনেও আছে। কোন গ্রামাঞ্চলে ১৪-১৮ বছর বয়সের অন্ততঃ ১৫ জন শিক্ষার্থী থাকলে এবং অভিভাবকরা দাবী করলে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ তাদের জন্য সান্ধ্য শিক্ষার আয়োজন করে realeksamen পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করে দেন।

জার্ম্মানীতে রিয়ালজিমন্যাসিয়াম স্কুলে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম অনুসারে লাটিন এবং একটি বিদেশী ভাষা (সাধারণতঃ ইংরেজী), অঙ্ক এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। এই ধরনের মাধ্যমিক স্কুলই জর্ম্মানীতে বেশি জনপ্রিয়। এরপর আছে Oberrealschule—যেখানে দুটি আধুনিক ভাষা (ইংরেজী ও ফরাসী) এবং বিজ্ঞান ও অঙ্ক চর্চ্চার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যে সব শিক্ষার্থী জিমন্যাসিয়ামে ভর্ত্তি হওয়ার সুযোগ পায় না, তাদের জন্য mittleschulen নামে আর এক ধরনের মাধ্যমিক স্কুল আছে, যেখানে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে শিল্প বাণিজ্য সংক্রান্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া হয়। গ্রামাঞ্চলের যেসব শিশু দু'বছর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণান্তে কাছাকাছি কোনও মাধ্যমিক স্কুলে অধ্যয়নের সুযোগ পায় না, তাদের জন্য Aufbauschule নামে আর এক ধরনের আবাসিক মাধ্যমিক স্কুল জর্ম্মানীতে আছে। এগুলি রিয়ালজিমন্যাসিয়ামের মত ৭ বছরের শিক্ষাক্রমের আয়োজন করে এবং ইংরেজী ভাষা ও লাটিন ভাষা শিক্ষা দেয়। জর্ম্মানীর মাধ্যমিক শিক্ষা পর্য্যায়ে সঙ্গীত ও শিল্প পাঠ্যবিষয়গুলি ক্রমবর্দ্ধমান সমাদর লাভ করছে।

জর্ম্মানীতে সহশিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় একমাত্র বিশেষ প্রয়োজনে। গ্রামাঞ্চলে বা কাছাকাছি কোনও মেয়েদের স্কুল না থাকলে তবেই ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়ানো হয়। বালিকাদের জন্য জর্ম্মানীতে পৃথক Frauenober-schule নামে মাধ্যমিক স্কুলব্যবস্থা আছে, কিন্তু এই স্কুলের সার্টিফিকেটে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়া যায় না বলে এটি জনপ্রিয় হতে পারেনি।

সম্প্রতি জর্ম্মানীতে অর্থনীতি হাইস্কুল নামে আর এক নতুন মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু হয়েছে, যার ফলে তিন বছরের শিক্ষাগ্রহণ করে তরুণরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর অর্থনীতি বিদ্যা বা ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত শিক্ষাগ্রহণের অধিকার পেতে পারে। ১৬ বছর বয়সে জিমন্যাসিয়াম স্কুল থেকে এই অর্থনীতি

স্কুলে ভর্তি হওয়া যায়। ১৮ বছর বয়স পর্য্যন্ত বৃত্তিমূলক বা কারিগরী শিক্ষা আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করার আয়োজন জর্ম্মানীতে করা হচ্ছে।

হল্যাণ্ডে জর্ম্মানীর মত সুষ্ঠু মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা আছে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে এদেশে একাধিক প্রবাহে ভাগ করা হয়েছে এবং শিক্ষার্থী সাধারণতঃ ১৩ বছর বয়সে শিক্ষকের পরামর্শমত মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণ সুরু করে। ডাচ ভাষা, ফরাসী ভাষা, জর্ম্মান ও ইংরেজী ভাষা সকল মাধ্যমিক স্কুলে আবশ্যিক-ভাবে শেখানো হয়। চার বছর অধ্যয়নের পর শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে বিজ্ঞান প্রবাহ অনুসরণ করতে পারে কিন্তু লাটিন ও গ্রীকভাষা শিক্ষা তখনও চলবে। এর-পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার পেতে হয়। হল্যাণ্ডের Hogere Burgerschool-এ মাধ্যমিক পর্য্যায়ে অঙ্ক, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, ভূমিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, সৃষ্টিবিজ্ঞান (Cosmo-graphy), ভূগোল, অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, ইতিহাস, বাণিজ্যবিষয়ক পাঠ্য এবং চারটি আধুনিক ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। এই স্কুল দু'ধরণের হয়: বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য এবং সাহিত্য অর্থনীতি শিক্ষার জন্য। জিমন্যাসিয়াম ও Hogere Burgerschool-এর সমন্বয়ে আর এক ধরনের মাধ্যমিক স্কুল আছে: Lyzeum—যেখানে অন্যান্য মাধ্যমিক স্কুলের মতই দু'বছরের পাঠক্রম অনুসরণ করা হয় এবং তারপরে চার বছরের বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করা যায় প্রাচীন ভাষা, অঙ্ক অথবা বিজ্ঞান বিষয়ে। Lyzeum হল্যাণ্ডে বিশেষ জনপ্রিয় হচ্ছে। মেয়েদের জন্য পাঁচ বছরের Lyzeum স্কুল প্রবর্ত্তিত হয়েছে।

সুইজারল্যাণ্ডে উপযুক্ত বালকবালিকাদের বিনামূল্যে মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। এদেশের মাধ্যমিক স্কুলগুলিকে Realschule, Handelschule বা Progymnasium বলা হয়। স্কুলগুলিতে ২ বা ৩ বছরের পাঠক্রমের মাধ্যমে অঙ্ক, বিজ্ঞান ও আধুনিক ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। এর পরে শিক্ষার্থীরা কোন বাণিজ্য বা কারিগরী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবীশী সুরু করে। অনেকে উচ্চতর গ্রামার স্কুলেও যোগ দেয়। জার্মানীর জিমন্যাশিয়ামের মতই গ্রামার স্কুলগুলির কাজ, তবে এগুলিকে হল্যাণ্ডে Mittleschule বলা হয়। স্কুলের পাঠক্রম রাষ্ট্র থেকে নির্দ্ধারণ করা হয়। সাধারণত; স্কুলগুলিতে ৬ থেকে ৮ বছর যাবৎ মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা বেতন দেয়, তবে তা খুবই অল্প এবং দারিদ্র্যের জন্য কোনও শিক্ষার্থীকে বঞ্চিত করা হয় না। জার্মানীর মত সুইজারল্যাণ্ডেও তিন ধরনের মাধ্যমিক স্কুল আছে; জিমন্যাসিয়াম (লাটিন ও গ্রীক ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়); Realgymnasium (লাটিন ও আরও দুটি আধুনিক ভাষা শিক্ষা দেয়); এবং Oberrealschule (লাটিন ছাড়া অঙ্ক ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি যত্ন নেয়)।

বেলজিয়ামে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হবার পর অভিভাবকের ইচ্ছামত ও

স্কুলে শিক্ষাপ্রগতির হিসাবমত শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মাধ্যমিক স্কুলে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হয়। মাধ্যমিক স্কুলগুলি চার ধরনের: école moyenne (মিড্‌ল্ স্কুল)—এখানে সহশিক্ষাও হয়, পৃথক শিক্ষাও হয়; athénée কেবলমাত্র বালকদের জন্য; Lycée কেবলমাত্র বালিকাদের জন্য এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত মাধ্যমিক স্কুল colléges। শিক্ষার্থীর ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত école moyenne স্কুলের শিক্ষা চলে। এরপর বেলজিয়ামের বিখ্যাত সাইকো-মেডিক্যাল কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ শিক্ষাধারা সম্পর্কে পথনির্দেশ পেয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের অনেক école moyenne-এর শিক্ষা শেষে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের ট্রেনিং গ্রহণের জন্য école normale primarie-তে যোগ দেয়। অনেকে কারিগরী স্কুলে যোগ দেয়। কোন কোন école moyenne-তে পূর্ণ ৬ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছে। চতুর্থ বছরে বিভিন্ন প্রবাহে শিক্ষা সুরু হয়। পাঁচটি শিক্ষাপ্রবাহ পরিবেশিত হয়: গ্রীক-লাটিন, লাটিন-অঙ্ক, লাটিন-বিজ্ঞান, ফলিত-বিজ্ঞান এবং অর্থনীতি-বাণিজ্যিক শিক্ষা। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অবশ্য একটি আধুনিক ভাষা (ইংরেজী বা জর্মান) শিখতে হয় এবং ফরাসী বা ডাচ ভাষাও শিখতে হয়। ৬ বছরের শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে পরীক্ষা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার লাভ করতে হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বেলজিয়ামে সামান্য বেতন আদায় করা হয়।

ফ্রান্সে ১১ বছর বয়সে শিশুর মাধ্যমিক শিক্ষা সুরু হয়। প্রতি বছর ১৫ই মে তারিখের মধ্যে অভিভাবককে আবেদন করতে হয় এবং ঐ তারিখে শিক্ষার্থীর বয়স ১১ বছরের কম বা ১২ বছরের বেশি হওয়া চলবে না। অভিভাবকের পছন্দ এবং শিক্ষকের নির্বাচনী পরীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী lycée, collége moderne, অথবা cours complémentaires—তিনটি শিক্ষাধারার যে কোন একটিতে মাধ্যমিক শিক্ষা সুরু করতে পারে। এই তিনটি মাধ্যমিক শিক্ষাধারারই প্রথম বছরগুলির পাঠক্রম একরকম থাকে, যাতে প্রয়োজন হলে সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুসারে শিক্ষার্থী শিক্ষাপ্রবাহ পরিবর্তন করতে পারে। পূর্বে, lycée-তে যে সকল পাঠ্যবিষয় পড়ানো হয়, সেগুলির পক্ষে অনুপযুক্ত প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের cours complémentaires-এ দু'বছরের বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া হতো এবং এখনও cours complémentaires-স্কুলগুলি প্রাথমিক স্কুল-পরিদর্শক দপ্তরের তত্ত্বাবধানে চলে—যদিও এখন এখানে চার বছরের মাধ্যমিক পর্যায়ের বাণিজ্যিক ও কারিগরী বৃত্তিশিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। অবশ্য এই স্কুলগুলির পাঠক্রম অন্যান্য বিষয়ে collége moderne-এরই মত। cours complémentaires স্কুলে অঙ্ক ফরাসী ও ইংরেজী ভাষা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল, কারিগরী

শিল্প, গৃহকর্ম প্রভৃতি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। গ্রামাঞ্চলে কৃষিবিদ্যাও শেখানো হয়।

১৫ বছর বয়সে প্রথম স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা দিয়ে পরবর্তী স্তরের শিক্ষা-গ্রহণ সুরু করা যায়। এই সময়ে collége moderne-এ যোগ দিয়ে ১৮ বছর পর্য্যন্ত অধিকতর মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণ করা যায়, école normale primarie-তে যোগ দিয়ে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকতার ট্রেনিং নেওয়া যায় অথবা collége technique-এ অধ্যয়ন করা যায়। অনেকে প্রথম স্কুল সার্টিফিকেট গ্রহণ করেই অর্থ উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে পড়াশুনা বন্ধ করে। অনেকে collége moderne-এর পরেও এক বছরের কারিগরী বা বাণিজ্যিক baccalauréat-এ বিশেষ বৃত্তিশিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। এই baccalauréat-এর শিক্ষা সমাপ্ত হলে শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার পায়।

ইটালীতে ১১ বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে শিক্ষার্থীরা বৃত্তি শিক্ষার স্কুলে বা ইণ্টারমিডিয়েট কমপ্রিহেন্সিভ স্কুলে মাধ্যধিক শিক্ষাগ্রহণ সুরু করে। ইণ্টারমিডিয়েট স্কুলের শিক্ষাকাল তিন বছর এবং এরপর উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এই স্কুলের পাঠক্রমে থাকে : ইটালী ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, প্রকৃতিবিজ্ঞান, অঙ্কণ, সঙ্গীত, লাটিন ও একটি বিদেশী ভাষা। বৃত্তিশিক্ষার স্কুলে লাটিন ও বিদেশী ভাষা ছাড়া একই পাঠক্রম অনুসরণ করা হয়। ইণ্টারমিডিয়েট স্কুল বা scuola media-র পর শিক্ষার্থী liceo classico বা liceo scientifico, বা istituto magistrale (প্রাথমিক শিক্ষক ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান), বা istituto tecnico-তে যোগ দিতে পারে। যে শিক্ষার্থী দুটি liceo-তে যোগ দিতে পারে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার লাভ করে। Liceo classico-স্কুলের পাঠক্রমে ইটালী ভাষা ও সাহিত্য, লাটিন ও গ্রীক ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতিবিজ্ঞান, অঙ্ক, একটি বিদেশী ভাষা, দর্শনশাস্ত্র এবং শিল্পের ইতিহাস দুটি পর্য্যায়ে অধ্যয়ন করানো হয়। Liceo scientifico স্কুলে পাঁচ বছরের পাঠক্রমে অধিক পরিমাণে বিদেশী ভাষা, অঙ্ক ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে শিক্ষার্থী পরবর্তী স্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও উচ্চতর বিজ্ঞানচর্চ্চায় আত্ম-নিয়োগ করতে পারে। ইটালীতে মাধ্যমিক শিক্ষা অবৈতনিক নয়, তবে দুঃস্থ শিক্ষার্থীরা যাতে বঞ্চিত না হয় সেদিকে রাষ্ট্রের লক্ষ্য থাকে। স্কুলের বেতন ধার্য্যের ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থাকে এবং রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে ৪০টি স্কুলে অবৈতনিক শিক্ষাদানের আয়োজন আছে।

মোটামুটিভাবে দেখা যায়, সকল দেশেই মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রায় ১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষার্থীদের 'মূল' পাঠক্রমে শিক্ষিত করে তারপর বিশেষ

পাঠপ্রবাহ পরিবেশন করা হয়। এইজন্য প্রাথমিক স্কুল ও বিভিন্ন পাঠপ্রবাহ সম্বলিত মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যবর্ত্তী শিক্ষান্তরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। আর একটি বিষয়ে সকল দেশেই সচেতনতা লক্ষ্য করা যায় যে, শিক্ষার্থীকে বিশেষ পাঠপ্রবাহে নিযুক্ত করার পূর্ব্বে অভিভাবকদের অভিমতকে মর্য্যাদা দেওয়া হয়।

Q. 16. Discuss the present position of secondary education in India.

Ans. [এই গ্রন্থের ১ম পরিচ্ছেদের Q. 8-এর উত্তর দ্রষ্টব্য—পৃ. ২২-২৯]।

Q 17. Discuss the place of secondary education in Five-year plans of India.

Ans. [এই গ্রন্থের ১ম পরিচ্ছেদের Q. 6-এর উত্তর দ্রষ্টব্য—পৃ. ১৪-১৮]।

Q. 18. Describe the special difficulties and problems of English teaching in secondary schools in India.

Ans. ভারতীয় মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে ইংরেজী শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা আছে। একদিকে ইংরেজী ভাষার ব্যাকরণগত জটিলতা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ, অপরদিকে ইংরেজী আদবকায়দা ও চিন্তাধারার মোহ ইংরেজী শিক্ষার লক্ষ্য বিকৃত করেছে। মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীরা ইংরেজী ভাষার পদপ্রকরণ, বাক্যবিশ্লেষণ, ভ্রমসংশোধন, কবিতার গদ্যরূপ প্রভৃতি ভালভাবে শেখে, কিন্তু সাধারণ ইংরেজী কথাবার্ত্তা বলতে বা চিঠিপত্র লিখতে পারে না। সম্ভবতঃ বহুদিন থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির বিপুল প্রভাব থাকায় স্কুলে ইংরেজী শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গীই ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। স্বাধীন ভারতের জাতীয় জীবনে ইংরেজী ভাষার স্থান সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা সুরু হয়েছে এবং বিষয়টি ব্যাপক মতদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে।

আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্ক রক্ষা, জাতীয় সংহতি রক্ষা, বিজ্ঞান সভ্যতার সমকক্ষতা অর্জ্জন প্রভৃতি কারণে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার উপযোগিতা পূর্ব্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু অনেকে বলেন, জাপান প্রভৃতি দেশ ইংরেজী ভাষার উপর এত নির্ভর না করেও বিজ্ঞান, কারিগরী ও আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বিস্ময়কর প্রগতিলাভ করতে পেরেছে। এই যুক্তিতে স্থানীয় ভাষা ও মাতৃভাষা শিক্ষার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়ার ফলে ইদানীং এদেশে ইংরেজী ভাষার উৎকর্ষমান হ্রাস পেয়েছে। স্কুলে, এমন কি কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণের রীতি বর্জ্জিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে একথা স্বীকার করতে হবে যে, যে কোন বিষয়ে গবেষণা এবং

উচ্চতর অধ্যাপনার সময়ে ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজন অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে এবং যে শিক্ষার্থী মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ভালভাবে ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ পায়নি, তার পক্ষে গবেষণা ও উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হয়। মুদালিয়র কমিশনও এই মর্মে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

সুতরাং মাধ্যমিক স্কুলে ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব হ্রাস পেতে পারে না। তবে এই ভাষাটি বর্ত্তমানে একটি বিদেশীভাষারূপে অধ্যয়ন করা হবে এবং ভাবগ্রহণের মাধ্যমরূপেই এর গুরুত্ব ভারতীয় শিক্ষার্থীদের কাছে বেশি হবে। ইংরেজী ভাষার সৌন্দর্য্য ও জটিলতা আয়ত্ত করে অনর্গল ইংরেজীতে ভাব-প্রকাশের গুরুত্ব অনেক হ্রাস পেয়েছে। তবে এই পর্য্যায়ে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার দৃঢ় বনিয়াদ স্থাপন করা হবে যার ফলে পরবর্ত্তী পর্য্যায়গুলিতে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণকালে অধিকতর ইংরেজী ভাষার চর্চ্চায় অসুবিধা না হয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, ইংরেজী ভাষার কার্য্যকরী জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের অন্ততঃ ২৫০টি বনিয়াদি বাক্য সংগঠন এবং প্রায় ২৫০০ শব্দসম্পদ আহরণ করতে হবে। মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীরা যাতে এই শব্দ ও বাক্যসম্পদ আয়ত্ত করতে পারে, এজন্য ৬ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ৩ বছর করে দুটি পর্য্যায়ে বিশেষ পাঠক্রম প্রণয়ন করতে হবে।

মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষকের অভাব, ব্যক্তিগত যত্নের অভাব প্রভৃতি অসুবিধা সত্ত্বেও ইংরেজী শিক্ষার কোন সংক্ষিপ্ত সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করা চলবে না। পূর্ব্বে ইংরেজী শিক্ষার জন্য শব্দসম্পদ আহরণের প্রতি যত্ন নেওয়া হতো, পরে বাক্য সংগঠন প্রণালী শিক্ষাদানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। পদ্ধতি হিসাবে দুটি উপায় অবলম্বন করা হয়। একটি হলো গতানুগতিক ব্যাকরণ ও অনুবাদ পদ্ধতি—যেটি এখনো ভারত, এমন কি বৃটেন, ফ্রান্স, জর্ম্মানী প্রভৃতি দেশে অনুসরণ করা হয়। আর একটি প্রত্যক্ষ (Direct) পদ্ধতি—অর্থাৎ কথাবার্ত্তা কাজকর্ম্মের মাধ্যমে নতুন ভাষার কৌশলগুলি আয়ত্ত করানো হয়। ১৯২৫ সাল থেকে ভারতের ট্রেনিং কলেজগুলিতে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

বাক্য সংগঠন ও শব্দসম্পদ কোন্ শ্রেণীতে কতখানি পরিবেশন করা হবে, সে বিষয়ে গবেষণালব্ধ তথ্যের সাহায্যে বাক্য সংগঠন ও শব্দসম্পদের স্তরবিভাগ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমেরিকার থর্নডাইক, বাংলাদেশে ডঃ মাইকেল ওয়েষ্ট, চীনদেশে ফসেট এবং জাপানে পামার সাহেবের গবেষণা ও অবদান উল্লেখ-যোগ্য। ত্রিশ বছর গবেষণার পর ডঃ ওয়েষ্ট কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ২০০০ শব্দসম্পদের স্তরবিন্যাস তালিকা এখন শিক্ষকরা ব্যবহার করে থাকেন। এ ছাড়া, ওয়েষ্টের নিউ মেথড রীডার্স এবং ফসেটের অক্সফোর্ড ইংলিশ কোর্স প্রভৃতি প্রকাশনাও

ভারত ও অন্যান্য দেশে ইংরেজীভাষা শিক্ষার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। সম্প্রতি লণ্ডনের ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশনের প্রচেষ্টায় আর একটি শব্দসম্পদ স্তরবিন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি ইংরেজী শিক্ষাদানের সমস্যাকে অনেকাংশে লাঘব করতে পেরেছে বলে অনেকে মনে করেন। তবে একটি বিদেশীশিক্ষার জন্য মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের অসুবিধা এতে সম্পূর্ণরূপে দূর হয়নি।

বিদেশী শিক্ষার্থীদের কাছে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার অসুবিধা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে বেসিক ইংলিশ নামে একটি সহজ ইংরেজী শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলনের একটি প্রচেষ্টা হয়েছিল। জাপান, হল্যাণ্ড ও ভারতের হায়দ্রাবাদ অঞ্চলে এই পদ্ধতির পরীক্ষামূলক প্রয়োগ চলেছিল। যুদ্ধকালে বৃটেনের উইনষ্টন চার্চিলও এর সমর্থন করেন। কিন্তু এই পদ্ধতি জনপ্রিয় ও কার্য্যকরী হয়নি।

আমাদের দেশে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার সমস্যা বাস্তবিকই কোন বিশেষ শিক্ষাদান পদ্ধতি দ্বারা সমাধান করা যাবে না বলে মনে হয়। এদেশের প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে এই যে, মাধ্যমিক স্কুলের সকল বুদ্ধিস্তরের শিক্ষার্থীকেই সমান উৎকর্ষমানের ইংরেজী ভাষা শেখানোর জন্য প্রচুর শক্তি নিয়োগ করা হয়। ইংলণ্ডে মাধ্যমিক স্কুলের মাত্র ২৫% শিক্ষার্থী বিদেশী ভাষা শিক্ষা করে এবং ঐ শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিস্তরের সর্ব্বোচ্চ পর্য্যায় থেকে নির্ব্বাচিত করা হয়। অন্যান্য দেশে অল্পবয়সে বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না; যদিও দেওয়া হয়, তবে সেই বিদেশী ভাষার সঙ্গে মাতৃভাষার সাদৃশ্য থাকে।

যাই হোক্, বিদেশীভাষারূপে ইংরেজী ভাষা যখন আমাদের মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত হয়েছে তখন শিক্ষার্থীর মধ্যে ইংরেজী পঠন, কথা বলা প্রভৃতির উৎসাহ দিতে হবে। উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে ইংরেজী ভাষা-সাহিত্য পাঠ ও উপলব্ধির সুযোগ দিতে হবে। সহজ প্রত্যক্ষ পদ্ধতির সহায়ক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে।

Q. 19. What are the general views for and against the maintenance and development of public schools in India ?

Ans. পাবলিক স্কুল প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের প্রাইভেট স্কুল, যেখানে বিশেষ ধরনের উচ্চস্তরের মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। এগুলি বেসরকারী ব্যক্তি বা সংগঠন কর্তৃক আবাসিক স্কুলরূপেই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজের ভাগ্যবান বিত্তশালী সম্প্রদায়ের তরুণদের শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। প্রচুর সম্পদ ও স্বাধীনতার মধ্যে তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্ব ক্ষমতা জাগ্রত করা এবং সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষার নানাপ্রকার অধিকতর সুযোগ দেওয়াই পাবলিক স্কুলের লক্ষ্য বলে ঘোষিত হয়। এই কারণে পাবলিক স্কুলগুলিকে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিবিধ গবেষণার সহায়ক মনে করা হয়।

ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে পাবলিক স্কুল পরিচালনার বিরুদ্ধে অনেকে সমালোচনা করে বলেন, শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের প্রতিশ্রুতিতে বদ্ধ বর্ত্তমান রাষ্ট্রে সংবিধান অনুযায়ী এধরনের শ্রেণীপোষণকারী পাবলিক স্কুল পরিচালনার ভার রাষ্ট্র নিতে পারে না। সমালোচকদের মতে পাবলিক স্কুলের শিক্ষার্থীরা সমাজের অল্পবিত্ত সম্প্রদায়ের ঘৃণা ও অবজ্ঞা করতে শিখবে। কিন্তু এই সমালোচনার উত্তরে পাবলিক স্কুলের সমর্থকরা বলেন, দেশের সমস্ত মাধ্যমিক স্কুলের উৎকর্ষমান খুব অল্পদিনের মধ্যেই উন্নত করা যাবে না এবং সেইজন্য কয়েকটি উন্নত ধরনের মাধ্যমিক স্কুল আদর্শরূপে পরিচালনা করা রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য। পাবলিক স্কুল এই ধরনের উন্নত মাধ্যমিক স্কুল এবং গতানুগতিক শিক্ষার সংস্কারে পাবলিক স্কুলের অস্তিত্ব বহুলাংশে সহায়ক হবে।

তবে পাবলিক স্কুলে একমাত্র উচ্চ মেধা ও প্রবণতার শিক্ষার্থীদের গ্রহণ করার নীতি সমর্থনযোগ্য হলেও বিত্তশীল পরিবারের বালকদের প্রবেশাধিকার দানের নীতি যুক্তিযুক্ত নয়। উচ্চ মেধা ও প্রবণতার বালকরা বিত্তশীল পরিবারের সন্তান না হলেও যাতে পাবলিক স্কুলে অধ্যয়ন করে নেতৃত্ব শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সেদিকে যত্ন নেওয়া দরকার। এ বিষয়ে আর্থিক সমস্যা ছাড়াও মেধা ও প্রবণতা পরিমাপের সমস্যাও আছে; এজন্য কার্যকরী পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করতে হবে। তারপর মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তার জন্য ছাত্রবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা ব্যাপকতর করতে হবে।

পাবলিক স্কুলের আর একটি সমস্যা হলো এর বিপুল অর্থব্যয়। অনেকে এর সমালোচনা করে বলেন, ভারতের মত দরিদ্র দেশে এমন ব্যয়বহুল স্কুল অসঙ্গত। কিন্তু মাধ্যমিক স্কুলে তরুণ বিকাশমান শিক্ষার্থীদের বহুমুখী প্রতিভার সন্ধান ও পরিপুষ্টির সর্ব্বাঙ্গীণ আয়োজন করার জন্য ব্যাপক পাঠক্রম ব্যবস্থা, সহপাঠ্য কার্য্যসূচী, সুদক্ষ যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষক প্রভৃতির জন্য উপযুক্ত ব্যয়ভার বহন করতে গেলে প্রত্যেক মাধ্যমিক স্কুলেরই পরিচালনা ব্যয়বহুল হয়ে পড়বে। পাবলিক স্কুলগুলি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলেও ব্যয়বাহুল্য স্বাভাবিক। তবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে হলে আবাসিক শিক্ষাই যে শ্রেষ্ঠ, একথা আজ সর্ব্বজনস্বীকৃত। ভারতের প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থাতেও আবাসিক শিক্ষা প্রচলিত ছিল।

পাবলিক স্কুলের অবদান মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে আরও কার্যকরী করে তুলতে হলে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য :—

১। প্রত্যেকটি পাবলিক স্কুলের অনাবশ্যক আদবকায়দা ও আড়ম্বর বর্জ্জন করে ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপোষক হতে হবে।

২। দেশের অন্যান্য শিক্ষাধারার সঙ্গে সমন্বয় রক্ষার সর্ব্বপ্রকার আয়োজন করতে হবে।

৩। পাবলিক স্কুলের ব্যয়বাহুল্য হ্রাস করে বুনিয়াদী শিক্ষানীতি অনুসারে শিক্ষার্থীদের তৈরী শিল্পদ্রব্য থেকে অর্থাগমের ব্যবস্থা করতে পারা যায়।

৪। সকলের সমানাধিকার স্বীকার করে গণতন্ত্রের উপযোগী শিক্ষাধারার পরিপোষণ করতে হবে।

Q. 20. What are the special difficulties and problems in organising school library services in secondary education ?

Ans. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, বিশেষতঃ মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্রে, গ্রন্থাগার অপরিহার্য্য। কিন্তু আমাদের দেশে বহু স্কুলে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, স্কুল লাইব্রেরীর অস্তিত্বই নেই। দান হিসাবে প্রাপ্ত কয়েকখানি পুরানো পরিত্যক্ত অপ্রয়োজনীয় বই স্কুলের অব্যবহৃত একটি কক্ষের আলমারীতে নিতান্ত অযত্নে সংগৃহীত থাকে। কোন কোন স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কক্ষে একখানি গ্রন্থপূর্ণ আলমারীকেই 'গ্রন্থাগার' বলা হয়। এই আলমারী হয়তো খোলা হয় না, বইএর সদ্ব্যবহার ও যত্নও হয় না। গ্রন্থাগার পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগার থেকে বই নিয়ে পড়তে উৎসাহ দেন না অতিরিক্ত কর্ম্মভার হ্রাসের উদ্দেশ্যে। কোন কোন গ্রন্থাগারে একটিও উপন্যাস রাখা হয় না, কারণ প্রধান শিক্ষক বা পরিচালকবর্গ মনে করেন নভেল পড়লে শিক্ষার্থীদের সমূহ ক্ষতি হয়।

স্কুলের গ্রন্থাগারের সংগঠনকার্য্যে সমস্যা দু ধরনের :—

১। স্কুল-গ্রন্থাগারের প্রসার এবং স্কুলের সকল কার্য্যসূচীর প্রাণকেন্দ্ররূপে গ্রন্থাগারের সংগঠন ;

২। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পঠন প্রবণতা বৃদ্ধি করা এবং আপন আপন সমস্যা সমাধানে গ্রন্থাগারের ব্যবহার শিক্ষা দান।

গ্রন্থাগার কক্ষটিকে স্বাস্থ্যকর স্থানে রাখতে হবে এবং উন্মুক্ত পরিবেশে স্বচ্ছন্দে গ্রন্থাদি চর্চ্চার সুযোগ দিতে হবে। গ্রন্থাগার কক্ষটি সুসজ্জিত হওয়াও বাঞ্ছনীয়।

স্কুল গ্রন্থাগার থেকে শিক্ষার্থীরা বই নিয়ে বাড়ীতে পড়তে যাওয়া রীতিটি ভাল ; কিন্তু দেখা যায়, প্রতি বছরই শিক্ষার্থীদের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত গাফিলতির জন্য বহু গ্রন্থ নষ্ট হয় এবং ফেরৎ পাওয়া যায় না। অনেকে বলেন, দুএকখানি গ্রন্থ নষ্ট হওয়ার ফলে শিক্ষার্থীরা যদি গ্রন্থ ব্যবহারের সৎশিক্ষা লাভের সুযোগ পায়, তবে সেই ক্ষতি স্বীকার করায় দোষ নেই। তবে এই ক্ষতি হ্রাস করার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন মনোভাব জাগ্রত করতে হবে, যাতে তারা স্কুল-গ্রন্থাগারকে নিজেদের প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতে শেখে।

অল্পবয়স্ক স্কুল-শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগার ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া সহজ নয়। বিশৃঙ্খলভাবে অনির্দ্দিষ্ট উপায়ে যে কোন বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠলে শিক্ষার্থীর কোনও উপকারই হয় না। কোন বিষয়ে বিশেষ তথ্য আহরণ করতে হলে, কোন বিশেষ গল্প বা বিষয় সম্পর্কে উপযুক্ত গ্রন্থের সন্ধান করতে হলে কিভাবে গ্রন্থাগারের সহায়তা নিতে হয়, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত পথনির্দ্দেশের প্রয়োজন হয়। বর্ত্তমানে অধিকাংশ স্কুলেই শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের এবিষয়ে বিশেষ সহায়তা করেন না। উল্লেখযোগ্য বই বা পত্র-পত্রিকার পরিচয় ঘোষণা, সে বিষয়ে বিশেষ সমালোচনা প্রতিযোগিতা প্রভৃতির আয়োজন করে শিক্ষার্থীদের পঠন প্রবণতা বৃদ্ধি করতে হয়। অভিভাবক দিবস ও মাতৃদিবস পালনের অনুরূপ বছরে একদিন 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করাও দরকার। ঐ উপলক্ষ্যে নতুন বই, পত্রিকা প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ করে প্রদর্শনীর আয়োজন করা যায়; গ্রন্থাগারের উপযোগিতা ও আনন্দ সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে সভার ব্যবস্থা করা চলে। এই সঙ্গে যে সকল শিক্ষার্থী গ্রন্থাগার ব্যবহারে উৎসাহ দেখিয়েছে, তাদের পুরস্কৃত করা যায় এই উপলক্ষ্যে।

ক্লাশকক্ষের মধ্যে সেই ক্লাশের প্রয়োজনমত একটি ক্ষুদ্র ক্লাশ-গ্রন্থাগার রক্ষা করলে শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগারের উপযোগিতা শিক্ষা দেওয়া সহজ হয়। কিন্তু এর জন্য যে অতিরিক্ত আসবাবপত্র, গ্রন্থাদি এবং আয়োজন দরকার হয়, তার ব্যবস্থা করা অনেক স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষেই সম্ভব হয় না। সুষ্ঠুভাবে ক্লাশরুম-গ্রন্থাগার সংগঠন করতে গেলে যেমন কিছু অতিরিক্ত অর্থবরাদ্দ প্রয়োজন, তেমনি সুদক্ষ উৎসাহী শিক্ষকমণ্ডলী না হলেও এই ব্যবস্থা সফল হতে পারে না। বলা বাহুল্য, এদেশের মাধ্যমিক স্কুলগুলি যে রকম অর্থাভাবের মধ্যে পরিচালিত হয়, তাতে প্রায় কোন স্কুলে উপযুক্তভাবে ক্লাশরুম-গ্রন্থাগার গড়ে তোলা সম্ভব হয় না।

স্কুল-গ্রন্থাগারের সফলতা নির্ভর করে অনেকাংশে গ্রন্থ নির্ব্বাচনের উপর। যদিও শিক্ষার্থীদের পাঠসহায়ক সহপাঠ্য গ্রন্থচর্চ্চার উদ্দেশ্যেই গ্রন্থাগার সংগঠন করা হয়, তবুও গ্রন্থনির্ব্বাচনের সময় নিতান্ত পাঠ্যসহায়ক গ্রন্থ ছাড়াও শিক্ষার্থীদের আগ্রহ অনুযায়ী আনন্দদায়ক পঠনতৃপ্তিকর যথেষ্ট গ্রন্থও নির্ব্বাচন করা দরকার। কোন কোন রাজ্য সরকার গ্রন্থাগারের উপযোগী গ্রন্থের একটি অনুমোদিত তালিকা প্রকাশ করে থাকেন, এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ এই তালিকা থেকে গ্রন্থ নির্ব্বাচন করে থাকেন। এই তালিকা গ্রন্থ নির্ব্বাচনে যথেষ্ট সাহায্য করে, কিন্তু সরকারী দপ্তর থেকে গ্রন্থ নির্ব্বাচনের রীতির মধ্যে যে সকল ত্রুটি থাকে, সেগুলির জন্য অনেক সময় এই তালিকা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

গ্রন্থাগারে তরুণ শিক্ষার্থীদের উপযোগী বিভিন্ন পত্রপত্রিকা রাখাও প্রয়োজন। বিভিন্ন বিষয়ে বহু সাময়িক পত্রিকা ইংরেজী ভাষায় বিদেশে প্রকাশিত হয়; কিন্তু ভারতীয় ভাষায়, বিশেষতঃ বাংলা ভাষায়, আজও নানা বিষয়ে ভাল সাময়িক পত্রিকা শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে প্রকাশিত হয় না। এ সকল কারণে গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে বিদেশী সাময়িক পত্র থেকে বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক তথ্যের সারাংশ সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় অনুবাদ করে পরিবেশন করতে হয়।

সংক্ষেপে, অর্থাভাব, স্থানাভাব এবং উপযুক্ত উৎসাহী শিক্ষকের অভাবে বর্তমানে ভারতীয় মাধ্যমিক স্কুলগুলির গ্রন্থাগার ব্যবস্থা একেবারেই অকার্য্যকরী হয়ে পড়েছে।

XI

PROBLEMS RELATING TO TECHNICAL, VOCATIONAL AND PROFESSIONAL EDUCATION

[Aims—relation with general education—individual aptitude—requirement of the country, plann-d economy, co-ordination between education and employment. Short history, present day position, spec.al problems and future plans of (a) Technical education, (b) Legal education, (c) Medical education, (d) Engineering education, (e) Agriculture, (f) Art and Craft, (h) other vocations and professions.]

Q. 1. What are the aims of vocational education ?

Ans. বৃত্তিমূলক শিক্ষা কেবল কর্ম্মসংস্থানের শিক্ষা নয়। কর্ম্মক্ষেত্রের উপযোগী দক্ষতা অর্জ্জন, ব্যবসাবাণিজ্যের কৌশল আয়ত্ত করা এবং বিভিন্ন বৃত্তিক্ষেত্রে প্রবেশের যোগ্যতা লাভ করাই বৃত্তিশিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য নয়। বৃত্তিশিক্ষা কারিগরের মনে স্বজনী উদ্দীপনা এনে দেয়, ব্যবসায়ীর মনে সেবার মনোভাব জাগ্রত করে, আইনজীবীর মনে বিচারের উপযোগিতা, কৃষিজীবীর মনে খাদ্য উৎপাদনের গুরুত্ববোধ, এবং চিকিৎসকের মনে জীবন রক্ষার মহান ব্রত জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। যে সকল মনোভাব, প্রক্ষোভ, নীতিবোধ, আচরণ, ভাষা ব্যবহার ও সৌন্দর্য্যমান কোনও কাজকে এক বিশিষ্ট বৃত্তিতে রূপান্তরিত করে উচ্চ মর্য্যাদা এনে দেয়, এবং কর্ম্মরত মানুষকে প্রতিবেশী ও জগতের নাগরিকমণ্ডলীর পরস্পরের সংরক্ষক করে তোলে, বৃত্তিশিক্ষা সেই সকল মনোভাব ইত্যাদির পরিপোষক। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন কাজের যেটিতে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত, সেখানে তাদের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বৃত্তিশিক্ষার প্রচলন।

উপযুক্ত পরিবেশ মানুষের জীবনকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে এবং যে মানুষের পরিবেশ তার সামর্থ্য, আগ্রহ এবং রুচির অনুকূল, তার কাছে জীবন আরও সুখময়। পরিবেশকে অনুকূল ও আকর্ষণীয় করে তোলার বিষয়ে আধুনিক সভ্যতায় বৃত্তিশিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থ উপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে বয়স্ক জীবনে সকল মানুষকেই কোন না কোন বৃত্তিগ্রহণ করে বর্ত্তমান সমাজে আপন আপন মর্যাদা ও অস্তিত্ব রক্ষায় সচেষ্ট হতে হয়; কিন্তু অর্থ উপার্জ্জনের তাগিদে যে কোন বৃত্তি গ্রহণ করে সেই বৃত্তি ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হওয়ায় বহু সম্ভাবনাময় ব্যক্তির জীবন দুর্ব্বিষহ হয়ে ওঠে। উপযুক্ত ক্ষেত্রের বৃত্তিশিক্ষার উদ্দেশ্য এই যে, সকল কর্ম্মীর কাজের পরিবেশকে চিত্তাকর্ষক জীবনধারার অনুকূল করে তোলা। বৃত্তিশিক্ষা

সেই জন্যই এমন পরিবেশের ভিত্তি স্থাপনা করে যার মধ্যে প্রতিটি মানুষ সার্থক জীবনের পথে ক্রমান্বয়ে পরিণতি লাভ করতে সক্ষম হয়।

জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করাই বৃত্তিশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। বৃত্তিশিক্ষা মানুষকে কিছু অর্পণ করে না, কিন্তু প্রতিটি উদ্যোগী, কৌতূহলী, প্রগতিকামী মানুষ যাতে আপন উদ্যোগে কোন কাজ করার তৃপ্তি পেতে পারে, বৃত্তিশিক্ষা সেই সকল সুযোগই উন্মোচন করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, বৃত্তিশিক্ষা মানুষের মনে কর্মোদ্যোগের স্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত করে এবং নিহিত সামর্থ্যের মুক্তি এনে দেয়, যাতে মানুষ বাঁচবার সুযোগ পেতে পারে।

জীবনযাপনের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য আছে, বৃত্তিশিক্ষা সেই ধারণা জাগাতে সহায়তা করে। উদ্দেশ্যের গুরুত্বহীন জীবনের মূল্য ও মর্য্যাদা অল্প। কোন কাজ উদ্দেশ্য সম্বলিত হলেই তবেই তার নাম বৃত্তি এবং এই উদ্দেশ্য সম্বলিত বৃত্তিশিক্ষাই অন্যান্য সকল সাধারণ শিক্ষা নীতি নির্দ্ধারণে বিশেষ সাহায্য করে। যখন কোন কাজের পিছনে উপযুক্ত মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট থাকে, তখনই মানুষ সেই কাজের জন্য চিন্তা করে এবং কাজে আত্মনিয়োগে ইচ্ছুক হয়। বৃত্তিশিক্ষার উদ্দেশ্য তরুণ শিক্ষার্থীর মনে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন বৃত্তির মূল্যবোধ জাগ্রত করা।

সকল মানুষের মনে জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সমান ধারণা থাকে না এবং কর্মোদ্যোগ বা সৃজনীক্ষমতাও সমান হয় না। বৃত্তিশিক্ষা এই ব্যক্তিবৈষম্যের মর্য্যাদা দান করে এবং বৈষম্য অনুসারে বিভিন্ন বৃত্তির সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির পরিচয় সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। অধীত বিদ্যার শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে বুদ্ধির তারতম্য থাকলে শিক্ষাগ্রহণের যে কোন স্তরে শিক্ষা সমাপনে বাধ্য হতে হয়, কিন্তু বৃত্তিশিক্ষার উদার বাস্তবসম্মত সহানুভূতিপূর্ণ ক্ষেত্রে বিকলাঙ্গ অথর্ব্ব জড়বুদ্ধি ব্যক্তিদেরও সার্থক জীবনের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হতে পারে। বৃত্তিশিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য ব্যক্তিবৈষম্য হ্রাস করে সকল মানুষকে ন্যূনতম সুখসমৃদ্ধির অধিকারী করে তোলা।

বৃত্তিশিক্ষার লক্ষ্য মানুষকে এমন কর্ম্মসংস্থানের পথনির্দ্দেশ দেওয়া, যার সাহায্যে প্রত্যেকে আপন সামর্থ্যের সার্থক মূল্যায়ন করে আপনার উপযোগিতা উপলব্ধি করতে পারে। রাষ্ট্রনেতাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনার্থে জনগণকে বিশেষ বৃত্তিপথে নিয়ন্ত্রিত করার আশঙ্কা থেকেও আধুনিক বৃত্তিশিক্ষা সমাজকে সচেতন করতে চায়। গণতান্ত্রিক সমাজে সকলের সামর্থ্যমত কাজ করার সুযোগ ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করাই বৃত্তিশিক্ষার লক্ষ্য। শ্রমের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখাই এর উদ্দেশ্য।

পুঁথিগত শিক্ষার অবাস্তব আধিক্য হ্রাস করে শিক্ষাকে বাস্তবমুখী করার বিষয়েই বৃত্তিশিক্ষা আগ্রহশীল। পরিবর্ত্তনশীল জগতের নিত্য নূতন

জীবনসংগ্রামের সম্মুখীন হওয়ার সার্থক জীবনদর্শনের উপলব্ধি ঘটে এই বৃত্তিশিক্ষার মাধ্যমেই।

Q. 2. Bring out the relation of vocational education with general education.

Ans. বর্তমান শতাব্দীর সুরু থেকেই শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে বৃত্তি শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার সম্পর্ক সম্বন্ধে মতভেদ দেখা দিয়েছে। শিক্ষা-সংগঠকদের অনেকে বলেন, বৃত্তিশিক্ষা মূলতঃ সাধারণ শিক্ষারই শাখাবিশেষ এবং অঙ্ক, বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার যে সম্পর্ক, বৃত্তিশিক্ষার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার সম্পর্ক সেইরকমই। আবার বৃত্তিশিক্ষাক্ষেত্রে নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ সংগঠকদের ধারণা, বৃত্তি শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে এক সামগ্রিক শিক্ষাসূচীর দুটি প্রধান শাখা মাত্র এবং এই দুইটি শাখাই একটি অপরটিকে অন্তর্ভুক্ত করে, এমন কোন কথা নেই। দুইটি শাখাই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং কর্মী-সমাজের শিক্ষার জন্য এই দুইটি শাখারই সহায়তা অবশ্য প্রয়োজন।

বৃত্তিশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার যথার্থ সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা থাকার ফলেই সম্ভবতঃ মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণতঃ, সাধারণ শিক্ষা বলতে সার্থক জীবনযাপনের জন্য এমন সব জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব আহরণের শিক্ষা বোঝায়, যার সঙ্গে বিশেষভাবে কোনও বৃত্তিক্ষেত্রের উপযোগিতার কথা ওঠে না। এই ধরনের সাধারণ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ প্রসঙ্গে অনেক সময় সংস্কৃতি, উদার শিক্ষা, অধীত বিদ্যা, বৃত্তি-বহির্ভূত শিক্ষা প্রভৃতি কথার প্রচলন আছে। সাধারণ শিক্ষা বলতে অনেক ক্ষেত্রে বৃত্তিশিক্ষাসহ সামগ্রিক শিক্ষাও বোঝানো হয়।

শিক্ষাদর্শনের বিভিন্ন মতবাদের জন্য সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষার সংজ্ঞার মধ্যে এই দ্বন্দ্ব। বহু শিক্ষাবিদ্ বিশ্বাস করেন, উপযুক্ত সাধারণ মৌলিক (ফাণ্ডামেণ্টাল) শিক্ষাই বৃত্তিশিক্ষার প্রস্তুতির পক্ষে যথেষ্ট। এই সকল শিক্ষাবিদ্‌দের মতে সাধারণ শিক্ষার মধ্যে অল্প পরিমাণে কৃষিবিদ্যা, গৃহবিজ্ঞান, বাণিজ্যবিজ্ঞান, শিল্পসংক্রান্ত জ্ঞানচর্চ্চার যে আয়োজন আছে, সেইটুকুই যথেষ্ট; স্কুলশিক্ষার মধ্যে বিশেষভাবে বৃত্তিশিক্ষার প্রয়োজন নেই। তবে বৃত্তি-শিক্ষাক্ষেত্রে নিযুক্ত সংগঠকগণ বলেন, সাধারণ শিক্ষাসূচীর ঐ সকল স্বল্পতম জ্ঞান আহরণ করে কোনও তরুণ বৃত্তিক্ষেত্রে দ্রুত সাফল্যলাভ করতে পারে না দেখা গেছে। অতএব তাঁদের মতে, প্রত্যেক বৃত্তির জন্য অধিকতর বিশেষ জ্ঞানচর্চ্চার প্রয়োজনেই ব্যাপক বৃত্তিশিক্ষার আবশ্যকতা রয়েছে।

বস্তুতঃ, তরুণ ও বয়স্ক নাগরিকদের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ ও সফলতার জন্য উভয় ধারার শিক্ষাই প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষা থেকে বৃত্তিশিক্ষার কার্য্যসূচীতে

অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় গ্রহণ করতে হবে এবং বৃত্তিশিক্ষার আকর্ষণীয় বিষয়ের কিছু কিছু সাধারণ শিক্ষাসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার্থীর কাছে সামগ্রিক শিক্ষার অখণ্ডরূপ তুলে ধরতে হবে। উভয় ধারার শিক্ষার মধ্যে এইভাবে সার্থক সমন্বয় সাধন করে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করতে হবে।

অনেকে মনে করেন, সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক এবং বৃত্তিশিক্ষার সঙ্গে উপযোগিতার সম্পর্ক আছে। যা জীবনধারণের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে একান্ত উপযোগী, বৃত্তিশিক্ষা কেবল সেই সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীকে সচেতন করে, ফলে সংস্কৃতির ধ্বংস হতে পারে। এইজন্য বৃত্তিশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন। যাঁরা এইভাবে বৃত্তিশিক্ষাকে সংস্কৃতির পরিপন্থী বলে আশঙ্কা করেন, তাঁদের কাছে সংস্কৃতির অর্থ সনাতন কতকগুলি মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্য। বস্তুতঃ, সংস্কৃতি কেবলমাত্র অতীতের ঐতিহ্যকে নিয়েই গড়ে ওঠে না। যথার্থভাবে মূল্যায়িত জীবনধারাই হলো প্রকৃত সংস্কৃতি এবং সেই মূল্যায়ন অনুসারে জীবনযাপনই সংস্কৃতির পরিচায়ক। সংস্কৃতিসম্পন্ন প্রতিটি ব্যক্তি নানা কাজের মধ্যে সত্য ও সুন্দরের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন, কেবলমাত্র অতীতের ঐতিহ্যই তাঁর একমাত্র পথপ্রদর্শক নয়। তাঁর কাজের মধ্যে পরিবর্ত্তনশীলতা আছে এবং বর্ত্তমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলে। সুতরাং বৃত্তিশিক্ষার মধ্যেও গতিষ্ণু নব্য সংস্কৃতির সংরক্ষণ সম্ভব।

বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক চিন্তার যুগে অনেকে মনে করেন, শিক্ষার্থীকে কোনও একটি বিশেষ শিক্ষা দিলে সে অন্য বৃত্তি গ্রহণে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং এই কারণে বৃত্তিশিক্ষা গণতন্ত্রসম্মত নয়। শিক্ষার্থীদের উদারনৈতিক সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত করে আপন উদ্যোগে পরীক্ষানিরীক্ষার সাহায্যে বৃত্তি গ্রহণের প্রস্তুতিলাভে উৎসাহ দেওয়াই গণতন্ত্রের পরিপোষক। এই মতবাদ অনুসারে বৃত্তিশিক্ষায় কোন বিশেষ বৃত্তির উপর গুরুত্ব আরোপ না করে সাধারণভাবে বৃত্তিক্ষেত্রের পরিচয় দানই যথেষ্ট।

কিন্তু এই মতবাদের বিরোধিতা করে বলা হয়, আধুনিক সমাজে সকল কর্ম্মীর সামর্থ্য অনুসারে সমানাধিকার প্রদানই অধিকতর গণতন্ত্রসম্মত এবং সেই অনুযায়ী কোনও এক ধরনের সাধারণ শিক্ষা সকল প্রকার সামর্থ্যের শিক্ষার্থীর প্রয়োজন মিটাতে পারে না। সুতরাং শিক্ষার্থীর বহুমুখী কর্ম্মোদ্যোগের অনুকূল বিবিধ বৃত্তিশিক্ষার সর্ব্বপ্রকার আয়োজন শিক্ষাসূচীর মধ্যে থাকা দরকার। এই বিবিধ বৃত্তিশিক্ষা একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সম্ভব নয় বলে একাধিক বিশেষ ধরনের বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংগঠন প্রয়োজন। এইভাবেই গণতন্ত্রের যুগে সকলকে সমান সুযোগ ও অধিকার দেওয়া সম্ভব।

অনেকের মতে সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বৃত্তিশিক্ষা

স্থগিত রাখা বিধেয়, কারণ অতি অল্পবয়সে বৃত্তিশিক্ষার সামর্থ্য থাকে না। বৃত্তিশিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্র থেকে পৃথক রাথার যুক্তিতেই এই মতবাদের উদ্ভব। কিন্তু শিক্ষানীতির দিক থেকে এই মতবাদ ভিত্তিহীন, কারণ শিক্ষার্থীর শিক্ষার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহের সঙ্গেই সার্থক শিক্ষার সম্পর্ক আজ বিশেষজ্ঞমহলে স্বীকৃত হয়েছে। বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে বৃত্তি-শিক্ষাকে সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখা চলছে না। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিশিক্ষার মূল তত্ত্বগুলি শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। তাছাড়া, কাজের আনন্দ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের কোন বয়ঃসীমা নেই। শিক্ষার্থী যখনই কাজ ভালবাসে, তখনই সকল সাধারণ শিক্ষা অক্ষুণ্ণ রেখেই সে সামর্থ্য অনুযায়ী যে কোন বৃত্তিশিক্ষা গ্রহণ করে আপন দক্ষতা বৃদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব গঠন করতে পারে।

Q. 3. Discuss the importance of technical education for the requirements of national development of India.

Ans. ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে কারিগরী শিক্ষার দুইটি মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রথমতঃ, কারিগরী শিক্ষার মাধ্যমে কেবল সঙ্কীর্ণ বৃত্তিক্ষেত্রের উপযোগী কর্মী সৃষ্টি ছাড়াও সুদক্ষ ইনজিনীয়ারদের মধ্যে মানবিক ও সামাজিক উপযোগিতা বোধ জাগাতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, কারিগরী শিক্ষার সাহায্যে দেশের নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ পুনর্গঠিত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার প্রগতির সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সামঞ্জস্য বিধান করে ভারতের কারিগরী শিক্ষাব্যবস্থার নবরূপ দান করা দরকার।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির সাহায্যে দেশের বিভিন্ন শিল্প, বাণিজ্য, বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন, প্রতিরক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য বহু সুদক্ষ কারিগর ও ইঞ্জিনীয়ারের আবশ্যক বোধ করা যাচ্ছে। যদিও কারিগর ও ইঞ্জিনীয়ারদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বহু কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ টাকা এই বাবদ ব্যয় করা হচ্ছে, দেশের ইঞ্জিনীয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু ভারতের মত বিশাল উপমহাদেশে সেই বৃদ্ধি এখনও আশানুরূপ ফল প্রদর্শন করতে পারছে না। সংখ্যাগত উন্নয়ন কিছু পরিমাণে পরিলক্ষিত হলেও অনেকে আশঙ্কা করেন, ভারতের কারিগরী শিক্ষার উৎকর্ষমান উন্নত হয় নি।

কারিগরী শিক্ষার উৎকর্ষমান উন্নয়নের সমস্যা ত্রিমুখী—শিক্ষক, উপকরণ এবং ভবন। কারিগরী শিক্ষার জন্য এই তিনটি বিষয়ে যথোপযুক্ত আয়োজন না থাকলে শিক্ষার উৎকর্ষমান রক্ষা করা দুরূহ। অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে উপযুক্ত

কারিগরী শিক্ষক, শিক্ষা-উপকরণ সরবরাহ এবং আধুনিক কারিগরী শিক্ষাভবন নির্ম্মাণের যথাসম্ভব আয়োজন করেছেন। কিন্তু ইদানীং যে রকম দ্রুতহারে কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি করা হচ্ছে, সেই অনুপাতে কারিগরী শিক্ষক শিক্ষণের গতি বৃদ্ধি পায় নি। ফলে, বহু প্রতিষ্ঠানে কারিগরী শিক্ষার উৎকর্ষমান রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না।

কারিগরী শিক্ষার বিভিন্ন নূতন শাখার প্রতি শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষের অধিকতর মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। সম্প্রতি পারমাণবিক বিজ্ঞানের যে প্রভূত বিকাশ সম্ভব হয়েছে, সে বিষয়ে আধুনিকতম শিক্ষাদানের আয়োজন না থাকলে দেশের প্রগতি ব্যাহত হবে। সিভিল, মেকানিক্যাল এবং ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইঞ্জিনীয়ারিং ছাড়াও মাইনিং, মেটালরজী, কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, স্থপতি-বিদ্যা, নগর পরিকল্পনা প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার উপযোগী কারিগরী শিক্ষারও আয়োজন করা দরকার। অবশ্য এই সকল প্রকার কারিগরী শিক্ষা শাখার প্রারম্ভিক পাঠক্রমে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা এবং গণিত শিক্ষা অপরিহার্য্য।

দেশের শিল্পে প্রগতি অক্ষুন্ন রাখার জন্য ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সুদক্ষ সুস্থমনা কর্ম্মীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। এজন্য মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর থেকেই বিভিন্ন প্রবাহ অনুসারে বিবিধ কারিগরী শিক্ষার প্রারম্ভিক অনুশীলন সুরু করা বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্যে এদেশে জুনিয়র টেকনিক্যাল হাইস্কুলের ৩ বছরের পাঠক্রম বিশেষ উপযোগী এবং এই পাঠক্রম অনুসারে দেশের সর্ব্বত্র কারিগরী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।

কারিগরী শিক্ষা প্রসারের সমস্যা স্বরূপ শিক্ষকের অভাব, উপকরণের অপ্রাচুর্য্য এবং শিক্ষাভবনের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এছাড়াও শিক্ষার্থী সমস্যা আছে। কারণ শিক্ষার্থী উপযুক্ত কারিগরী শিক্ষার শাখা নির্ব্বাচন করতে না পারলে তার শিক্ষাগ্রহণ অনেকাংশে ব্যর্থ হয়। শিক্ষার্থীদের আবাস সংস্থান, শিক্ষাব্যয়, শিক্ষার্থী কল্যাণ প্রভৃতি বিষয়ে যথাযথ যত্ন অবলম্বন না করা হলে ব্যয়বহুল কারিগরী শিক্ষার অপচয় ঘটে এবং ভবিষ্যতের ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগরদের দক্ষতা ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

জাতীয় প্রগতির সঙ্গে জড়িত রয়েছে এই কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থা, সুতরাং এবিষয়ে যত্ন নেওয়া প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই কর্ত্তব্য। সমস্যাবলী সম্পর্কে নিয়ত গবেষণার আয়োজন দরকার। কারিগরী শিক্ষার সুযোগ সকল উৎসাহী তরুণের কাছে সহজলভ্য করতে হবে।

Q. 4. Discuss the importance of vocational education in fighting the problems of unemployment in a planned economy.

Ans. দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে অত্যধিক উদারতা ও

স্বাধীনতার সুযোগ থাকলে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের ত্রুটির ফলে দেশ ও জাতির সমূহ ক্ষতি হতে পারে। স্বাধীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের আয়বণ্টনের সমতা রক্ষা করা যায় না, দারিদ্র্য বিস্তার লাভ করে। পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে মনোমালিন্য ও বিরোধ বৃদ্ধি পাওয়ার মূলেও থাকে স্বাধীন অর্থনীতির কুপ্রভাব। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অপরিকল্পিত স্বাধীনতা থাকলে দেখা গেছে বেকার সমস্যার ভয়াবহ ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে তেজীমন্দার যথাযথ পূর্ব্ব ধারণা করতে অক্ষম হওয়ার দরুণ, বহু ব্যবসায়ী শ্রমিক নিয়োগ বিষয়ে অমিতব্যয়িতার পরিচয় দিয়ে সর্ব্বনাশ সৃষ্টি করে। এই জন্যই অধুনা পরিকল্পিত অর্থনীতি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন সুরু হয়েছে। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শিল্প উৎপাদনের জন্য প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের যথাযথ সদ্ব্যবহারের বন্দোবস্ত হয় এবং বেকার সমস্যার সমাধান সুনিশ্চিত করে জনগণের জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নের প্রচেষ্টায় সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা রক্ষার পথ সুগম করে।

অর্থনীতিবিদ্‌গণ বলেন, ব্যাপক বেকার সমস্যার উদ্ভব হয় পণ্যদ্রব্যের চাহিদার অভাব ও কর্ম্মসংস্থানের চাহিদার অভাব থেকে। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে হলে রাষ্ট্রের উদ্যোগে পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমে নাগরিকদের ব্যয়ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হয়। যখনই সামগ্রিকভাবে জাতীয় ব্যয় বৃদ্ধি পাবে, তখনই জনসাধারণের মধ্যে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং সেই সকল পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য অধিকতর সংখ্যায় কর্ম্মসংস্থানের প্রয়োজন অনুভূত হবে, ফলে বেকার সমস্যার সমাধান হবে। অন্যভাবে, রাষ্ট্র নিজে অধিকতর অর্থব্যয়ে উদ্যোগী হতে পারে ; রাস্তা নির্ম্মাণ, সেতু, বাসগৃহ প্রভৃতি সংগঠনের পরিকল্পনা করে বেকার সমস্যা মিটাতে পারে।

এইভাবে কর্ম্মসংস্থানের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে স্বভাবতই সুদক্ষ কর্ম্মীর প্রয়োজন অনুভূত হয়ে থাকে, কারণ উপযুক্ত কর্ম্মী না হলে কেবলমাত্র বেকার সমস্যার দাবীতেই রাষ্ট্র বা শিল্পপতিরা সকলকে পছন্দমত কর্ম্মসংস্থান দিতে পারে না। এইজন্যই বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষার সুষ্ঠু আয়োজনও যে কোনও পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গীভূত। আমাদের দেশে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার পর থেকে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হচ্ছে এবং সেইজন্য কারিগরী ও বৃত্তিশিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

অপরপক্ষে, কারিগরী ও বৃত্তিশিক্ষার ব্যাপক আয়োজনের ফলে অধিকতর সংখ্যায় সুদক্ষ কর্ম্মী ও কারিগর সৃষ্টি হওয়া সত্বেও যদি দেশে সুষ্ঠু সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থানুযায়ী কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা না থাকে, তবে বৃত্তিশিক্ষার সমস্ত সুফল ব্যর্থ হবে এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণদের মনে হতাশার মনোভাব জাগ্রত হবে। তাছাড়া, পরিকল্পিত অর্থনীতি ভিন্ন শিক্ষণপ্রাপ্ত কারিগরদের

উপযুক্ত কাজে লাগানো না গেলে ব্যাপকভাবে শ্রম অপচয় ঘটবে। তার ফলে বৃত্তিশিক্ষার প্রতিও তরুণদের আগ্রহ হ্রাস পাবে। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য বৃত্তিশিক্ষা গ্রহণ একমাত্র উপায় নয়; বৃত্তির উপযুক্ত কর্ম্মসংস্থানের আয়োজনই প্রাথমিক প্রয়োজন।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রগতির যুগে অনেক সময় শিল্পক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা বা অনুরূপ নূতন উৎপাদন ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ায় বেকার সমস্যার উদ্ভব হয়। কখনও বা জনসাধারণের চাহিদা পরিবর্ত্তিত হয়—যেমন বই কেনা কমিয়ে সিনেমা দেখা বৃদ্ধি করা। এসব ক্ষেত্রে পরিকল্পিত অর্থনীতি অনুযায়ী একটি বিশেষ বৃত্তিক্ষেত্র থেকে শ্রমিক ও কারিগরদের বিভিন্ন উপায়ে অন্য বৃত্তিক্ষেত্রে আগ্রহ ও দক্ষতা পরিবর্ত্তন করাতে হয়। যে বৃত্তিক্ষেত্রে জনসাধারণের চাহিদা হ্রাস পায়, সেখানে মন্দা হওয়ার দরুন কর্ম্মসংস্থান হ্রাস পায় এবং সেই বৃত্তিক্ষেত্রে শিক্ষাদান অব্যাহত থাকলে বেকার সমস্যা প্রকট হয়। অতএব, পরিকল্পিত অর্থনীতি অনুসারে সমাজের পরিবর্ত্তনশীল প্রয়োজনমত বৃত্তিশিক্ষার আয়োজন করতে হবে এবং সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যেন কোনও বৃত্তিক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্ম্মী-শিক্ষণের ব্যবস্থা না হয়।

পরিকল্পিত অর্থনীতি ভিন্ন বৃত্তিশিক্ষার আর একটি অসুবিধা এই যে, সাধারণতঃ যেসকল বৃত্তিক্ষেত্রে বিপুল অর্থ উপার্জ্জনের সম্ভাবনা থাকে, অভিভাবকগণ সন্তানদের আগ্রহ ও সামর্থ্যের বিচার না করেই সেই সকল বৃত্তিক্ষেত্রে শিক্ষণ গ্রহণের জন্য তরুণদের প্রেরণ করেন। স্বভাবতঃ, এই ধরণের মনোভাব বৃত্তি শিক্ষাক্ষেত্রে এবং পরে বেকার সমস্যা ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করে। সুতরাং জাতীয় অর্থনীতির প্রয়োজনে বিভিন্ন বৃত্তিক্ষেত্রে ঠিক যে পরিমাণ যে সামর্থ্যের কর্ম্মী প্রয়োজন, সেইরূপ ভাবে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার। স্বাধীন স্বেচ্ছাচার উৎসাহে একটি বিশেষ বৃত্তিশিক্ষার জন্য আত্মনিয়োগ করে অন্যান্য বৃত্তিশিক্ষাকে অবহেলা করলে বেকার সমস্যার উদ্ভব হতে পারে।

Q. 5. Discuss the need of co-ordination between vocational education and employment.

Ans. বৃত্তিশিক্ষা গ্রহণান্তে তরুণ কর্ম্মীরা যাতে উপযুক্ত বৃত্তিক্ষেত্রে নিযুক্ত হতে পারে, তার প্রস্তুতি সুরু হয় শিক্ষাগ্রহণ কালেই। বৃত্তিশিক্ষা ও বৃত্তিক্ষেত্রে নিয়োগ বিষয়ে নিবিড় সমন্বয় সংযোগ না থাকলে এই প্রস্তুতি সুসম্পন্ন হওয়া সহজ নয়। বৃত্তিশিক্ষা ও কর্ম্মসংস্থানের মধ্যে এজন্য সমন্বয় রক্ষার ব্যবস্থা অপরিহার্য্য এবং সেই ব্যবস্থা স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কর্ম্মক্ষেত্রেই প্রথম সূচনা হয়। প্রত্যেক বৃত্তিশিক্ষার স্কুলে যেমন পথনির্দ্দেশ কেন্দ্র

(guidance bureau) থাকা দরকার, তেমনি অন্যান্য শিক্ষাস্তরেও সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপদেষ্টা পরিষদ থাকা প্রয়োজন। এই পথনির্দ্দেশ কেন্দ্র বা উপদেষ্টা পরিষদ বিভিন্ন শিল্পসংস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করবে এবং শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে বৃত্তিশিক্ষার আধুনিক প্রয়োজনগুলি সম্পর্কে যথাসম্ভব বিশদ তথ্য সংগ্রহ করে বৃত্তিশিক্ষার্থীদের সাহায্য করবে। বৃত্তিশিক্ষার জন্য শিক্ষাবিদ্‌রা যে পাঠক্রম নির্দ্ধারণ করে থাকেন, তা চিরকাল একইভাবে কার্য্যকরী থাকতে পারে না; শিল্পবাণিজ্যের প্রগতি ও পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ও কর্ম্মীদের বিভিন্ন যোগ্যতা ও দক্ষতার চাহিদাও পরিবর্ত্তিত হতে থাকে। বৃত্তিশিক্ষার পাঠক্রম রচয়িতাগণ পথনির্দ্দেশ কেন্দ্র বা উপদেষ্টা পরিষদের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে যদি সদাসর্ব্বদা পাঠক্রম সংস্কারে উদ্যোগী থাকেন, তবেই বৃত্তিশিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ কর্ম্মীরা সার্থকভাবে বৃত্তিক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করতে পারবে।

পথনির্দ্দেশ কেন্দ্র ও উপদেষ্টা পরিষদগুলি এছাড়া শিল্পসংস্থা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও কর্ম্মী সংগ্রহ বিষয়ে নানাপ্রকারে সাহায্য করতে পারে। বৃত্তিশিক্ষাকেন্দ্রে যে সকল শিক্ষার্থী নিষ্ঠার সঙ্গে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে, তাদের সম্পর্কে কর্ম্মসংস্থান ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুমোদন করা, মাঝে মাঝে শিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের তালিকা শিল্পসংস্থাগুলিতে পাঠানো প্রভৃতি কাজের দ্বারা তরুণ কর্ম্মীদের কর্ম্মসংস্থানের পথ সুগম করা যায় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ম্মীসংগ্রহ সমস্যাও বহুলাংশে লাঘব করা যায়।

বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ যদি প্রত্যক্ষভাবে কোনও বৃত্তিক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থাকেন, তাহলে তাঁরা বৃত্তিক্ষেত্র সম্পর্কে যথাযথ তথ্য যেমন ভালভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করতে পারেন, তেমনই সার্থকভাবে উপযুক্ত শিক্ষার্থীদের যথাযথ বৃত্তিক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের পরামর্শ ও পথনির্দ্দেশ দিতে পারেন। বৃত্তিশিক্ষা ও কর্ম্মসংস্থানের মধ্যে সমন্বয় রক্ষার পক্ষে এইজন্যই বৃত্তিসংশ্লিষ্ট শিক্ষকের প্রয়োজনই বেশি।

দেশের সর্ব্বত্র কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্র বা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ আছে। সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং আগ্রহী কর্ম্মীদের মধ্যে সেই তথ্য প্রচারই এই সকল কেন্দ্রের কর্ত্তব্য। বিশেষ বিশেষ বৃত্তিক্ষেত্রের যোগ্যতা, বৃত্তিক্ষেত্রের বর্ত্তমান পরিস্থিতি প্রভৃতি বিষয়ে যথাযথভাবে তরুণদের অবহিত না করলে বৃত্তিশিক্ষা গ্রহণ করেও উপযুক্ত বৃত্তিক্ষেত্র নির্ব্বাচনে অনেক বিভ্রান্তি বোধ করে এবং অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ করে সময় ও শক্তির অপচয় করে।

অবশ্য বৃত্তিক্ষেত্রে প্রবেশের পরেও তরুণদের শিক্ষা বিকাশ অব্যাহত থাকে। অর্থাৎ বৃত্তিক্ষেত্র সম্পর্কে পূর্বে শিক্ষার্থী নীতিগতভাবে যে সকল জ্ঞান অর্জ্জন করে থাকে, সেগুলি প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগের সময় ব্যক্তি বৈষম্য অনুসারে

নূতনভাবে সমন্বিত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সুতরাং নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে বৃত্তিক্ষেত্রেও তরুণ নবীন কর্ম্মীর শিক্ষা বিকাশ চলতে থাকে। এসময়ে যদিও স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কিছু করণীয় থাকে না, তবে বৃত্তিক্ষেত্রের তত্ত্বাবধায়কগণ সহানুভূতির সঙ্গে নবীন কর্ম্মীদের সমন্বয়ন শিক্ষাদানে যত্নবান হলে সুফল পাওয়া সহজ হবে। প্রয়োজন হলে একটি নূতন বৃত্তিক্ষেত্রে নূতন কর্ম্মী অক্ষম ও অনাগ্রহী মনে হলে, তাকে অধিকতর চিত্তাকর্ষক বৃত্তিক্ষেত্রে সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুসারে স্থানান্তরিত করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। প্রত্যেক বৃত্তিক্ষেত্রে শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে এজন্যই সুদক্ষ কর্ম্মসংস্থান তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা উচিত। তাতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক অকারণে ক্ষুণ্ণ হতে পারে না।

বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও প্রাক্তন শিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণদের নিয়ে সন্ধ্যাবেলা নিয়মিত পথনির্দ্দেশনার কাজ চালাতে পারে। বৃত্তিক্ষেত্রে নিযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্ম্মীরা এই সময়ে আপন আপন অসুবিধাগুলি তাদের পূর্ব্বতন শিক্ষকদের কাছে জানাতে পারলে অনেক সময় যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। কারণ শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বহুদিন যাবৎ সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে তাদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারেন এবং সেই ধারণা অনুসারে তরুণ কর্ম্মীদের সমস্যা সমাধানে সহায়তা করতে পারেন। অবশ্য এই ধরণের কর্ম্মকালীন পথনির্দ্দেশনা গ্রহণের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার উৎসাহ শিল্পবাণিজ্য সংস্থাগুলি থেকেই কর্ম্মীদের কাছে আসা বাঞ্ছনীয়।

Q. 6. Write a short history of technological and engineering education in India.

Ans. একসময়ে ভারতবর্ষ কারিগরী ও ইঞ্জিনীয়ারীং বিদ্যায় সুদক্ষ ছিল। মহেনজদারোর নগর পরিকল্পনা ও স্থপতির নিদর্শন তার দৃষ্টান্ত। ঋগ্বেদেও খাল ও নদীর বাঁধ গঠনের কারিগরী নিপুণতার উল্লেখ আছে। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণকালে এদেশে উত্তম শ্রেণীর ইস্পাত নির্ম্মিত হতো, তার প্রমাণ ইতিহাসে আছে। পরবর্ত্তীকালে এবিষয়ে ভারতের অবনতি ঘটে।

বৃটিশ রাজত্বকালে ভারতে কারিগরী ও ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার পুনরুজ্জীবন ঘটে। রাস্তাঘাট, খাল, বন্দর প্রভৃতি নির্ম্মাণ এবং উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উপযোগী কর্ম্মীপ্রস্তুতির জন্য বৃটিশ শাসকগণ এদেশে কারিগরী ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষাদানের আয়োজন করে। সৈন্য বিভাগ, জমি জরীপ প্রভৃতির জন্য বৃটেন থেকে সুদক্ষ উচ্চপদস্থ কর্ম্মীদের পূর্বে আনা হতো, কিন্তু নিম্নপদস্থ কর্ম্মীদের বিলাত থেকে আনা যুক্তিসঙ্গত নয় বলে সমরাস্ত্র নির্ম্মাণের

কারখানার সঙ্গে বা অন্যান্য ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কারিগরী শিল্প শিক্ষার স্কুল প্রতিষ্ঠা সুরু হয়। প্রথমে মাদ্রাজের অস্ত্রনির্মাণ কারখানায় ১৮৪২ সালে একটি কারিগরী স্কুল স্থাপিত হয়; পরে ১৮৫৪ সালে পুণাতেও অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয় ১৮৪৭ সালে উত্তরপ্রদেশের রুরকীতে। পরে সরকারী উদ্যোগে ১৮৫৬ সালে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংএ ক্যালকাটা কলেজ অব সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠিত হয়; পরবর্তীকালে এই কলেজের নাম হয় বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এবং শিবপুরে স্থানান্তরিত হয়। পুণার এবং মাদ্রাজের কারিগরী স্কুলগুলি ১৮৫৮ সালে কলেজ পর্য্যায়ে উন্নীত হয়। ১৮৮০ সালের পর এদেশে যন্ত্র ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় বোম্বাইতে ১৮৮৭ সালে ভিক্টোরিয়া জুবিলী টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হয় এবং যন্ত্র (মেক্যানিক্যাল), বিদ্যুৎ (ইলেকট্রিক্যাল) এবং বস্ত্র (টেক্সটাইল) ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার প্রশিক্ষণ দান সুরু করে।

১৯১৫ সালে ব্যাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষাক্রম প্রবর্ত্তিত হয় এবং পরে এই বিষয়ে ডিগ্রী দান সুরু হয়। ১৯০৭ সালে বাংলাদেশের স্বদেশী নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশন নামে এক বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনের প্রচেষ্টা হয়; এই প্রচেষ্টার ফলে যাদবপুর কলেজ অব ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড টেকনোলজী নামে, যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি সৃষ্টি হয়। সেখানে ১৯০৮ সালে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং এবং ১৯২১ সালে কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষাক্রম প্রবর্ত্তিত হয়।

১৯১৫ সালে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কমিশনের বিবরণীতে বলা হয় যে, ভারতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নির্ম্মাণের শিল্প বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। নতুবা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণদের মধ্যে বেকার সমস্যা দেখা দিতে পারে।

১৯১৭ সালে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের প্রচেষ্টায় কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ডিগ্রী শিক্ষাক্রম প্রবর্ত্তিত হয়। মেটালারজী বা খনিজ দ্রব্যসম্পর্কিত ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যারও সূচনা প্রথম এইখানেই হয়। ক্রমশ ১৯৪০ সালের মধ্যে শিবপুর, মাদ্রাজ ও পুণাতেও মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ও মেটালারজী ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষাক্রম প্রবর্ত্তিত হয়।

বৃটিশ আমলে ভারতে ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরী শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রথম দিকে ছিল না বলে ইংলণ্ডে নির্ব্বাচিত শিক্ষার্থীদের পাঠানো হতো। ভারতীয়রা এই ব্যবস্থায় অসন্তোষ প্রকাশ করায় ১৯২১ থেকে ১৯৩৭ সালের

মধ্যে ভারতে বহু ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এগুলির মধ্যে ধানবাদের ইণ্ডিয়ান স্কুল অব্ মাইন্‌স্, কানপুরের হারকোর্ট টেকনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট এবং বোম্বাইএর স্কুল অব কেমিক্যাল টেকনোলজি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রতিককালে ভারতে ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরী বিদ্যার প্রসার ব্যাপকতা লাভ করার দুটি মূল কারণ আছে। প্রথমতঃ, দেশব্যাপী শিক্ষিত বেকার সমস্যার ভয়াবহতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন বৃত্তিশিক্ষার উপযোগিতা অনেকে ক্রমশ উপলব্ধি করছে এবং শ্রমমূলক কাজ মানহানিকর, এই ভুল ধারণা দূরীভূত হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বযুদ্ধের ফলে বৃটিশ সরকার সামরিক প্রয়োজনে কারিগরী শিক্ষাপ্রসারে বাধ্য হয় এবং দেশের সর্ব্বত্র কারখানা ও শ্রমশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

ক্রমশই ভারত সরকার উপলব্ধি করে যে, কারিগরী শিক্ষাপ্রসারের দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর ন্যস্ত রেখে নিশ্চিন্ত থাকা চলবে না। এবং সমগ্র দেশে কারিগরী শিক্ষার প্রসার, সমন্বয়ন ও গবেষণার সুষ্ঠু আয়োজন কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারত সরকারের উদ্যোগে ধীরে ধীরে ভারতের এক সামগ্রিক কারিগরী শিক্ষা পরিকল্পনা রূপ গ্রহণ করে। ঐ পরিকল্পনার অঙ্গীভূত হয়:

১। ১৯৪০ সালে বোর্ড অব সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ সংগঠিত হয় শ্রমসম্পর্কিত গবেষণা প্রসারের উদ্দেশ্য।

২। ১৯৪১ সালে দিল্লী পলিটেকনিক স্থাপিত হয়।

৩। ১৯৪৫ সালে সরকার (Sarkar) কমিটি নিযুক্ত হয় এবং এই কমিটি বলেন, ভারতের পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে অন্ততঃ একটি করে উচ্চতর কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হওয়া উচিত দেশের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের জন্য।

৪। ১৯৪৫ সালে অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫। ১৯৪৭ সালে সায়েন্টিফিক ম্যান-পাওয়ার কমিটি নিযুক্ত হয় এবং এই কমিটির তথ্যানুসন্ধান থেকে দেশের পুনর্গঠনের জন্য কারিগর ও ইঞ্জিনীয়ারদের প্রয়োজন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হয়।

Q. 7. Describe the development of technical education in free India and its present position.

Ans. ভারত স্বাধীন হওয়ার পর শিল্পোন্নতি, জলসেচ, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, পরিবহন ব্যবস্থা, সংযোগ ব্যবস্থা কৃষি উন্নতি এবং বহু বিবিধ উন্নয়নমূলক কাজের জন্য কারিগরী শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী

পরিকল্পনার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যায় পর্য্যন্ত কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা দেশের সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত করার প্রচেষ্টা স্থরু হয় এবং এর জন্য ঐ পরিকল্পনাকালে প্রায় ২৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কারিগরী শিক্ষার প্রসারের জন্য ৪৮.৭০ কোটি টাকা ব্যয় মঞ্জুর হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কারিগরী শিক্ষার কর্ম্মসূচীতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে সর্ব্বপর্য্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্ম্মীবৃন্দের সংখ্যাবৃদ্ধির ওপর, পর্য্যাপ্ত সংখ্যায় শিক্ষক সংগ্রহ, বৃত্তি এবং ফেলোশিপের ব্যবস্থা, আংশিক সময়ের পাঠক্রম এবং ডাকযোগে শিক্ষার পাঠ্যক্রমের প্রবর্ত্তন, কতকগুলি ক্ষেত্রে বিশেষ পাঠ্যক্রমের উন্নয়ন, প্রাপ্য প্রাকৃতিক স্থবিধা-স্থযোগের সদ্ব্যবহার, অপব্যয় হ্রাস এবং গবেষণায় উৎসাহদানের ওপর। এই কর্ম্মসূচীর দরুণ ব্যয় হবে ১৪২ কোটি টাকা অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন শিক্ষামূলক খাতের বরাদ্দ ব্যয়ের ২৫%। এই শতকরা অনুপাত প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ছিল যথাক্রমে ১৩ এবং ১৯।

সমগ্র দেশে কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালে অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন নামে অতি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাটির প্রতিষ্ঠা হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলিকে কারিগরী শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে পরামর্শদানই এই সংস্থার মূল কাজ। এই সংস্থার স্থপারিশ অনুসারে ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে চারটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়েছে। সংস্থার উদ্যোগে সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল ও কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারীং, এবং কেমিক্যাল টেকনোলজী, বাণিজ্য ও ফলিত শিল্প বিষয়ে সাতটি পাঠ্যব্যবস্থা সম্পর্কিত পরিষদও সংগঠিত হয়েছে। সরকারী শিল্প ও কারিগরী দপ্তরগুলিতে কর্ম্মরত কারিগরদের আংশিক সময়ের প্রশিক্ষণ দানেরও আয়োজন হয়েছে। এই কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত বিশেষ কমিটি টেকনিক্যাল হাইস্কুলের পাঠক্রম রচনা করে।

শিল্পশ্রমিকদের স্তরবিভাগ অনুসারে বিভিন্ন ধরনের কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হয়েছে। সাধারণতঃ শিল্পশ্রমিকদের স্তরবিভাগ এইরকম : (১) পরিচালন পর্য্যায়ের কর্ম্মী, (২) তত্ত্বাবধান পর্য্যায়ের কর্ম্মী, এবং (৩) দক্ষ ও অল্পদক্ষ কর্ম্মী। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিদের ডিগ্রী পর্য্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয়, পরে দুবছরের স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রমও আছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্য ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট ট্রেনিংএর আয়োজন আছে, শিক্ষাক্রম প্রায় ৩।৪ বছর হয়। তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মীদের জন্য আর্ট এণ্ড ক্রাফ্‌ট্ স্কুলে বয়ন, হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প শেখানো হয়। মেয়েদের জন্য পৃথক শিল্পস্কুল আছে; সেখানে সূচীশিল্প প্রভৃতি শেখানো হয়। বুনিয়াদী স্কুলগুলিতে

ইদানীং শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে শিক্ষার্থী শিল্প ও কারিগরী দক্ষতা অর্জ্জনের সুযোগ পাচ্ছে।

১৯৪৭ সালে ভারতে যথেষ্ট সংখ্যক কারিগরী ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। ঐ সময়ে ৩৮টি টেকনিক্যাল ও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ছিল এবং ৫৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঐ বিষয়ে ডিপ্লোমা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। স্বাধীন ভারতে কারিগরী ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার ব্যাপক প্রসারতার ফলে বর্ত্তমানে প্রায় ৩৪১০টি বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমগ্র ভারতে সংগঠিত হয়েছে এবং আরও হচ্ছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতি বছর ১৯০০০ ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রাজুয়েট শিক্ষাদানের প্রয়োজন দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য। এজন্য ম্যাঙ্গালোর, ওয়ারাঙ্গল, নাগপুর, ভূপাল, দুর্গাপুর, জামসেদপুর, এলাহাবাদ, শ্রীনগর ও দিল্লীতে ৯টি নূতন কারিগরী কলেজের মাধ্যমে দ্রুত ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষাপ্রসারের আয়োজন চলেছে। এছাড়া ২৭টি পলিটেকনিক—৩টি পশ্চিমবঙ্গে, ২টি বিহারে, ১টি আসামে, ১টি উড়িষ্যায়, ৩টি বোম্বাইতে, ২টি মধ্যপ্রদেশে, ২টি মাদ্রাজে, ২টি মহীশূরে, ২টি অন্ধ্রপ্রদেশে, ১টি কেরলে, ৩টি উত্তরপ্রদেশে, ৩টি পাঞ্জাবে এবং ২টি রাজস্থানে—স্থাপনার প্রস্তাব রয়েছে। এই পলিটেকনিকগুলি থেকে বছরে ৪০০০ কারিগরী শিক্ষার্থী প্রস্তুত হবে এবং এগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন থাকবে। এ ছাড়া প্রত্যেক রাজ্যে একটি করে কেন্দ্রীয় টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও হচ্ছে এই ইনষ্টিটিউটগুলি কোনও বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট থাকবে এবং শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ ও কর্ম্মনিয়োগ ব্যবস্থার সমন্বয়নে সহায়তা করবে।

ভারত সরকার কারিগরী ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা বিকাশের উদ্দেশ্যে আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কর্ম্মসূচী গ্রহণ করেছেন: (১) ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের সম্প্রসারণ; (২) উচ্চতর কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনা; (৩) নূতন কারিগরী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন; (৪) কারিগরী শিক্ষার জন্য বৃত্তিপ্রদান; (৫) 'বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা; এবং (৬) গবেষণা।

ব্যাঙ্গলোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স সয়েল মেকানিক্স্ ও ফাউণ্ডেশন ইনঞ্জিনীয়ারিং (Soil mechanics and Foundation Engineering), Automobile Engineering, Foundry Engineering, Electrical Engineering, Electrical Communication Engineering, Industrial and Production Engineering and Industrial Administration প্রভৃতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর (পোষ্ট-গ্রাজুয়েট) শিক্ষাক্রম আছে এবং Internal Combustion Engineering, Hydraulic machines, Technical Gas Reactions, Physical Metallurgy,

Radio and Electrical Communication Engineering বিষয়ে গবেষণা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে।

১৯৪৬ সালে সরকার (Sarkar) কমিটির স্থপারিশ মত চারটি আঞ্চলিক টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট গঠিত হওয়ার কথা। ১৯৫১ সালে খড়্গপুরে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজীর কাজ স্থরু হয়েছে; ১৯৫৮ সালে বোম্বাইতেও আর একটি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাদ্রাজে ও কানপুরেও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপনার আয়োজন চলছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রত্যেকটি থেকে প্রতি বছর প্রায় ২০০০ কারিগর ও ইঞ্জিনীয়ার প্রস্তুতি লাভ করবে।

অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশনের পরামর্শমত কারিগরী বিদ্যার নূতন নূতন শিক্ষাক্রমও প্রবর্ত্তিত হচ্ছে, যেমন—মুদ্রণ কারিগরী, নগর পরিকল্পনা, ব্যবসায় তত্ত্বাবধান, খনি সম্পর্কিত ইঞ্জিনীয়ারিং, ভেষজ ইত্যাদি।

গত ১০।১২ বছরে ভারত সরকার কারিগরী শিক্ষায় উৎসাহ দানের জন্য বৃত্তি প্রদানের তিনটি পরিকল্পনা কার্য্যকরী করেছেন—প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণ বৃত্তি, গবেষণা প্রশিক্ষণ বৃত্তি এবং উচ্চতর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গুলিকে অর্থ সাহায্য।

সমষ্টি উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 'বিজ্ঞান-মন্দির' স্থাপিত হচ্ছে। এই সকল বিজ্ঞান-মন্দিরে ল্যাবরেটরী ও স্থশিক্ষিত কর্ম্মীরা থাকেন এবং গ্রামাঞ্চলে বিজ্ঞান ও কারিগরী চিন্তা প্রসারে সহায়তা করেন। প্রত্যেক জেলায় এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে একটি করে 'বিজ্ঞান-মন্দির' প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা আছে।

গবেষণার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৪০ সালে বোর্ড অব সায়েন্টিফিক এবং ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সকল উদ্যোগের ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে নিম্নলিখিত গবেষণাগারগুলি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। (১) ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী, পুনা; (২) ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরী, নয়াদিল্লী; (৩) সেণ্ট্রাল ফুয়েল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, বিহার; (৪) সেণ্ট্রাল গ্লাস এণ্ড সেরামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, যাদবপুর; (৫) সেণ্ট্রাল ফুড টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, মহীশূর; (৬) ন্যাশন্যাল মেটালরজীক্যাল ল্যাবরেটরী, জামসেদপুর; (৭) সেণ্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, লক্ষ্ণৌ; (৮) সেণ্ট্রাল রোড রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, নয়াদিল্লী; (৯) সেণ্ট্রাল ইলেক্ট্রো-কেমিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, মাদ্রাজ; (১০) সেণ্ট্রাল লেদার রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, মাদ্রাজ; (১১) সেণ্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, রুড়কী; (১২) সেণ্ট্রাল ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, রাজস্থান; (১৩) ন্যাশন্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেন্স, লক্ষ্ণৌ,

(১৪) সেণ্ট্রাল সল্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ভাবনগর; (১৫) সেণ্ট্রাল মাইনিং রিসার্চ ষ্টেশন, ধানবাদ; (১৬) রিজিওন্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী, হায়দ্রাবাদ; (১৭) ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব বায়োকেমিষ্ট্রি এণ্ড এক্সপেরিমেণ্ট্যাল মেডিসিন, কলিকাতা; (১৮) বিড়লা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম, কলিকাতা; (১৯) রিজিওন্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী; জম্মু; (২০) সেণ্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউট. দুর্গাপুর; (২১) সেণ্ট্রাল পাবলিক হেল্‌থ্ ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, নাগপুর।

এছাড়া উদারভাবে অর্থ সাহায্য বিতরণ করে ভারত সরকার বহু বেসরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও গবেষণা বিষয়ে সহযোগিতা করছেন।

Q. 8 Examine critically the place of technical and engineering education in the Third-Five-year plan of India.

Ans. অতি দ্রুত অর্থ নৈতিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলির পুনঃসংগঠন এবং সম্প্রসারণ, বহুসংখ্যক নূতন প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতি, বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং কারিগরী শিক্ষক সংগ্রহ, এবং তাঁদের শিক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন, শিক্ষণকার্য্যের প্রগাঢ়তা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষণকাল হ্রাস করবার জন্য নূতন নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তন, ব্যবহারিক শিক্ষণ দানের জন্য সম্প্রসারিত সুযোগসুবিধা এবং যাতে শিক্ষকগণ দুর্লভ জাতীয় সম্পদ হয়ে উঠতে পারেন সেইভাবে তাঁদের কর্ম্মে নিয়োগের নূতন উপায় উদ্ভাবন। সরকারী কিংবা বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানে লভ্য সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা সমষ্টির সেবায় নিযুক্ত—এই মনে করে জনশক্তি সম্পর্কিত পরিকল্পনার অর্থনীতিকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করতে হবে।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই কর্ম্মীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যার হিসাব অতি যত্নের সঙ্গে এবং দীর্ঘকাল ধরে নির্দ্ধারণ করতে হবে। এর জন্য আবশ্যক উন্নত পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্য এবং জনশক্তির হিসাব নির্দ্ধারণ পদ্ধতির উন্নতি। প্রয়োজনীয় কর্ম্মী সংখ্যা নির্দ্ধারণ, মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তনশীল প্রয়োজন এবং অভিজ্ঞতার আলোকে পুনঃ পরীক্ষা করে দেখা একান্তভাবে দরকার। প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি সংস্থার মধ্যে জনশক্তির পরিকল্পনা অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠা অবশ্যই উচিত।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যার একটা সুস্পষ্ট ধারণা দেবার জন্য, জনশক্তি সংক্রান্ত পরিকল্পনায় উন্নত শিক্ষণ ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধার আয়োজনের জন্য, এবং নূতন নূতন পদ্ধতির উদ্ভাবনের জন্য শীঘ্রই একটি ব্যবহারিক জনশক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব হয়েছে।

বহু ক্ষেত্রে, শিক্ষণ কার্য্যের কর্ম্মসূচী যা তৃতীয় পরিকল্পনারও একটি অংশ, এমন ভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে যাতে চতুর্থ এবং পরবর্ত্তী পরিকল্পনাগুলিতে যে আরও নিবিড় উন্নয়নের কথা চিন্তা করা হয়েছে, তার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্ম্মী পাওয়া যায়। বহু বৃহৎ অঞ্চল রয়েছে, যেখানে যথোপযুক্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্ম্মী পর্য্যাপ্ত সংখ্যায় পাওয়া যাবে না। এই সকল ক্ষেত্রে একদিকে যেমন সহজপ্রাপ্য স্থানীয় শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্ম্মীদেরই যত অধিক পরিমাণে সম্ভব কাজে লাগাতে হবে, অন্যদিকে তেমনই প্রয়োজনমত উচ্চ শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্ম্মী লাভের জন্য প্রায়োগিক সহায়তা কর্ম্মসূচীগুলির এবং অন্যান্য স্থান থেকে প্রাপ্তব্য সহায়তার সুযোগকে কাজে লাগাবার ব্যাপারে কোনরকম দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

অতীত কিংবা বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে নানারকম অনুমান এবং সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেই প্রয়োজনীয় কর্ম্মীসংখ্যা নির্ণীত হয়, কাজেই দেশের ভেতরে এবং বিদেশে শিল্প-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অতি দ্রুত পরিবর্ত্তনের দরুণ এবং অর্থনৈতিক ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োজনের জন্য অদৃষ্টপূর্ব্ব নিত্য নূতন চাহিদা ক্রমাগতই বেড়ে যেতে থাকবে। অতএব বর্ত্তমান হিসাব উপরের দিকে বৃদ্ধি পাবারই সম্ভাবনা বেশি। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবশ্যকতার পুনঃনির্দ্ধারণ মাঝে মাঝে করা এবং এই আবশ্যকতার পুনর্ব্বিচার শুধু চতুর্থ পরিকল্পনার জন্যই নয়, পঞ্চম পরিকল্পনার জন্যও করার সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগরী কর্ম্মীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যার কথা বিবেচনা করতে হবে তিনটি প্রধান পর্য্যায়ে—স্নাতক, উপাধিধারী এবং দক্ষ কারিগর। বর্ত্তমান অনুমান অনুযায়ী ৫১,০০০ অতিরিক্ত বাস্তবিদ্যায় স্নাতকের প্রয়োজন হওয়ার সম্ভাবনা তৃতীয় পরিকল্পনায়, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই সংখ্যা ছিল ২৯,০০০। চতুর্থ পরিকল্পনায় এই চাহিদার আনুমানিক হিসাব ৮০,০০০। ইঞ্জিনীয়ারিং ও প্রযুক্তিবিদ্যার উপাধিধারীদের প্রয়োজনীয় বাড়তি সংখ্যার হিসাব তৃতীয় পরিকল্পনায় ধরা হয়েছে ১,০০,০০০ ; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই সংখ্যা ছিল ৫৬,০০০। চতুর্থ পরিকল্পনায় এই সংখ্যার হিসাব বর্ত্তমানে অনুমান করা হচ্ছে প্রায় ১,২৫,০০০।

তৃতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কারিগরী শিক্ষার কর্ম্মসূচীতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে সর্ব্ব পর্য্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্ম্মীবৃন্দের উপর, পর্য্যাপ্ত সংখ্যায় শিক্ষক সংগ্রহ, বৃত্তি এবং ফেলোশিপের ব্যবস্থা, আংশিক সময়ের পাঠক্রম এবং ডাকযোগে শিক্ষার পাঠক্রমের প্রবর্ত্তন; কতকগুলি ক্ষেত্রে বিশেষ পাঠক্রমের উন্নয়ন, প্রাপ্য প্রাকৃতিক সুবিধা-সুযোগের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার, অপব্যয় হ্রাস এবং গবেষণায় উৎসাহদানের উপর। এই কর্ম্মসূচীর দরুণ

ব্যয় হবে ১৪২ কোটি টাকা অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন শিক্ষামূলক স্কীমের খাতে বরাদ্দ ব্যয়ের শতকরা ২৫ ভাগ। এই শতকরা অনুপাত প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ছিল যথাক্রমে ১৩ এবং ১৯। শিল্প-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষানবিসী কর্ম্মসূচী, শিল্পকর্ম্মীদের জন্য সান্ধ্য বিদ্যালয়, এবং কারিগরী শিক্ষকদের শিক্ষণের উন্নয়নের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৪৯ কোটি টাকা।

নীচের তালিকাটিতে এযাবৎ সম্পাদিত উন্নতি এবং তৃতীয় পরিকল্পনার কর্ম্মসূচীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হলো :

ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এবং পলিটেকনিক—ছাত্রভর্ত্তি এবং শিক্ষিত হয়ে বহির্গত ছাত্রের সংখ্যা

	স্নাতক পাঠক্রম			উপাধি পাঠক্রম		
	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	নির্দ্দিষ্ট আসন সংখ্যা	শিক্ষিত হয়ে বহির্গত ছাত্রের সংখ্যা			
বৎসর	(১)	(২)	(৩)	(১)	(২)	(৩)
১৯৫০-৫১···	৪৯	৪,১২০	২,২০০	৮৬	৫,৯০০	২,৪৮০
১৯৫৫-৫৬···	৬৫	৫,৮৯০	৪,০২০	১১৪	১০,৪৮০	৪,৫০০
১৯৬০-৬১···	১০০	১৩,৮৬০	৫,৭০০	১৯৬	২৫,৫৭০	৮,০০০
১৯৬৫-৬৬ ··	১১৭	১৯,১৪০	১২,০০০	২৬৩	৩৭,৩৯০	১৯,০০০

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে যেসমস্ত বাড়তি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবে তার মধ্যে আছে ৭টি আঞ্চলিক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এবং তার প্রত্যেকটিতে ২৫০টি করে আসন থাকবে। এইসব প্রতিষ্ঠানে ইঞ্জিনীয়ারিংএর বিশেষ বিশেষ শাখা, যেমন, খনি খননবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, রাসায়নিক ইঞ্জিনীয়ারিং ইত্যাদি বিষয়েও শিক্ষণের বন্দোবস্ত থাকবে এবং চতুর্থ পরিকল্পনায় এইসব বিষয়ে বহুসংখ্যক কর্ম্মীর প্রয়োজন হবে। ইঞ্জিনীয়ারিং ও প্রযুক্তিবিদ্যার আংশিক সময়ের পাঠক্রমের এবং ডাকযোগে শিক্ষার পাঠক্রমেরও বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি বিশেষ জোর দেয় প্রযুক্তি বিদ্যাশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি মৌলিক বিষয় সমূহের অধ্যয়নের আবশ্যকতার উপর। প্রায়োগিক বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয় এইরকম মুখ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই বিবেচনার উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইঞ্জিনীয়ারিং ও প্রযুক্তিবিদ্যায় স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন এবং গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। মুদ্রণশিল্প, পরিচালনবিদ্যা, শিল্পসংক্রান্ত ইঞ্জিনীয়ারিং, বাণিজ্য

এবং কর্ম্মকার ও ঢালাইয়ের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনীয়ারিংএর বিশেষ পাঠক্রমের জন্য অতিরিক্ত বন্দোবস্ত রাখা হবে। দুটি সর্ব্বভারতীয় পরিচালন-বিদ্যা শিক্ষণ সংস্থা এবং একটি শিল্প-বিষয়ক ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষণের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও যেসব কর্ম্মসূচী স্থান পেয়েছে তা হলো, পঞ্চবার্ষিকী সংহত স্নাতক পাঠক্রমের প্রবর্ত্তন, বর্দ্ধিত আবাসিক সুযোগসুবিধা, বিভিন্ন রাজ্যে প্রায়োগিক শিক্ষা পর্ষদগুলিকে অধিকতর শক্তিশালী করে তোলা, কলাবিদ্যার সম্প্রসারণ, ব্যবহারিক শিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, নিম্ন প্রায়োগিক বিদ্যালয় এবং বালিকা ও মহিলাদের জন্য প্রায়োগিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন।

প্রায়োগিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে মেধা-বৃত্তি এবং ঋণস্বরূপ দেওয়া বৃত্তি ব্যবস্থা তৃতীয় পরিকল্পনায় করা হয়েছে, এবং আশা করা যায় যে, শতকরা ১৮ জনেরও বেশি ছাত্রকে তৃতীয় পরিকল্পনায় আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে; এক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে শতকরা ৫ জন এই সাহায্য পেয়েছে। প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষণপ্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং আঞ্চলিক কলেজগুলিতে শতকরা ২৫ জনের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

বর্তমানে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং পলিটেকনিকগুলিতে শিক্ষণ-কর্মীদের গুরুতর সংখ্যাল্পতা হয়েছে। এই স্বল্পতা দুরীকরণের জন্য একটানা অনেকগুলি উপায়ের কথা চিন্তা করা হয়েছে, যেমন দেশের মধ্যে এবং বিদেশে শিক্ষাব্রতী শিক্ষণ কর্ম্মসূচী, বেতনের হার এবং সাধারণ চাকরীর সর্তাবলীর উন্নতিবিধান, অগ্রিম শিক্ষক সংগ্রহ, শিক্ষক-তালিকায় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষণ-বন্দোবস্তের সম্প্রসারণ। এই ধারা-প্রসূত কর্মসূচীর সূত্রপাত করা হয়েছিল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এবং সেগুলি এখন আরও সম্প্রসারিত হবে।

শিল্পে শ্রীবৃদ্ধিলাভের জন্য শুধু যে কারিগরের সংখ্যারই প্রভূত বৃদ্ধি প্রয়োজন তা নয়, তাদের কর্ম্মকুশলতারও অব্যাহত উৎকর্ষসাধন প্রয়োজন। সেই কারণে বহু দেশেই ঝোঁক দেখা যাচ্ছে সাধারণ শিক্ষার মান উন্নীত করার দিকে এবং ব্যবসায় শিক্ষার বিদ্যালয়ে প্রবেশের সর্ব্বনিম্ন যোগ্যতার মান উন্নীত করার দিকে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ১৩ লক্ষ কারিগরের প্রয়োজন হবে, প্রায় ৮,১০,০০০ ইঞ্জিনীয়ারিং সংক্রান্ত ব্যবসায়ে, আর বাকি সংখ্যক এই সংক্রান্ত ব্যবসায় ছাড়া অন্যান্য ব্যবসায়ে। কারিগর বা দক্ষ কর্ম্মী এবং কলচালকদের বর্ত্তমানে বহু রকমের প্রতিষ্ঠানে এবং বহু বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিল্পশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষণের সুযোগসুবিধা সম্প্রসারিত করা হবে যাতে এই প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৬৭ থেকে ৩১৮-তে বাড়িয়ে তোলা যায় এবং ছাত্রভর্ত্তির আসন সংখ্যাও ৪২,০০০ থেকে ১,০০,০০০ হয়। তাছাড়া, জাতীয়

শিক্ষানবীশী কার্য্যসূচী অনুযায়ী প্রায় ১২,০০৭ লোককে শিক্ষাদানের আয়োজন প্রস্তারিত হয়েছে। সান্ধ্য বিদ্যালয়ের সুযোগও সম্প্রসারিত হবে প্রায় ২,০০০ থেকে ১১,০০০এরও অধিক আসন পর্য্যন্ত। কয়েকটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রক এবং বিভাগের, যেমন রেলওয়ে, প্রতিরক্ষা, ডাক ও তার বিভাগের নিজস্ব বিশেষ শিক্ষণ-কর্ম্মসূচী রয়েছে। নিজের চাহিদা মেটাবার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত সকল ব্যবসার সংস্থার এবং ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যক বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষণ কর্ম্মসূচী রয়েছে। পল্লী এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসংক্রান্ত সর্ব্বভারতীয় পর্ষদগুলি, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি এবং রাজ্য সরকারের শিল্প বিভাগগুলিও শিক্ষণ-কর্ম্মসূচীর আয়োজন করে থাকেন।

কারিগরী শিক্ষকদের জন্য, বর্ত্তমান মহিলা শিক্ষকদের জন্য একটি শিক্ষণ বিদ্যালয়সহ চারটি কেন্দ্রীয় কারিগরী শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয় পরিপূর্ণভাবে উন্নত করা হবে এবং তিনটি নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হবে। এই সকল প্রতিষ্ঠান থেকে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সরবরাহের আনুমানিক সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৭,৮০০ এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ে শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য আরও ১,৮০০টি আসনের বন্দোবস্ত থাকবে।

কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ বিজ্ঞানীও প্রয়োগবিদ্যায় নিপুণ ব্যক্তিদের যে জাতীয় রেজিষ্টার তৈরী করেছেন, তাতে প্রায় ১,০৬,০০০ জনের নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। এই তালিকাভুক্তদের মধ্যে ৬৬,০০০ জন হলেন ইঞ্জিনীয়ার এবং প্রযুক্তিবিদ। 'বিজ্ঞানীদের তালিকা'য় আছেন অতি উচ্চযোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী ও অন্যান্যরা, বিশেষ করে যাঁরা বিদেশ থেকে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তনকারী। এ পর্য্যন্ত ৬৫৩ জন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিদিগকে কর্ম্মসংস্থানে সহায়তা করা গেছে। বিজ্ঞানী কর্ম্মীবৃন্দের সংখ্যা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২৩,৩০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭,৫০০-এ দাঁড়িয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যায়ে বিজ্ঞানশিক্ষার সুযোগ-সুবিধা যথেষ্ট পরিমাণে সম্প্রসারিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যায়ে মোট ৪,০০,০০০ অতিরিক্ত ছাত্র ভর্ত্তির মধ্যে ২,৩০,০০০ হবে বিজ্ঞানের ছাত্র। আর তৃতীয় পরিকল্পনায় কলেজের জন্য যে ২৭,০০০ শিক্ষকের প্রয়োজন হবে, তার মধ্যে ১৭,০০০ জনই হবেন বিজ্ঞানী।

উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন, শিক্ষণ, স্বাস্থ্য এবং সমাজকল্যাণ, প্রশাসন ও পরিসংখ্যান বিষয়ে তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য, প্রয়োজনীয় কর্ম্মীসংখ্যার হিসাব করা হয়েছে এবং সম্ভবপর ক্ষেত্রে চতুর্থ পরিকল্পনার জন্যও এই হিসাব করা হয়েছে। কতকগুলি ক্ষেত্রে, যেমন কৃষি এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বহু পরিমাণে প্রয়োজনীয় শিক্ষণ-বিষয়ক সুবিধাদি দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালেই উন্নীত করা হয়েছিল। ফলে, বর্ত্তমানে যে

প্রত্যাশিত চাহিদা তা বর্ত্তমান সুযোগসুবিধার সামান্যমাত্র বৃদ্ধি সাধনেই পূরণ হতে পারে।

Q. 9. What are the problems of technical education in India ?

Ans. স্বাধীনতার পূর্ব্বে ভারতে বৃটিশ শাসকদের শিল্পসংস্থানগুলির প্রয়োজনেই কারিগরী শিক্ষার কিছু কিছু আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু তার ফলে দেশের প্রকৃত কারিগরী শিক্ষার উন্নতি সম্ভব হয়নি। উন্নত ধরনের শিল্প উৎপাদনের উৎসাহ দেওয়া হয়নি এবং বিদেশী পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির দিকেই মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্র ও জনগণ ক্রমশই উপলব্ধি করেছে যে, উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য কারিগরী শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপযোগিতা আছে। সুতরাং প্রাথমিক ও বৃহদায়তন শিল্পপ্রসারের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে, সমগ্র দেশে কারিগরী শিক্ষা ও গবেষণা কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। তবে এখনও কারিগরী শিক্ষা ক্ষেত্রে একাধিক সমস্যা রয়েছে, যেমন (১) বিভিন্ন কারিগরী ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত জনশক্তি আহরণ ; (২) নূতন কলেজের দাবী ; (৩) নিম্ন ও মধ্য স্তরে কারিগরের অভাব ; (৪) প্রশাসন কর্ম্মীর অভাব ; (৫) সঙ্কীর্ণ শিক্ষাক্রম ; (৬) শিক্ষাদানের ভাষামাধ্যম ; (৭) শিক্ষকের অভাব ; (৮) যথোপযুক্ত কর্ম্মশালার অভাব ; (৯) স্কুলের পরে শিক্ষাদান ; (১০) গবেষণা এবং (১১) রাষ্ট্র, শিল্পসংস্থা এবং কারিগরী শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সহযোগিতা।

বিভিন্ন কারিগরী ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত জনশক্তি আহরণে কারিগরী শিক্ষাকে চিত্তাকর্ষক এবং কার্য্যকরী করে তোলা প্রয়োজন। সাধারণতঃ যে কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করলে অধিকতর আর্থিক উপার্জ্জন করা যায়, শিক্ষার্থীরা সেই ধরনের শিক্ষার দিকেই নির্ব্বিচারে আকৃষ্ট হয় এবং সামর্থ্য ও আগ্রহের বিবেচনা করে না। ফলে, কোনও কারিগরী শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন শিক্ষার্থীদের অত্যধিক সমাবেশ দেখা যায়, তেমনি বহু অত্যাবশ্যক কারিগরী শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ জাগে না। এর ফলে একই কারিগরী শিক্ষা প্রয়োজনের অধিক ব্যক্তি গ্রহণ করায় সেই কারিগরী বৃত্তিক্ষেত্রে স্বভাবতই বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয় ; আবার অন্যদিকে, কোনও কোনও বৃত্তিক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্ম্মীই পাওয়া যায় না, কারণ ঐ সকল বৃত্তির প্রতি সাধারণতঃ বেশি লোক আকৃষ্ট হয় না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বৃত্তি নির্ব্বাচন ও বৃত্তিশিক্ষা গ্রহণে তরুণদের যথোপযুক্ত পথনির্দ্দেশ অত্যাবশ্যক।

নূতন কলেজের প্রতিষ্ঠা করে কারিগরী ও বৃত্তিশিক্ষা প্রসারের কাজ এদেশে গত কয়েক বছরে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু তবুও দেশের প্রয়োজনের তুলনায় ঐ নূতন কলেজগুলি কর্ম্মী প্রস্তুত করতে সক্ষম হচ্ছে না। এই জন্য বৃহৎ কারিগরী

কলেজ প্রতিষ্ঠা করে অল্পসময়ে অধিকতর সংখ্যায় কারিগরী কর্ম্মী শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর্ টেকনিক্যাল এডুকেশন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৯টি বৃহৎ ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এবং ২৭টি পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রচনা করেছেন। ছোট ও মাঝারী ধরনের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ-গুলি এবং এই ধরনের বৃহৎ কলেজ, টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট ও পলিটেকনিক-গুলি একযোগে শিক্ষার্থী প্রস্তুত সুরু করলে দেশের কারিগরী শিক্ষার ব্যাপকতা সম্ভব হবে বলে অনেকে মনে করেন।

কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারের ফলে ভারতে বর্ত্তমানে শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্ম্মীর সংখ্যাবৃদ্ধি পেলেও নিম্ন ও মধ্যস্তরে কর্ম্মীর সংখ্যা এখনও যথেষ্ট নয়। উচ্চতর শিক্ষা, ডিগ্রীও ডিপ্লোমায় প্রতি বহু কর্ম্মীর আকর্ষণ আছে, কারণ ঐ ধরনের শিক্ষাগ্রহণ করলে অধিকতর উপার্জ্জন করা যায়। ফলে, নিম্ন ও মধ্য স্তরে শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্ম্মী আকৃষ্ট করার আবশ্যকতা রয়েছে। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করে যে সকল অল্পবিত্ত পরিবারের সন্তানরা কর্ম্মসংস্থানে আগ্রহী হয়, তাদের জন্য ক্ষুদ্রায়তন কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করলে এ বিষয়ে সমাধান হতে পারে।

আর একটি সমস্যা কারিগরী ক্ষেত্রের প্রশাসন সম্পর্কে। যদিও কারিগরী শিক্ষা বিস্তার লাভ করেছে, তবুও বৃহৎ কারিগরী, ইঞ্জিনীয়ারিং কর্ম্মক্ষেত্রে সুদক্ষ প্রশাসন কর্ম্মীর অভাব অনুভূত হয়ে থাকে। কারিগরী শিক্ষাব্যবস্থা এখনও আমাদের দেশের শিল্পপ্রগতির অনুপাতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রশাসনিক কর্ম্মী প্রস্তুত করতে সক্ষম হচ্ছে না, অথচ উচ্চ পর্য্যায়ের প্রশাসন কর্ম্মী ছাড়া কারিগরী শিক্ষণপ্রাপ্ত সাধারণ কর্ম্মীদের কাছ থেকে আশানুরূপ কর্ম্মকুশলতা কাজে লাগানো সম্ভব নয়। এর ফলে নিম্ন ও মধ্য পর্য্যায়ের কারিগরী শিক্ষণ-প্রাপ্ত বহু কর্ম্মী সৃষ্টি হলেও তারা তাদের কর্ম্মক্ষমতার উপযুক্ত পরিচয় দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না এবং বহুক্ষেত্রে কারিগরী শিক্ষণ এই কারণেই অপচিত হচ্ছে।

কারিগরী বৃত্তিক্ষেত্রে আজকাল বহুপ্রকার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি উদ্ভাবিত হওয়ায় কারিগরী কর্ম্মীদের দক্ষতার প্রয়োজনও ব্যাপক হয়েছে। প্রচলিত কারিগরী শিক্ষণ পাঠক্রমগুলি সঙ্কীর্ণ ও প্রাচীনপন্থী বলে অনেকে অভিযোগ করে থাকেন। কারিগরী শিক্ষণ পাঠক্রমের এই সঙ্কীর্ণতা দূর করে সর্ব্বাধুনিক কারিগরী পদ্ধতি শিক্ষণের আয়োজন করতে হবে এবং শিক্ষার্থীকে সাধারণ শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা করতে হবে। এইজন্য আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড সুপারিশ করেছেন যে, কারিগরী শিক্ষার প্রথম ডিগ্রী শিক্ষাক্রম পাঁচবছরের শিক্ষাদানের উপযোগী করে পুনঃসংগঠিত হওয়া আবশ্যক।

মাতৃভাষার মাধ্যমে ভারতে কারিগরী শিক্ষা দেওয়া সম্পর্কে এক মতদ্বৈধ আছে। অনেকে বলেন, বিশ্বের প্রগতিশীল শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলির সমকক্ষতা

অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই হওয়া দরকার। কিন্তু অপর পক্ষ মনে করেন, মাতৃভাষা ছাড়া এই বিষয়ে দ্রুত জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাশিয়া ও জাপানের উল্লেখ করে বলা যায়, ঐ দেশগুলিতে মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাদানের আয়োজন করে অল্পসময়ে সাফল্য অর্জ্জন করা সম্ভব হয়েছে।

কারিগরী শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব এক বিশেষ সমস্যা। কারিগরী কর্ম্মীর প্রয়োজন বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সমস্যা আরও প্রকট হয়েছে। উপযুক্ত শিক্ষককে কারিগরী শিক্ষাক্ষেত্রে আকৃষ্ট করতে হলে তাঁদের বেতনের হার ও চাকুরীর সর্ত্তাদির সংশোধন করা প্রয়োজন। এবিষয়ে তৎপরতা অবলম্বন না করলে শিক্ষক সমস্যা দূর করা সহজ নয়।

কারিগরী শিক্ষা কেবলমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সার্থক ও কার্য্যকরী কারিগরী শিক্ষার জন্য প্রয়োজন সুসজ্জিত কর্ম্মশালা ও ল্যাবরেটরী। আমাদের দেশে কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্ম্মশালা ও ল্যাবরেটরী থাকা সত্ত্বেও সেগুলির উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করা হয় না। তাছাড়া, কারিগরী শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের সুযোগদানের উদ্দেশ্যে নিয়মিতভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে কলকারখানা ও বিভিন্ন-ধরণের কারিগরী ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশীর সুযোগ দেওয়া দরকার। এর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প সংস্থা ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের নিবিড় সমন্বয় থাকা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগ্রহণের অবসরে আংশিক সময়ের জন্য কোন কর্ম্মসংস্থান পেলে উপার্জ্জন ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন উভয়ই সম্ভব হতে পারে।

শিক্ষার্থীরা কারিগরী শিক্ষাগ্রহণ সমাপ্ত করে কর্ম্মরত হওয়ার পরেও শিক্ষা পুনরুজ্জীবনের জন্য ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। মাঝে মাঝে স্বল্পকালীন শিক্ষা-ক্রমের সাহায্যে কর্ম্মরত কারিগরদের শিক্ষা পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা না থাকলে কারিগরী শিক্ষার সুদূরপ্রসারী সুফল পাওয়া সম্ভব হয় না। তাছাড়া কারিগরী বৃত্তির বস্তুমুখী পরিশ্রমের মাঝে অবসর সময়ের যথাযোগ্য সদ্ব্যবহারের দ্বারা কিভাবে আত্মিক উন্নতি সাধন সম্ভব, সেবিষয়েও কর্ম্মরত কারিগরদের জন্য মাঝে মাঝে পথনির্দ্দেশের সুব্যবস্থা রাখা দরকার। কেবল বর্দ্ধিত বেতনই তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে পারে না, অবসর বিনোদনের শিক্ষাও কারিগরী শিক্ষার অঙ্গীভূত হওয়া আবশ্যক।

শিল্পক্ষেত্রে গবেষণার ব্যাপক কার্য্যকরী ব্যবস্থা না থাকলে কারিগরী শিক্ষার সুফল আধুনিক যুগের প্রগতির সঙ্গে সমান গতিতে অগ্রসর হতে পারে না। ভারতে শিল্প ও কারিগরী বিষয়ে গবেষণার জন্য অনেকগুলি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু এই বিশাল দেশের বিপুল সমস্যার অনুপাতে সেই প্রতিষ্ঠানগুলির গবেষণা ক্ষেত্র সকল প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছে না।

সকল বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রচেষ্টা এই বিষয়ে সংহত করা দরকার, যাতে উন্নততর কারিগরী পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশের শিল্প উন্নয়ন সহজ করা যায়।

কারিগরী শিক্ষার উল্লিখিত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য রাষ্ট্র, শিল্পসজ্ঞ এবং কারিগরী প্রতিষ্ঠানগুলির সমবেত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

Q. 10. Give a brief history of Legal Education in India.

Ans : ভারতে অন্যান্য বৃত্তিশিক্ষার ইতিহাসের মত আইনবৃত্তি শিক্ষার ইতিহাসকেও তিনটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করা চলে। প্রথম পর্য্যায়ে আইন শিক্ষার সূত্রপাত হয় কলকাতার সংস্কৃত কলেজ ও কলকাতা মাদ্রাসায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। ১৮৩২ সালে কলকাতার আইন কর্ম্মচারীদের পরীক্ষা লওয়ার জন্য একটি কমিটি ছিল। ১৮৪২ সালে কিছুদিনের জন্য হিন্দু কলেজে একজন আইন বিষয়ক অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রায় ১২ বছর পরে এই আইন শিক্ষার ব্যবস্থাটি স্থায়িত্বের মর্য্যাদা লাভ করে। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বি. এল. ডিগ্রী পর্য্যায়ের শিক্ষাক্রম প্রবর্ত্তিত হয়। এর পর বোম্বাইতে স্যার পেরী একটি আইন শিক্ষার ক্লাশ খোলার চেষ্টা করেন, কিন্তু সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। তবে ১৮৫৫ সালে বোম্বাইতে এলফিন্‌ষ্টোন কলেজে আইনবিষয়ে অধ্যাপনার জন্য সর্ব্বপ্রথম একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং আরও দুজন শিক্ষক নিযুক্ত হন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর বোম্বাই আইন কলেজ নামে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। মাদ্রাজেও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরে নিয়মিত আইন শিক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব হয়।

১৮৫৭ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হওয়ার পর থেকেই আইন শিক্ষার ইতিহাসের দ্বিতীয় যুগ সুরু হলো। ১৮৫৩ সালের উডের শিক্ষা ডিসপ্যাচে বৃত্তিশিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং আইন বিষয়ে ডিগ্রী পর্য্যায়ের পাঠক্রম প্রবর্ত্তনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। তবে আইনবৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থাপনার ভার পরীক্ষাগ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে, প্রশাসনের জন্য শিক্ষা দপ্তরের হাতে এবং আইন বৃত্তিশিক্ষার যোগ্যতা নির্দ্ধারণের ক্ষমতা হাইকোর্টের হাতে যুক্তভাবে ন্যস্ত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও হাইকোর্ট আইনশাস্ত্রে পরীক্ষা গ্রহণ করতো, কোন কোন রাজ্য সরকারও আইনজীবী বৃত্তি বা মুক্তিয়ার বৃত্তির পরীক্ষা গ্রহণ করতো। ঐ সময়ে আইন শিক্ষার জন্য পৃথক আইন কলেজও কিছু কিছু ছিল; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ আইনশিক্ষার ক্লাশ স্থানীয় আর্টস বা সায়েন্স কলেজে, এমন কি হাইস্কুলেও অনুষ্ঠিত হতো।

লর্ড কার্জ্জনের আমল থেকে আইন শিক্ষার ইতিহাসের তৃতীয় যুগের

সূচনা। এই সময়ে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মব্যবস্থা নূতন প্রাণলাভ করে, ফলে বৃত্তিশিক্ষা ক্ষেত্রে কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয় এবং আইনবৃত্তির প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। আইনবৃত্তি ক্ষেত্রে অত্যধিক আইনজীবীর সমাবেশ হওয়া সত্ত্বেও আইন-শিক্ষার চাহিদা হ্রাস পায়নি। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে প্রায় ২০টি আইন কলেজ ছিল।

Q. 11. Discuss the present-day position of legal education in India.

Ans. আইন শিক্ষা এক মর্য্যাদাপূর্ণ শিক্ষা এবং আইন শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে থেকেই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আবির্ভাব সম্ভব হয়। এইজন্য আইনশিক্ষার এক বিশেষ গুরুত্ব আছে। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বর্ত্তমানে আইন কলেজ স্থাপনে সযত্ন হয়েছেন, কিন্তু এই শিক্ষাব্যবস্থাকে সরকারী কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্মীর প্রয়োজন মিটানোর কাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লাগানো হচ্ছে, কেবলমাত্র চাকুরী ও কর্ম্মসংস্থানের অন্যতম উপায় হিসেবেই আইন শিক্ষার উপযোগিতা স্বীকৃত হচ্ছে। অবশ্য এ সত্ত্বেও আমাদের দেশে বহু দক্ষ এবং আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনবিদ্ সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়ে আছেন, আইন শিক্ষাক্ষেত্রের পক্ষে সেটি অবশ্যই গৌরবের কথা।

ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর থেকে আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্ক রক্ষা ও দেশের আভ্যন্তরীণ সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য উন্নত শ্রেণীর আইন শিক্ষা কলেজ স্থাপনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা গেছে। কিন্তু বর্ত্তমানে আইন কলেজ-গুলির কাজ সন্তোষজনক বলা চলে না। দু-একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া,অন্য সর্ব্বত্র আইন শিক্ষাব্যবস্থার এখনো বহু উন্নতি ও সংস্কার প্রয়োজন। আইন শিক্ষার পাঠক্রম কোনও ক্ষেত্রে ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের পরে প্রবর্ত্তিত হয়। কোথাও স্নাতক শিক্ষাক্রমের পাঠ শেষ করে আইন শিক্ষার অধিকার লাভ করতে হয়। শিক্ষক সংগ্রহ সম্পর্কেও কোনও নির্ভরযোগ্য নীতি অনুসরণ করা হয় না; শিক্ষকদের উচ্চশিক্ষা থাকে, বেতন যথেষ্ট দেওয়া হয়—কিন্তু তাঁদের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাদান বিষয়ে আগ্রহ বিশেষ থাকে না। অনেকক্ষেত্রেই নূতন আইনজীবীরা অতিরিক্ত আয় বৃদ্ধির মানসে আইন কলেজে শিক্ষকতা গ্রহণ করে থাকেন। প্রায়ই তাঁদের আইনজীবিকা ক্ষেত্রে বিশেষ কাজ পড়লে আইন কলেজের ক্লাশে অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য হন। সাধারণতঃ আইন কলেজগুলিতে প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যায় ক্লাশের ব্যবস্থা থাকে; দিনমানে সম্পূর্ণ সময়ের আইন শিক্ষা আমাদের দেশে বিরল। শিক্ষার্থীরাও আইন শিক্ষাকে অবসর সময়ের আংশিক শিক্ষাবস্তুরূপে সহজভাবে গ্রহণ করে থাকে এবং অন্যান্য দৈনন্দিন বৃত্তি ও কাজকর্ম্মের তুলনায় এই শিক্ষার মর্য্যাদা অল্পজ্ঞান

করে। সুতরাং, আমাদের আইন শিক্ষা কলেজগুলির পুনঃসংগঠন অত্যাবশ্যক যাতে আইনশাস্ত্র অধ্যয়নের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলেই উপযুক্ত মর্য্যাদা আরোপ করতে সক্ষম হয়।

সমগ্র ভারতে এখন মাত্র ৩৪টি আইন কলেজ আছে এবং ছাত্রীদের জন্য পৃথক কোন আইন শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। ১৯৬০ সালে ভারতে ২৫,২৭৭ জন ছাত্র এবং ৬৪৮ জন ছাত্রী (মোট ২৫,৯২৫ জন শিক্ষার্থী) আইনশাস্ত্র অধ্যয়নে রত ছিল।

Q. 12. What are the problems of legal education in India ?

Ans. ভারতে আইন শিক্ষার সমস্যা অনেক। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় আইন শিক্ষার পাঠক্রম সংক্রান্ত সমস্যার কথা। জটিল সমাজে আইনের পরিধি ক্রমশই বিস্তৃত হওয়ার দরুণ পাঠক্রমের বিপুলতা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, কিন্তু শিক্ষাকাল পূর্ব্বের মতই আছে। এর ফলে স্বভাবতই পাঠক্রমকে গুরুভার বলে মনে হয় এবং শিক্ষাকালের মধ্যে সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ে সম্যক্ ধারণা সৃষ্টির অবকাশ পাওয়া যায় না। এর জন্য আইন শিক্ষার পাঠক্রমকে সংক্ষেপিত করা উচিত অথবা শিক্ষাকাল বৃদ্ধি করা উচিত।

আইন শিক্ষার পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে সমস্যা আছে। সাধারণতঃ আইন গ্রন্থগুলির পাঠ ও আলোচনার মধ্যে আইনশিক্ষা পদ্ধতি বর্ত্তমানে সীমাবদ্ধ বলা চলে। শিক্ষাদানে বহু সময় অপচয় হয় এবং আইনগ্রন্থকেই একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ আশ্রয় বলে শিক্ষার্থীকে বোঝানো হয়। বস্তুতঃ, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্য পর্য্যালোচনা এবং আইন শিক্ষাক্ষেত্রে সেগুলির সার্থক প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উৎসাহিত করা হয় না। আইনের বিধিগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করলেই চলবে না; আইনজগতের স্বরূপ সম্পর্কেও শিক্ষার্থীকে অবহিত করতে হবে এবং মামলা মোকদ্দমার দৃষ্টান্তগুলি পর্য্যালোচনা করতে হবে।

আইনশিক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে শিক্ষার্থীর বিশেষ ধরণের প্রাক্-শিক্ষা অনুশীলন বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশে তার অভাব আছে। আইনশিক্ষার পূর্ব্বে বিশেষ শিক্ষার কোনও সার্থকতা অনেক আইন শিক্ষাবিদ ও আইনজীবীরাও উপলব্ধি করতে পারেন না। অথচ প্রত্যেক আইনজীবীর পক্ষে ইংরেজী ভাষার প্রতি গভীর আয়ত্ত থাকা যে কতখানি অত্যাবশ্যক, তা সহজেই অনুমেয়; এবং ইংরেজী ভাষাকে আয়ত্ত না করে আইন শিক্ষায় পাণ্ডিত্য লাভ করা সত্ত্বেও সফলতা অর্জ্জন করা সম্ভব না হতে পারে। কেবল ইংরেজী ভাষা শিক্ষা ছাড়াও আইন শিক্ষার পূর্ব্বে কলেজ শিক্ষার অন্যান্য লব্ধ জ্ঞানকে আইন শিক্ষাক্ষেত্রে কিভাবে যথাযথ উপায়ে কার্য্যকরী করতে হয় সে বিষয়েও বিশেষ

সমন্বয়মূলক শিক্ষার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশের বর্ত্তমান আইনশিক্ষা ব্যবস্থায় এই ধরনের কোনও সর্ব্বাঙ্গীন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করা হয় না বলেই মনে হয়।

ভারতে আইন শিক্ষার্থীদের জন্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের অবকাশ খুব অল্প। ডাক্তারী শিক্ষার জন্য যেমন কলেজ সংলগ্ন হাসপাতাল থাকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য, আইন কলেজেরও সংলগ্ন সেরূপ আইন প্র্যাকটিস ক্লিনিক থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এর জন্য ব্যয়ের পরিমাণের কথা চিন্তা করে কোন ব্যবস্থাই এ পর্য্যন্ত করা সম্ভব হয়নি। আইনজীবীরাও কোন ইনষ্টিটিউট গঠনের মাধ্যমে নবাগতদের সুশিক্ষণের কোন সন্তোষজনক আয়োজন আজও করতে পারেন নি। আইনজীবীদের এবং আইন শিক্ষার্থীদের জন্য অনুরূপ ইনষ্টিটিউটের ব্যবস্থা থাকলে যেমন শিক্ষার সহায়ক হয়, তেমনি আইন বিষয়ে বহু গবেষণার পথও সুগম হতে পারে। বর্ত্তমানে আইন কলেজগুলি স্বল্পব্যয়ে পাইকারীহারে আইনজ্ঞ ব্যক্তি সৃষ্টির বিষয়েই অধিকতর আগ্রহী।

Q. 13. What are the recommendations of the University Education Commission of 1948-49 for the development of legal education in India ?

Ans. ভারতে আইন শিক্ষার উন্নতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (রাধাকৃষ্ণন কমিশন) তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্ত্তনের সুপারিশ করেন। এই তিন বছরের শিক্ষাক্রমের শেষ বছরটিতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। ঐ কমিশন বলেন, সমগ্র ভারতে আইন শিক্ষার বিষয়গুলি একই রকম এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া দরকার। অবশ্য একই রকমের সর্ব্বভারতীয় আইন চর্চ্চার মধ্যেও বিভিন্ন রাজ্যের বিশেষ আইনবিধি, রীতিনীতির মর্য্যাদা রক্ষা করে চলতে হবে।

রাধাকৃষ্ণন কমিশন আরও বলেন যে, সকল আইনশাস্ত্রের আধুনিক রূপের মূলে আছে রোমান আইন। অতএব ভারতের আইন শিক্ষাক্ষেত্রে রোমান আইন চর্চ্চাকে অবহেলা করলে চলবে না। তাছাড়া, আইন কলেজে শিক্ষার্থীকে আইনশাস্ত্রের অন্তর্গত চুক্তি বিধি, সম্পত্তি হস্তান্তর, ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিধি প্রয়োগ, ভূমিস্বত্ব প্রভৃতি সংক্রান্ত সকল প্রকার রীতি ও আইনের চর্চ্চা করাতে হবে। এদেশের আইনের দু'টি বিশেষ ধারা—হিন্দু ও মুসলিম—প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অবশ্যই ভালভাবে জানতে হবে। বৃটিশ সাধারণ আইনবিধির সঙ্গেও আইন শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটানো বাঞ্ছনীয় বলে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন মনে করেন।

বর্ত্তমান যুগ সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে আইন শিক্ষার মধ্যে রাষ্ট্র সংবিধান

সংক্রান্ত আইন, আন্তর্জ্জাতিক আইন, আইনের ইতিহাস এবং আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত সকল বিষয় চর্চ্চার অধিকতর আয়োজন করতে হবে।

আইনশাস্ত্রের মধ্যে যে কোনও বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত করা হোক না কেন, আইন শিক্ষার্থীর স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি, সঠিক বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং সুস্পষ্ট ভাব-প্রকাশ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি বিকশিত হওয়া দরকার। এই গুণগুলি না থাকলে কোন আইন শিক্ষার্থী ডিগ্রী গ্রহণ করেও আইনক্ষেত্রে সফলতা অর্জ্জন করতে পারে না।

বর্ত্তমানে আইনশিক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধ্যাপকের বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বলেন, আইন অধ্যাপকের বক্তৃতার সঙ্গে টিউটোরিয়াল, সেমিনার, কৃত্রিম আদালত এবং কেস প্রণালীর আয়োজন করা উচিত। এই কেস-প্রণালী প্রবর্ত্তনের মধ্য দিয়াই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্বখ্যাতি অর্জ্জন করেছে।

কৃত্রিম আদালত ব্যবস্থাটিও সুদক্ষ সুনির্ব্বাচিত আইনজ্ঞ সদস্যমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে থাকা দরকার। উপযুক্ত যত্ন সহকারে কৃত্রিম আদালত ব্যবস্থা পরিচালিত না হলে এই ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের প্রকৃত উপকারে লাগতে পারে না। কৃত্রিম আদালতে আইন শিক্ষার্থীরা কিভাবে প্রয়োগ-কৌশল আয়ত্ত করছেন, সে বিষয়ে প্রগতি নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে পরীক্ষাগ্রহণের আয়োজন করা উচিত বলে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন মনে করেন। এই সকল পরীক্ষা সময়ভিত্তিক এবং বিষয়ভিত্তিক উভয়ভাবেই হওয়া দরকার।

আইন শিক্ষা ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর প্রতি অধিকতর মেধাবী শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করতে হবে। আইনক্ষেত্রে মাষ্টার্স ডিগ্রী শিক্ষাক্রমে রাষ্ট্রসংবিধান আইন, আন্তর্জ্জাতিক আইন, প্রশাসন সংক্রান্ত আইন, আইন প্রয়োগবিধি, হিন্দু ও মুসলিম আইন প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষাচর্চ্চার ব্যবস্থা করতে হবে। দু বছর শিক্ষাক্রমের শেষে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে এবং একটি গবেষণামূলক রচনা (থীসিস) আহ্বান করা হবে। গবেষণায় উৎসাহদানের জন্য উচ্চতর বৃত্তি ও ফেলোশিপ প্রবর্ত্তন করা উচিত। আইনের বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন মূল্যবান অংশ সম্পর্কে গভীর গবেষণার জন্য ডক্টরেট ডিগ্রীর আয়োজনও থাকা দরকার।

ভারতে আইন শিক্ষা উন্নয়ন সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণন কমিশনের সুপারিশগুলিকে সংক্ষেপে নিম্নরূপে তালিকাবদ্ধ করা চলে—

১। আমাদের আইন কলেজগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পুনঃসংগঠন করতে হবে।

২। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টির মত আইন বিষয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে দক্ষ ব্যক্তিদের পরিচালনায় পৃথক ফ্যাকাল্টি থাকা দরকার।

৩। আইনশিক্ষায় প্রবেশাধিকার লাভের পূর্ব্বে তিন বছরের প্রাক্-আইন শিক্ষা এবং সাধারণ আইন চর্চ্চার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। আইনশিক্ষার জন্য তিন বছরের ডিগ্রী শিক্ষাক্রম প্রবর্ত্তন করতে হবে ; এই শিক্ষাক্রমের শেষ বছরটিতে প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণের ব্যাপক আয়োজন থাকবে এবং শিক্ষার্থীকে এডভোকেটের দপ্তরে শিক্ষানবীশী করতে হবে।

৫। আইনশিক্ষা কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী আংশিক সময়ের এবং পূর্ণ সময়ের জন্যও নিযুক্ত হবেন। আইনশিক্ষার মূল বিষয়গুলি পূর্ণ সময়ের শিক্ষকগণ অধ্যাপনা করবে এবং প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণের বিষয়গুলি চুক্তিবদ্ধ ব্যবস্থানুসারে আংশিক সময়ের শিক্ষকগণ অধ্যাপনা করবে।

৬। আইনশিক্ষার ক্লাশগুলি শিক্ষাদানের স্বাভাবিক নিয়মিত সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।

৭। আইন ডিগ্রী অধ্যয়নরত কোনও শিক্ষার্থীকে একই সঙ্গে অন্য ডিগ্রী অধ্যয়নের অনুমতি সাধারণতঃ দেওয়া হবে না। তবে মেধাবী উচ্চতর প্রতিভার শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও সামর্থ্য বিবেচনা করে এ বিষয়ে শিথিলতা অবলম্বন করা চলতে পারে।

৮। প্রত্যেক আইন ফ্যাকাল্টিতে, বিশেষ করে রাষ্ট্র সংবিধান আইন, আন্তর্জ্জাতিক আইন, প্রশাসনমূলক আইন, আইন প্রয়োগ বিধি, হিন্দু ও মুসলিম আইন সম্পর্কে কিছু কিছু গবেষণার আয়োজন ও সুযোগ সুবিধা রাখতে হবে।

৯। আইন শিক্ষার্থীদের প্রগতি পরিমাপের জন্য অভীক্ষা প্রয়োগ ও মাঝে মাঝে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে ; পরীক্ষাগুলি সময়ভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিকও হবে।

Q. 14. Trace the beginnings of modern medical education in India.

Ans. প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেই ভারতে আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যা চর্চ্চার সূচনা হয়েছে। ১৮৫৭ সালে এদেশে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব্বেও কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে চিকিৎসাবিদ্যার কলেজ ছিল এবং সেইসব কলেজ থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় ডিগ্রী পর্য্যায়ের শিক্ষাদান চলতো। অবশ্য চিকিৎসা বৃত্তিতে নিয়োজিত চিকিৎসকের অধিকাংশই মেডিক্যাল স্কুলগুলি থেকেই চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষা গ্রহণ করতেন। ১৮২২ সালে কোম্পানী কলকাতায় নেটিভ মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউশন স্থাপন করে। ১৮৩৫ সালে কলকাতায় একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। মেডিক্যাল স্কুলগুলির কিছু কিছু রাষ্ট্র কর্ত্তৃক পরিচালিত হতো, এবং অন্যগুলি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বিশেষতঃ মিশনারীদের উদ্যোগে পরিচালিত হতো। এই ধরণের

মেডিক্যাল স্কুলগুলির শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল চিকিৎসা বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সহকারী সৃষ্টি করা এবং ঐ সকল শিক্ষিত সহকারী চিকিৎসকদের নিজ দায়িত্বে কোন চিকিৎসা করার দায়িত্ব নিতে হতো না। এদের প্রায় চার বছরের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো এবং প্রশিক্ষণ শেষে হাসপাতাল-সহকারীর কাজ দেওয়া হতো। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উচ্চতর বিষয়গুলি এদের শেখানো হতো না। ১৮২৬ সালে বোম্বাই এলফিনষ্টোনে নেটিভ মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু ব্যর্থতার জন্য ১৮৩২ সালে বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৩৬ সালে পুণা কলেজে মেডিক্যাল ক্লাশ সুরু হয়। ১৮৪৫ সালে বোম্বাইতে গ্রাণ্ট মেডিক্যাল কলেজ সুরু হয়।

ক্রমে মেডিক্যাল স্কুলগুলির পাঠক্রম সংশোধন করা হয় এবং মেডিক্যাল কলেজগুলির পাঠক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে বহু নূতন পাঠ্যবিষয় সংযোজিত হতে থাকে। ১৮৬০ সালে লাহোরে একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। ১৯০১-২ সালে সমগ্র ভারতে মোট ২৪টি মেডিক্যাল স্কুল ছিল।

সৈন্যবিভাগের চিকিৎসার জন্য সেনা-চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানেও কিছু কিছু চিকিৎসা বিদ্যার আয়োজন ছিল। চার বছরের শিক্ষার পর সেনা বিভাগের চিকিৎসা কার্য্যে সহকারীরূপে গ্রহণ করা হতো। অবশ্য এই শিক্ষার উৎকর্ষমান খুব সন্তোষজনক ছিল না। পশু চিকিৎসার জন্য লাহোরে (১৮৮২), বোম্বাইতে (১৮৮৬) এবং কলকাতায় (১৮৯৩) ভেটেরিনারী কলেজ স্থাপিত হয়।

চিকিৎসা বিদ্যা গ্রহণের পূর্ব্বে শিক্ষার্থীদের কমপক্ষে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হতো। মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতার তারতম্য ছিল, তবে প্রবেশলাভের পূর্ব্বে সকলকেই বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হতো।

ডিগ্রী শিক্ষাক্রমে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি বিভিন্ন পর্য্যায়ে চিকিৎসা বিদ্যার শিক্ষা দেওয়া হতো—এল. এম. এস. এবং এম. বি. বি. এস.। যদিও প্রবেশাধিকারের যোগ্যতা দুই পর্য্যায়েই সমান ছিল, তবে শিক্ষাকাল ও পরীক্ষার মান সম্পর্কে পার্থক্য ছিল।

চিকিৎসা বৃত্তিতে প্রবেশের যোগ্যতালাভের জন্য নানাপ্রকার ডিপ্লোমাও প্রচলিত হয়েছিল। যেমন, এল. এম. পি এবং ডি. এম. এস. (সেনাবিভাগের চিকিৎসা সহকারীদের জন্য)। এল. এম. এস. এবং এম. বি. বি. এস. (বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত চিকিৎসা বিদ্যার ডিগ্রী) গ্রহণের পূর্ব্বে ডিপ্লোমার প্রয়োজনও এক সময়ে অনুভূত হত। মেডিক্যাল স্কুলের চিকিৎসা বিদ্যার ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রম ছিল সাধারণতঃ চার বছর। পরে মাদ্রাজে পাঁচ বছরের

শিক্ষাক্রমও প্রবর্ত্তিত হয় এবং এই শিক্ষার শেষে ডি. এম. এস. ডিপ্লোমা দেওয়া হতো।

একই বৃত্তির জন্য দু-ধরনের যোগ্যতা মান থাকা সামঞ্জস্যহীন বলেই মনে হয়। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ক্রমে এল. এম. এস. ডিগ্রী লোপ করেন। ১৯২৬ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এল. এম. এস. ডিগ্রী শিক্ষা সব শেষে লুপ্ত হয়। এম. বি. বি. এস্. ডিগ্রীর নাম পরিবর্ত্তন করে বৃটিশ রীতি অনুসারে এম. বি. বি. এস, করা হয়। অনেক প্রদেশেই মেডিক্যাল স্কুল ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং চিকিৎসা বৃত্তিতে প্রবেশযোগ্যতা স্বরূপ কেবলমাত্র ডিগ্রী শিক্ষাকেই মর্য্যাদা দেওয়া হয়। প্রথমে মাদ্রাজে ও পরে উত্তর প্রদেশে চিকিৎসা বিদ্যার ডিপ্লোমা শিক্ষা লুপ্ত করা হয়; পরে অন্যান্য সকল প্রদেশেই এই নীতি অনুসরণ করা হতে থাকে।

অনেকদিন যাবৎ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির চিকিৎসা বিদ্যার ডিগ্রী সর্ব্বত্র মর্য্যাদা লাভ করতো। কিন্তু ১৯২১ সালে জেনারেল মেডিক্যাল কাউন্সিল সিদ্ধান্ত করলেন যে, ভারতীয় চিকিৎসা বিদ্যার কলেজগুলি ভালভাবে পরিদর্শন না করে এদেশের চিকিৎসা বিদ্যার ডিগ্রীকে মর্য্যাদা দেওয়া হবে না। কারণ, তাঁরা মনে করেন, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু প্রয়োজনীয় চিকিৎসা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণের যথাযথ আয়োজন নেই। এই পরিদর্শনের ব্যবস্থা হওয়ার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষ অধ্যাপনা ব্যবস্থা করেন।

জেনারেল মেডিক্যাল কাউন্সিলের এই নিয়মিত পরিদর্শনের ফলে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কিছুদিন মতানৈক্য চলার পর ১৯৩১ সালে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার ন্যূনতম মান নির্দ্ধারিত হয়। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল কর্তৃক মান নির্দ্ধারণের ফলে এদেশের চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

সাম্প্রতিককালে ভারতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। ১৯৫০-৫১ সালে এদেশে মোট ৩৯টি মেডিক্যাল কলেজ ও ৩১টি মেডিক্যাল স্কুল ছিল। ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিও গঠিত হয়েছে—

১। অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হাইজীন এণ্ড পাবলিক হেলথ, কলিকাতা
২। সেণ্ট্রাল ড্রাগস্ ল্যাবরেটরী, কলিকাতা
৩। সেণ্ট্রাল রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট, কাসাউলী, এবং
৪। ম্যালেরিয়া ইনষ্টিটিউট অব ইণ্ডিয়া, দিল্লী।

Q. 15. Discuss the present position and problems of medical education in India.

Ans. বর্ত্তমানে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই চাহিদা পূরণের জন্য অধিকসংখ্যক মেডিক্যাল কলেজ খোলা দরকার। কিন্তু অধিক সংখ্যক মেডিক্যাল কলেজ খোলার অনেক সমস্যা আছে। আর্থিক সমস্যা ছাড়াও উপযুক্ত যোগ্য শিক্ষক সংগ্রহের সমস্যাও আছে। কোন কোন অঞ্চলে শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণের জন্য মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থী আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ; কিন্তু শিক্ষার উৎকর্ষ মান হ্রাস পেয়েছে বলে আশঙ্কা করা হয়। উপযুক্ত শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ল্যাবরেটরীর আয়োজন না করে কেবল আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে সমস্যার সমাধান হবে না। কোনও মেডিক্যাল কলেজেই ১০০ জনের বেশী শিক্ষার্থী গ্রহণ করা উচিত নয় বলে শিক্ষাবিদগণ দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করে থাকেন।

কলেজগুলির স্থানাভাবের জন্যই শিক্ষাগ্রহণের পর চিকিৎসা বিদ্যার শিক্ষার্থীরা কলেজ সংলগ্ন হাসপাতালে প্র্যাকটিস্ করার যথেষ্ট সুযোগ পায় না। অথচ চিকিৎসাবিদ্যা ক্ষেত্রে আবাসিক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য্য। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণ সমাপ্ত হলেই তাকে কলেজ সংলগ্ন হাসপাতালে আবাসিক প্র্যাক্‌টিসের কাজে নিয়োগ করা উচিত ; অন্ততঃ ১ বছর বা ১৫ মাস এইভাবে কাজ করার পর শিক্ষার্থীকে চিকিৎসা বৃত্তিতে যোগদানের ছাড়পত্র দেওয়া বিধেয়। এ বিষয়ে প্রত্যেক মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষেরই যত্নবান হওয়া উচিত।

চিকিৎসা বিদ্যায় উপযুক্ত অধ্যয়ন অধ্যাপনার জন্য মেডিক্যাল কলেজ-গুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক সরঞ্জাম, গ্রন্থাগার, মিউজিয়াম, বক্তৃতা কক্ষ, প্রভৃতি থাকা দরকার। অনেক কলেজে এগুলি যথেষ্ট নয়। শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এগুলিও বৃদ্ধি না করতে পারলে চিকিৎসা বিদ্যায় সঙ্কট দেখা দিতে পারে।

কলেজ সংলগ্ন হাসপাতাল ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই আছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবস্থাটি সুসমঞ্জস নয়। কলেজের বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় সংক্রান্ত হাসপাতাল বিভাগ একই সঙ্গে থাকা দরকার। কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে হাসপাতাল প্রাঙ্গণ খুব দূরে হলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও চিকিৎসকের মধ্যে পরামর্শ এবং উপযুক্ত রোগীদের পর্য্যবেক্ষণ করার অনেক অসুবিধা ঘটে থাকে। তাছাড়া হাসপাতালের বেড সংখ্যা যথেষ্ট না হলে শিক্ষার্থীদের পর্য্যবেক্ষণের সুবিধা হয় না। অনেকে বলেন, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য অন্ততঃ ১০টি বেড সম্বলিত হাসপাতাল প্রত্যেক কলেজ বিভাগের সংলগ্ন থাকা উচিত।

মেডিক্যাল কলেজগুলিতে বর্ত্তমানে তিন শ্রেণীর শিক্ষক আছেন :—বিভিন্ন ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান—এই সকল ব্যক্তি উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন সম্পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং এঁদের তত্ত্বাবধানে ভেষজ, শল্য এবং ধাত্রীবিদ্যার ভার থাকা বিধেয়। অধ্যাপকরা অন্যান্য ক্লিনিক্যাল শিক্ষকদের অধ্যাপনার সমন্বয় সাধন করে থাকেন। ক্লিনিক্যাল শিক্ষকগণ আংশিক সময়ের অধ্যাপনাও করে থাকেন। কোন কোন রাজ্যে অবৈতনিক মেডিক্যাল অফিসারগণ আংশিক সময়ের জন্য ক্লিনিক্যাল শিক্ষকের কাজ করে থাকেন মেডিক্যাল কলেজগুলিতে এই ব্যবস্থাটি ভাল। অবশ্য যোগ্য শিক্ষকদের চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যাপনার ক্ষেত্রে আকৃষ্ট করার জন্য উপযুক্ত বেতন হার প্রবর্ত্তন করতে হবে।

চিকিৎসাবিদ্যা ক্ষেত্রে কয়েকটি নূতন পাঠ্য বিষয় প্রচলিত হয়েছে, সেগুলি আমাদের দেশের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে এখনো ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। এই নূতন চিকিৎসা পাঠ্যবিষয়গুলির মধ্যে একটি হলো পাবলিক হেল্থ্ ইঞ্জিনীয়ারীং এবং অপরটি উচ্চতর নার্সিং বিদ্যা। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নকল্পে এই দুইটি বিষয়ের গুরুত্ব সমধিক, সুতরাং মেডিক্যাল কলেজগুলিতে যাতে এই বিষয়গুলি যথাযথভাবে অধ্যাপনার ব্যবস্থা হয়, সেদিকে উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের যত্ন নেওয়া অত্যাবশ্যক।

চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যার প্রভাবই আজকাল বেশী। কিন্তু ভারতের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ ও উনানী চিকিৎসা পদ্ধতির নীতিগুলিও যাতে মেডিক্যাল কলেজের পাঠক্রমের মধ্যে যোগ্য মর্য্যাদা লাভ করে, সে বিষয়ে লক্ষ্য দিতে হবে।

Q. 16. Trace the beginnings of modern teachers' education in India.

Ans. ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শিক্ষক শিক্ষণের প্রতি মোটেই মনোযোগ দেয়নি। তবে পর্তুগীজ মিশনারীরা যাজকশ্রেণীর শিক্ষকতাবৃত্তি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কয়েকটি শিক্ষক শিক্ষণ সেমিনারের ব্যবস্থা করেছিল। দিনেমার মিশনারীরাও শিক্ষক শিক্ষণের জন্য একটি স্কুল স্থাপনা করেছিল। ডক্টর এন্‌ড্রু বেল প্রমুখ বুদ্ধিমান শিক্ষকগণ মনিটর ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষণের পরোক্ষ ব্যবস্থা করেছিলেন। শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্যে কেরী সাহেব শ্রীরামপুরে একটি নর্ম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। মনরো এবং এল্‌ফিনষ্টোন তাঁদের শিক্ষাসংক্রান্ত দলিলে শিক্ষক শিক্ষণের গুরুত্ব লিপিবদ্ধ করেন।

নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সুসংবদ্ধভাবে শিক্ষক শিক্ষণের প্রথম আয়োজন হয় বোম্বাই প্রদেশে। সেখানে বোম্বাই নেটিভ এডুকেশন সোসাইটি ২৪ জন নির্ব্বাচিত সংগঠককে এবং অগণিত প্রাথমিক শিক্ষককে শিক্ষণ দান করে

লাঙ্কাষ্টার পদ্ধতি অনুসারে। বোম্বাই সরকারও এলফিনষ্টোন ইনষ্টিটিউশন, পুণা সংস্কৃত কলেজ ও সুরাট ইংরেজী স্কুলে নর্ম্যাল ক্লাশ প্রবর্ত্তন করেন। উল্লেখযোগ্য এই যে, এই সকল শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে পাশ্চাত্য জ্ঞান সরবরাহের আয়োজন ছিল। ১৯২৬ সালে মাদ্রাজেও অনুরূপ একটি নর্ম্যাল স্কুল স্থাপিত হয়।

বাংলাদেশে শিক্ষক শিক্ষণ অবহেলিত ছিল। অবশ্য কলিকাতা স্কুল সোসাইটির উদ্যোগে কিছুসংখ্যক শিক্ষককে লাঙ্কাষ্টার পদ্ধতি শিক্ষণদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে জানা যায় এবং ক্যালকাটা লেডীজ্ সোসাইটির প্রচেষ্টায় সেন্ট্রাল স্কুল ফর গার্ল্স্-এ মহিলা শিক্ষিকাদের শিক্ষণদানের এক বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। দুঃখের বিষয়, এডাম সাহেব শিক্ষক শিক্ষণের জন্য যে পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন, কমিটি অব্ পাবলিক ইন্ষ্ট্রাকশন তা একেবারেই প্রত্যাখ্যান করে দেন। ১৮৪৭ সালে কলকাতায় অবশ্য একটি নর্ম্যাল স্কুল স্থাপিত হয় এবং কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে আরও তিনটি শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। আগ্রা, মীরাট ও বেনারসে যথাক্রমে ১৮৫২, ১৮৫৬ ও ১৮৫৭ সালে নর্ম্যাল স্কুল স্থাপিত হয়। স্মরণ করা যেতে পারে, এই সময়ে শিক্ষক শিক্ষণ প্রধানতঃ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের জন্যই সীমায়িত ছিল।

স্ট্যানলীর শিক্ষা ডিসপ্যাচে শিক্ষক শিক্ষণের অভাব সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়। ফলে, শিক্ষক শিক্ষণের প্রতি সরকারী প্রযত্ন বৃদ্ধি পায় এবং কয়েকটি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৮১-৮২ সালে ১০৬টি নর্ম্যাল স্কুল ছিল এবং স্কুলগুলিতে ৩,৮৮৬ জন শিক্ষক শিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পায়। এই শিক্ষণ ব্যবস্থার জন্য ঐ সময়ে বার্ষিক চার লক্ষ টাকা ব্যয় হতো। হাণ্টার কমিশনও শিক্ষক শিক্ষণের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেন। ১৯০১-০২ সালে ১৩৩টি নর্ম্যাল স্কুল শিক্ষণ দান চালায় এবং ৪৪১০ জন শিক্ষার্থী এই শিক্ষণ সুযোগ পায়। এ ছাড়া মহিলা শিক্ষিকাদের শিক্ষণের জন্য ৪৬টি বিশেষ স্কুল ছিল; সেখানে মহিলা শিক্ষার্থী ছিলেন ১২৯২ জন।

মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য প্রথম যুগে মাত্র দুটি স্কুল ছিল: মাদ্রাজে সরকারী নর্ম্যাল স্কুল (১৮৫৬) এবং লাহোর ট্রেনিং স্কুল (১৮৮১)। তবে এই শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব প্র্যাক্‌টিস স্কুল ছিল না এবং গ্রাজুয়েট ও আণ্ডার গ্রাজুয়েট উভয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীই গ্রহণ করতো। হাণ্টার কমিশনের বিবরণী প্রকাশিত হওয়ার পরেই মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতির সূচনা হয়। ১৮৮৬ সালে মাদ্রাজ নর্ম্যাল স্কুলটিকে কলেজের মর্য্যাদা দান করা হয় এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হয়। ১৮৯৪ সালে রাজমন্ত্রীতে একটি শিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়

এবং ১৮৯৯ সালে কার্শিয়ং-এ একটি ক্ষুদ্র শিক্ষণ ক্লাশ সুরু হয়। এইভাবে ১৯০১-০২ সালের মধ্যে ৬টি শিক্ষণ কলেজ গড়ে ওঠে। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বিষয়ে এল. টি. ডিগ্রী প্রবর্ত্তন করেন। এইসব প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরণের ৫০টি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান অভাবে কোন কোন প্রদেশে শিক্ষক সার্টিফিকেট পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয় এবং যে সকল শিক্ষক পূর্ণ সময়ের জন্য শিক্ষণ গ্রহণ করতে অক্ষম, তাঁদের এই সার্টিফিকেট পরীক্ষায় আহ্বান করা হয়।

১৯০৪ সালের শিক্ষাসংক্রান্ত প্রস্তাবটি শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার গুরুত্ব আবার স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শিক্ষক শিক্ষণের কলেজ স্থাপিত হয় বোম্বাইতে (১৯০৬), কলকাতায় (১৯০৮), পাটনায় (১৯০৯) এবং ঢাকায় (১৯১০)। জব্বলপুরে যে ক্ষুদ্র ট্রেনিং ক্লাশ ছিল সেটি ১৯১১ সালে পূর্ণায়তন একটি ট্রেনিং কলেজে উন্নীত হয়। ১৯১২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের বিবরণীতেও শিক্ষক শিক্ষণের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ১৯১৩ সালে শিক্ষাসংক্রান্ত প্রস্তাবে বলা হয়, শিক্ষণহীণ কোনও শিক্ষককে শিক্ষকতা বৃত্তিতে রাখা হবে না; ফলে বহু শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ১৯২৯ সালে হার্টগ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণের শিক্ষাকাল বৃদ্ধি করতে বলেন এবং আরও শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনার সুপারিশ করেন। বর্ত্তমানে প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই একটি করে শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ আছে। ১৯৫০-৫১ সালে ৫৩টি শিক্ষক শিক্ষণ কলেজে ৫,৫৮৫ জন শিক্ষক শিক্ষণরত ছিলেন। শিক্ষণ স্কুলের সংখ্যা ছিল ৫৬৭ (পুরুষদের) এবং ২১৫ (মহিলাদের)। এই শিক্ষণ স্কুলগুলিতে পুরুষ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫২,০৬৯ এবং মহিলা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৭,৯৯৪ জন।

Q. 17. Draw a general lay out and present position of teacher education in India.

Ans. ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর থেকে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। ১৯৪৮ সালে শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৪২,১৫৭; ১৯৫৬ সালে শিক্ষার্থী সংখ্যা হয় ১০৫,১৯৪; এবং ১৯৬২-তে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮৪,৭৭০।

সাধারণভাবে বর্ত্তমানে ভারতে ছয় প্রকার শিক্ষকশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে:

১। প্রাক্-প্রাথমিক কেন্দ্র;
২। নর্ম্যাল বা প্রাথমিক শিক্ষণ স্কুল;
৩। আণ্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষণ স্কুল;
৪। গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের শিক্ষণ কলেজ;

৫। বিশেষজ্ঞদের জন্য শিক্ষণ কেন্দ্র ; এবং

৬ মহিলা শিক্ষিকাদের জন্য শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।

প্রাক্-প্রাথমিক কেন্দ্র : ভারতে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো শৈশবাবস্থায় রয়েছে এবং প্রাক্-প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থা খুবই অল্প। বর্ত্তমানে (১৯৬২ সালের হিসাবে) এই ধরণের মাত্র ৩২টি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এদেশে আছে। এর মধ্যে তিনটি রাষ্ট্র পরিচালিত এবং অন্যান্যগুলি বেসরকারী সংস্থা কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। স্কুলগুলিতে ১৯৬২ সালে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল : পুরুষ ১৭৮ জন, মহিলা ১,৬৬১ জন (মোট ১৮৩৯ জন)। ম্যাট্রিকুলেট বা প্রাইমারী সার্টিফিকেট পাশ-করা শিক্ষকদের এক বছরের শিক্ষণ সাধারণতঃ এই কেন্দ্রগুলিতে দেওয়া হয়। এই সকল শিক্ষণকেন্দ্রের পাঠক্রম এক ধরনের নয় এবং নার্শারী, কিণ্ডারগার্টেন, মন্তেসরী, প্রাক্-বুনিয়াদী প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের প্রাক্-প্রাথমিক স্কুলের প্রয়োজনানুসারে শিক্ষণদান করা হয়। প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষকদের শিক্ষণ পাঠক্রম মূলতঃ কর্ম্মকেন্দ্রিক এবং নিম্নরূপে শ্রেণীবিভক্ত : (১) সমষ্টিজীবন সংগঠন, (২) সমাজশিক্ষণ ; (৩) শিশু পর্য্যবেক্ষণ, (৪) শিশু শিক্ষার ইতিহাস, (৫) প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষার মূল নীতি ও লক্ষ্য, (৬) প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষার উপাদান, (৭) কর্ম্ম সংগঠন, (৮) পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য (৯) প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ (বাগান-করা ও পশুপালন সহ), (১০) ভাষা ও সাহিত্য, (১১) সঙ্গীত ও ছন্দ, এবং (১২) শিল্পকলা। কোন কোন কেন্দ্রে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে উচ্চতর শিক্ষণ দানের আয়োজনও করা হচ্ছে। বরোদার ফ্যাকাল্টি অব হোম সায়েন্স নামক সংস্থা থেকে শিশু বিকাশ সম্পর্কে এম. এসসি. ডিগ্রী প্রদান করা হয় এবং ঐ সংস্থা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা প্রদান করে। বিক্রমে শিক্ষণ স্কুলের সঙ্গে একটি প্রাক্-বুনিয়াদী স্কুল এবং শিশু পর্যবেক্ষণের একটি ল্যাবরেটরী আছে। ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার 'ইণ্ডিয়ান কমিটি অন্ আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশন' নামে একটি কমিটি নিয়োগ করেছেন ; এই কমিটি উপদেষ্টা সংস্থারূপে দেশের শিশুশিক্ষা সম্পর্কে ভারত সরকারকে পরামর্শদানে সহায়তা করবেন এবং দেশের বেসরকারীভাবে পরিচালিত শিশু শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করবেন।

নর্ম্ম্যাল বা প্রাথমিক শিক্ষণ স্কুল : ভারতে প্রাথমিক স্কুল দু'শ্রেণীর : বুনিয়াদী এবং অ-বুনিয়াদী। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রের শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য দু'ধরণের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে বুনিয়াদী শিক্ষকদের জন্য ৫২০টি শিক্ষণ স্কুল ছিল এবং অ-বুনিয়াদী শিক্ষকদের জন্য ছিল ৪০৩টি শিক্ষণ স্কুল। এই স্কুলগুলিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫৫,০৯১ এবং ৩৫,২৪১ জন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্নভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে। নীচের হিসাব থেকে সে বিষয়ে ধারণা করা যাবে :—

পরিচালন ব্যবস্থা	স্কুলের সংখ্যা
সরকারী	৫১৫
স্থানীয় সংস্থা	১৫
বেসরকারী সংস্থা	৪০
সাহায্যপুষ্ট	৩১৩
সাহায্যবিহীন	৪৭
মোট	৯৩০

১৯৬২ সালে অনুমোদিত বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ স্কুলের সংখ্যা হয়েছে ৮৫৩ এবং অবুনিয়াদী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ স্কুলের সংখ্যা হয়েছে ২৫৮টি। ঐ বছরে প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ স্কুলগুলিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :—

	পুরুষ	মহিলা	মোট
বুনিয়াদী	৮৫,৪৭৭	২৯,১২৪	১,১৪,৬০১
অবুনিয়াদী	১০,৮৩০	৫,১৬৭	১৫৯৯৭
মোট—	৯৬,৩০৭	৩৪,২৯১	১,৩০,৫৯৮

এই দু-ধরনের প্রাথমিক শিক্ষণ স্কুলে শিক্ষার্থীরা দু'শ্রেণীর (ক) প্রাথমিক শিক্ষার সার্টিফিকেট পাশ করা শিক্ষক, অর্থাৎ যাঁরা প্রাথমিক স্কুলে সাত বছরের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, এবং (খ) ম্যাট্রিকুলেট শিক্ষক। সাধারণতঃ উভয় শ্রেণীর শিক্ষকদের শিক্ষণকাল দু'বছর, তবে প্রথম পর্য্যায়ের শিক্ষকরা জুনিয়র শিক্ষকের সার্টিফিকেট পান এবং দ্বিতীয় পর্য্যায়ের শিক্ষকরা পেয়ে থাকেন সিনিয়র শিক্ষকের সার্টিফিকেট। এই সকল শিক্ষণ স্কুলে যোগদানের জন্য কোন পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা প্রয়োজন হয় না। এই শিক্ষণ স্কুলের পাঠক্রমে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম। সাধারণতঃ অ-বুনিয়াদী জুনিয়র শিক্ষণ পাঠক্রমে থাকে (১) একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা, (২) গণিত ও ভাষা শিক্ষাদানের পদ্ধতি, (৩) সাধারণ জ্ঞান, সামাজিক জ্ঞান ও দৈনন্দিন বিজ্ঞানের শিক্ষাদানের পদ্ধতি, (৪) শ্রেণী পরিচালনা, (৫) শিক্ষা দানের সাধারণ নীতি ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, এবং (৬) হিন্দী ভাষা। এছাড়া ভূগোল, কৃষি, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষণরত শিক্ষকদের পাঠগ্রহণ করতে হয়। শিল্পকলা শিক্ষাকে দুটি ভাগে ভাগ করা আছে : (ক) কাঠের কাজ, মাটির কাজ, বই বাঁধাই, বুনন, পশুপক্ষী পালন, অঙ্কণ ; (খ) ইট তৈরী, ঝুড়ি তৈরী, মাদুর বোনা, কার্ডবোর্ডের কাজ, সাবান তৈরী, কালি তৈরী, ক্যালিকো মুদ্রণ, শারীর শিক্ষণ. প্রাথমিক চিকিৎসা এবং জুনিয়র বয়স্কাউট। এই ধরনের শিল্পকলা থেকে একটি করে মোট দুটি শিল্প বা কায়িক শ্রম শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। সিনিয়র শিক্ষণ পাঠক্রম মোটামুটি জুনিয়র পাঠক্রমেরই

অনুরূপ, তবে কোন কোন অংশে উচ্চতর বিষয় সম্বলিত। মূল পার্থক্যগুলি এই রকম: (ক) গণিত শিক্ষার সঙ্গে বীজগণিত ও জ্যামিতি শিক্ষা দেওয়া হয়, (খ) শ্রেণী পরিচালনার সঙ্গে স্কুল সংগঠনের নীতিগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়, (গ) কায়িক শ্রম শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যে কোন দুটির উচ্চতর পাঠ অবশ্যই গ্রহণ করবে: পশুপক্ষী পালন, বাড়ী ঘর নির্মাণের কাজ, চর্মশিল্প, ধাতুর কাজ, কাপড় রাঙানো, ফলসজী সংরক্ষণ, বুনন, দড়ি তৈরী, কম্বল তৈরী, রেশমগুটি পালন, গোপালন, মৌমাছি পালন। বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থায় নঈতালিম শিক্ষানীতি অনুসরণ করা হয়। কয়েকটি মূল শিল্প, কয়েকটি সাহায্যকারী (auxiliary) শিল্প শিখতে হয়। মহিলাদের গৃহবিজ্ঞান শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এছাড়া শিক্ষাদান পদ্ধতি, স্কুল সংগঠন ও পরিচালনা, ২০টি অনুবন্ধ পাঠদান, ৫০টি সাধারণ পাঠদান, বুনিয়াদী স্কুলে এক সপ্তাহ শিক্ষকতা প্রভৃতিও থাকে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে থাকে আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষা, হিন্দী, সমাজবিদ্যা, সাধারণ বিজ্ঞান, অঙ্ক ও প্রাচীন ভাষা। শিক্ষার্থীদের সমাজ সম্পর্ক বিষয়েও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষণ স্কুল: মধ্য ইংরেজী বা জুনিয়র মাধ্যমিক স্কুলগুলির শিক্ষকরা সাধারণতঃ আণ্ডার গ্রাজুয়েট হন। তাঁরা মাধ্যমিক শিক্ষণ স্কুলে শিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। শিক্ষণকাল এক অথবা দু'বছর হয় এবং কৃতকার্য্য শিক্ষণার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় বা রাজ্যশিক্ষা দপ্তর থেকে সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। বরোদা, বোম্বাই, গুজরাট, কর্ণাটক, পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ে টি. ডি. ডিপ্লোমা পরীক্ষা নেওয়া হয়; নাগপুর, জব্বলপুর ও সৌগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপ. টি. নামে অনুরূপ পাঠক্রমে ডিপ্লোমা পরীক্ষা নেওয়া হয়। টি. ডি. পাঠক্রম এক বছরের, তবে শিক্ষণার্থীদের তিন বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকা চাই। ডিপ. টি. পাঠক্রম দু'বছরের। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ শিক্ষার্থীদের জন্য এক বছরের এল. টি. শিক্ষণ ব্যবস্থা আছে। কোন কোন রাজ্য শিক্ষা দপ্তর ও আণ্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন, যেমন: বিহারে সি. টি.; বোম্বাইতে এস. টি. সি.; মধ্য প্রদেশে সি. টি.; উত্তর প্রদেশে সি. টি.; এবং পশ্চিমবঙ্গে টি. টি. সি.। এই সকল পরীক্ষার পাঠক্রম বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজ্যে বিভিন্ন রূপ, তবে সাধারণভাবে পাঠক্রমের মূল একই রকম। পাঠক্রম সাধারণতঃ চার ভাগে বিভক্ত: (১) শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, (২) শিক্ষাদান পদ্ধতি, (৩) স্কুল সংগঠন ও স্বাস্থ্য, (৪) প্র্যাকটিস শিক্ষাদান।

শিক্ষণ কলেজ: ভারতের গ্রাজুয়েট শিক্ষকরা শিক্ষণ কলেজে শিক্ষকতা বৃত্তির অনুশীলন গ্রহণ করে থাকেন। ১৯৬২ সালে এদেশে শিক্ষণ কলেজের

মোট সংখ্যা ছিল বুনিয়াদী ধরণের ২৫৭টি এবং অ-বুনিয়াদী ধরণের ২৮০টি। অধিকাংশ কলেজেই পুরুষ ও মহিলা একই সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। এই কলেজগুলিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা নিম্নরূপ :

	পুরুষ	মহিলা	মোট
বুনিয়াদী	৩,২৩৮	১,৫৫০	৪,৭৮৮
অ-বুনিয়াদী	১০,৪৪২	৪,৯৫৪	১৫,৩৯৬
মোট	১৩,৬৮০	৬,৫০৪	২০,১৮৪

অ-বুনিয়াদী শিক্ষণ কলেজে এক বছরের শিক্ষণ দেওয়া হয় এবং কৃতকার্য্য শিক্ষণার্থীদের বি. এড., বি. টি., এল. টি., বা ডিপ. ইন এডুকেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। পাঠক্রমে সাধারণতঃ থাকে : (১) শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ও পরিসংখ্যান, (২) শিক্ষাতত্ত্বের মূল নীতি ও পদ্ধতি, (৩) স্কুল প্রশাসন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা, (৪) শিক্ষাদান পদ্ধতি, (৫) শিক্ষার ইতিহাস ও ভারতীয় শিক্ষার বর্তমান সমস্যা, (৬) প্র্যাকটিস শিক্ষাদান। বুনিয়াদী ধরণের শিক্ষণ কলেজেও এক বছরের পাঠক্রম প্রচলিত। এই পাঠক্রমে সাধারণতঃ থাকে : (১) শিক্ষাতত্ত্বের দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান, (২) শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, (৩) শিক্ষা প্রশাসন ও তত্ত্বাবধান, অথবা শিক্ষা পদ্ধতির গবেষণা, (৪) বুনিয়াদী শিক্ষাদান পদ্ধতি, (৫) শিল্প কাজ। বুনিয়াদী ধরণের শিক্ষণ কলেজগুলি অধিকাংশই রাষ্ট্র পরিচালিত, সুতরাং সার্টিফিকেট প্রদত্ত হয় রাজ্য শিক্ষা দপ্তর থেকে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নয়। তবে বুনিয়াদী শিক্ষণ কলেজের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত শিক্ষকরা সচরাচর কোন মাধ্যমিক স্কুলে কাজ করতে পারেন না, তাঁরা বুনিয়াদী শিক্ষণ স্কুলে শিক্ষকতা করতে পারেন।

বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য শিক্ষণ কেন্দ্র : শারীর শিক্ষা, কান্তি বিদ্যা (aesthetic) শিক্ষা, গৃহবিজ্ঞান, শিল্প এবং অন্যান্য বিশেষ ধরণের শিক্ষণীয় বিষয়ের শিক্ষকদের জন্য বিশেষ শিক্ষণ দানের উদ্দেশ্যে কতকগুলি শিক্ষণ কেন্দ্র আছে। **শারীর শিক্ষায়** শিক্ষণদান গ্র্যাজুয়েটদের জন্য হয় কলেজে এবং আণ্ডার গ্র্যাজুয়েটদের জন্য হয় শারীর শিক্ষণ স্কুলে। এখন এদেশে শারীর শিক্ষা কলেজ আছে ১৮টি, স্কুল আছে ৪৪টি (১৯৬২ সালের হিসাব)। কলেজের শিক্ষার্থী সংখ্যা ৬১৩ জন পুরুষ ও ১২০ জন মহিলা (মোট ৭৩৩ জন) ছিল। শারীর শিক্ষণ স্কুলে ২,৮৮৫ পুরুষ ও ৪৩৮ জন মহিলা শিক্ষনার্থী ছিলেন। শিক্ষণকাল সাধারণতঃ এক বছর ; কোন কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষণকাল শেষ হওয়ার পরেও তিন মাসের অতিরিক্ত তালিম দেওয়া হয়। লোনাভালার কৈবল্যধাম সমিতিতে যোগ বিদ্যা সম্পর্কেও ডিপ্লোমা শিক্ষা আছে। উল্লেখযোগ্য এই যে, এযাবৎ ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হয়নি ; উপরোক্ত শিক্ষাক্রমগুলি প্রধানতঃ সরকারী উদ্যোগেই প্রবর্তিত ও পরিচালিত

হয়ে থাকে। ১৯৫৭ সালে গোয়ালিয়রে কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের উদ্যোগে ১০০ একর ভূখণ্ডে লক্ষ্মীবাঈ কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশন স্থাপিত হয়েছে। এই কলেজে শারীর শিক্ষার নীতি, শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাপক শিক্ষাক্রম প্রবর্ত্তিত হয়েছে এবং এই প্রথম শারীর শিক্ষণ কলেজে সাধারণ শিক্ষাদানেরও সম্পূর্ণ আয়োজন করা হয়েছে। এই কলেজটিতেই একমাত্র তিন বছরের শারীর শিক্ষণ ডিগ্রী দেওয়া হয়ে থাকে এবং শারীর শিক্ষণ বিষয়ে গবেষণারও সুবিধা আছে। **কান্তিবিদ্যা** বা (aesthetic) শিক্ষার জন্য এদেশে শিক্ষকদের শিক্ষাদানের বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই। এ বিষয়ে যে কয়টি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে, সেগুলি (১) সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্রাঙ্কণের জন্য বিশ্বভারতী, (২) চিত্রাঙ্কণের জন্য বোম্বাইয়ের স্যার জে. জে স্কুল অব্ আর্টস, (৩) চারুকলার জন্য বরোদার এম. এস. বিশ্ববিদ্যালয়, (৪) নৃত্যের জন্য মাদ্রাজের কলা ক্ষেত্র, (৫) সঙ্গীতের জন্য মাদ্রাজের টিচার্স কলেজ অব মিউজিক, (৬) শিল্পকলার জন্য লক্ষৌয়ের গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টস, এবং (৭) শিল্প শিক্ষকদের জন্য দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া ইনষ্টিটিউট অব আর্ট এডুকেশন। **গৃহবিজ্ঞান** শিক্ষার প্রচলন দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজনও অনুভূত হয়েছে। এ বিষয়ে দিল্লীর লেডী আরউইন কলেজ; বোম্বাই-এর এস. এন. ডি. টি. মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়; বরোদার ফ্যাকাল্টি অব হোম্ সায়েন্স; হায়দ্রাবাদের ডোমেষ্টিক সায়েন্স ট্রেনিং কলেজ; এলাহাবাদের গভর্ণমেণ্ট কলেজ অব হোম সায়েন্স ফর উইমেন এবং আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান শিক্ষাক্রম প্রবর্ত্তন করেছে। শিল্প শিক্ষার বিষয়টি ইদানীং মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবশ্যিকরূপে প্রবর্ত্তিত হয়েছে. সুতরাং এ বিষয়ে সুশিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজন পূরণের জন্য রাজ্য শিক্ষা দপ্তরগুলি থেকে বিশেষ বন্দোবস্তক্রমে শিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন কারিগরী বিদ্যালয়ে বা শিল্প বিদ্যালয়ে শিক্ষণদানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। অন্যান্য বিশেষ বিষয়গুলির মধ্যে ভূগোল, ইংরেজী শিক্ষাদান, হিন্দী শিক্ষাদান প্রভৃতি সম্পর্কেও বিশেষ শিক্ষণদানের আয়োজন সরকারী উদ্যোগেই করা হয়ে থাকে। শিক্ষণকাল হয় সাধারণতঃ এক বছর।

মহিলা শিক্ষিকাদের জন্য শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ মহিলা শিক্ষকরা পুরুষদের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষণগ্রহণ করে থাকেন, তবে মহিলা শিক্ষিকাদের জন্য পৃথক শিক্ষণ স্কুল ও কলেজও আছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে সমগ্র দেশে মহিলাদের জন্য পৃথক শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ ছিল ৩১টি এবং শিক্ষণ স্কুল ছিল ২৫৮টি; এবং এই শিক্ষণ কলেজ ও স্কুলগুলিতে মহিলা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩০,৪৭৫ জন।

স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণা : শিক্ষাতত্ত্ব বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষণদান ও গবেষণার আয়োজন এদেশে অল্পদিন হয়েছে। এই শিক্ষণ ব্যবস্থা সাধারণতঃ দু-ধরনের : (১) এম. এড. (বি. টি বা বি. এড. অধ্যয়নের পর পর দুবছর বা কোথাও এক বছরের শিক্ষাক্রম) এবং (২) পি. এচ. ডি বা ডি. ফিল (এম. এড. অধ্যয়নের পর দুবছরের অধ্যয়ন ও গবেষণা)। নিম্নলিখিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এম. এড. ডিগ্রীর জন্য অধ্যয়নের ব্যবস্থা হয়েছে : আলিগড়, এলাহাবাদ, উৎকল, ওসমানিয়া, কর্নাটক, কেরল, জব্বলপুর, গুজরাট, গোরখপুর, দিল্লী, পঞ্জাব, পাটনা, পুণা, বরোদ, বেনারস, বিক্রম, বোম্বাই, নাগপুর, মাদ্রাজ, মহীশূর, রাজস্থান, লক্ষ্ণৌ, এস. এন. ডি. টি., এবং সৌগর। কলকাতা এবং গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. (এডুকেশন) ডিগ্রী প্রদত্ত হয়। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষাতত্ত্ব পাঠক্রমে একটি ক্ষুদ্রায়তন গবেষণাপত্র আহ্বান করা হয়। বরোদা, বেনারস, বোম্বাই, কর্নাটক, সৌগর ও পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবলমাত্র গবেষণাপত্রের ভিত্তিতেই এম. এড. ডিগ্রী দেওয়া হয়ে থাকে। স্নাতকোত্তর এম. এড. ডিগ্রী গ্রহণের পর নূতন শিক্ষাতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণার জন্য পি. এচডি বা ডি. ফিল, ডিগ্রী দেওয়া হয়। তবে ডক্টরেট পর্য্যায়ে শিক্ষাতত্ত্ব বিষয়ে অধ্যয়নের বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না।' বুনিয়াদী শিক্ষানীতি অনুসারে স্নাতকোত্তর শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা এখনো সুষ্ঠুভাবে আমাদের দেশে প্রচলিত হয়নি। তবে কোন কোন বুনিয়াদী শিক্ষণ কলেজে এবিষয়ে উচ্চতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার আয়োজন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সম্প্রতি ন্যাশন্যাল সেণ্টার ফর রিসার্চ ইন বেসিক এডুকেশন নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; এই সংস্থাটি বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে নূতন তথ্যাদি প্রসারে সহায়তা করে থাকে। ১৯৫৩-৫৪ সাল থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি পরিকল্পনা প্রবর্ত্তিত হয়েছে, যার দ্বারা শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগে অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে শিক্ষাসমস্যা সম্পর্কে গবেষণার সুব্যবস্থা করা যায়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ অনুমোদিত গবেষণা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে থাকেন এবং গবেষণার সকল অর্থব্যয় রাষ্ট্রকোষ থেকে নির্ব্বাহিত হয়।

শিক্ষকতাকালীন শিক্ষণ : শিক্ষকগণ কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষণ গ্রহণের পর শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার পরেও শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা থাকে। রিফ্রেসার (refresher) শিক্ষাক্রম, বিশেষ বিষয়ের জন্য স্বল্পকালীন শিক্ষাক্রম (সর্ট কোর্স), কর্ম্মকেন্দ্রে প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের সম্মেলন বা আলোচনা চক্র প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষকদের শিক্ষকতাকালীন দক্ষতার উৎকর্ষ মান অক্ষুণ্ণ রাখার আয়োজন করতে হয় ; কিন্তু এদেশে এই ব্যবস্থাগুলি

সুষ্ঠুভাবে করা হয় না। অবশ্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি অভিনব ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা জগতের অন্য কোন দেশে প্রচলিত নেই। এই নূতন ব্যবস্থা অনুসারে বহু শিক্ষক শিক্ষণ কলেজে এক্সটেনসন সেণ্টার স্থাপিত হয়েছে। এই শিক্ষণ-প্রসার কেন্দ্রগুলিতে সপ্তাহান্তে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন শিক্ষণ দানের আয়োজন হয়, শিক্ষা সপ্তাহ ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, পরামর্শমূলক আলোচনাচক্র সংগঠিত হয়। গ্রন্থাগার পরিচালিত হয় এবং শ্রাব্যদৃশ্য (অডিও-ভিজুয়াল) অনুষ্ঠান ও প্রকাশনার মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মাঝে মাঝে প্রধান শিক্ষকদের আলোচনা চক্র আয়োজিত হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিলের পরিচালনায় এ ধরণের আলোচনা চক্রে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের প্রধান শিক্ষকগণ সম্মিলিত হয়ে শিক্ষাসমস্যাগুলি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

Q. 18. What are the special problems of teacher education in India ?

Ans. সাম্প্রতিক কালে ভারতে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি সাধিত হলেও শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থাকে সর্ব্বাঙ্গীণভাবে সন্তোষজনক বলা চলে না। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বহু সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। সমস্যাগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য নূতন আদর্শ-বোধের কথা। বর্ত্তমান ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রতি বিশেষ নীতিগত গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, সুতরাং শিক্ষককে বাস্তব-অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে শিক্ষাদানের উপাদান সংগ্রহের দিকে অধিকতর যত্নবান হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বুনিয়াদী ধরনের শিক্ষণ কলেজগুলি এই নূতন আদর্শকে রূপায়িত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এই সকল কলেজে কেবলমাত্র পুঁথিগত জ্ঞানের ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থাকে সংগঠিত না করে জীবন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পুনঃসংগঠিত করার প্রয়াস চলেছে। বি. টি. ও বি. এড. পর্য্যায়েও এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হতে দেখা যাচ্ছে। নূতন আদর্শবোধ অনুসারে শিক্ষক শিক্ষণ কলেজের পাঠক্রমে (১) শিক্ষাতত্ত্বের মূলনীতি ও স্কুল সংগঠন, (২) শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যশিক্ষা, (৩) শিক্ষাদান পদ্ধতি (৪) শিক্ষা সমস্যা, (৫) গ্রন্থাগার পরিচালন, (৬) শিক্ষা ও বৃত্তি পথনির্দ্দেশ, (৭) অনগ্রসর অল্পধী শিক্ষার্থীদের বিশেষ শিক্ষাদান পদ্ধতি, (৮) শ্রাব্যদৃশ্য (অডিও ভিজুয়াল শিক্ষাদান পদ্ধতি), (৯) মানসিক পরিমাপ (১০) শারীর শিক্ষা, (১১) সহপাঠক্রমিক কার্য্যাবলীর সংগঠন, (১২) সমাজ শিক্ষা, প্রভৃতি নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হচ্ছে। এছাড়া প্র্যাকটিস শিক্ষাদান, শিক্ষাদান পর্য্যবেক্ষণ, পাঠদান পর্য্যালোচনা, বিভিন্ন পর্য্যায়ের স্কুল পর্য্যবেক্ষণ, সহ পাঠক্রমিক কর্ম্ম-সূচীতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষক শিক্ষণার্থীদের নিয়োগ করা

হচ্ছে। সুতরাং শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমের নীতিমূলক পাঠক্রমের গুরুভার হ্রাস করার প্রয়োজন হয়েছে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কোনও একটি বিশেষ শিক্ষণ বিষয়ে পারদর্শী করে তোলার দিকে মনোযোগ দিতে হচ্ছে এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কার্য্যাবলীর ব্যাপক আয়োজন করতে হচ্ছে। এই অনুসারে বি. টি. ও বি. এড. পাঠক্রম সংশোধনের প্রয়োজন হয়েছে।

বুনিয়াদী এবং অ-বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য দূর করার সমস্যাটিও অনুধাবনযোগ্য। দু-ধরনের শিক্ষক শিক্ষণের জন্য পৃথক ধরনের শিক্ষণ কলেজ পরিচালনার সম্পর্কেও অনেকের দ্বিমত আছে। নিখিল ভারত শিক্ষণ কলেজ সম্মেলনে এই দুই ধারাকে একটি সুসমন্বিত ধারায় একীভূত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিশ্বভারতীর বিনয়-ভবনে এবং উদয়পুরের বিদ্যা-ভবন (টিচার্স ট্রেনিং কলেজ)-এ এবিষয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছে এবং বুনিয়াদী শিক্ষাদর্শন সম্বলিত একটি বি. টি. বা বি. এড ডিগ্রী পাঠক্রম উদ্ভাবনের চেষ্টা হচ্ছে।

শিক্ষণার্থী শিক্ষকদের কেবলমাত্র নীতিমূলক শিক্ষণদান করলেই তাঁদের শিক্ষকতা বৃদ্ধি করা যায় না। নীতিগুলি শিক্ষণার্থী যাতে বাস্তব শিক্ষাদান ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে এবং প্রয়োগের মাধ্যমে আপন শিক্ষকতা সম্পর্কে সম্যক্‌ধারণা সৃষ্টি করতে পারে, সে আয়োজন রাখা দরকার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-মূলক কার্য্যাবলী (প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক) মাধ্যমে। এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ দিতে হলে প্রত্যেক শিক্ষণ কলেজের সঙ্গে আদর্শ স্কুল সংলগ্ন থাকা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই তা সম্ভব হয় না এবং শিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ নানা অসুবিধার মধ্যে নিকটস্থ যে কোনও স্কুলে প্র্যাকটিস শিক্ষাদান সমাধা করতে বাধ্য হন। তাছাড়া শিক্ষণ কাল এত অল্প যে কোনও শিক্ষণার্থীর পক্ষে এত অল্প সময়ে শিশু শিক্ষার্থীদের বিকাশ সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা সম্ভব হয় না। এজন্য নীতিমূলক অধ্যয়নের পরিমাণ হ্রাস করে শিশু পর্য্যবেক্ষণের সময় বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য।

অনেকে মনে করে আণ্ডার গ্রাজুয়েট পর্য্যায় থেকেই চার বছরের শিক্ষক শিক্ষণ শিক্ষাক্রম প্রবর্ত্তন করলে শিক্ষণার্থীরা শিক্ষকতাবৃত্তি সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জনে সক্ষম হবেন। আমেরিকাতেও এই ধরনের শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে।

ভারতে বহুসাধক (মালটিপারপাস) স্কুল ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় বিভিন্ন পাঠপ্রবাহের শিক্ষা উপাদান সম্পর্কে শিক্ষকদের ধারণা সুস্পষ্ট নয়। শিক্ষকগণ সাধারণ শিক্ষানীতি সম্পর্কে শিক্ষণপ্রাপ্ত হলেও বিভিন্ন পাঠপ্রবাহের বিশেষ ধরনের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত না হলে চলে না। বহু সাধক স্কুলের জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা কার্য্যকরী করতে হলে

(১) কয়েকটি বিশেষ বৃত্তিমূলক সংস্থায় শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ স্থাপন করতে হবে, অথবা (২) শিক্ষণ কলেজগুলিতে বিভিন্ন বৃত্তির জন্য বিশেষ বিভাগ স্থাপন করতে হবে। বিশেষ বৃত্তিদক্ষ শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে এই ব্যবস্থা অনুযায়ী বহুসাধক স্কুলের শিক্ষক শিক্ষণার্থীগণ শিক্ষণ গ্রহণ করবেন। তবে এই ব্যবস্থা খুবই ব্যয়বহুল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে কয়েকটি কেন্দ্রে এবিষয়ে প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ রেখে কাজ স্থুরু করা যেতে পারে।

বহুসাধক স্কুলের শিক্ষণদানের উদ্দেশ্যে ভারতের চারটি অঞ্চলে চারটি আঞ্চলিক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব ১৯৫৯ সালে রাজ্য শিক্ষাসচিব সম্মেলনে গৃহীত হয়েছে। এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী করতে সময় লাগবে, কারণ বিষয়টি ব্যয়বহুল। অন্তর্ব্বর্ত্তীকালে বিভিন্ন পলিটেকনিকের মাধ্যমে বহুসাধক স্কুলের শিক্ষণকার্য চালিয়ে যাওয়া উচিত। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগগুলি নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমেও বহুসাধক স্কুলের শিক্ষকদের বিশেষ শিক্ষণদানের ব্যবস্থা কার্য্যকরী করতে পারেন।

আণ্ডারগ্রাজুয়েট শিক্ষকদের জুনিয়র স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষণ দেওয়ার জন্য যে পাঠক্রম আছে, তার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব আছে। পাঠক্রমটি কোথাও এক বছরের, কোথাও দুবছরের। এই পাঠক্রম দুবছরের হওয়া উচিত। প্রথম বছরে সাধারণ শিক্ষা ও দ্বিতীয় বছরে শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষণ দেওয়া আবশ্যক। এই ধরণের মাধ্যমিক শিক্ষণ স্কুলগুলিতে প্রাক্-স্কুল শিক্ষা, শিল্প শিক্ষা, শারীর শিক্ষা ও সঙ্গীতকলা বিষয়ে শিক্ষণদানের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এড. শিক্ষাক্রম সাধারণতঃ বি. টি. বা বি. এড. শিক্ষাক্রমের প্রসার মাত্র। দেশের বর্ত্তমান প্রয়োজনে এই শিক্ষাক্রমের সার্থকতা অল্প। এই স্নাতকোত্তর পর্য্যায়ের শিক্ষণদানের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চতর-ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক, পরিদর্শক এবং শিক্ষণ অধ্যাপকের পদের যোগ্যতা দান করা। এই পাঠক্রম তিনভাগে বিভক্ত করা উচিত: (১) আবশ্যিক—শিক্ষাতত্ত্ব, পাঠক্রম, শিক্ষাদর্শন, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা-পদ্ধতির তুলনামূলক পাঠ, শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত পরিসংখ্যানতত্ত্ব এবং শিক্ষাগবেষণার পদ্ধতি; (২) ঐচ্ছিক একটি নির্ব্বাচিত বিষয়ে বিশেষ অধ্যয়ন ও গবেষণাপত্র রচনা; এবং (৩) মৌখিক পরীক্ষা।

উপরোক্ত আবশ্যিক পাঠ্যক্রম অংশের মাধ্যমে শিক্ষণার্থীকে শিক্ষাক্ষেত্র সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা সৃষ্টিতে সহায়তা করা হবে এবং ঐচ্ছিক অংশের মাধ্যমে একটি বিশেষ শিক্ষাক্ষেত্রে গভীর জ্ঞান অর্জ্জনে উদ্বুদ্ধ করা হবে। ঐচ্ছিক অংশে (১) পাঠক্রম, (২) বিশেষ বিষয় শিক্ষাদান, (৩) বুনিয়াদি শিক্ষা,

(৪) শিক্ষক শিক্ষণ, (৫) শিক্ষণ প্রসার (এক্সটেন্সন) কর্ম্মসূচী, (৬) শিক্ষা পথনির্দ্দেশ এবং অনুরূপ বিশেষ বিষয়ের শিক্ষণদানের ব্যবস্থা থাকবে।

এম. এড. ও পি. এচডি বা ডি. ফিল. ডিগ্রীর জন্য গবেষণাপত্রের উৎকর্ষমান খুব উচ্চ হওয়া বাঞ্ছনীয়। গবেষণাপত্রের মাধ্যমে কেবল শিক্ষাতত্ত্বের উপর নূতন আলোকপাত ছাড়াও ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রের জ্ঞান প্রসারেও যেন সহায়তা হয়।

শিক্ষণ কলেজগুলি কেবল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দানের কার্য্যে ব্যস্ত থাকলেই চলবে না। মুদালিয়র কমিশনের পরামর্শমত প্রত্যেকটি শিক্ষণ কলেজকে শিক্ষাতত্ত্ব বিষয়ে ধারাবাহিক ও সুসমন্বিত উপায়ে গবেষণাকার্য্য চালিয়ে যেতে হবে। গবেষণাগুলি শিক্ষণ-অধ্যাপক ও শিক্ষণার্থীদের সহযোগিতায় সম্পন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই সকল গবেষণা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে হওয়া উচিত: (১) পাঠক্রম প্রণয়ন, (২) সংগঠন ও প্রশাসন, (৩) শিক্ষকদের কর্ম্মভার, (৪) শিক্ষাদান প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি উন্নয়ন, (৫) ভারতীয় শিশুর মনোবিজ্ঞান, (অল্পধী, প্রতিভাবান, সমস্যামূলক শিশুদের বিষয়ে), (৬) অভীক্ষা ও পথনির্দ্দেশ, (৭) শিক্ষামূলক সমাজবিজ্ঞান।

শিক্ষক শিক্ষণ বিষয়ে কলেজ অধ্যাপক সৃষ্টি করার সমস্যাটিও উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ শিক্ষণ কলেজের অধ্যাপকগণ বক্তৃতাদানের সাহায্যে শিক্ষাদান সম্পন্ন করেন। কিন্তু সুদক্ষ শিক্ষণ অধ্যাপকের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা দরকার: (১) পাঠ্যবিষয়ে উপাদান সংগঠন, (২) সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা, (৩) পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞান, (৪) শিক্ষণার্থীর মধ্যে চিন্তা সৃষ্টির দক্ষতা, এবং (৫) পাঠ্যবিষয়ের প্রতি উৎসাহী মনোভাব। এ বিষয়ে শিক্ষণ অধ্যাপকদের বিশেষ স্বল্পকালীন শিক্ষণদানের আয়োজন করা উচিত এবং শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণায় অংশগ্রহণে উৎসাহ দেওয়া উচিত।

শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ম্মধারার মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনটি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কারণ শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত এম. টি., এম. এড., বি. টি., বি. এড., এল. টি., সি. টি., টি. সি., টি. ডি., ডিপ. এড., এস. এ. ভি, প্রভৃতি নানাবিধ ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মধ্যে দ্বিধা সৃষ্টি হয়। শিক্ষণ কলেজগুলির মধ্যে কোনটিতে কেবলমাত্র প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, আবার কোন কলেজে গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে মাধ্যমিক শিক্ষকতার জন্য। সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে এই সকল ব্যবস্থাকে সুসমন্বিত করা বাঞ্ছনীয়। কোন কোন রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষণ ডিগ্রী দেওয়া হয়, আবার রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর থেকেও শিক্ষণ ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। এ বিষয়ে অবশ্যই সুসমন্বিত ব্যবস্থা প্রয়োজন।

Q. 19. Describe the background of Agricultural education in India.

Ans ভারতে শিক্ষার ইতিহাসে কৃষি শিক্ষার আধুনিক ব্যবস্থার প্রথম উল্লেখ ঘটে গ্রাণ্ট সাহেবের প্রবন্ধে এবং এডাম সাহেবের তৃতীয় রিপোর্টে। ১৮২০ সালে কলকাতায় এগ্রিকালচারাল ও হর্টিকালচারাল সোসাইটি স্থাপিত হয়। ১৮৫৪ সালে মাদ্রাজে একটি কৃষি কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং ১৮৮৬ সালে এই কেন্দ্রের সঙ্গে একটি কৃষি স্কুল সংলগ্ন হয়। ১৮৭৯ সালে পুণা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের সঙ্গে একটি কৃষিশিক্ষা বিভাগ খোলা হয়। এইভাবে ভারতের আধুনিক কৃষি শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা হয়। ১৮৮০ সালে দুর্ভিক্ষ কমিশন এবং ১৮৮৮ সালে কৃষি সম্মেলনের প্রস্তাবে গ্রামাঞ্চলে কৃষিশিক্ষা প্রসারের জন্য সরকারকে তৎপর হতে বলা হয়। ১৮৮৯ সালে বৃটিশ রয়্যাল এগ্রিকালচারাল সোসাইটির ডক্টর জে. এ. ভোয়েলকার (Voelcker)-কে ভারতে প্রেরণ করা হয় দেশের কৃষি ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও পরামর্শদানের জন্য। ১৮৯০ ও ১৮৯৩ সালে দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ডঃ ভোয়েলকারের পরামর্শ ও বিবরণী পর্য্যালোচনার জন্য। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে, কৃষি পদ্ধতির মূল নীতিগুলি গ্রামীণ স্কুলের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হবে, সেইমত প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হবে এবং উপযুক্ত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে শিক্ষক শিক্ষণের আয়োজন করা হবে। কেন্দ্রীয় ভারত সরকার এই সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনা করে ১৮৯৭ সালের মার্চ্চ মাসে এক সরকারী প্রস্তাব ঘোষণা করে বলেন—

(১) আর্টস ও সায়েন্স কলেজের ডিগ্রীর মর্য্যাদায় কৃষিবিদ্যা সংক্রান্ত ডিগ্রীর ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

(২) উচ্চ পর্য্যায়ের কৃষি বিদ্যার ডিপ্লোমা প্রদানের জন্য অনধিক চারটি প্রতিষ্ঠান থাকবে।

(৩) সরকারী কর্ম্মনিয়োগ ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা গ্রহণ আবশ্যিক করা হবে।

(৪) কৃষিশিক্ষার ডিপ্লোমা, ডিগ্রী ও সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য বিশেষ ধরণের কৃষি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হবে।

(৫) গ্রামীণ স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণের পূর্ব্বে বা পরে শিক্ষকগণ যাতে কোন সরকারী কৃষিকেন্দ্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পান, সে বিষয়ে ব্যবস্থা করা হবে।

এই সকল প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তের ফলে ভারতে কৃষিশিক্ষার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ১৮৮৫ সালে মাদ্রাজ কৃষি স্কুলটি কলেজ পর্য্যায়ে উন্নীত হয়, এবং পুণায় কৃষিশিক্ষা বিভাগ খোলা হয়। কোয়েম্বাটুরে (১৮৭৬), নাগপুরে (১৮৯০) এবং কানপুরে (১৮৯২) কৃষি স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৯৯ সালে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে একটি কৃষিশিক্ষা বিভাগ খোলা হয়। কোন

কোন উচ্চ ইংরেজী স্কুলে এবং নর্ম্যাল বা ট্রেনিং স্কুলে কৃষি ক্লাশ প্রবর্ত্তিত হয়। একমাত্র বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পর্য্যায়ের কৃষিবিদ্যা চর্চ্চার আয়োজন হয় এবং ১৮৯২ থেকে ১৮৯৯ সাল পর্য্যন্ত ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ডিপ্লোমা প্রদানের পর কৃষি বিষয়ে ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়।

১৯০১ সালে সমগ্র ভারতের জন্য একজন ইন্সপেক্টর-জেনারেল অব এগ্রিকালচার নিযুক্ত হন এবং বিভিন্ন প্রদেশে রাজ্য সরকারের দপ্তরে কৃষি বিভাগ খোলা হয়। ১৯০৪ সালে সরকারী প্রস্তাবে কৃষি শিক্ষার স্বল্পতার কথা বলা হয় এবং সরকার তখন প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে কৃষি কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন। সেই অনুসারে, কানপুরে (১৯০৬), কোয়েম্বাটুরে (১৯০৯), সাবুরে (১৯০৯) এবং লায়লপুরে (১৯১০) কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৮ সালে পুণা কৃষি স্কুলটি একটি পৃথক কৃষি কলেজে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু মাদ্রাজের কৃষি কলেজ ও শিবপুরের কৃষি শিক্ষা বিভাগ বন্ধ হয়ে যায়। শিকাগোর হেনরী ফিলিপ্‌স্‌ নামক এক ব্যক্তির বদান্যতায় কৃষিশিক্ষা প্রসার সহজ হয়; তিনি এদেশে কৃষি শিক্ষার জন্য ৩০ হাজার পাউণ্ড অর্থ দান করেন। এই অর্থের বৃহদাংশ ব্যয়ে ১৯০৮ সালে পুসা রিসার্চ ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হয়।

১৯২৮ সালে রয়াল কমিশন অন এগ্রিকালচার স্থাপিত হয় দেশের কৃষি ব্যবস্থা ও গ্রামীণ জীবনধারা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য। এই কমিশন কৃষি বিষয়ে গবেষণার জন্য অবিলম্বে একটি গবেষণা সংস্থা স্থাপনের পরামর্শ দেন। সেই অনুযায়ী দিল্লীতে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ এবং ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট নামে দুটি সংস্থা গড়ে ওঠে। সাম্প্রতিককালে আরও অনেক কৃষি শিক্ষার কলেজ গড়ে উঠেছে।

Q 20. What is the present position of Agricultural education in India ?

Ans. কৃষি শিক্ষার প্রতি সরকারী দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় সম্প্রতি এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রগতি সম্ভব হয়েছে। ১৯৬০ সালে সমগ্র ভারতে কৃষি কলেজের সংখ্যা ছিল ৩৩ এবং কৃষি স্কুল ছিল ১০০টি। কৃষি কলেজগুলিতে ১৩,৪০৭ জন পুরুষ ও ১২৫ জন মহিলা (মোট ১৩,৫৩২ জন) শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করেছে। কৃষি স্কুলগুলিতে ৭,৫৬৪ জন পুরুষ ও ৭৫ জন মহিলা (মোট ৭,৬৩৯ জন) শিক্ষার্থী কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করেছে। তবে এই হারে কৃষিশিক্ষা প্রসারের অর্থ প্রতি দশলক্ষ জনগণের জন্য মাত্র ৩ জন কৃষিবিদ্যায় শিক্ষিত জন সৃষ্টি। এই প্রগতির হার অবশ্যই সন্তোষজনক নয়। তাছাড়া কৃষিবিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে মাত্র ২% বা ৩% জন প্রকৃতপক্ষে কৃষিক্ষেত্রে অর্জিত বিদ্যা প্রয়োগ করে। অন্য সকলেই অন্যান্য বৃত্তিগ্রহণ করে থাকে। ১৯৩৬-৩৭

সালে ইংলণ্ডের ইম্পিরিয়েল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চের স্যার জন রাসেল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা পর্যাবেক্ষণ করে বলেন, এদেশে যারা প্রকৃত ভূমি কর্ষণ করে, তাদের মধ্যে প্রায় কেউই কৃষি বিদ্যায় আধুনিকভাবে শিক্ষিত নয়। কৃষিবিজ্ঞান গবেষণার সুফলগুলি সম্পর্কে প্রকৃত কৃষিজীবীদের যথাযথভাবে অবহিত করতে পারলে তবেই কৃষিবিদ্যার প্রতি কৃষিজীবীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং কৃষিবিদ্যার মর্য্যাদাও প্রসার লাভ করবে। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ এজন্য মাঝে মাঝে কৃষিবিদ্যা সংক্রান্ত পুস্তিকা ও প্রচার পত্র প্রকাশ ও প্রচার করে থাকেন। কৃষিবিদ্যা শিক্ষাকে জনপ্রিয় করার জন্য অনুরূপভাবে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব ফ্রুট টেকনোলজী (১৯৪৫), সেণ্ট্রাল এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং ডিপার্টমেণ্ট (১৯৩৪), ইম্পিরিয়েল ব্যাক্টোরিয়লজিক্যাল ল্যাবরেটরী (১৮৯০), ইণ্ডিয়ান ডেয়ারী রিসার্চ ইনষ্টিটিউট (১৯২৩) এবং রাইস্ ইনষ্টিটিউট (১৯৪৬) স্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়া কমোডিটি (Commodity) কমিটি এবং অন্যান্য কমিটিও জনগণকে কৃষিশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে সাহায্য করে থাকে।

কৃষিবিদ্যা বিষয়ে উচ্চতর স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য আগ্রা, বেনারস, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক আয়োজন আছে। এ ছাড়া নয়াদিল্লীর ইণ্ডিয়া এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, বাংলোরের ইণ্ডিয়ান ডেয়রী রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ইজ্জাতনগরের ইণ্ডিয়ান ভেটেরিনারী রিসার্চ ইনষ্টিটিউট এবং পুণার এগ্রিকালচারাল মেটিঅরোলজিক্যাল কেন্দ্রেও কৃষিবিদ্যা বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার সুযোগ আছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পর্য্যায়ের গ্রাজুয়েটদের জন্য মৃত্তিকা বিজ্ঞান, চারা প্রতি-পালন ও চারা শারীরবিদ্যা সম্পর্কে ডিগ্রী শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও আছে। ভারতের বহু কৃষি কলেজ থেকে প্রতি বছর শতাধিক সংখ্যায় শিক্ষার্থী কৃষিবিদ্যায় এম. এস সি. বা ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জ্জন করেছে। তবে বছরে মাত্র ১৬৬ জনের বেশি এই উচ্চতর কৃষিশিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না, কারণ যথেষ্ট সংখ্যক কলেজ নেই। তাছাড়া মৃত্তিকা পর্য্যবেক্ষণ ও মৃত্তিকা সংরক্ষক সম্পর্কেও কোনও সন্তোষজনক কৃষিশিক্ষা ব্যবস্থা এদেশে নেই।

ভারতের কৃষি সম্পদও বিপুল সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে এদেশের কৃষিশিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার এখনো আশানুরূপ হয়নি বলা চলে।

Q. 21. Discuss some of the proposals for a pattern of Agricultural education in India as envisaged by the University Education Commission of 1948-'49.

Ans যে কোন দেশের কৃষিশিক্ষার মধ্যেই সেই দেশের কৃষিনীতি প্রতিফলিত হয়ে থাকে। উপযুক্ত কৃষিশিক্ষা না থাকলে কৃষিনীতিও সঠিকভাবে

রূপায়িত হতে পারে না। ভারতে বিশেষ ধরণের লোকায়ত্ত কৃষি ব্যবস্থার অস্তিত্ব আছে বটে, তবে সমগ্র দেশের উপযোগী জাতীয় কৃষি ব্যবস্থা এখনো গড়ে ওঠেনি। জাতীয় কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কৃষি শিক্ষার মাধ্যমে কৃষিনায়কত্ব সৃষ্টি করা প্রয়োজন এবং উপযুক্ত কৃষিনায়কত্বে সুসমন্বিত কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা সহজ হবে। ১৯৪৮-৪৯ সালের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (রাধাকৃষ্ণন) এ বিষয়ে বলেন, কৃষিনায়কত্ব গঠনের জন্য কৃষিশিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার সম্যক্ ধারণা সঞ্চার করার সঙ্গে সঙ্গে জগতের অন্যান্য কৃষিপ্রধান প্রগতিশীল দেশগুলির কৃষি ব্যবস্থার তুলনামূলক চর্চ্চা করতে হবে। এ ধরণের তুলনামূলক কৃষি চর্চ্চার জন্য কৃষিশিক্ষা ব্যবস্থাকে উদার করতে হবে এবং কোনও রকম সংস্কারের বশীভূত না হয়ে মুক্তমনে সকল দেশের কৃষি ব্যবস্থার উত্তম প্রণালী ও পদ্ধতিগুলি ভারতীয় ব্যবস্থার উপযোগী করে কাজে লাগানোর মত শিক্ষা প্রসার করতে হবে। এ বিষয়ে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করবে। সরকারী তত্ত্বাবধানে গবেষক শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন কৃষি ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নত করার চেষ্টা করবে।

অবশ্য কৃষিশিক্ষাকে আমূল সংস্কারের জন্য যে ধরণের কৃষিনায়কত্ব প্রথমে সংগঠন করা দরকার, তার জন্যও বিশেষ ধরণের নায়কত্ব শিক্ষাদানের আয়োজন করতে হবে। আমাদের দেশে কৃষিনায়কত্ব শিক্ষাদানের জন্য কোনও বিশেষ সংস্থা আজও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এ বিষয়ে অবশ্য গ্রামীণ বুনিয়াদী স্কুল ও গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে কিছু প্রগতি আশা করা যায়। রাধাকৃষ্ণন কমিশনের মতে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কৃষিনীতি, কৃষি অর্থনীতি, এবং কৃষিনায়কত্ব বিষয়ে বিশেষ পাঠক্রমের আয়োজন থাকা দরকার। এই শিক্ষা অবশ্যই স্নাতকোত্তর পর্য্যায়ে দেওয়া হবে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরণের পাঠক্রম প্রবর্ত্তন করার চেষ্টা চলছে।

কৃষিশিক্ষা যাতে প্রকৃত কৃষিজীবীদের আয়ত্তে আসে, সেজন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে আংশিক সময়ের জন্য করা উচিত, যাতে কৃষকগণ অবসর মত ভূমিকর্ষণের কাজের মাঝে কৃষিশিক্ষা গ্রহণ করে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারে। নচেৎ উচ্চশিক্ষালোভী যুবকগণকে কৃষিশিক্ষা দিয়ে দেখা গেছে ২০ জনের একজনও কৃষিবৃত্তি গ্রহণ করে না।

ভারতের কৃষিশিক্ষা ব্যবস্থার তিনটি প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন মনে করেন—

১। কৃষকদের সন্তানদের কৃষিশিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা শিক্ষা সমাপ্ত করে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে কৃষিবৃত্তিগ্রহণ করতে পারে।

২। আধুনিক কৃষি গবেষণার সুফলগুলি কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য অন্য পর্য্যায়ের উৎসাহী ব্যক্তিদেরও উচ্চতর কৃষিশিক্ষা দিতে হবে; এই সব ব্যক্তিরা সরকারী বেসরকারী কৃষি সংস্থাগুলি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনার ভার নিতে পারবেন। দেশের বর্তমান কৃষি ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সংস্কার করতে হলে ২০,০০০ ফিল্ড এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট, (কৃষির জন্য) ২০,০০০ ষ্টকমেন (পশু চিকিৎসার জন্য), ১০,০০০ আণ্ডার গ্রাজুয়েট ফিল্ড এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট (কৃষির জন্য), ৪,০০০ পরিদর্শক (পশু চিকিৎসার জন্য), ৩০০ গেজেটেড অফিসার (কৃষির জন্য) এবং ৫৫০ গেজেটেড অফিসার (পশু চিকিৎসার জন্য) প্রয়োজন।

৩। কৃষি ও পশুপালন সমস্যাগুলি সম্পর্কে গবেষণা, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃতির জন্যও উচ্চতর কৃষিশিক্ষায় বহু তরুণকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

প্রথম পর্য্যায়ের লক্ষ্যটি নিয়ে কাজ করবে আমাদের বুনিয়াদী স্কুলগুলি। কৃষিবিদ্যাকে মূল শিল্প শিক্ষারূপে প্রবর্ত্তিত করে বহু স্কুল স্থাপন করতে হবে।

ফিল্ড এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট শিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে কৃষিকেন্দ্র সংলগ্ন সংস্থাগুলি (Farm Institutes) এবং গ্রামীণ উচ্চ বিদ্যালয়গুলি। ফিল্ড এ্যাসিষ্ট্যাণ্টদের অন্ততঃপক্ষে বুনিয়াদি শিক্ষা সমাপ্ত করে এক বছরের শিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

আবাসিক গ্রামীণ হাইস্কুলে (কৃষি হাইস্কুলে) আণ্ডারগ্রাজুয়েট ফিল্ড এ্যাসিষ্ট্যাণ্টদের ১২ বছরের উচ্চতর মাধ্যমিক পর্য্যায়ের শিক্ষাদান করা হবে। গ্রাজুয়েট এ্যাসিষ্ট্যাণ্টরা কৃষি কলেজ বা গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষণ গ্রহণ করবে। শিক্ষাক্রম হবে তিন বছর এবং ডিগ্রী প্রদান করা হবে। পশু-পালনের ক্ষেত্রে এই শিক্ষাক্রম হবে চার বছরের। ডিগ্রীর নাম হবে বি, এস. সি (এগ্রি)। এই ডিগ্রীলাভের পর দু'বছরের স্নাতকোত্তর শিক্ষাগ্রহণ করে এম. এগ্রি. উপাধিলাভ করা যাবে। স্নাতকোত্তর শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে কৃষিবিষয়ে গবেষণা পত্র রচনা আবশ্যিক থাকবে। সকল পর্য্যায়ে শিক্ষাক্ষেত্রে পুঁথিগত নীতিশিক্ষার চেয়ে বাস্তবক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষাগ্রহণের গুরুত্বই অধিক হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের মতে কৃষিক্ষেত্রে প্রথম ডিগ্রী শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এই যে, শিক্ষার্থীরা কৃষিবিদ্যা সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা লাভ করবে, কৃষিকেন্দ্র পরিচালনায় প্রত্যক্ষ শিক্ষণ গ্রহণ করবে, গ্রামীণ নেতৃত্বের প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করবে এবং কৃষিবিষয়ে গবেষণা ও শিক্ষকতার মূলনীতিগুলি আয়ত্ত করবে।

এই লক্ষ্য স্মরণ রেখে ডিগ্রী শিক্ষার পাঠক্রম প্রণয়ন করতে হবে এবং এর মধ্যে মূলতঃ চারটি উপাদান থাকা চাই-ই :—

১। সাধারণ শিক্ষা
২। মূল বিজ্ঞানসমূহ
৩। কৃষি ও পশুপালন
৪। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কর্ম্মসূচী

কৃষিশিক্ষার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা রেখে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সমাজ জীবনযাপনের উপযোগী করে তুলতে হবে। অর্থনীতি, ইতিহাস, ভাষা-সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, চারুকলা প্রভৃতি শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ সর্ব্বাঙ্গীণ করতে হবে। মূল বিজ্ঞানের মধ্যে রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থ বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ও ভূ-বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। যেহেতু কৃষিব্যবস্থা সমাজব্যবস্থারই অঙ্গীভূত, সেজন্য কৃষি শিক্ষার পাঠক্রমে অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে অধ্যয়নের ব্যবস্থা রাখতে হবে। মূল বিজ্ঞানগুলির সঙ্গে দেশের কৃষিব্যবস্থার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক সম্বন্ধে কৃষি-শিক্ষার্থীদের অবহিত করতে হবে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কর্ম্মসূচীর মধ্যে কেবল ল্যাবরেটরী প্রশিক্ষণ ছাড়াও থাকা উচিত কৃষিকেন্দ্র পরিদর্শন, বাজার, সার কারখানা, গবাদি প্রদর্শনী পর্য্যবেক্ষণ এবং কৃষিবাণিজ্য সংস্থা পরিদর্শন।

কৃষি কলেজগুলি কেবলমাত্র ডিগ্রী পর্য্যায়ের শিক্ষাদান ছাড়াও কৃষি বিষয়ে গবেষণা ও শিক্ষণ প্রসার কর্ম্মসূচী পরিচালনারও এক একটি কেন্দ্ররূপে কাজ করবে। প্রতিবেশীদের কৃষি-সমস্যাগুলি সম্পর্কে সহায়তা করার জন্যও কৃষি-কলেজগুলিকে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে

কৃষি শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে শস্য বোঝাই, বাজারজাত করা, বিক্রয়, রপ্তানী প্রভৃতি বিষয় এবং মৎস্যপালন ও সামুদ্রিক মৎস্য সংগ্রহ বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখা দরকার।

Q. 22. Give a short history of Arts & Crafts education in India.

Ans. ভারতে আধুনিক পদ্ধতিতে শিল্পকলা শিক্ষার সূচনা হয় সম্ভবতঃ ১৮৫০ সালে। যখন ডাঃ হাণ্টার নামে এক চিকিৎসক মাদ্রাজে একটি স্কুল স্থাপন করেন 'সংস্কৃতি ও চারুকলার মানবিকতা বিকাশের' উদ্দেশ্যে। এক বছর পরে তিনি শিল্পকলা শিক্ষাদানের জন্য আর একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুটি স্কুল পরে সংযুক্ত করে 'দি স্কুল অব আর্ট্‌স্' নাম দেওয়া হয় এবং সরকারী পরিচালনাধীনে দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে সেই প্রতিষ্ঠানটি 'মাদ্রাজ স্কুল অব আর্ট্‌স্' নামে খ্যাত। ১৮৫৩ সালে বোম্বাইতে শিল্পকলার উন্নতির জন্য একটি স্কুল স্থাপনের উদ্দেশ্যে স্যার জে. জে. টাটা এক লক্ষ টাকা দান করেন এবং সেই অর্থে ১৮৫৬ সালে স্যার জে. জে. স্কুল অব আর্ট্‌স্ প্রতিষ্ঠিত হয়।

উডের ডিসপ্যাচ প্রকাশিত হওয়ার পর ভারতীয় শিক্ষা প্রগতির ক্ষেত্রে যে উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দেয়, তার ফলে বিভিন্ন বৃত্তিক্ষেত্রে বিশেষ উদ্দীপনা দেখা দেয়। ১৮৫৭ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রের নূতন শাখাগুলি বিশেষ কর্ম্মতৎপর হয়ে উঠে। এই সময়ে সমগ্র ভারতে ৪টি শিল্পকলার স্কুল ছিল। বোম্বাই ও মাদ্রাজের স্কুল ছাড়াও লাহোরে মেয়ো স্কুল অব আর্টস ১৮৭৫ সালে এবং কলকাতা আর্টস্ স্কুল ১৮৯৬ সালে সংগঠিত হয়। ১৮৯৩ সালে সেক্রেটারী অব স্টেট প্রস্তাব করেন আর্ট্‌স্ স্কুলগুলিকে টেকনিক্যাল স্কুলে রূপান্তরিত করা হোক, কিন্তু লর্ড এলগিন সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। তিনি বলেন, ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য শিল্পকলা স্কুলগুলি অক্ষুন্ন রাখা একান্ত প্রয়োজন।

কার্জ্জনের সময়ে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে আর একবার প্রগতির ধারা পরিলক্ষিত হয় এবং বিভিন্ন বৃত্তিক্ষেত্রের মত শিল্পকলা শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রসার ঘটে। সিমলায় অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে ভারতীয় শিল্পকলা স্কুলগুলির গুরুত্ব স্বীকৃত হয় এবং এই স্কুলগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কারিগরী বৃত্তি শিক্ষাদানের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। ১৯০৪ সালের সরকারী শিক্ষা প্রস্তাবে এই নীতি সমর্থিত হয় এবং শিল্পকলা স্কুলগুলিতে বহু শিল্প বিষয় শিক্ষা না দিয়ে কয়েকটি অত্যাবশ্যক শিল্প বিষয়ে ভালভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী আর্ট্‌স্ স্কুলগুলির পাঠক্রম সংশোধন করা হয় এবং বৃত্তিশিল্পের স্থান দেওয়া হয়। এই সময়ে কয়েকটি সঙ্গীত শিক্ষার স্কুলও প্রতিষ্ঠিত হয়; এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য: লক্ষ্ণৌয়ের মরিস কলেজ অব হিন্দুস্তানী মিউজিক, কলিকাতার সঙ্গীত বিদ্যালয়, মাদ্রাজের কলাকেন্দ্র এবং বোম্বাইএর-ভাতখণ্ডে স্কুল অব মিউজিক।

Q. 23. Describe the present position of Arts & Crafts education in India.

Ans. ভারতের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কণ বিষয়কে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এখনো এই সকল বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে অগভীর শিক্ষা দেওয়া হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয় ব্যতীত পৃথক পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এই বিষয়গুলির উচ্চতর পর্য্যায়ের সামঞ্জস্যহীন চর্চ্চা চলেছে। শিক্ষার্থীদের অধিকাংশক্ষেত্রেই ন্যূনতম যোগ্যতা সম্পর্কে কোনও নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করা হয় না। শিল্প ও চারুকলা শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুসমন্বিত তত্ত্বাবধানেই হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে এই সকল বিষয়ে শিক্ষাদান যথাসম্ভব ত্রুটিহীন ও সংস্কৃতির প্রকৃত বাহক হতে পারে। এই বিষয়গুলি শিক্ষাদানের নীতি, তত্ত্ব ও ইতিহাসও শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। অনেকে বলেন, কলেজ পর্য্যায়ে শিল্প ও চারুকলার

অর্থনীতি সম্পর্কেও শিক্ষার্থীদের অবহিত করা দরকার। দুঃখের বিষয়, রাধাকৃষ্ণন কমিশন এ সকল বিষয়ে সুপারিশ করা সত্বেও যথাযথরূপে প্রতিপালিত হয়নি। সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি চারুকলা বিদ্যাকে শিক্ষার্থীরা কেবল বৃত্তিরূপে শিক্ষা না করে যাতে এগুলির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কেও অধীত জ্ঞান অর্জ্জন করতে পারে, সে বিষয়ে যত্ন নেওয়া উচিত।

১৯৬০ সালে সমগ্র ভারতে সঙ্গীত, নৃত্য এবং অন্যান্য চারুকলা শিক্ষার জন্য পুরুষদের কলেজ ছিল ৪২টি এবং মহিলা কলেজ ৭টি (মোট ৪৯টি)। ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষাদানের পুরুষদের স্কুল ১৫১টি, মহিলাদের স্কুল ৫৯টি (মোট ২০৯টি) ছিল। কলেজগুলিতে ১৯৬০ সালে ২৫৪৫ জন পুরুষ শিক্ষার্থী ও ৩,৪২৯ জন মহিলা শিক্ষার্থী (মোট ৫,৯৭৪ জন শিক্ষার্থী এবং চারুকলা স্কুলগুলিতে উক্ত বিষয়গুলি শিক্ষালাভের জন্য ৮,১৩৩ জন পুরুষ শিক্ষার্থী ও ৯,৬১০ জন মহিলা শিক্ষার্থী (মোট ১৭,৭৪৩ জন) ছিল। উল্লিখিত হিসাব থেকে বোঝা যায়, মহিলা শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনুপাতে মহিলাদের জন্য চারুকলা বিষয়ক কলেজ ও স্কুলের সংখ্যা উভয়ই খুব অল্প।

সঙ্গীত, নৃত্য, এবং চারুকলা বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করার পূর্ব্বে বিশেষভাবে পরীক্ষা করা বা যোগ্যতা নির্দ্ধারণ করার নির্ভরযোগ্য কোন ব্যবস্থা এদেশে নেই। বিভিন্ন ধরনের প্রবণতা অভীক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও রুচি পরীক্ষা করে তবে চারুকলা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিত, নচেৎ দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ম্লান হয়ে যেতে পারে।

উল্লিখিত বিষয়গুলির পাঠক্রম এদেশে এখনো সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়নি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রীতির চারুকলা পদ্ধতির সুনিপুণ সমন্বয়ের মাধ্যমে সামঞ্জস্যপূর্ণ পাঠক্রম একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বর্ত্তমানে বহুক্ষেত্রেই উপযুক্ত পাঠক্রমের অভাবে বিদেশী পাঠক্রমের অসম্পূর্ণ রদবদল করে কার্য্যকরী করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শক্রমে পাঠক্রম সংশোধন করে চারুকলা শিক্ষাধারাকে ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপোষক করে তুলতে হবে।

সঙ্গীত, নৃত্য ও চারুকলা বিষয়ে সুষ্ঠু গবেষণার অভাব এদেশে খুবই বেদনাদায়ক। এবিষয়ে সংগঠিত গবেষণা সংস্থাও আমাদের দেশে নেই বললেই চলে। উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের গবেষণা ক্ষেত্রে অনুপ্রেরিত করার জন্য সরকারী দপ্তর থেকে গবেষণাবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা উচিত।

Q 24. Trace the beginnings of modern commerce education in India.

Ans. ভারতের বাণিজ্য শিক্ষার সূচনা ঘটে ১৯০৩ সালে কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে। এই সময়ে উক্ত কলেজে বাণিজ্য শিক্ষার জন্য একটি ক্লাশ খোলা হয়। পরে ঐ শিক্ষাব্যবস্থাটি কলকাতার গভর্ণমেন্ট কমার্শিয়াল

ইনষ্টিটিউট নামে একটি সংস্থায় পরিণত হয়। এই ইনষ্টিটিউটে দিবাভাগে সম্পূর্ণ সময়ের জন্য মাধ্যমিক পর্য্যায়ের শিক্ষার মত বাণিজ্য শিক্ষা দেওয়া হতো। শিক্ষাক্রম ছিল দুবছরের এবং পাঠক্রমে আবশ্যিক বিষয়রূপে ছিল ইংরেজী ভাষা, বাণিজ্যিক পত্রালাপ, পত্রলিখন, সারাংশ লিখন, বাণিজ্যিক ও মানসিক গণিত, একটি ভারতীয় ভাষা, এই সঙ্গে শর্টহ্যাণ্ড, টাইপরাইটিং ও বুককিপিং ঐচ্ছিক বিষয়রূপে অধীত হতো। সন্ধ্যাকালে বিশেষ ক্লাশে ব্যাঙ্কিং ও একাউণ্টেন্সিসহ বুককিপিং, সওদাগরী আইন ও বীমা পদ্ধতি, সর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত ছিল।

বোম্বাইতে বাণিজ্য শিক্ষার সূত্রপাত হয় ১৯১৪ সালে সিডেনহ্যাম কলেজ অব কমার্স এণ্ড ইকনমিক্স প্রতিষ্ঠার সময়ে। পরে প্রায় সমস্ত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য শিক্ষার বিভাগ বা ফ্যাকাল্টি প্রবর্ত্তিত হয়েছে। বোম্বাই-এর বৈরামজী জিজিভাই পার্শি ইনষ্টিটিউশন, লণ্ডনের চেম্বার অব কমার্সের শিক্ষাধারা অনুসারে এদেশে বাণিজ্য বিষয়ে স্কুল সার্টিফিকেট শিক্ষাক্রম প্রবর্ত্তন করে। কার্জ্জনের আমলে সমগ্র ভারতে ১৫টি বাণিজ্য শিক্ষার স্কুল গড়ে ওঠে এবং প্রায় ১২২৩ জন শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণের সুযোগলাভ করে। ১৯৫০-৫১ সালে সমগ্রভারতে ২৬টি বাণিজ্য শিক্ষার কলেজ ও ৫৪৯টি বাণিজ্য শিক্ষার স্কুল গড়ে ওঠে। বাণিজ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রথমদিকে বেসরকারী উদ্যোগেই পরিচালিত হতো, ক্রমে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেও বহু বাণিজ্য স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পরে ভারতের হাইস্কুলগুলিতেও বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Q. 25. Discuss the present position of commerce education in India.

Ans. ভারতের অধিকাংশ রাজ্যেই বাণিজ্য বিষয়ে ডিগ্রী পর্য্যায়ের শিক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বে শিক্ষার্থীদের ইণ্টারমিডিয়েট পর্য্যায়েই শিক্ষার প্রাথমিক পাঠগ্রহণ সুরু করতে হয়। পাঠক্রমে থাকে ব্যাঙ্কিং এবং একাউণ্টেন্সির মূল তত্ত্ব, ব্যবসাবাণিজ্যের সাধারণ নীতি, শর্টহ্যাণ্ড, টাইপরাইটিং এবং এই বিষয়গুলি আয়ত্ত করে শিক্ষার্থীকে ডিগ্রী পর্য্যায়ের বাণিজ্যিক শিক্ষাগ্রহণের যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হয়। ডিগ্রী পর্য্যায়ে এই পাঠ্যবিষয়গুলি ছাড়াও অর্থনীতি ও অর্থ বিনিময় নীতি সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে হয়। তবে ডিগ্রী পর্য্যায়ের পাঠক্রমে ব্যবসায় সংগঠন, কোম্পানী কর্ম্মসচিবের করণীয়, বাণিজ্যিক ভূগোল, বাণিজ্যিক পরিসংখ্যান ও সওদাগরী আইন সম্পর্কে অধ্যয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ডিগ্রী অধ্যয়নের শেষ বছরে কোন একটি বিশেষ বাণিজ্য-সম্পর্কিত পাঠ্যবিষয়, যেমন—উচ্চতর হিসাব-নিকাশ, ব্যাঙ্কিং বা পরিবহণ অধ্যয়ন করতে হয়। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে

বীমা পরিসংখ্যান বিজ্ঞান, বা কোনও বিশেষ শিল্পব্যবসা সংগঠন সম্পর্কে উচ্চতর অধ্যয়নের সুযোগ আছে। অন্ধ্র এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিষয়ে ডিগ্রী পর্য্যায়ে তিন বছরের অনার্স পাঠক্রম অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে এবং এই পাঠক্রমে সাধারণ-বাণিজ্য পাঠক্রমের উচ্চতর বিষয়গুলি অধীত হয়ে থাকে। বোম্বাই, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, কলিকাতা প্রভৃতি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর (মাষ্টার্স) ডিগ্রী অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে। স্নাতকোত্তর বাণিজ্য পাঠক্রমে বিশেষ বিশেষ শিল্পক্ষেত্র ও কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কে উচ্চতর অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়া হয়। কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে মাষ্টার্স ডিগ্রী অধ্যয়নের সময় গবেষণাপত্র (থীসিস) আহ্বান করা হয়।

উল্লিখিত বাণিজ্য পাঠক্রমগুলির উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট নয় বলে অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন। বর্ত্তমানে বাণিজ্যিক পাঠক্রমগুলি শিক্ষার্থীদের হিসাবরক্ষণ, ব্যাঙ্কিং বা বীমা সংগঠন সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে বলে মনে হয় না। সকল বিষয়ে কিছু কিছু মূলনীতি মাত্র অধীত হয়ে থাকে। ফলে শিক্ষার্থীরা বাণিজ্য বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ করার পরেও কোনও বিশেষ বাণিজ্যক্ষেত্রে আপন দক্ষতা প্রকাশ করতে অক্ষম হয়। অনেক শিক্ষার্থী বাণিজ্য বিষয়ে ডিগ্রী লাভ করার পরে অর্থনীতির মাষ্টার্স ডিগ্রী গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করে, কারণ ডিগ্রী পর্য্যায়ের জ্ঞান যথেষ্ট নয় বলে সে উপলব্ধি করে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে। অনেক বাণিজ্য ডিগ্রীধারী আইন ডিগ্রী অধ্যয়ন করতে সুরু করে এবং মনে করে, তাছাড়া বাণিজ্য ক্ষেত্রের আইন বিষয়ে সম্যক্ ধারণা সৃষ্টি করা যায় না। কেবল বাণিজ্য বিষয়ে যে সব শিক্ষার্থী প্রথম ডিগ্রী ও মাষ্টার্স ডিগ্রী গ্রহণে সক্ষম হয়, তারা শিক্ষকতা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উচ্চতর কর্ম্মচারী হিসাবেই প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে, কিন্তু বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে দৈনন্দিন বাণিজ্য বিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের অন্যান্য বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী কর্ম্মীদের উপরেই অধিকাংশ সময়ে নির্ভর করতে হয়। বাণিজ্য সংস্থার বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন পরিচালকগণ এইজন্যই বর্ত্তমান বাণিজ্য শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করে থাকেন এবং বাণিজ্য স্নাতক ও সাধারণ কলা বা বিজ্ঞান স্নাতকের মধ্যে তাঁরা কোন পার্থক্য দেখেন না। বাণিজ্য শিক্ষা ব্যবস্থার এই ত্রুটির প্রধান কারণ, বাণিজ্য নীতি শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কোন ব্যবস্থা নেই।

বাণিজ্য বিষয়ে বি. কম. ডিগ্রী লাভের পরেই শিক্ষার্থীদের রুচি ও আগ্রহ অনুযায়ী বিশেষ সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণে বাধ্য করা উচিত। এই প্রশিক্ষণ ছাড়া বাণিজ্য শিক্ষা সম্পূর্ণ নয় বলে ঘোষণা করতে হবে। অবশ্য হিসাবরক্ষণ বিষয়ে ইতিমধ্যেই এই ধরণের রীতি প্রচলিত হয়েছে; হিসাব

রক্ষণ বিষয়ে কেবল ডিগ্রী গ্রহণ করলেই কোন হিসাবরক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কর্মীর যোগ্যতা স্বীকৃত হয় না, হিসাবরক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কয়েক বছরের শিক্ষানবীশী করে শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে হয়।

বাণিজ্য শিক্ষার অকার্য্যকারিতা সম্পর্কে বর্ত্তমানে যে সকল অভিযোগ করা হয়ে থাকে, তা দূর করতে হলে উচ্চতর পর্য্যায় পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। এমন কি, মাষ্টার্স ডিগ্রী ও ডক্টরেট অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও কোনও সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ সমস্যাবলীর সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচিত করতে হবে।

XII

PROBLEMS RELATING TO EDUCATION FOR THE HANDICAPPED

[State responsibility—Present-day position and future plans—Education and rehabilitation—Comparison with some other countries—special problems —Methods—Present-day position and future needs of the following: (a) Mentally handicapped—deficient and retarded children, (b) blind children, (c) deaf and mute children, (d) crippled children, (e) other forms of handicap.]

Q. 1. Discuss the responsibility of the State in providing education for the handicapped.

Ans. যাদের স্বাভাবিক বিকাশ প্রতিবদ্ধ বা ব্যাহত হয়, তাদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা সমাজের এক বিশেষ সমস্যা। ব্যাহত (handicapped) শিক্ষার্থীদের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাসের প্রথম দিকে জগতের সর্ব্বত্রই দেখা গেছে সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাব্যবস্থারই একটি অঙ্গ হিসাবে এই সমস্যাটিকে সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। ব্যাহত শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ধরণের চিন্তা সাম্প্রতিককালে প্রসারলাভ করেছে এবং উপলব্ধি করা গেছে যে, সমস্যাটি সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যার চেয়ে অনেক জটিল এবং এর সমাধান যথেষ্ট ব্যয়বহুল।

ব্যাহত শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক স্কুল ব্যবস্থা পূর্ব্বে অবশ্য ছিল তবে সেই স্কুলগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বচ্ছল পরিবারের বুদ্ধিমান বিকলাঙ্গ বালকদেরই শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হতো। কোন কোন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানেও জনহিতকর সংস্থার প্রচেষ্টায় দরিদ্র বিকলাঙ্গ শিশুদের কিছু প্রাথমিক শিক্ষাদানের আয়োজনও হয়। তবে এইসব স্কুল ব্যাহত শিক্ষার্থীদের বিশেষ ধরণের দৈহিক ও মানসিক বিকাশের উপযোগী বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাদানের রীতি তখন আদৌ ছিল না; শিক্ষাপদ্ধতি ছিল সীমাবদ্ধ এবং অকার্য্যকরী।

ব্যাহত শিক্ষার্থীদের বিশেষ ধরণের শিক্ষাদান পদ্ধতি কার্য্যকরী করতে হলে বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিদ্যা ও মানসিক পরিমাপ সংক্রান্ত যে সকল কৌশল আয়ত্ত করা প্রয়োজন, সেগুলির ব্যাপক প্রচলন না থাকার ফলে এতদিন ব্যাহত শিক্ষার্থীরা সমাজের সকল ক্ষেত্রে অবহেলিত হতো। ইদানীং বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিদ্যা ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ে প্রভূত উন্নতি সাধিত হওয়ায় ব্যাহত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান সম্ভব বলে উপলব্ধি করা গেছে; কিন্তু এদের শিক্ষাপদ্ধতি বাস্তবিক এত দক্ষতা ও সহানুভূতির প্রয়োজন বোধ করে যে, সাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ শিক্ষকের পক্ষে তা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। সুতরাং এই বিষয়ে বিত্তবান বদান্য ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সহযোগিতা ও কার্য্যকরী অর্থসাহায্য প্রার্থনা করা ছাড়া উপায় নেই।

তাছাড়া, ব্যাহত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান ব্যবস্থাকে সময়, অর্থ ও উদ্যোগের অপচয় বলে বহুজনের ভুল ধারণা থাকায় সে বিষয়ে ব্যাপক প্রচার চালিয়ে জনগণকে সহানুভূতিসম্পন্ন ও সচেতন করে তোলারও যে প্রয়োজনীয়তা আছে, তা একমাত্র রাষ্ট্রই গ্রহণ করতে পারে। লুই ব্রেইল অন্ধজনের শিক্ষাদানের যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন, তা প্রায় পঞ্চাশ বছর অবহেলিত ছিল। বহুজন এই পদ্ধতির উপযোগিতা স্বীকার করতে চায়নি। বধির শিক্ষার্থীরা যে উপযুক্ত শিক্ষণ পেলে কথা বলতে পারে, এ বিষয়েও বহুদিন জনগণ স্বেচ্ছায় অজ্ঞ হয়ে ছিল। যখন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ব্যাপক প্রচার, প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত কার্য্যকরী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়, তখনই এই সকল বিশেষ ধরণের শিক্ষার সুফল লাভের প্রতি কুসংস্কারবদ্ধ জনগণ আগ্রহবোধ করে।

ব্যাহত বিকলাঙ্গ জড়ধী শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষার দায়িত্ব সম্পর্কে রাষ্ট্র-নায়করাও এক সময়ে সচেতন ছিলেন না। সমাজের কল্যাণের অজুহাতে ঐ সকল শিশুদের নষ্ট করা হতো। স্পার্টায় লাইকর্গসের বিধি অনুযায়ী জড়ধী শিশুদের সমাজ থেকে বর্জ্জন করা নীতিসম্মত বলে স্বীকৃত হয়েছিল এবং বিকলাঙ্গ শিশুদের অযত্নের মধ্যে পরিত্যাগ করে দ্রুত মৃত্যুর আয়োজন করা হতো। এমন কি প্লেটোর সময়েও এথেন্সবাসীরা বধির শিশুদের স্বহস্তে হত্যা করতো এবং অন্যান্য বিকলাঙ্গদের অযত্নে পরিত্যাগ করে হত্যা করতো। স্পার্টাবাসীরা বিকলাঙ্গদের নিষ্ঠুরভাবে একটি নির্দ্দিষ্ট খাদে নিক্ষেপ করে বধ করতো।

আধুনিক কালে বিংশ শতাব্দীতেও জড়ধী, বিকলাঙ্গ শিশুদের প্রতি নির্মম অত্যাচারের কাহিনী প্রায় শোনা যায়। জড়ধী ও বিকলাঙ্গ শিশুদের কোন ভাবে সমাজের উপযোগী করে তোলা যায় না, এই ভুল ধারণার জন্যই আজও এই ব্যাহত শিশুরা বহুক্ষেত্রে নিদারুণ অবহেলা পেয়ে থাকে। উপযুক্ত দক্ষ যত্ন পেলে এই ব্যাহত শিশুর অধিকাংশই সমাজের কোন না কোন কাজে

আত্মনিয়োগ করতে পারে। তাতে সমাজের জনশক্তি যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি মানুষের সমান অধিকারও স্বীকৃত হয়। এ বিষয়ে জনগণকে সহানুভূতিশীল ও সচেতন করার জন্ম প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আইন বিধিবদ্ধ করে ব্যাহত শিশুদের যে কোন অবহেলাকে দণ্ডনীয় ঘোষণা করতে হয়। তাছাড়া, দরিদ্র পরিবারের ব্যাহত শিশুকে নিয়ে পিতামাতা যখন বিব্রত বোধ করেন, তখন রাষ্ট্রীয় সমাজসেবা সংগঠনের কর্ম্মীদের সহায়তায় অচিরেই তাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করে দিতে হয়। ব্যাহত শিশুদের বিশেষ ধরণের শিক্ষাব্যবস্থার ব্যয় নির্ব্বাহ করা দরিদ্র অভিভাবকদের পক্ষে সম্ভব না হলে রাষ্ট্রীয় অর্থসাহাষ্য দেওয়া উচিত। ব্যাহত শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষা যাতে প্রত্যেক পল্লীতে সহজলভ্য হয়, সে বিষয়ে রাষ্ট্রীয় শিক্ষাদপ্তরের সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা করে সুদক্ষ শিক্ষক শিক্ষণ, বিশেষ ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনায় সহযোগিতা, বিশেষ ধরণের শিক্ষা উপকরণ সহজলভ্য করা প্রভৃতি কর্ম্মসূচী গ্রহণ করতে হয়। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের সহযোগিতাও এই বিষয়ে একান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ ব্যাহত শিশুদের দৈহিক ও মানসিক চিকিৎসা নিয়মিত ও সহজলভ্য না হলে কোনও বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থাই তাদের উপকার সাধন করতে পারবে না।

Q. 2. Discuss the background, present-day position and future needs for education and rehabilitation for the handicapped.

Ans. বিংশ শতাব্দীকে 'শিশুদের শতাব্দী' বলা হয় এবং যদিও পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় আমাদের দেশের শিশুরা অনেক অল্প সুযোগসুবিধা পেয়ে থাকে, তবুও এ বিষয়ে ভারতে নবযুগ সূচিত হয়েছে, বলা চলে। একথা এখন উপলব্ধি করা গেছে, দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ প্রগতির জন্ম .কেবল কলকারখানা শিল্পবাণিজ্যের কথা চিন্তা করলেই হবে না,—শিশু কল্যাণের কথাও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। আমাদের দেশে শিশুকল্যাণের ক্ষেত্রে এই জন্মই ব্যাহত শিশুদের প্রতি অধিকতর যত্ন নেওয়া হচ্ছে।

ব্যাহত বা প্রতিবন্ধ (handicapped) শিক্ষার্থীদের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে: (১) দৈহিক ব্যাহত- (২) মানসিক ব্যাহত, (৩) সামাজিক ব্যাহত এবং (৪) আচরণজনিত ব্যাহত। দৈহিক ব্যাহত শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্ধ, বধির, মূক এবং বিকলাঙ্গদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যাদের বুদ্ধি স্বাভাবিক সাধারণ বুদ্ধিমানদের চেয়ে কম, তাদের মানসিক ব্যাহত বলা হয়। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.) ৭০ থেকে ৮০, তাদের প্রায়-ব্যাহত বলা হয়। বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০-এর নীচে হলে জড়ধী বলে গণ্য করা হয়। যে সব শিশু পিতৃমাতৃহীন অনাথ, তাহাদের সামাজিক ব্যাহত শিশু বলা হয়।

মানব শিশু কতকগুলি দৈহিক ও সামাজিক প্রয়োজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে; এই প্রয়োজনগুলির মধ্যে আছে খাদ্য, শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য, সামাজিক স্বীকৃতি, স্নেহ এবং নিরাপত্তা। নানা কারণে শিশুর এই প্রয়োজনগুলি পূর্ণ হওয়ার পথে কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হলে এবং দারিদ্র্য, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি কারণে শিশু আপন চেষ্টায় সেই সকল প্রতিবন্ধক দূর করতে অক্ষম হলে, তার মনে যে হতাশা ও ব্যর্থতা জাগে, তা থেকে তার আচরণ বিকৃতি ঘটে এবং এ ধরণের শিশুকেই আচরণজনিত ব্যাহত শিক্ষার্থীরূপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেখা যায়। আচরণজনিত ব্যাহত শিক্ষার্থীদের আচরণ হয় সমস্যামূলক, নানা প্রকার মানসিক বিভ্রান্তিজনিত স্বভাব দেখা দেয় এবং তারই ফলে শিক্ষাগ্রহণে অগ্রসর হতে পারে না।

ব্যাহত শিশু ও ব্যক্তির শিক্ষা ববস্থার উদ্দেশ্যে তাদের বিকাশের ব্যাঘাত গুলির তীব্রতা যথাসম্ভব হ্রাস করা এবং শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুসারে তাদের হতাশা ও ব্যর্থতা বোধ দূর করে সুস্থ আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন স্বাধীন ব্যক্তিতা গঠনে সহায়তা করা। প্রত্যেক ব্যাহত শিক্ষার্থীর পৃথক ব্যক্তিতার মর্য্যাদা দিতে হয় এবং তার নিজস্ব সমস্যার বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যার সমাধান নির্দ্ধারণ করতে হয়।

ব্যাহত শিক্ষার্থীকে প্রথম থেকে বুঝতে পারা একটি বিশেষ সমস্যা। যথেষ্ট সহানুভূতি, পর্য্যবেক্ষণ ও দক্ষতার সঙ্গে ব্যাহত শিশুকে অন্যান্য শিশুদের মধ্যে থেকে খুঁজে বার করে অবিলম্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পথনির্দ্দেশ ও পরামর্শদানের তৎপর আয়োজন করা দরকার। প্রত্যেক ব্যাহত শিক্ষার্থীর পৃথক ব্যক্তিগত তথ্যানুসন্ধান আবশ্যক। এই কাজটি যথাযথভাবে করার জন্য শিশু পথনির্দ্দেশ কেন্দ্র ও মনস্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকা দরকার। আমাদের দেশে এধরণের চিকিৎসা কেন্দ্র কিছু কিছু স্থাপিত হয়েছে, বিশেষতঃ শহরাঞ্চলে।

শিশুর স্বাস্থ্য বিশ্লেষণ ও শিক্ষা প্রয়োজন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের পর তার উপযুক্ত শিক্ষণ ব্যবস্থা করার প্রশ্ন আসে। এই শিক্ষণ ব্যবস্থা তিনটি উপায়ে করা চলে: (১) শিশুকে বিশেষজ্ঞের অধীনে বা মানসিক হাসপাতালে রাখা; (২) সাধারণ ক্লাসে বিশেষ পাঠক্রম দিয়ে শিশুকে অধ্যয়ন করানো, এবং (৩) শিশুকে কোন বিশেষ ধরণের স্কুলে বা প্রতিষ্ঠানে পাঠানো। বিশেষ ধরণের স্কুল বলতে বোঝায়: (১) অন্ধদের স্কুল, (২) মূক-বধিরদের স্কুল, (৩) বিকলাঙ্গদের শিক্ষাকেন্দ্র, (৪) জড়ধী শিক্ষার্থীদের স্কুল, (৫) অনাথাশ্রম, (৬) আচরণ-বিকৃত বালকবালিকাদের প্রতিষ্ঠান, এবং (৭) পথনির্দ্দেশ চিকিৎসাকেন্দ্র।

ভারতে বর্ত্তমানে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে প্রচলিত হয়নি এবং শিক্ষার্থীদের পর্য্যবেক্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়নি বলে দৈহিক, মানসিক ও

সামাজিক ব্যাহত শিশুদের সমস্যার প্রকৃত রূপ সম্যক্‌ভাবে বিচার করা যায় না। তবে ব্যাহত শিশু সংখ্যা যে বিপুল, একথা বলা চলে। এদেশে অন্ধ, মূক, বধির ও জড়ধী শিশুর প্রকৃতি জানা যায় না। জনগণনার মাধ্যমে এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগৃহীত ও সঙ্কলিত না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্যার বিপুলতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা এবং সমাধানের ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা করাও অসম্ভব।

ভারতে আধুনিককালে বৃটিশ আমলে ব্যাহত শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য কোনও আয়োজনই করা হয়নি ; তবে এবিষয়ে প্রশংসনীয় কাজ করেছিলেন খ্রীষ্টান মিশনারীরা। ১৮৮৩ সালে এ্যানি শার্প নামে এক মিশনারী মহিলা অমৃতসরে অন্ধদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৩ সালে স্কুলটি দেরাদুনে স্থানান্তরিত হয়। অন্ধদের জন্য একটি মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন কুমারী আস্কউইথ নামে এক মহিলা ১৮৯০ সালে পালিয়াম কোট্টাইতে। তারপর ১৮৯৯ সালে লালবিহারী শাহ নামে একজন ভারতীয় খ্রীষ্টান কলিকাতা অন্ধ স্কুল স্থাপনা করেন। বোম্বাইতে ১৯০০ সালে কুমারী আনা মিলার্ড আমেরিকান মিশন স্কুল ফর্‌ দি ব্লাইণ্ড নামে অন্ধদের স্কুল খোলেন, এই স্কুলটি এখন দাদার স্কুল ফর্‌ দি ব্লাইণ্ড নামে পরিচিত।

ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং রাজ্য শিক্ষা দপ্তরগুলি ব্যাহতদের শিক্ষা প্রসার বিষয়ে অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণে প্রয়াসী হয়েছে এবং এবিষয়ে অর্থ সাহায্য, ব্যাহতদের শিক্ষা কেন্দ্রগুলি তত্ত্বাবধানের আয়োজন হচ্ছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে ব্যাহতদের শিক্ষা বিষয়ে পরামর্শদানের জন্য একটি জাতীয় উপদেষ্টা কাউন্সিল স্থাপিত হয়েছে। এই সংস্থায় ব্যাহতদের শিক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা আছেন এবং ব্যাহতদের শিক্ষা সম্পর্কে, তাদের প্রশিক্ষণ, কর্ম্মনিয়োগ, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সুখ-সুবিধা বিষয়ে ভারত সরকারকে পরামর্শ দেওয়াই সংস্থাটির কাজ। :৯৫২ সালে ভারতীয় শিশু কল্যাণ কাউন্সিল সংগঠিত হয়েছে শিশুকল্যাণ ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, সংকলন, গবেষণা, সমন্বয়ণ, সহযোগিতা ও তথ্য বিনিময়ের উদ্দেশ্যে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা—কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষৎ গঠিত হয়েছে, এই পর্ষদটিও ব্যাহতদের শিক্ষা বিষয়ে সংগঠন ও অর্থবণ্টন করছে। এই পর্ষদের মাধ্যমে ১৯৫৫ সালে ভারত সরকার ১৩'৫ লক্ষ টাকা শিশু কল্যাণে ব্যয় করেছেন। ১৯৬২ সালে সমগ্র ভারতে ব্যাহতদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ধরণের স্কুল ছিল ১৫৩টি এবং স্কুলগুলি ৬,৭২৩ জন বালক ও ১,৮৮৫ জন ব্যাহত বালিকা (মোট ৮,৬০৮ জন ব্যাহত শিক্ষার্থী) বিশেষ ধরণের শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে।

অন্ধদের স্কুল : ভারতে এখন প্রায় ২০ লক্ষ অন্ধজন আছে বলে ভারতের পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন। কিন্তু ঐ জনসংখ্যার অতি অল্পই

শিক্ষা-গ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান জনহিতকর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুঃস্থ অন্ধ শিশুদের ভরণপোষণের আবাসরূপেই গণ্য করা হয়; শিক্ষার আয়োজন সেখানে আশানুরূপ নয়। প্রতিষ্ঠানগুলি সামান্য চাঁদা ও দানলব্ধ অর্থে পরিচালিত হয়; বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি প্রতিষ্ঠানগুলিকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য দিচ্ছেন। অন্ধদের স্কুলের পাঠক্রমে থাকে বৃত্তিমূলক বিষয়, যেমন—বেত বোনা, ঝুড়ি তৈরী, বই বাঁধাই প্রভৃতি। আঞ্চলিক ভাষায় ব্রেইল পদ্ধতি লিখন ও পঠনের অধ্যাপনাও হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ভারতীয় ব্রেইল পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা চলেছে এবং ঐ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেরাদুনে দুটি সুসজ্জিত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে অন্ধদের শিক্ষা ও পুনর্ব্বাসনের উদ্দেশ্যে; এই দুটি প্রতিষ্ঠানে অন্ধদের শিক্ষা সম্পর্কে গবেষণার আয়োজনও করা হয়েছে। প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষায় ব্রেইল পদ্ধতিতে গ্রন্থাদি প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সালে কেন্দ্রীয় ব্রেইল প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; সম্ভবতঃ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় এধরণের একমাত্র ছাপাখানা এইটি। কিছুদিন পূর্ব্বে এই ছাপাখানাটির বিভাগরূপে অন্ধদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতির অন্যান্য উপকরণ প্রস্তুতের কেন্দ্রও খোলা হয়েছে।

মূক ও বধিরদের স্কুল : আমাদের দেশে বধিরদের স্কুলে সাধারণতঃ মূক, বধির, বিকলাঙ্গ ও অন্ধদেরও একই সঙ্গে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। অন্ধদের স্কুলের পাঠক্রমের মতই এদের পাঠক্রম হয়ে থাকে। সঙ্গীত শিক্ষার পরিবর্ত্তে বধিরদের চিত্রাঙ্কণ, মাটির কাজ প্রভৃতি শেখানো হয়। ওষ্ঠ সঞ্চালন পদ্ধতির সাহায্যে লিখন, পঠন ও গণিত শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

বিকলাঙ্গদের শিক্ষাকেন্দ্র : বিকলাঙ্গদের শিক্ষাব্যবস্থা অন্ধ ও মূক-বধিরদের থেকে পৃথক, কারণ বিকলাঙ্গ শিশুরা সাধারণ শিশুদের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তবে বিকলাঙ্গরা যে সকল অত্যাবশ্যক উপকরণ ব্যবহার করে চলাফেরা করতে বাধ্য হয়, সেই উপকরণগুলির যথাযথ ব্যবহার শিক্ষা দেওয়াই তাদের শিক্ষার একটি প্রধান সমস্যা। বিকলাঙ্গ শিশুদের কর্ম্মের প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পেশীর অনুশীলন করানো তাদের শিক্ষার অঙ্গ। এজন্য তাদের শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য তাদের পেশী চিকিৎসায় সহায়তা করা। এজন্য বিকলাঙ্গদের শিক্ষাকেন্দ্র স্বভাবতই হাসপাতালের সংলগ্ন হয়; সাধারণ স্কুলে যোগ দিয়েও বিকলাঙ্গদের হাসপাতালে চিকিৎসা চলে।

জড়ধীদের স্কুল : জড়ধী শিশুদের শিক্ষাদানের মূল লক্ষ্য হলো তাদের নিজস্ব উপায়ে ও সামর্থ্য অনুসারে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জ্জনে সক্ষম করে তোলা। এধরণের প্রতিষ্ঠান এদেশে মাত্র তিনটি আছে। মানসিক

চিকিৎসার হাসপাতালগুলিতে এদেশে জড়ধী শিশুদের শিক্ষাদানের কোনও বিশেষ বন্দোবস্ত নেই।

অনাথাশ্রম : আশ্রয়হীন শিশুদের জন্য অনাথাশ্রম এদেশে অনেক আছে। বোম্বাই, মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী এবং উত্তর প্রদেশে শিশুদের জন্য আইনবিধি প্রবর্ত্তিত হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী ঐ সকল রাজ্যে অনাথাশ্রম ব্যবস্থা প্রসার লাভ করেছে। এই সকল অনাথাশ্রম ছাড়াও মিশনারী প্রতিষ্ঠান, স্যালভেশন আর্মি আবাস, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের অনাথ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে স্বেচ্ছাসেবী জনকল্যাণকর কর্ম্মসূচী অনুযায়ী। নির্ভরযোগ্য অনাথাশ্রমে শিশুদের কল্যাণে যথার্থ ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু বহু অনাথাশ্রমে দুঃস্থ বালকবালিকাদের শোষণ করা হয় বলে শোনা যায়।

আচরণ-বিকৃত তরুণদের প্রতিষ্ঠান : কিশোর ও তরুণ আচরণ-বিকৃতি ও সমস্যামূলক গতিপ্রকৃতি পারিবারিক পরিবেশ থেকেই সৃষ্টি হয়, কিন্তু পরে সামাজিক পরিবেশে সমস্যার সংক্রমণ ঘটে। শিশুদের জন্য আইনবিধি অনুসারে শিশুদের আইনগত অপরাধ, শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা, শিশুদের উন্মত্ত আচরণের নিয়ন্ত্রণ, এবং অসহায়ত্ব সম্পর্কে রাষ্ট্র থেকে ব্যবস্থা অবলম্বনের আয়োজন ইদানীং হয়েছে। অনেক রাজ্যে তরুণদের জন্য বিশেষ বিচারালয় স্থাপিত হয়েছে। আচরণ-বিকৃত তরুণদের শিক্ষার জন্য তরুণদের কারাগার, সংস্কারমূলক প্রতিষ্ঠান, অন্তরীণ প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বিভিন্ন সংগঠনে কিছু কিছু ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

চিকিৎসা ও পথনির্দ্দেশ কেন্দ্র : ক্লিনিক ও গাইড্যান্স সেন্টারগুলিতে শিশু ও বয়স্ক ব্যাহত শিক্ষার্থীদের মনচিকিৎসা পদ্ধতিতে স্বাভাবিক প্রগতির পথে সহায়তা করা হয়। এধরণের প্রতিষ্ঠান এদেশে খুবই অল্প ; কয়েকটি মাত্র মানসিক হাসপাতালে পথনির্দ্দেশ কেন্দ্র আছে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অনুসারে কয়েকটি শিশু পথনির্দ্দেশ ক্লিনিক বিভিন্ন শহরে স্থাপিত হয়েছে। বেসরকারী উদ্যোগেও কিছু কিছু গাইড্যান্স ক্লিনিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে এখনো এই সুযোগ পৌছয়নি।

ব্যাহতদের শিক্ষার প্রশাসনের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে চীফ্ ইন্সপেক্টর বা চীফ প্রবেশন অফিসার নিযুক্ত থাকেন। ব্যাহতদের শিক্ষাব্যয় নির্ব্বাহ হয় কিছুটা রাষ্ট্রকোষ থেকে, কিছুটা স্থানীয় সংস্থার কোষ থেকে, কিছুটা শিক্ষার্থীদের বেতন ও কিছুটা অন্যান্য অর্থদান থেকে। কেন্দ্রীয় সরকার মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে দুটি কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্র স্থাপনা করেছেন ব্যাহতদের কর্ম্মসংস্থানের বিশেষ বন্দোবস্তের উদ্দেশ্যে। অন্ধদের স্কুলের পরে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভারত সরকার অর্দ্ধেক ব্যয়ভার বহন করেন। সম্প্রতি মূক-বধির ও বিকলাঙ্গদের জন্য বিদ্যার্থ-বৃত্তি প্রবর্ত্তিত হয়েছে।

Q. 2. Discuss the problems of education for the handicapped in India.

Ans. ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন দিকে দ্রুত প্রগতি হয়ে চলেছে। সামাজিক কল্যাণের সকল দিকেই রাষ্ট্র এখন মনোযোগী হয়েছে। সমাজ-কল্যাণের জন্যই ব্যাহতদের শিক্ষার ব্যবস্থাতেও যথাযথ মনোযোগ দিতে হবে এবং সেজন্য এই বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থাটির সমস্যাগুলি পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

প্রথমেই প্রয়োজন, দেশের ব্যাহত প্রতিবন্ধ বিভিন্ন ধরণের ব্যক্তি ও শিশুর সঠিক জনগণনা। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন পর্য্যায়ের ব্যাহতদের সঠিক সংখ্যা জানা না গেলে সমস্যা সমাধানের সর্ব্বাঙ্গীন আয়োজন করা সম্ভব নয়। অথচ আমাদের জনগণনার হিসাবে সেরকম কোন সঠিক পরিসংখ্যান সহজে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে জনগণনা কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

সঠিক জনগণনা অনুসারে বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাহতদের শিক্ষার প্রয়োজন নির্দ্ধারণ করে উন্নততর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। ব্যাহত শিশুদের জন্য বিশেষ ধরণের নার্শারীর অভাব আমাদের দেশে আছে; সুতরাং এ ধরণের উন্নত পর্য্যায়ের প্রতিষ্ঠান, ব্যাহতদের জন্য গ্রন্থাগার, বৃত্তিমূলক সংস্থা, উচ্চতর শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও সহায়তা দান প্রভৃতির আয়োজন করতে হবে। বৃদ্ধ ব্যাহত ব্যক্তিরা যাতে সমাজে অবহেলিত না হন, সেজন্য তাঁদের উপযোগী যত্ন নেওয়ার এবং তাঁদের জীবনকে সার্থকতার আনন্দে ভরিয়ে তোলার জন্য বিশেষ আবাসিক কেন্দ্র আরও প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার।

ব্যাহত ব্যক্তিদের এক বিপুল সংখ্যা গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী। সুতরাং তাদের উপযোগী গ্রামীণ পাঠক্রম প্রণয়ন করা কর্ত্তব্য। গ্রামের উপযোগী বৃত্তি ও কৃষিকার্য্য সম্পর্কে গ্রামের ব্যাহত জনগণ যাতে বিশেষ শিক্ষালাভ করে গ্রামেরই উন্নয়ন কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করে সার্থকতায় তৃপ্তি পেতে পারে, সে ব্যবস্থা আমাদের দেশে উপযুক্ত পাঠক্রমের মাধ্যমে করতে হবে।

এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে, ব্যাহতদের জন্য আরও অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে প্রয়োজন। কিন্তু অর্থের অভাবে এ ধরণের প্রতিষ্ঠান অধিক সংখ্যায় গড়ে তোলা এবং পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং এ বিষয়ে অধিকতর অর্থসংগ্রহের দিকে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিশু কল্যাণ কর্ম্মসূচীর জন্য মাত্র তিন কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে; স্পষ্টতই এই অর্থ বিপুল সমস্যার অনুপাতে অতি অল্প। অথচ এ ধরণের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রীয় অর্থ সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না।

ব্যাহতদের শিক্ষার জন্য সুদক্ষ সহানুভূতিশীল শিক্ষক ও কর্মীর অভাব একটি বিশেষ সমস্যা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ ব্রতে উদ্বুদ্ধ কর্মী ও শিক্ষকদের এ বিষয়ে অগ্রসর হতে দেখা যায়। ব্যাহত ও প্রতিবন্ধ শিশু ও ব্যক্তিদের শিক্ষাদানের আধুনিকতম পদ্ধতি ও কৌশলগুলি সম্পর্কে গভীরভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা প্রত্যক্ষ শিক্ষকতার কার্য্যে খুব উৎসাহ বোধ করে না। সম্ভবতঃ বেতনের স্বল্পতার জন্যই এই সমস্যা এত প্রকট। সেজন্য ব্যাহতদের শিক্ষাকার্য্যে যোগদানে ইচ্ছুক কর্মীদের কতকগুলি বিশেষ সম্মান ও সুবিধাদানের কথা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

ব্যাহত শিশুদের প্রতি যথাযথ যত্ন নেওয়ার জন্য যে শিশু-আইন প্রবর্ত্তিত হয়েছে, তা রাজ্যের সকল অংশে সমানভাবে প্রয়োগ করা হয় না বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। তাছাড়া আইনের সকল বিধিও ঠিকমত কার্য্যকরী হয় না। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের অব্যবস্থা ও দুর্ব্বলতাই একমাত্র কারণ বলে, মনে হয়। কেবল আইন প্রণয়ন করেই সমস্যার সমাধান করা যায় না; যথেষ্ট সংখ্যক কর্মীরও প্রয়োজন আইন কার্য্যকরী করার জন্য। তাছাড়া ব্যাহত শিশুদের পুনর্ব্বাসন সমস্যা সমাধানের জন্য কর্মীদের যথেষ্ট উৎসাহী ও সহিষ্ণু হতে হয়। বর্ত্তমান প্রশাসন ব্যবস্থা এমনই যে কর্মীরা এ বিষয়ে যথেষ্ট উদ্দীপনা বোধ করে না। সুতরাং ব্যাহতদের শিক্ষা এবং পুনর্ব্বাসন কর্ম্মসূচীর অগ্রগতি খুবই ধীর হয়ে পড়েছে।

Q. 3. Describe the role of Third Five-Year Plan of India in the field of education for the handicapped as social welfare.

Ans. প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গত এক যুগ ধরে সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার উন্নয়নের এমন একটি তাৎপর্য্য রয়েছে, যা বিভিন্ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা অথবা সঙ্গতি সদ্ব্যবহারের পরিমাণকে অতিক্রম করে যায়। এই সমস্ত কার্য্যকলাপের মধ্যে প্রকাশ পায় সমাজের ভিতরকার বহুবিধ দুর্ব্বল শ্রেণীর লোকদের কল্যাণকল্পে সমাজের উৎকণ্ঠা এবং এতে জোর দেওয়া হয় জাতীয় উন্নয়নে একটি অপরিহার্য্য মূল্যের উপর। সৃজনধর্ম্মী সমাজসেবার ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের, বিশেষতঃ মহিলাদের আকর্ষণ করে এনে সমাজ নিজেই সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় যে সমস্ত সমাজকল্যাণ কর্ম্মসূচী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি কর্ত্তৃক রূপায়িত হয়েছে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সেগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়াও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সমাজ-কল্যাণ পর্ষদসমূহ কর্ত্তৃক গৃহীত কল্যাণ প্রসার প্রকল্পগুলি, সামাজিক

প্রতিরক্ষা, সামাজিক ও নৈতিক স্বাস্থ্য এবং আরোগ্যোত্তর সংস্থাসমূহ সম্পর্কিত কর্ম্মসূচীও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজ কল্যাণমূলক কর্ম্মসূচীর যে সমস্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তার জন্য মোট বরাদ্দ হয়েছে ২৫ কোটি টাকা—১৬ কোটি টাকা কেন্দ্রে এবং ৯ কোটি টাকা রাজ্যসমূহে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি এবং কল্যাণসম্প্রসারণ প্রকল্পসমূহকে সহায়তা দানসমেত কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের কর্ম্মসূচীগুলি বাবদ মোট ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে ১২ কোটি টাকা। এছাড়া শিক্ষাকল্যাণ কার্য্যসূচীর জন্য রাখা হয়েছে মোট ৩ কোটি টাকা শিক্ষা খাতে। দৈহিক অকর্ম্মণ্য, বৃদ্ধ এবং অন্যান্য ব্যাহত ও প্রতিবন্ধ নারী ও শিশুদের সহায়তা প্রদানের সামান্য কিছু ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে শিশু-কল্যাণসূচীর উপর। প্রতিরাজ্যে এবং কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে শিশু কল্যাণ সংক্রান্ত অন্ততঃ একটি পথদেশক প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ এবং অন্যান্য সংস্থা কর্ত্তৃক আয়োজিত কার্য্যকলাপের সম্পূর্ণ সমন্বয়সাধনের ভিত্তিতে। শিশুকল্যাণ কর্ম্মীবৃন্দের (বালসেবিকা) শিক্ষণসূচীও হাতে নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

সামাজিক প্রতিরক্ষাসূচীতেও তরুণ-বয়স্কদের অপরাধ নিরোধ ও সংশোধন, নৈতিক ও সমাজিক স্বাস্থ্য, নারী ও বালিকাদের মধ্যে পতিতাবৃত্তি দমনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ১৯৬০ সালের শিশু-আইন বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অত্যাবশ্যক বিষয়গুলিতে দেশের সর্ব্বত্র সমরূপতা অবলম্বনের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ব্যাহত প্রতিবন্ধ বিভিন্ন ধরণের গোষ্ঠীর জন্য, ব্যবস্থিত কার্য্যকলাপগুলির প্রথম লক্ষ্য হবে কাজের মাধ্যমে ব্যাহত ব্যক্তিরা যাতে নিজেদের পুনর্ব্বাসন নিজেরাই সম্পাদন করতে পারে। এই কার্য্যকলাপগুলি নিম্নলিখিত ধারায় অধিকতর সুষ্ঠু করে তুলতে হবে :—

১। ব্যাহত ব্যক্তি ও শিশুদের আপন গৃহেই শিক্ষার আয়োজন ;

২। বিকলাঙ্গদের বাসগৃহের নিকটেই কর্ম্মসংস্থানের আয়োজন ;

৩। ব্যাহত বিকলাঙ্গ ব্যক্তি ও শিশুদের স্বাস্থ্যকর অবসর বিনোদনের সুযোগ ; এবং

৪। বিশেষ সাহায্যের আকারে অর্থসহায়তা প্রদান।

Q 4. Give a brief description of education for the handicapped in U. S. A.

Ans. আমেরিকায় গত ১০।১৫ বছরে ব্যাহত জনগণের শিক্ষা ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে। ঐদেশে কোনও শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক ৭৫-এর

নীচে হলে তাকে মানসিক ব্যাহতদের পর্য্যায়ভুক্ত করা হয়। আমেরিকার শিক্ষাবিদরা মনে করেন, শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক ৩০ পর্য্যন্ত হলে তাকে প্রশিক্ষণ দান করা চলে, কিন্তু ৩০-এর নীচে হলে শিক্ষার চেয়ে তার রক্ষণাবেক্ষণের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন বোধ করেন। শিশুর শিক্ষার প্রাথমিক পর্য্যায়তেই বুদ্ধি পরিমাপ ও সতর্ক পর্য্যবেক্ষণের ফলে আজকাল আমেরিকার ব্যাহত শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কিত অবহেলা অনেক হ্রাস পেয়েছে। বুদ্ধি অভীক্ষা ছাড়াও র্‍র্শাক অভীক্ষার মতো বহুবিধ প্রক্ষেপমূলক (প্রজেক্টিভ) অভীক্ষা প্রয়োগের সাহায্যে শিশুর প্রতিবন্ধতা নিরূপণে তৎপর হন আমেরিকার শিক্ষাবিদরা। মানসিক ব্যাহত শিশুদের বিপুল অংশ সাধারণ স্কুলেই অধ্যয়ন করে; অনেক শিশু দিনমানে বিশেষ স্কুলেও পড়ে। অতি অল্পসংখ্যক ব্যাহত শিশুই আবাসিক স্কুলে যোগ দেয়। সাধারণ স্কুলে যে সব ব্যাহত শিশু অধ্যয়ন করে, তাদের শিক্ষাপদ্ধতি ও প্রগতি সম্পর্কে লক্ষ্য রাখা ও সহায়তা করার জন্য বিশেষজ্ঞ শিক্ষক মাঝে এক একটি স্কুলে কিছুদিন অন্তর শিক্ষকতা করে যান; ব্যাহত শিশুদের শিক্ষাদানের উপযোগী বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের অভাবের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমেরিকায় ব্যাহত শিশুদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করে অনেকে বলেন, এর ফলে বহু ব্যাহত শিশু সাধারণ ও স্বাভাবিক শিক্ষালাভে ও সমাজ সংযোগে বঞ্চিত হবে।

আমেরিকার ব্যাহত শিশুদের যদিও সাধারণ স্কুলেই অধ্যয়নের ব্যবস্থা অধিক প্রচলিত, তবুও ঐ দেশে ব্যাহত শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ক্লাশ ও বিশেষ পাঠক্রমের প্রয়োজন স্বীকৃত হয়। ব্যাহত শিক্ষার্থীর মনোভঙ্গীর লক্ষণগুলি অবলম্বনে বিশেষ ধরনের syndrome পাঠক্রম প্রণয়নের গবেষণা করা হচ্ছে। সমাজনাট্য (sociodrama) পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাহত শিশুদের, বিশেষ করে ব্যাহত তরুণদের শিক্ষাদান সহজ করা গেছে বলে অনেক আমেরিকান শিক্ষাবিদ দাবী করে থাকেন।

১৯৫০ সাল পর্য্যন্তও আমেরিকার শিশুদের যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ২৫ থেকে ৫০ হতো, তাদের বাড়ীতে অথবা আবাসিক স্কুলে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হতো। তারপর থেকে দিনমানে বিশেষ ক্লাশে ব্যাহত শিশুদের বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ক্রমশঃই প্রসারলাভ করছে। প্রতি বছর উক্ত বুদ্ধ্যঙ্কের প্রায় ২৫ হাজার ব্যাহত শিশু আমেরিকার বিভিন্ন বিশেষ ক্লাশে বা আবাসিক স্কুলে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। এই সব ক্লাশে বা স্কুলে ব্যাহত শিশুদের সমাজায়িত করা, ব্যক্তিগত যত্ন নেওয়ার শিক্ষা দেওয়া, গ্রহণযোগ্য আচরণ শেখানো, পরিবারের কাজকর্ম্মে সহায়তা করতে শেখানো, সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কর্ম্মসংস্থান ক্ষেত্রে সফলতা অর্জ্জনের উপায়গুলি শেখানোর দিকেই অধিকতর যত্ন নেওয়া হয়।

দৈহিক ব্যাহত শিশুদের শিক্ষার জন্যও আমেরিকায় ব্যাপক আয়োজন আছে। তবে গ্রামাঞ্চলের ব্যাহত শিশুরা এখনো শহরের শিশুদের চেয়ে কম সুযোগ সুবিধাই পেয়ে থাকে। দৈহিক ত্রুটি যথাসম্ভব শীঘ্র নিরূপণ করা, দৈহিক শিক্ষার্থীদের বিশেষ শিক্ষার জন্য উচ্চতর শিক্ষক শিক্ষণ, দৈহিক ব্যাহতদের সহায়তার জন্য উন্নততর সরঞ্জাম ও উপকরণ প্রস্তুত প্রভৃতি বিষয়ে সম্প্রতি বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছে। দৈহিক ব্যাহতদের শিক্ষার সুযোগদানের জন্য রাষ্ট্রীয় আইনবিধিও যথেষ্ট সহায়তা করে থাকে এবং রাষ্ট্র থেকে ব্যাহতদের শিক্ষাবিষয়ে বহু অর্থ ব্যয় করা হয়। প্রতি বছর প্রায় ৩০,০০০ দৈহিক ব্যাহত শিশু আমেরিকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষ শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকে ; এদের মধ্যে অন্ধ, মূক বধির, বিকলাঙ্গ, এলার্জিগ্রস্ত, হৃদরোগগ্রস্ত, হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত বহু মূত্ররোগগ্রস্ত, এমন কি যক্ষ্মাক্রান্ত শিশুও আছে। শিক্ষাদানের পর শিক্ষার্থীদের কর্ম্মসংস্থানের বিষয়ে সহায়তার জন্য বৃত্তি পথনির্দ্দেশ কেন্দ্র আছে।

ব্যাহতদের বৃত্তি ও কর্ম্মসংস্থান সম্পর্কে সুব্যবস্থার জন্য আমেরিকায় বৃত্তি পুনর্ব্বাসন আইন প্রচলিত আছে। ১৯৫৪ সালের পাবলিক ল ৫৬৫ নামক আইনটি ব্যাহত ব্যক্তিদের রক্ষণাবেক্ষণ শিক্ষা ও কর্ম্মসংস্থানের সুষ্ঠু আয়োজন সম্ভব করেছে। এই বিষয়টি আমেরিকার সরকারী শিক্ষাদপ্তরের অধীন। এই বিষয়ে রাষ্ট্রকোষ থেকে আমেরিকায় প্রতি বছর প্রায় ৩·২০ কোটি ডলার ব্যয় করা হয়।

Q. 5. Give a brief description of education for the handicapped in U. K.

Ans. **বৃটিশ যুক্তরাজ্যে** ১৯৪৪ সালের শিক্ষাআইনে ব্যাহত শিক্ষার্থীদের বিশেষ ধরনের শিক্ষাদানের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। এইসব শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক স্কুল স্থাপন বা অন্য কোনরকমভাবে সুশিক্ষার আয়োজন করতে বলা হয়েছে। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে ব্যাহত শিক্ষার্থীদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে এইরকম : অন্ধ, আংশিক অন্ধ, বধির, আংশিক বধির, ক্ষীণ স্বাস্থ্য বহুমূত্র রোগগ্রস্ত, শিক্ষায় অনগ্রসর, হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত, আচরণ-বিকৃত, দৈহিক-ব্যাহত প্রভৃতি। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই বৃটিশ রাজ্যে ব্যাহত শিশুদের শিক্ষার নানারকম আয়োজন ছিল। ১৮৯৩ সালের প্রাথমিক শিক্ষা আইনে অন্ধ ও বধির ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল কর্ত্তৃপক্ষগুলিকে বিশেষ ধরণের স্কুল স্থাপন করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। ১৮৯৯ সালের প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিকলাঙ্গ ও হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত শিশুদেরও ঐ ধরনের বিশেষ শিক্ষার আয়োজন করতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

১৯৪৪ সালের শিক্ষাআইনে ব্যাহত শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থাকে সাধারণ

শিক্ষাব্যবস্থা থেকে পৃথক করা হয়নি। সাধারণ ছেলেমেয়েদের মতো ব্যাহত শিশুদেরও বয়স সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষাদানের দায়িত্ব স্কুল কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছে।

অন্ধদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা বৃটিশ রাজ্যে অনেকদিন পূর্ব্বেই সুরু হয়েছে। ১৭৯০ সালে লিভারপুলে প্রথম অন্ধদের স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৬৯ সালে Worcester কলেজে অন্ধদের জন্য প্রথম মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৯ সালে অন্ধদের জন্য স্কুল ছিল ৩৯টি, শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ১৬০০। বর্ত্তমানে সেখানে অন্ধদের জন্য স্কুলের সংখ্যা প্রায় ৬০টি এবং শিক্ষার্থী প্রায় ৪০০০ জন। পূর্ব্বে কেবলমাত্র পূর্ণ অন্ধদেরই অন্ধ বলে গণ্য করা হতো। কিন্তু ১৯৪৪ সালের আইনের বিধিমত আংশিক অন্ধ বা ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্যও বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। পূর্ব্বে পূর্ণ অন্ধ ও আংশিক অন্ধদের একই আবাসিক প্রতিষ্ঠানে রেখে শিক্ষা দেওয়া হতো। ১৯৪৫ ও ১৯৪৭ সালে আংশিক অন্ধদের জন্য পৃথক আবাসিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়েছে।

বধির শিক্ষার্থীদের জন্যও বৃটিশ রাজ্যে বিশেষ শিক্ষার আয়োজন ১৮শ শতাব্দী থেকেই আছে। বর্ত্তমানে ঐ দেশে বধিরদের জন্য বিশেষ স্কুল আছে প্রায় ৬০টি এবং ঐ স্কুলগুলিতে বিশেষ শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে প্রায় ৬০০০ জন শিক্ষার্থী। তবে ঐ দেশে বধির শিশুর সংখ্যা প্রায় ১০,০০০; সুতরাং তাদের জন্য আরও স্কুল প্রয়োজন।

বিকলাঙ্গ ও ক্ষীণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্যও পৃথক স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা ১৯৪৪ সালের শিক্ষাআইনে নির্দ্দেশিত হয়েছে। বৃটিশ রাজ্যে এ ধরণের শিশুর সংখ্যা প্রায় ১৪০,০০০; কিন্তু বর্ত্তমানে তাদের মধ্যে মাত্র ১৯,০০০ শিশুর বিশেষ ধরনের শিক্ষার আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং বিকলাঙ্গদের স্কুলের সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে হবে।

শিক্ষায় অনগ্রসর শিশুদের বিশেষ ধরনের শিক্ষার সুযোগ দেওয়াও ১৯৪৪ সালের আইন অনুসারে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য বলে গণ্য হয়েছে। ক্ষীণবুদ্ধির জন্য যারা শিক্ষায় অগ্রসর হতে ব্যাহত হয়, তাদের জন্য ১৮৯০ সালে লিসেষ্টার ও লণ্ডনে প্রথম বিশেষ ধরনের স্কুল খোলা হয়। ১৯০৯ সালের মধ্যে বিভিন্ন স্থানীয় শিক্ষা সংস্থা এই ধরনের প্রায় ৪০টি স্কুল সংগঠিত করেন। বর্ত্তমানে দেশের সর্ব্বত্র এ ধরনের বহু স্কুল আছে। কিন্তু আরও প্রয়োজন। এখন প্রতি বছর প্রায় ১৭০০০ অনগ্রসর বৃটিশ শিশু বিশেষ শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকে। তবে আরও ১০,০০০ অনগ্রসর শিশুর শিক্ষার আয়োজন করতে হবে।

হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য বৃটিশ রাজ্যে প্রথম বিশেষ স্কুল

প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৩ সালে। ১৯১০ সালে স্থানীয় শিক্ষা সংস্থার উদ্যোগে ম্যানচেষ্টারেও একটি স্কুল খোলা হয়। এখন এ ধরনের ব্যাহত শিশুদের মধ্যে প্রায় ৯০০ জন বিশেষ শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।

আচরণ-বিকৃত শিক্ষার্থীদের জন্য চিকিৎসা ও পথনির্দেশ কেন্দ্র বৃটেনে ১৯শ শতাব্দী থেকেই প্রচলিত। সাম্প্রতিক হিসাবে দেখা যায়, সমগ্র দেশে এখন এ ধরণের নির্দেশকেন্দ্রের সহায়তায় প্রতি বছর সহস্রাধিক শিশু উপযুক্ত সুশিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ছাড়াও বৃটেনে বহু স্বেচ্ছাসেবী জনহিতকর প্রতিষ্ঠানেও ব্যাহত শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। বর্তমানে সমগ্র বৃটেনে রাষ্ট্রীয় ও স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগে সকল শ্রেণীর ব্যাহত শিশুদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭০০-এরও বেশি।

তবে ১৯৪৪ সালের শিক্ষাআইন বৃটেনের ব্যাহত শিক্ষার সকল সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। যথেষ্ট সংখ্যক মনোবিদ্ শিক্ষকের অভাবে আজও মেডিক্যাল অফিসারদের নির্দেশমত ব্যাহত শিশুদের শিক্ষার আয়োজন করতে হয়। বিশেষ ক্লাশগুলিতে বহু ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষক ব্যাহত শিক্ষার্থীদের প্রতি যথোপযুক্ত যত্ন নিতে পারেন না। অবশ্য রাষ্ট্র ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির যুক্ত উদ্যোগে অগ্রগতি সন্তোষজনক।

Q. 6. Discuss the special problems and methods of educating the blind child.

Ans. কোন অন্ধ শিশুকে বিশেষ ধরণের শিক্ষাদানের আয়োজন করা হবে কিনা, তা সিদ্ধান্ত করার পূর্বে শিশুটির মানসিক সামর্থ্য সম্পর্কে তথ্য-নিরূপণ আবশ্যক। এই তথ্যনিরূপণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করতে হয়; অন্ধত্বের কারণ যথাযথভাবে জানতে হবে; কোন কোন অন্ধত্বের মূলে মস্তিষ্কের গুরুতর ত্রুটি থাকে।

অন্ধ শিশুকে মাঝে মাঝে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রাখতে হয় বা হাসপাতালে থাকতে হয়। এর ফলে শিশু মাতৃস্নেহ থেকে প্রায়ই বঞ্চিত হয়ে মানসিক বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। এজন্য চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শিশুর সঙ্গে সামাজিক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয় এবং শারীরিক চিকিৎসার সঙ্গে তার মানসিক সজীব স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখার দিকে সমান যত্ন নিতে হয়। বিশেষতঃ যে পরিবারে সামাজিক সম্পর্ক শান্তিময় নয়, সেক্ষেত্রে অন্ধ শিশুর মনে আরও নিরাপত্তাবোধ জাগাতে হয়। অন্ধ শিশু কোনও একজন সহানুভূতিশীল বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে নিরাপত্তামূলক সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হলে তার শিক্ষাব্যবস্থা সফল হতে পারে।

অন্ধ শিশুদের জন্য বিশেষ ধরণের বুদ্ধি অভীক্ষা অন্যান্য দেশে আছে।

অনুরূপ বুদ্ধি অভীক্ষা আমাদের দেশেও গবেষণা মাধ্যমে প্রণয়ন ও ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া শিশুকে তার খেলার মধ্যে পর্য্যবেক্ষণ করে তার প্রকৃত অসুবিধা ও ত্রুটির কারণগুলি বোঝবার চেষ্টাও করতে হবে। তার দৃষ্টিশক্তি নেই বলে তাকে স্নেহ বোঝাবার জন্য স্পর্শ ও কথাবার্ত্তার দ্বারা সন্তুষ্ট রাখতে হবে। অন্যান্য পেশী যাতে কর্ম্মক্ষম থাকতে পারে, এজন্য বয়স্ক তত্ত্বাবধানে তাকে যতদূর সম্ভব অবাধ চলাফেরা, কাজ করার সুযোগ দিতে হবে; কারণ অন্ধ শিশুর অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্ট হলে তবেই তার পক্ষে দর্শনেন্দ্রিয়ের অভাব পূরণ করা সহজ হবে। অন্ধ শিশুদের বিভিন্ন ধরণের জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করার সুযোগ দিতে হবে; তবে বিপজ্জনক ক্ষতিকর জিনিসপত্র তার হাতে দেওয়ার সময়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্ধ শিশুর দু'বছর থেকে সাত বছর পর্য্যন্ত সাধারণ শিশুর মতই শিক্ষাদান চালানো যায়; অবশ্য লিখন, পঠন ও গণিত শিক্ষার জন্য বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। ৬।৭ বছর বয়সে অন্ধ শিশু উপলব্ধি করে যে, সে অন্যান্য শিশুদের থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। তখন থেকেই তার শিক্ষার কোন কোন বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

অন্ধ শিশুকে প্রথমেই আত্মনির্ভরতার সঙ্গে চলাফেরার শিক্ষা দিতে হবে। স্বভাবত তারা আত্মকেন্দ্রিক হয় বলে সামাজিক সংযোগ রক্ষা বেশি পরিমাণে করতে হবে, যাতে তার মন সমাজের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে সক্ষম হয়। সেই সঙ্গে তাকে বিবিধ কায়িক কর্ম্মসূচীর মাধ্যমে হাতের আঙুল ব্যবহারে দক্ষ করে তুলতে হবে, কারণ ব্রেইল পদ্ধতিতে লিখন-পঠন চালাতে হলে নিপুণ অঙ্গুলি সঞ্চালন ও স্পর্শক্ষমতা থাকা দরকার। এই ক্ষমতা যথেষ্ট না হলে ব্রেইল পদ্ধতির সাথে অন্ধ শিশুর পরিচয় করানো ঠিক নয়। সাধারণতঃ ৬ বছর বয়সের আগে এইজন্যই ব্রেইল পদ্ধতি অন্ধ শিশুদের শেখানো হয় না।

অন্ধ শিশুদের শিল্পকাজের মধ্যে মাটির কাজ, বালির খেলা, প্রভৃতি রাখা যায় প্রাথমিক স্তরে; পরে অঙ্গুলি দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে অন্যান্য শিল্প শিক্ষা দেওয়া উচিত। খেলাধুলার মধ্যে কল্পনামূলক খেলাই অন্ধ শিশুদের প্রিয় এবং হিতকর। সঙ্গীত ও ছন্দমূলক আনন্দানুষ্ঠানও অন্ধ শিশুদের খুবই উপযোগী। অনেক সময়ে বুদ্ধিমান প্রতিভাশালী অন্ধ শিশু বয়স্ক জীবনে সঙ্গীত বৃত্তি গ্রহণ করে থাকে।

Q. 7. Discuss the special problems and methods of educating the deaf child.

Ans. এক বছর বয়সেই শিশুর বধিরতা বোঝা যায়। সুতরাং যথাসম্ভব শীঘ্র শিশুর বধিরতা বুঝতে পেরে তার উপযুক্ত শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। তবে যেসব শিশু আংশিক বধির, তাদের অসুবিধা বা ব্যাঘাত সহজে

বোঝা যায় না। এই ধরণের শিশুকে অনেকে ভুল বোঝে এবং কথার জবাব না দিলে মানসিক ত্রুটিসম্পন্ন মনে করা হয়। চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী এবং শ্রবণ-যন্ত্র সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি শ্রবণ-সরঞ্জামের সাহায্যে শিশুর বধিরতা ঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারেন।

বধির শিশুর শ্রবণশক্তি ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার ফলে সে কোন ঘটনার পূর্ব্বাভাষ গ্রহণ করতে পারে না। সেজন্য তার দৈনন্দিন জীবনে বহু জিনিস আকস্মিক বলে সে মনে করে এবং মানসিক ও প্রাক্ষোভিক প্রস্তুতির সুযোগ না পেয়ে তৎপরতার সঙ্গে প্রতিক্রিয়া সাধন করতে পারে না। এই আকস্মিকতা তাকে আঘাত করে এবং সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে না বলে বধির শিশু পারিবারিক জীবনে সার্থকভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। ভাষার দিক থেকে তার এই অক্ষমতা থাকার দরুণ তার ব্যক্তিত্ব গঠন ব্যাহত হয়। সেজন্য বধির শিশুকে অন্যভাবে ঘরের কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহ দেওয়া উচিত এবং তার আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টিতে সহায়তা করা উচিত। স্নেহ ও নিরাপত্তা সম্পর্কে বধির শিশুকে নিশ্চিন্ত করতে পারলে তার মধ্যে যুক্তিসঙ্গত স্বাধীন সহযোগী ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে থাকে। বধির শিশুরা অন্ধকারকে খুব ভয় করে, সেজন্য এই জিনিসটি থেকে তাদের দূরে রাখতে পারলেই নিরাপত্তাবোধ অক্ষুণ্ণ থাকে। শব্দ শুনতে পায় না বলে বয়স্ক ব্যক্তিদের উপস্থিতি অন্য উপায়ে তাকে বোঝাতে হয়—প্রধানতঃ যা দৃষ্টিশক্তিতে বোঝা যায়।

বধির শিশুর বুদ্ধি বিকাশ ব্যাহত হয় ভাষার অভাবে। ভাষার সাহায্যে চিন্তাশক্তি প্রসারতা লাভ করে, কিন্তু বধির শিশু ভাষা ব্যবহার করতে না পারায় তার বুদ্ধ্যঙ্ক হ্রাস পায়। অবশ্য এই অসুবিধা দূর করার জন্য শিক্ষাবিদগণ বধির শিশুর খেলার মধ্যে বিবিধ সরঞ্জাম ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং এই খেলার সরঞ্জামগুলিকেই বধির শিশু ভাষার উপাদানরূপে সুকৌশলে কাজে লাগাতে হয়।

বধির শিশুকে ভাষা শিক্ষা দেওয়ার সমস্যাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ওষ্ঠ সঞ্চালনের সাহায্যে বধির শিশুকে অপরের ভাষা বুঝতে শেখাতে পারলে তার চিন্তাশক্তি ও ভাব আদানপ্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বধির শিশুর দৃষ্টিশক্তি ভাল না হলে তার পক্ষে অপরের ওষ্ঠ সঞ্চালন যথাযথভাবে লক্ষ্য করা সম্ভব হয় না, ফলে ওষ্ঠ সঞ্চালনের মাধ্যমে ভাষাশিক্ষার ব্যাপারেও বধির শিশুকে অনেক সময় অসুবিধা ভোগ করতে হয়। তাছাড়া এ বিষয়ে শিশুর ধৈর্য্য, আগ্রহ ও সমাজপ্রিয়তা থাকাও একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং সহানুভূতির সঙ্গে বধির শিশুর ব্যক্তিত্বে এই গুণগুলি প্রথমে সঞ্চারিত করতে হয়।

সম্পূর্ণ বধির শিশু কখনই স্বাভাবিক ভাষা আয়ত্ত করতে পারে না। তবে